জন্ম শতবর্ষ স্মরণে

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

জন্ম-শতবর্ষ-স্মরণে

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

অষ্টম খণ্ড

উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

এই খণ্ডে 'পত্রাবলী' শেষ হইল (১৮৯৭ সেপ্টে.—১৯০২ জুলাই)। যথাসম্ভব সময়ানুক্রমে সাজাইবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ১২ খানি পত্র পরিশিষ্টে দিতে হইল, সেগুলি বিভিন্ন বৎসরের।

পত্রাবলীর পর এই খণ্ডে 'মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ' সন্নিবেশিত হইয়াছে ; 'উদ্বোধন' হইতে প্রকাশিত ঐ নামের পুস্তকে যে বক্তৃতাগুলির অনুবাদ গ্রথিত, সেগুলির সঙ্গে 'কৃষ্ণ ও তাঁহার শিক্ষা' বক্তৃতার অনুবাদ, বুদ্ধের বাণী, 'মহম্মদ' বিষয়ক বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ, 'পওহারী বাবা' প্রবন্ধের অনুবাদ, এবং বিখ্যাত 'My Master' বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ 'মদীয় আচার্যদেব' সংযোজিত হইল। তদুপরি এই গ্রন্থে আলোচিত মহাপুরুষগণ সম্বন্ধে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত আলোচনাও আছে। 'গীতা' বিষয়ক বক্তৃতা-তিনটি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত শিক্ষা, সেগুলি 'গীতা-প্রসঙ্গ' নামে এই খণ্ডের শেষে যুক্ত হইল।

তথ্যপঞ্জীতে প্রথমে 'মহাপুরুষ-প্রসঙ্গে'র পরে সমগ্র পত্রাবলীর অতি-প্রয়োজনীয় তথ্যপঞ্জী প্রদত্ত হইল। পত্রাবলীর সূচীপত্রে (বর্তমান গ্রন্থাবলীর তিন খণ্ডে প্রকাশিত) ক্রমিক সংখ্যানুসারে যথাসম্ভব সকল পত্রের তারিখ, কোথা হইতে, কাহাকে ও কি ভাষায় লিখিত—সকল তথ্য তালিকাকারে সজ্জিত হইয়াছে। আশা করি, অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের ইহাতে বিশেষ সুবিধা হইবে।

এই খণ্ড প্রকাশযোগ্য করিবার জন্য যাঁহারা আমাদের সামান্যভাবেও সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। মেরী লুই বার্ক লিখিত 'Swami Vivekananda in America : New Discoveries' হইতে আমরা বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি।

এই গ্রন্থাবলীর অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ড ছাপাইবার আংশিক ব্যয় ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

স্বামীজীর বাণী ও রচনা ছোট বড় সকলের নিকট সমাদৃত হউক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

প্রকাশক

সূচীপত্র

পত্রাবলী

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীনগর, কাশ্মীর*

১লা অক্টোবর, ১৮৯৭

প্রিয় মার্গো,[১]

অনেকে অপরের নেতৃত্বে সবচেয়ে ভাল কাজ করতে পারে। সকলেই কিছু নেতা হয়ে জন্মায় না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নেতা তিনিই, যিনি শিশুর মতো অন্যের উপর নেতৃত্ব করেন। শিশুকে আপাততঃ অন্যের উপর নির্ভরশীল ব'লে মনে হলেও, সে-ই সমগ্র বাড়ির রাজা। অন্ততঃ আমার ধারণা এই যে, এই হ'ল নেতৃত্বের মূল রহস্য।...অনুভব অনেকেই করে সত্য, কিন্তু জন-কয়েকেই মাত্র প্রকাশ করতে পারে। অন্যের প্রতি অন্তরের প্রেম, প্রশংসা ও সহানুভূতি প্রকাশ করার যে ক্ষমতা, তাই এক জনকে অপরের অপেক্ষা ভাবপ্রচারে অধিক সাফল্য দান করে।...

তোমার কাছে কাশ্মীরের বর্ণনা দেবার চেষ্টাও ক'রব না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এই ভূস্বর্গ ছাড়া অন্য কোন দেশ ছেড়ে আসতে আমার কখনও মন খারাপ হয়নি। সম্ভব হ'লে, রাজাকে রাজী করিয়ে এখানে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবারও যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। এখানে অনেক কিছু করবার আছে—আর উপকরণও এত আশাপ্রদ!...

বড় অসুবিধা এই: আমি দেখতে পাই—অনেকে তাদের প্রায় সবটুকু ভালবাসাই আমাকে অর্পণ করে; কিন্তু প্রতিদানে কোন ব্যক্তিকে আমার তো সবটুকু দেওয়া চলে না; কারণ একদিনেই তা হ'লে সমস্ত কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। অথচ নিজের গণ্ডীর বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত নয়—এমন লোকও আছে, যারা এরূপ প্রতিদানই চায়। কর্মের সাফল্যের জন্য যত বেশী সম্ভব লোকের উৎসাহপূর্ণ অনুরাগ আমার একান্ত প্রয়োজন; অথচ আমাকে সম্পূর্ণভাবে সব গণ্ডীর বাইরে থাকতে হবে। নতুবা হিংসা ও কলহে সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। নেতা যিনি, তিনি থাকবেন ব্যক্তির গণ্ডীর বাইরে। আমার বিশ্বাস তুমি এ কথা বুঝতে পারছ। আমি

---

১ মিস মার্গারেট নোবল্।

একথা বলছি না যে, অপরের শ্রদ্ধাকে তিনি পশুর মতো নিজের কাজে লাগাবেন, আর মনে মনে হাসবেন। আমি যা বলতে চাই, তা আমার নিজের জীবনেই পরিস্ফুট; আমার ভালবাসা একান্তই আমার আপনার জিনিস, আবার প্রয়োজন হ'লে—বুদ্ধদেব যেমন বলতেন 'বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়'—তেমনি আমি নিজহস্তেই আমার হৃদয়কে উৎপাটিত করতে পারি। এ প্রেমে উন্মত্ততা আছে, কিন্তু কোন বন্ধন নেই। প্রেমের প্রভাবে অচেতন জড়বস্তু চেতনে পরিবর্তিত হয়। বস্তুতঃ এই হ'ল আমাদের বেদান্তের সার কথা। একই সদ্বস্তু অজ্ঞানীর চক্ষে 'জড়' এবং জ্ঞানীর চক্ষে 'ভগবান' ব'লে প্রতিভাত হন এবং জড়ের মধ্যে যে চেতনের ক্রমিক পরিচয়-লাভ—তাই হ'ল সভ্যতার ইতিহাস। অজ্ঞানীরা নিরাকারকেও সাকাররূপে দেখে, জ্ঞানী সাকারেও নিরাকারের দর্শন পান। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দের মধ্যে আমরা শুধু এই শিক্ষাই পাচ্ছি।...অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা কর্মের পক্ষে অনিষ্টকর। 'বজ্রের মতো দৃঢ় অথচ কুসুমের মতো কোমল'—এটিই হচ্ছে সার নীতি।

চিরস্নেহশীল সত্যাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৩৬৬

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

মরী
১০ই অক্টোবর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

কাশ্মীর হইতে গত পরশু সন্ধ্যাকালে মরীতে পৌঁছিয়াছি। সকলেই বেশ আনন্দে ছিল। কেবল কেষ্টলাল ও গুপ্তর মধ্যে মধ্যে জ্বর হইয়াছিল—তাহাও সামান্য। এই Address (অভিনন্দনটি) খেতড়ির রাজার জন্য পাঠাইতে হইবে—সোনালী রঙে ছাপাইয়া ইত্যাদি। রাজা ২১।২২শে অক্টোবর নাগাদ বোম্বে পৌঁছিবেন। বোম্বেতে আমাদের কেহই এক্ষণে নাই। যদি কেহ থাকে, তাহাকে এক কপি পাঠাইয়া দিবে—যাহাতে সে ব্যক্তি রাজাকে জাহাজেই ঐ Address প্রদান করে বা বোম্বে শহরেতে কোথাও। উত্তম কপিটি খেতড়িতে পাঠাইবে। একটি মিটিং-এ (সভাতে) ঐটি পাস

করিয়া লইবে। যদি কিছু বদলাইতে ইচ্ছা হয়, হানি নাই। তাহার পর সকলে সহি করিবে; কেবল আমার নামের জায়গাটা খালি রাখিবে—আমি খেতড়ি যাইয়া সহি করিব। এ বিষয়ে কোন ত্রুটি না হয়। যোগেন কেমন আছে পত্রপাঠ লিখিবে—লালা হংসরাজ সাহানী, উকিল, রাওলপিণ্ডির ঠিকানায়। রাজা বিনয়কৃষ্ণের তরফের Address (অভিনন্দন)টা দুদিন নয় দেরী হবে—আমাদেরটা যেন পৌঁছায়। * *

এইমাত্র তোমার ৫ই তারিখের পত্র পাইলাম। যোগেনের সংবাদে বিশেষ আনন্দিত হইলাম এবং আমার এই চিঠি পাইবার পূর্বেই হরিপ্রসন্ন বোধ হয় আম্বালায় পৌঁছিবে। আমি তাহাদিগকে ঠিক ঠিক advice (নির্দেশ) সেখানে পাঠাইব। মা-ঠাকুরানীর জন্য ২০০৲ টাকা পাঠাইলাম—প্রাপ্তিস্বীকার করিবে।...ভবনাথের স্ত্রীর সম্বন্ধে কিছুই কেন লিখ নাই। তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলে কি ?

ক্যাপ্টেন সেভিয়ার বলিতেছেন যে, তিনি জায়গার জন্য অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। মসূরীর নিকট বা অন্য কোন central (কেন্দ্রস্থানীয়) জায়গায় একটা স্থান যত শীঘ্র হয়—তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে, মঠ হ'তে দু-তিন জন এসে জায়গা select (পছন্দ) করে। তাদের মনোনীত হলেই তিনি মরী হ'তে গিয়ে খরিদ ক'রে একদম বিল্ডিং শুরু করবেন। খরচ অবশ্য তিনিই পাঠাবেন। আমার selection (পছন্দ) তো এক আমাদের ইঞ্জিনিয়র। বাকী আর যে যে এ বিষয়ে বোঝে—পাঠাবে। ভাব এই যে, খুব ঠাণ্ডা স্থানেও কাজ নাই, আবার বড় গরমও না হয়। ডেরাডুন গরমিকালে অসহ্য—শীতকালে বেশ। মসূরী itself (খাস মসূরী) শীতকালে বোধ হয় সকলের পক্ষে ঠিক নয়। তার আগিয়ে বা পেছিয়ে—অর্থাৎ ব্রিটিশ বা গাড়োয়াল রাজ্যে জায়গা পাওয়া যাবেই। অথচ সেই জায়গায় বারমাস জল চাই নাইবার-খাবার জন্য। এ বিষয়ে মিঃ সেভিয়ার তোমায় খরচ পাঠিয়ে চিঠি লিখছে। তার সঙ্গে সমস্ত ঠিকানা করবে।

আমার plan (পরিকল্পনা) এক্ষণে এই—নিরঞ্জন, লাটু, দীনু এবং কৃষ্ণলালকে জয়পুরে পাঠাই; আমার সঙ্গে কেবল অচু আর গুপ্ত। মরী থেকে রাওলপিণ্ডি, তথা হ'তে জম্মু, সেখান হ'তে লাহোর, তারপর একেবারে করাচি তথা হ'তে। আমি এখান হইতেই মঠের জন্য collection (অর্থসংগ্রহ)

আরম্ভ করিলাম। যেখান হ’তে তোমার নামে টাকা আসুক না, তুমি মঠের ফণ্ডে জমা করিবে ও দুরস্ত হিসাব রাখিবে। দুটো ফণ্ড আলাদা—একটা কলকাতার মঠের জন্য, আর একটা famine work etc. (দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য ইত্যাদি)। আজ সারদা ও গঙ্গার দুই চিঠি পাইলাম। কাল তাদের চিঠি লিখব। আমার বোধ হয় সারদাকে ওখানে না পাঠিয়ে Central Province (মধ্যপ্রদেশ)-এ পাঠানো ভাল ছিল। সেখানে সাগরে ও নাগপুরে আমার অনেক লোক আছে—ধনী ও পয়সা-দেনেওয়ালা ইত্যাদি। যাহা হউক, আসছে নভেম্বরে সব হবে। আজ বড় তাড়া। এইখানেই শেষ।

শশীবাবুকে আমার বিশেষ আশীর্বাদ ও প্রণয় দিও। মাষ্টার মহাশয় এতদিন বাদে কোমর বেঁধে নেমেছেন দেখছি। তাঁকে আমার বিশেষ প্রণয়ালিঙ্গন দিও। এইবার তিনি জেগেছেন দেখে আমার বুক দশহাত হয়ে উঠল। আমি কালই তাঁকে পত্র লিখছি। অলমিতি—ওয়া গুরুকী ফতে—To work! to work! (কাজে লেগে যাও, কাজে লেগে যাও)। তোমার সব চিঠিপত্র পেয়েছি। ইতি

বিবেকানন্দ

৩৬৭

(স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লিখিত)

মরী

১০ই অক্টোবর, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রে তোমার শরীর তেমন ভাল নয় শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। Unpopular (অপ্রিয়) লোককে যদি popular (লোকপ্রিয়) করতে পারো, তবেই বলি বাহাদুর। পরে ওখানে কোনও কার্য হইবার আশা নাই। তদপেক্ষা ঢাকা বা অন্য কোন স্থানে যাইতে পারিলেই ভাল হইত। যাহা হউক, নভেম্বরে যে work close (কাজ বন্ধ) হইবে, সেই মঙ্গল। শরীর যদি খারাপ বেশী হয় তো চলিয়া আসিবে। Central Province-এ (মধ্যপ্রদেশে) অনেক field (কার্যক্ষেত্র) আছে এবং famine (দুর্ভিক্ষ) ছাড়াও আমাদের দেশে দরিদ্রের অভাব কি? যেখানে হউক একটা ভবিষ্যৎ বুঝে বসতে পারলেই কাজ হয়। যাহা হউক, দুঃখিত হইও না।

যাহা করা যায়, তাহার নাশ নাই—কখনও নহে; কে জানে ঐখানেই পরে সোনা ফলিতে পারে।

আমি শীঘ্রই দেশে কার্য আরম্ভ করিব। এখন আর পাহাড় বেড়াবার আবশ্যক নাই। শরীর সাবধানে রাখিবে। কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ

৩৬৮

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত)

মরী
১০ই অক্টোবর, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। লম্বা প্ল্যানে এখন কাজ নাই, যাহা under existing circumstances possible (বর্তমান অবস্থায় সম্ভব) হয়, তাহাই করিবে। ক্রমে ক্রমে the way will open to you (তোমার পথ খুলিয়া যাইবে)। Orphanage (অনাথাশ্রম) অতি অবশ্যই করিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মেয়েটিকেও ছাড়া হবে না। তবে মেয়ে-Orphanage-এর (অনাথাশ্রমের জন্য) মেয়ে-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চাই, আমার বিশ্বাস '—'মা এ বিষয়ে কাজ করতে বেশ পারবেন। অথবা উক্ত গ্রামের কোনও বৃদ্ধা বিধবাকে এ কার্যে ব্রতী করাও, যাঁর ছেলেপুলে নাই। তবে ছেলেদের ও মেয়েদের স্বতন্ত্র স্থান হওয়া চাই। সেভিয়ার সাহেব এ কার্যের জন্য তোমায় টাকা পাঠাইতে রাজী। তাঁহার ঠিকানা Nedon's Hotel, লাহোর। যদি তাঁকে চিঠি লেখ, উপরে লিখবে 'To wait arrival' (আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে)। আমি শীঘ্রই কাল বা পরশু রাওলপিণ্ডি যাইতেছি, পরে জম্মু হইয়া লাহোর ইত্যাদি দেখিয়া, করাচি প্রভৃতি হইয়া রাজপুতানায় আসিব।

আমার শরীর বেশ ভাল আছে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুঃ—মুসলমান বালকও লইতে হইবে বৈকি এবং তাহাদের ধর্ম নষ্ট করিবে না। তাহাদের খাওয়া-দাওয়া আলগ্ করিয়া দিলেই হইল এবং

যাহাতে তাহারা নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম—জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এখন শিকেয় তুলে রাখো।

বি

আমাদের দেশে এখন আবশ্যক Manhood (মনুষ্যত্ব) এবং দয়া। 'স ঈশঃ অনির্বচনীয়প্রেমস্বরূপঃ'—তবে 'প্রকাশ্যতে ক্কাপি পাত্রে'[১]—এই স্থলে এই বলা উচিত,—'সঃ প্রত্যক্ষ এব সর্বেষাং প্রেমরূপঃ'—তিনি প্রেমরূপে সর্বভূতে প্রকাশমান। আবার কি কাল্পনিক ঈশ্বরের পূজো হে বাপু! বেদ, কোরান, পুরাণ, পুঁথি-পাতড়া এখন কিছুদিন শান্তি লাভ করুক—প্রত্যক্ষ ভগবান দয়া-প্রেমের পূজো দেশে হোক। ভেদবুদ্ধিই বন্ধন, অভেদবুদ্ধিই মুক্তি, সাংসারিক মদোন্মত্ত জীবের কথায় ভয় পেও না। অভীঃ, অভীঃ। লোক না পোক! হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান ইত্যাদি সকল জাতের ছেলে লও, তবে প্রথমটা আস্তে আস্তে, অর্থাৎ তাদের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি একটু আলগ্ হয়; আর ধর্মের যে সর্বজনীন সাধারণ ভাব, তাই শিখাইবে। ইতি

বিবেকানন্দ

৩৬৯

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

মরী

১১ই অক্টোবর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

কাশ্মীর হ'তে আজ দশ দিন পর্যন্ত সমস্ত কাজ যেন একটা ঝোঁকে করেছি ব'লে মনে হচ্ছে। সেটা শরীরের রোগ হোক বা মনেরই হোক। এক্ষণে আমার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি আর কাজের যোগ্য নই।...তোমাদের উপর অত্যন্ত কটু ব্যবহার করেছি, বুঝতে পারছি। তবে তুমি আমার সব সহ্য করবে আমি জানি; ও মঠে আর কেউ নেই যে সব সইবে। তোমার উপর অধিক অধিক কটু ব্যবহার করেছি; যা হবার তা হয়েছে—কর্ম! আমি

---

১ সেই ঈশ্বর অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ—তবে পাত্রবিশেষে প্রকাশ পান।

অনুতাপ কি ক'রব, ওতে বিশ্বাস নাই—কর্ম! মায়ের কাজ আমার দ্বারা যতটুকু হবার ছিল ততটুকু করিয়ে শেষ শরীর-মন চুর ক'রে ছেড়ে দিলেন 'মা'। মায়ের ইচ্ছা!

এক্ষণে আমি এ-সমস্ত কাজ হ'তে অবসর নিলাম। দু-এক দিনের মধ্যে আমি সব···ছেড়ে দিয়ে একলা একলা চলে যাব; কোথাও চুপ ক'রে বাকী জীবন কাটাব। তোমরা মাপ করতে হয় ক'রো, যা ইচ্ছা হয় ক'রো। মিসেস বুল বেশী টাকা দিয়েছেন। শরতের উপর তাঁর একান্ত বিশ্বাস। শরতের পরামর্শ নিয়ে সকল মঠের কাজ ক'রো, যা হয় ক'রো। তবে আমি চিরকাল বীরের মতো চলে এসেছি—আমার কাজ বিদ্যুতের মতো শীঘ্র, আর বজ্রের মতো অটল চাই। আমি ঐ রকমই ম'রব। সেইজন্য আমার কাজটি ক'রে দিও—হারা-জিতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। আমি লড়ায়ে কখনও পেছ-পাও হইনি; এখন কি···হবো? হার-জিত সকল কাজেই আছে; তবে আমার বিশ্বাস যে, কাপুরুষ মরে নিশ্চিত কৃমিকীট হয়ে জন্মায়। যুগ যুগ তপস্যা করলেও কাপুরুষের উদ্ধার নেই—আমায় কি শেষে কৃমি হয়ে জন্মাতে হবে?···আমার চোখে এ সংসার খেলামাত্র—চিরকাল তাই থাকবে। এর মান-অপমান দু-টাকা লাভ-লোকসান নিয়ে কি ছমাস ভাবতে হবে?···আমি কাজের মানুষ! খালি পরামর্শ হচ্ছে—ইনি পরামর্শ দিচ্ছেন, উনি দিচ্ছেন; ইনি ভয় দেখাচ্ছেন, তো উনি ডর! আমার চোখে এ জীবনটা এমন কিছু মিষ্টি নয় যে, অত ভয়-ডর ক'রে হুঁশিয়ার হয়ে বাঁচতে হবে। টাকা, জীবন বন্ধু-বান্ধব, মানুষের ভালবাসা, আমি—সব অত সিদ্ধি নিশ্চিত ক'রে যে কাজ করতে চায়, অত ভয় যদি করতে হয়তো গুরুদেব যা বলতেন যে, 'কাক বড় স্যায়না—' তার তাই হয়। আর যাই হোক, এ-সব টাকা-কড়ি, মঠ-মড়ি, প্রচার-ফ্রচার কি জন্য? সমস্ত জীবনের এক উদ্দেশ্য—শিক্ষা। তা ছাড়া ধন-বাড়ি স্ত্রী-পুরুষ প্রয়োজন কি?

এজন্য টাকা গেল, কি হার হ'ল—আমি অত বুঝতে পারি না বা পারব না। লড়াই করলুম কোমর বেঁধে—এ আমি খুব বুঝি; আর যে বলে, 'কুছ পরোয়া নেই, ওয়া বাহাদুর, আমি সঙ্গেই আছি'···তাকে বুঝি, সে বীরকে বুঝি, সে দেবতাকে বুঝি। তেমন নরদেবের পায়ে আমার কোটি কোটি নমস্কার; তারাই জগৎপাবন, তারাই সংসারের উদ্ধারকর্তা! আর যেগুলো

খালি 'বাপ রে এগিও না, ওই ভয়, ওই ভয়'—ডিস্‌পেপ্‌টিকগুলো—প্রায়ই ভয়তরাসে। তবে আমার মায়ের কৃপায় মনের এত জোর যে, ঘোর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া কখন আমায় কাপুরুষ করতে পারবে না। কাপুরুষদের আর কি ব'লব, কিছুই বলবার নাই। কিন্তু যত বীর এ জগতে বড় কাজ করতে নিষ্ফল হয়েছেন, যাঁরা কখন কোন কাজ থেকে হঠেননি, যে সকল বীর ভয় আর অহঙ্কারবশে হুকুম অগ্রাহ্য করেননি, তাঁরা যেন আমায় চরণে স্থান দেন। আমি শাক্ত মায়ের ছেলে। মিন্‌মিনে, ভিন্‌ভিনে, ছেঁড়া ন্যাতা তমোগুণ আর নরককুণ্ড আমার চক্ষে দুই এক। মা জগদম্বে, হে গুরুদেব! তুমি চিরকাল বলতে, 'এ বীর!'—আমায় যেন কাপুরুষ হয়ে মরতে না হয়। এই আমার প্রার্থনা, হে ভাই!...'উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা'—এই ঠাকুরের দাসানুদাসের মধ্যে কেউ না কেউ উঠবে আমার মতো, যে আমায় বুঝবে।

'জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন; শিয়রে শমন,...তাহা না ডরাক তোমা'—যা কখন করিনি, রণে পৃষ্ঠ দিইনি, আজ কি...তাই হবে?.. হারবার ভয়ে লড়াই থেকে হঠে আসব? হার তো অঙ্গের আভরণ; কিন্তু না লড়েই হারব?

তারা! মা!...একটা তাল ধরবার মানুষ নেই; আবার মনে মনে খুব অহঙ্কার, 'আমরা সব বুঝি'।...আমি এখন চললাম; সব...তোমাদের রইল। মা আবার মানুষ দেন—যাদের ছাতিতে সাহস, হাতে বল, চোখে আগুন জ্বলে, যারা জগদম্বার ছেলে—এমন একজনও যদি দেন, তবে কাজ ক'রব, তবে আবার আসব; নইলে জানলুম মায়ের ইচ্ছা এই পর্যন্ত।...আমার এখন 'ঘড়িকে ঘোড়া ছোটে', আমি চাই তড়িঘড়ি কাজ, নির্ভীক হৃদয়।...

সারদা বেচারীকে অনেক গাল দিয়েছি। কি ক'রব?...আমি গাল দিই; কিন্তু আমারও বলবার ঢের আছে।...আমি হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর article (প্রবন্ধ) লিখেছি।...সব ভাল, নইলে বৈরাগ্য হবে কেন?...শেষটা কি আর মা আমায় জড়িয়ে মারবেন? সকলকার কাছে আমার অনেক অপরাধ—যা হয় ক'রো।

আমি তোমাদের সকলকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি—মা যেন মহাশক্তিরূপে তোমাদের মধ্যে আসেন, 'অভয়প্রতিষ্ঠং' অভয় যেন তোমাদের করেন। আমি জীবনে এই দেখলাম, যে সদা আত্ম-সাবধান করে, সে পদে পদে বিপদে পড়ে। যে মানের ভয়ে মরে, সে অপমানই পায়। যে সদা

লোকসানের ভয় করে, সে সর্বদা খোয়ায়।...তোমাদের সব কল্যাণ হোক। অলমিতি

বিবেকানন্দ

৩৭০

মরী

১১ই অক্টোবর, ১৮৯৭

প্রিয় জগমোহনলাল,

আমি জয়পুরে যে তিন জন সন্ন্যাসীকে পাঠাচ্ছি, তাদের দেখাশোনা করার জন্য আপনি বম্বে যাবার পূর্বে কাউকে বলে যাবেন। তাদের খাবার ও থাকার একটি ভাল জায়গার ব্যবস্থা করবেন। আমি সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত তারা সেখানে থাকবে। তারা সরল মানুষ—পণ্ডিত নয়। তারা আমারই লোক, একজন আমার গুরুভ্রাতা। যদি তারা চায়, তাদের খেতড়িতে নিয়ে যেতে পারেন, আমি শীঘ্রই সেখানে যাব। এখন চুপচাপ ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই বছর বেশী বক্তৃতাও ক'রব না। এই সমস্ত হট্টগোলে আমার আর কোন আস্থা নেই, এতে কার্যক্ষেত্রে কোন কল্যাণই সাধিত হয় না। কলকাতায় আমার প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার জন্য আমাকে নীরবে চেষ্টা করতে হবে; আমি তাই অর্থ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে চুপচাপ ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আশীর্বাদ সহ আপনার

বিবেকানন্দ

৩৭১

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

মরী

১২ই অক্টোবর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

কল্যকার পত্রে সবিশেষ লিখিয়াছি। কোন কোন বিষয়ে বিশেষ direction (নির্দেশ) আবশ্যক বোধ করিতেছি।...(১) যে যে ব্যক্তি টাকা যোগাড় করিয়া পাঠাইবে...তাহার acknowledgment (প্রাপ্তি-স্বীকার) মঠ হইতে পাইবে। (২) Acknowledgment দুইখানা—একখানা তার, অপর খানা মঠে থাকিবে। (৩) একখানা বড় খাতায় তাদের সকলের

নাম ও ঠিকানা entered (লিপিবদ্ধ) থাকিবে। (৪) মঠের ফণ্ডে যে টাকা আসিবে, তাহার যেন কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব থাকে এবং সারদা প্রভৃতি যাহাকে যাহা দেওয়া হচ্ছে, তাদের কাছ হ'তে কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব লওয়া চাই। হিসাবের অভাবে…আমি যেন জোচ্চোর না বনি। ঐ হিসাব পরে publish (ছাপিয়া বাহির) করিতে হইবে। (৫) পত্রপাঠ উকিলের পরামর্শ নিয়ে এই মর্মে উইল রেজেস্ট্রী ক'রে নিয়ে এস যে, in case (যদি) আমি তুমি মরে যাই তো হরি এবং শরৎ আমাদের মঠের যা কিছু আছে, সব পাবে।

আম্বালা হইতে এখনও কোন সংবাদ পাই নাই—হরিপ্রসন্ন প্রভৃতি পৌঁছিয়াছে কিনা। অপরার্ধ মাষ্টার মহাশয়কে দিও। ইতি

বিবেকানন্দ

৩৭২

('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'কার 'শ্রীম'কে লিখিত)

C/o লালা হংসরাজ *
রাওলপিণ্ডি
১২ই অক্টোবর, ১৮৯৭

প্রিয় ম—,

C'est bon, mon ami (বেশ হচ্ছে, বন্ধু)—এখন আপনি ঠিক কাজে হাত দিয়েছেন। হে বীর, আত্মপ্রকাশ করুন। জীবন কি নিদ্রাতেই অতিবাহিত হবে? সময় যে বয়ে যায়। সাবাস্, এই তো পথ।

আপনার পুস্তিকাপ্রকাশের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ; শুধু এই পুস্তিকার আকারে খরচ পোষাবে কি না তাই ভাবছি।… লাভ হোক বা নাই হোক গ্রাহ্য করবেন না, তা দিনের আলোতে বেরিয়ে আসুক! এজন্য আপনার উপর যেমন অজস্র আশীর্বাদ বর্ষিত হবে, তেমনি ততোধিক অভিশাপও আসবে—চিরন্তন ধারাই এই।

এই তো সময়!

ভগবদাশ্রিত
বিবেকানন্দ

৩৭৩

জম্মু*

৩রা নভেম্বর, ১৮৯৭

প্রিয় মিস নোবল,

…অত্যধিক ভাবপ্রবণতা কাজের বিঘ্ন করে; 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি'—এই হবে মূল মন্ত্র।

আমি শীঘ্রই স্টার্ডিকে লিখব। সে তোমায় ঠিকই বলেছে, বিপদ-আপদে আমি তোমার পাশে দাঁড়াব। ভারতে আমি যদি একটুকরা রুটি পাই নিশ্চয় জেনো, তুমি তার সবটুকুই পাবে। আমি কাল লাহোরে যাচ্ছি; সেখানে পৌঁছে স্টার্ডিকে চিঠি লিখব। কাশ্মীরে মহারাজের কাছ থেকে কিছু জমি পাবার আশায় গত পনর দিন আমি এখানে আছি। যদি এদেশে থাকি তো আগামী গ্রীষ্মে আবার কাশ্মীর যাব এবং সেখানে কিছু কাজ শুরু ক'রব ভাবছি।

আমার অফুরন্ত স্নেহ জানবে।

তোমাদের

বিবেকানন্দ

৩৭৪

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

লাহোর

১১ই নভেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

লাহোরের লেকচার এক রকম হইয়া গেল। দু-এক দিনের মধ্যেই ডেরাদুন যাত্রা করিব। তোমাদের সকলের অমত এবং অন্যান্য অনেক বাধাবশতঃ সিন্ধুযাত্রা এখন স্থগিত রহিল। আমার দুইখানি বিলাতী চিঠি কে রাস্তায় খুলিয়াছে। অতএব আমার চিঠিপত্র এক্ষণে আর পাঠাইবে না। খেতড়ি হইতে লিখিলে পাঠাইবে। যদি উড়িষ্যায় যাও তো এমন বন্দোবস্ত করিয়া যাও যে, কোন ব্যক্তি তোমার প্রতিনিধি হইয়া সমস্ত কার্য করে—যথা হরি। বিশেষতঃ এক্ষণে আমি প্রতিদিন আমেরিকা হইতে টাকার অপেক্ষা করিতেছি।…

হরি ও শরতের নামে যে উইল করিবার জন্য বলিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় হইয়া গিয়াছে।

এখানে সম্ভবতঃ সদানন্দ ও সুধীরকে ছাড়িয়া যাইব একটি সভা স্থাপন করিয়া। এবার লেকচারাদি আর নয়—একেবারে হুড়মুড় রাজপুতানায় যাচ্ছি। মঠ না ক'রে আর কথা নয়। শরীর regular exercise (নিয়মিত ব্যায়াম) না করিলে কখনও ভাল থাকে না, বকে-বকেই যত ব্যারাম ধরে, ইহা নিশ্চিত জানিও। সকলকে আমার ভালবাসা। ইতি

বিবেকানন্দ

৩৭৫

(শ্রীমতী ইন্দুমতী মিত্রকে লিখিত)

লাহোর

১৫ই নভেম্বর, ১৮৯৭

কল্যাণীয়াসু,

মা, বড় দুঃখের বিষয় যে, একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও এ যাত্রায় সিন্ধুদেশে আসিয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করা ঘটিল না। প্রথমতঃ ক্যাপ্টেন এবং মিসেস সেভিয়ার নামক যাঁহারা ইংলণ্ড হইতে আসিয়া আমার সহিত প্রায় আজ নয় মাস ফিরিতেছেন, তাঁহারা ডেরাদুনে জমি খরিদ করিয়া একটি অনাথালয় করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। তাঁহাদের অত্যন্ত অনুরোধ যে, আমি যাইয়া ঐ কার্য আরম্ভ করিয়া দিই, তজ্জন্য ডেরাদুন না যাইলে নহে।

দ্বিতীয়তঃ আমার অসুখ হওয়ার জন্য জীবনের উপর ভরসা নাই। এক্ষণেও আমার উদ্দেশ্য যে, কলিকাতায় একটি মঠ হয়—তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না। অপিচ দেশের লোক বরং পূর্বে আমাদের মঠে যে সাহায্য করিত, তাহাও বন্ধ করিয়াছে। তাহাদের ধারণা যে, আমি ইংলণ্ড হইতে অনেক অর্থ আনিয়াছি !! তাহার উপর এবার মহোৎসব হওয়া পর্যন্ত অসম্ভব ; কারণ রাসমণির (বাগানের) মালিক বিলাতফেরত বলিয়া আমাকে উদ্যানে যাইতে দেবেন না !! অতএব আমার প্রথম কর্তব্য এই যে, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে যে দুই-চারিটি বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কলিকাতায় একটি স্থান করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা। এই সকল

কারণের জন্য আপাততঃ অত্যন্ত দুঃখের সহিত সিন্ধুদেশ-যাত্রা স্থগিত রাখিলাম। রাজপুতানা ও কাথিয়াওয়াড় হইয়া আসিবার বিশেষ চেষ্টা করিব। তুমি দুঃখিত হইও না। আমি একদিনও তোমাদের ভুলি না, তবে কর্তব্যটা প্রথমেই করা উচিত। কলিকাতায় এক মঠ হইলে আমি নিশ্চিন্ত হই। এত যে সারা জীবন দুঃখে-কষ্টে কাজ করিলাম, সেটা আমার শরীর যাওয়ার পর নির্বাণ যে হইবে না, সে ভরসা হয়। আজই ডেরাদুনে চলিলাম —সেথায় দিন সাত থাকিয়া রাজপুতানায়, তথা হইতে কাথিয়াওয়াড় ইত্যাদি।

সাশীর্বাদং
বিবেকানন্দস্য

৩৭৬

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

লাহোর
১৫ই নভেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

বোধ হয় তোমার ও হরির শরীর এক্ষণে বেশ আছে। লাহোরে খুব ধুম-ধামের সহিত কার্য হইয়া গেল। এক্ষণে ডেরাদুনে চলিলাম। সিন্ধুযাত্রা স্থগিত রহিল। দীনু, লাটু ও কৃষ্ণলাল জয়পুরে পৌঁছিয়াছে কি না, এখনও কোন সংবাদ নাই। এখান হইতে মঠের খরচের জন্য বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় চাঁদা আদায় করিয়া পাঠাইবেন। রীতিমত receipt (রসিদ) তাঁহাকে দিও। মরী, রাওয়ালপিণ্ডি ও শিয়ালকোট হইতে কিছু পাইয়াছ কিনা লিখিবে।

এই পত্রের জবাব C/o Post Master, Dehra Dun লিখিও। অন্য চিঠি আমি ডেরাদুন হইতে পত্র লিখিলে পর পাঠাইবে। আমার শরীর বেশ আছে। তবে রাত্রে দু-একবার উঠিতে হয়। নিদ্রা উত্তম হইতেছে। খুব লেকচার করিলেও নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না, আর exercise (ব্যায়াম) রোজ আছে। ভাত তো আজ ৩ মাস রোজ খাই, কিন্তু কোনও গোল নাই। এইবার উঠে-পড়ে লাগো। সেই বড় জায়গাটার উপর চুপিসাড়ে

চোখ রেখো। এবার মহোৎসব[১] যাতে সেথায় হয়, তার বিধিমত চেষ্টা করা যাচ্ছে। সকলকে আমার ভালবাসা। ইতি

বিবেকানন্দ

পুঃ—মাষ্টার মহাশয় যদি আমাদের work (কাজকর্ম) সম্বন্ধে মাঝে মাঝে 'ট্রিবিউন'-এ লেখেন তো বড়ই ভাল হয়। তা হ'লে লাহোরটা আর জুড়ায় না। এখন তো খুব তেতেছে। টাকা-কড়ি একটু হিসাব ক'রে খরচ ক'রো; তীর্থযাত্রাটা নিজের নিজের উপর, প্রচারাদি মঠের ভার।

৩৭৭

(শ্রীমতী ইন্দুমতী মিত্রকে লিখিত)

ডেরাডুন

২৪শে নভেম্বর, ১৮৯৭

কল্যাণীয়াসু,

মা, তোমার ও হরিপদ বাবাজীর পত্র যথাকালে পাইলাম। অবশ্যই তোমাদের দুঃখিত হইবার কারণ অনেক হইয়াছে। কি করি বলো? এক্ষণে ডেরাডুনে যে কার্যে আসিয়াছিলাম, তাহাও নিষ্ফল হইল—সিন্ধুদেশেও যাওয়া হইল না। প্রভুর ইচ্ছা। এক্ষণে রাজপুতানা ও কাথিয়াওয়াড় দেশ হইয়া সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া কলিকাতায় যাইব, ইচ্ছা আছে। পথে কিন্তু আর একটি বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। তা যদি না হয়, নিশ্চিত সিন্ধুদেশে আসিতেছি। ছুটি লইয়া হায়দ্রাবাদে বৃথা আসা ইত্যাদিতে তোমাদের নিশ্চয়ই অনেক অসুবিধা হইয়া থাকিবে—সকলই প্রভুর ইচ্ছা। কষ্ট করিলেই তার সুফল আছে নিশ্চিত। আমি আগামী শুক্রবারে এ স্থান হইতে যাইব —সাহারানপুর হইয়া একেবারে রাজপুতানায় যাইবার ইচ্ছা। আমার শরীর এক্ষণে ভাল আছে। ভরসা করি, তোমরাও নীরোগ শরীরে স্বচ্ছন্দে আছ। এস্থানে ও ডেরাডুনের নিকট প্লেগ হওয়ায় অনেক হাঙ্গাম করিতেছে এবং আমাদের অনেকটা ব্যাঘাত সহ্য করিতে হইতেছে ও হইবে। মঠের

১ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

ঠিকানায় পত্র লিখিলে আমি যে-স্থানেই থাকি না কেন পাইব। তুমি ও হরিপদ বাবাজী আমার বিশেষ আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে। ইতি

সাশীর্বাদং

বিবেকানন্দস্য

৩৭৮

(স্বামী প্রেমানন্দকে লিখিত)

ডেরাডুন

২৪শে নভেম্বর, ১৮৯৭

প্রিয়বরেষু,

তোমার সকল সমাচার হরিপ্রসন্ন ভায়ার মুখে শুনিলাম। রাখাল ও হরির শরীর এক্ষণে সারিয়াছে শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম।

এবার টিহিরীর শ্রীযুক্ত বাবু রঘুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ঘাড়ে একটা বেদনার জন্য অত্যন্ত ভুগিতেছেন; আমিও নিজে ঘাড়ের একটা বেদনায় অনেকদিন যাবৎ ভুগিতেছি। যদি তোমাদের সন্ধানে পুরাতন ঘৃত থাকে, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ ডেরাডুনে উক্ত বাবুকে এবং খেতড়ির ঠিকানায় কিঞ্চিৎ আমাকে পাঠাইবে। হাবু, শরৎ (উকিল)-এর নিকট নিশ্চিত পাইবে। 'ডেরাডুন —N. W. P., রঘুনাথ ভট্টাচার্য' বলিলেই উক্ত বাবু পাইবেন।

আমি পরশ্ব দিবস সাহারানপুরে চলিলাম। সেথা হইতে রাজপুতানা।

ইতি

বিবেকানন্দ

পু:—সকলকে আমার ভালবাসা। বি

৩৭৯

ডেরাডুন*

২৪শে নভেম্বর, ১৮৯৭

প্রিয় ম—,[১]

আপনার দ্বিতীয় পুস্তিকাখানির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। বইটি সত্যই অপূর্ব। আপনার প্রণালী সম্পূর্ণ মৌলিক। ইতিপূর্বে আর কোন জীবন-

১ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'কার শ্রীম (মহেন্দ্র গুপ্ত)

চরিতকার কোন মহাপুরুষের জীবন ঠিক এই ভাবে নিজের কল্পনায় কিছুমাত্র অনুরঞ্জিত না ক'রে প্রকাশ করেনি। ভাষাও অনবদ্য—যেমন সরস ও সতেজ, তেমনি সরল ও সহজ।

আমি যে বইটি কতটা উপভোগ করেছি, তা ভাষায় প্রকাশ করবার নয়। ঐ সব পাঠ করবার সময় আমি যেন সত্যই অন্য জগতে চলে যাই। এ বড় আশ্চর্য, নয় কি? আমাদের গুরুদেব ছিলেন সম্পূর্ণ মৌলিক; সুতরাং আমাদের প্রত্যেককেও হয় মৌলিক হ'তে হবে, নয় তো কিছুই না। এখন আমি বুঝতে পারছি যে, কেন আমাদের মধ্যে আর কেউ এর আগে তাঁর জীবনী লিখতে চেষ্টা করেনি। এই বিরাট কাজ আপনার জন্যই পড়ে ছিল। তিনি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে আছেন।

অসীম ভালবাসা ও নমস্কার জানবেন। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—সক্রেটিসের কথোপকথনগুলিতে যেন প্লেটোর কথাই সর্বত্র চোখে পড়ে; আপনার এই পুস্তিকায় আপনি নিজেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রেখেছেন। নাটকীয় অংশগুলি সত্যই অপূর্ব। এদেশে এবং পাশ্চাত্যে প্রত্যেকেই বইটি পছন্দ করছে।

৩৮০

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

দিল্লী

৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

মিসেস মূলার যে টাকা দিবেন বলিয়াছেন, তাহার কতক কলিকাতায় হাজির। বাকী পরে আসিবে শীঘ্রই। আমাদেরও কিছু আছে। মিসেস মূলার তোমার ও আমার নামে গ্রিণ্ড্‌লে কোম্পানির ওখানে টাকা রাখবেন। তাতে তোমার power of attorney (ক্ষমতাপত্র) থাকার দরুন তুমি একাই সমস্ত draw করতে (তুলতে) পারবে। ঐটি যেমন রাখা, অমনি তুমি নিজে ও হরি পাটনায় সেই লোকটিকে ধর গিয়া—যেমন ক'রে পারো

influence কর (রাজী করাও); আর জমিটে যদি ন্যায্য দাম হয় তো কিনে লও। নইলে অন্য জায়গার চেষ্টা দেখ। আমি এদিকেও টাকার যোগাড় দেখছি। নিজের জমিতে মহোৎসব ক'রে তবে কাজ—তাতে বুড়োই মরে আর চেক্‌ড়াই ছেঁড়ে। এটি তোমার মনে থাকে যেন।

এই ৮।৯ মাস তুমি যে কাজ করেছ, খুব বাহাদুরি দেখিয়েছ। এইবার ধড়াধড় দেখ না একটা মঠ ও কলিকাতার একটা জায়গা না বনিয়ে দিয়ে তবে কাজ। কাজকর্ম, অথচ খুব গোপনে। কাশীপুরের বাগানটারও তল্লাস রেখো। আমি কাল আলোয়ার হয়ে খেতড়ি যাচ্ছি। শরীর বেশ আছে, ...সর্দি করেছে বটে। চিঠিপত্র খেতড়িতে পাঠাবে। সকলকে ভালবাসা। ইতি

বিবেকানন্দ

পু:—তোমাকে যে উইল করতে বলেছিলাম শরৎ ও হরির নামে, তার কি হ'ল? অথবা তুমি জায়গা-ফায়গা আমার নামে কিনবে—আমি উইল ঠিক all ready (সম্পূর্ণ তৈরী) ক'রে রাখবো। ইতি

বি

৩৮১

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

খেতড়ি[১]

৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

আমরা কাল খেতড়ি যাত্রা করিব। দেখিতে দেখিতে লটবহর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। খেতড়ি হইয়া সকলকেই মঠে পাঠাইবার সঙ্কল্প আছে। যে-সকল কাজ এদের দ্বারা হইবে মনে করেছিলাম, তাহার কিছুই হইল না। অর্থাৎ আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিলে কেহই যে কিছুই করিতে পারিবে না—তাহা নিশ্চিত। স্বাধীনভাবে না ঘুরিলে ইহাদের দ্বারা কিছুই হইবে না। অর্থাৎ আমার সঙ্গে থাকিলে কে ইহাদের পুঁছিবে—কেবল সময় নষ্ট। এই জন্য ইহাদের পাঠাইতেছি মঠে।

১ উত্তরপ্রাপ্তির জন্য খেতড়ির ঠিকানা।

Famine (দুর্ভিক্ষ) ফণ্ডে যে টাকা বাঁচিয়াছে, তাহা একটা permanent work (স্থায়ী কার্যের) ফণ্ড করিয়া রাখিয়া দিবে। অন্য কোন বিষয়ে তাহা খরচ করিবে না এবং সমস্ত famine work (দুর্ভিক্ষ-কার্য)-এর হিসাব দেখাইয়া লিখিবে যে, বাকী এত আছে অন্য good work (ভাল কাজ)-এর জন্য।...

কাজ আমি চাই—don't want any humbug (কোন প্রতারক চাই না)। যাদের কাজ করবার ইচ্ছা নেই—'যাদু, এই বেলা পথ দেখ' তারা। খেতড়ি পৌঁছিয়াই তোমার power of attorney (ক্ষমতাপত্র)-তে সহি করিয়া পাঠাইয়া দিব—যদি পৌঁছিয়া থাকে। আমেরিকার বস্টন ছাপওয়ালা চিঠিমাত্রই খুলিবে, অন্য কোনও চিঠি খুলিবে না। আমার চিঠিপত্র খেতড়িতে পাঠাইবে। টাকা আমি রাজপুতানাতেই পাইব, তাহার কোন চিন্তা নাই। তোমরা প্রাণপণে জায়গাটা ঠিক কর—এবার নিজের জমির উপর মহোৎসব করিতেই হইবে।

টাকাটা কি বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আছে অথবা তুমি অন্য কোথাও রাখিয়া দিয়াছ? টাকাকড়ি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইবে। হিসাব তন্ন তন্ন রাখিবে ও টাকার জন্য আপনার বাপকেও বিশ্বাস নাই জানিবে। ইতি

সকলকে ভালবাসা জানাইও। হরি কেমন আছে লিখিবে। মধ্যে ডেরাদুনে উদাসী সাধু কল্যাণদেব ও আরও দুই-এক জনের সহিত সাক্ষাৎ। হৃষীকেশওয়ালারা আমাকে দেখিবার জন্য বড়ই উৎসুক—'নারায়ণ হরি'র কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা ইত্যাদি।

বিবেকানন্দ

৩৮২

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

খেতড়ি

১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার power of attorney (ক্ষমতাপত্র)-তে আজ সহি করিয়া পাঠাইলাম।...টাকাটা যত শীঘ্র পার draw করিবে (তুলিবে) এবং করিয়াই

আমাকে তার দিবে। ছত্রপুর নামে কি একটি জায়গার বুন্দেলখণ্ডী রাজা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। যাইবার সময় তাঁহার ওখানে হইয়া যাইব। লিমডির রাজাও ডাকিতেছেন আগ্রহ করিয়া, সেখানেও না গেলে নহে। একবার পোঁ ক'রে কাথিয়াওয়াড় ঘুরিয়া চলিলাম আর কি! কলিকাতায় যেতে পারলেই বাঁচি।...বস্টনের খবর তো এখনও নাই; তবে হয়তো শরৎ টাকাটা নিজে নিয়ে আসছে।...যাহা হউক, যেখান থেকে যা খবর আসবে, তৎক্ষণাৎ আমাকে পত্র লিখিবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—কানাই কেমন আছে? শুনিতে পাই, তাহার শরীর ভাল নহে। তাহার বিশেষ খবর লইবে এবং কাহারও উপর হুকুম যেন না হয় দেখিবে। হরির ও তোমার সুস্থ সংবাদ লিখিবে।

৩৮৩

(স্বামী শিবানন্দকে লিখিত)

২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৯৭

প্রিয় শিবানন্দজী,

মান্দ্রাজে থাকিতেই বোম্বে গিরগাঁওয়ের যে মিঃ শেতলুরের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল, তিনি আফ্রিকাতে যে-সকল ভারতীয় বাসিন্দা রয়েছে, তাদের আধ্যাত্মিক অভাব দূরীকরণের জন্য কাহাকেও পাঠাইতে লিখিয়াছেন। অবশ্য তিনিই মনোনীত ব্যক্তিকে আফ্রিকায় পাঠাইবেন এবং আবশ্যকীয় সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন।

কাজটি আপাততঃ খুব সহজ কিংবা নির্ঝঞ্ঝাট হবে ব'লে মনে হয় না। কিন্তু এ-কাজে প্রত্যেক সৎলোকেরই এগিয়ে যাওয়া উচিত। আপনি বোধ হয় জানেন, ওখানের শ্বেতকায়েরা ভারতীয়দিগকে মোটেই ভাল চোখে দেখে না। তাই সেখানকার কাজ হচ্ছে ভারতীয়দের তত্ত্বাবধান করতে হবে, অথচ এমন ধীরভাবে, যাতে আর বিবাদের সৃষ্টি না হয়। হাতে হাতে অবশ্য এ-কাজের ফল পাবার আশা করা যায় না; কিন্তু পরিণামে দেখবেন

যে, আজ পর্যন্ত ভারতের কল্যাণের জন্য যত কাজ করা হয়েছে, সে-সকলের চেয়েও এতে বেশী উপকার হবে। আমার ইচ্ছা, আপনি একবার এতে আপনার ভাগ্যপরীক্ষা ক'রে দেখুন। যদি রাজী থাকেন, তবে এই পত্রের উল্লেখ ক'রে শেতলুরকে আপনার সম্মতি জানাবেন এবং আরও খবর চেয়ে পাঠাবেন। 'শিবা বঃ সন্তু পন্থানঃ'। আমি শারীরিক খুব ভাল নই; কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই কলকাতা যাচ্ছি, সেখানে শরীর সুস্থ হবে আশা করি। ইতি

ভগবৎপদাশ্রিত
বিবেকানন্দ

৩৮৪

(শ্রীমতী মৃণালিনী বসুকে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

দেওঘর, বৈদ্যনাথ
৩রা জানুআরি, ১৮৯৮

মা,

তোমার পত্রে কয়েকটি অতি গুরুতর প্রশ্নের সমুত্থান হইয়াছে। একখানি ক্ষুদ্র লিপিতে ঐ সকল প্রশ্নের সদুত্তর সম্ভব নহে, তবে যথাসম্ভব সংক্ষেপে উত্তর লিখিতেছি।

১। ঋষি, মুনি, দেবতা কাহারও সাধ্য নাই যে, সামাজিক নিয়মের প্রবর্তন করেন। সমাজের পশ্চাতে যখন তাৎকালিক আবশ্যকতার বেগ লাগে, তখন আত্মরক্ষার জন্য আপনা-আপনি কতকগুলি আচারের আশ্রয় লয়। ঋষিরা ঐ সকল আচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। আত্মরক্ষার জন্য মনুষ্য যেমন অনেক সময় তৎকালে রক্ষা পাইবার উপযোগী অনেক আগামী-অতি-অহিতকর উপায় অবলম্বন করে, সেই প্রকার সমাজও অনেক সময় সেই সময়ের জন্য রক্ষা পান, কিন্তু যে উপায়ে বাঁচেন, তাহা পরিণামে ভয়ঙ্কর হয়।

যথা, আমাদের দেশে বিধবা-বিবাহ-প্রতিষেধ। মনে করিও না যে, ঋষি বা দুষ্ট পুরুষেরা ঐ সকল নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছে। পুরুষজাতির স্ত্রীকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখিবার ইচ্ছা থাকিলেও সমাজের সাময়িক

আবশ্যকতার সহায়-অবলম্বন ব্যতিরেকে কখনও সফলকাম হয় না। এই আচারের মধ্যে দুটি অঙ্গ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

(ক) ছোট জাতিদের মধ্যে বিধবার বিবাহ হয়।

(খ) ভদ্র জাতিদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক।

এক্ষণে যদি প্রত্যেক কন্যাকেই বিবাহ দেওয়া নিয়ম হয়, তাহা হইলে এক-একটির এক-একটি পাত্র মিলাই কঠিন, এক-এক জনের দুই-তিনটি কোথা হইতে হয়? কাজেই সমাজ এক পক্ষের হানি করিয়াছে, অর্থাৎ যে একবার পতি পাইয়াছে, তাহাকে আর পতি দেয় না; দিলে একটি কুমারী পতি পাইবে না। যে-সকল জাতিতে আবার স্ত্রীর সংখ্যা কম, তাহাদের পূর্বোক্ত বাধা না থাকায় বিধবার বিবাহ হয়।

ঐ প্রকার জাতিভেদ-বিষয়ে এবং অন্যান্য সামাজিক আচার সম্বন্ধেও।

পাশ্চাত্যদেশে ঐ প্রকার কুমারীদের পতি পাওয়া বড়ই সঙ্কট হইতেছে।

ঐ প্রকার যদি সামাজিক কোনও আচারের পরিবর্তন ঘটাইতে হয়, তাহা হইলে ঐ আচারের মূলে কি আবশ্যকতা আছে, সেইটি প্রথমে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সেইটি পরিবর্তন করিয়া দিলেই উক্ত আচারটি আপনা হইতে নষ্ট হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন নিন্দা বা স্তুতির দ্বারা কাজ হইবে না।

২। এক্ষণে কথা এই: সমাজ এই যে-সকল নিয়ম করেন, অথবা সমাজ যে সংগঠিত হয়, তাহা কি সামাজিক সাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত? অনেকে বলেন, হাঁ; আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন, তাহা নহে। কতকগুলি লোক অপেক্ষাকৃত শক্তিমান হইয়া ধীরে ধীরে অপর সকলকে আপনার অধীন করিয়া ফেলে এবং ছলে বলে বা কৌশলে স্ব-কামনা পূর্ণ করে। যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে অজ্ঞ লোকদিগকে স্বাধীনতা দেওয়ায় ভয় আছে, এ কথার মানে কি? স্বাধীনতা মানেই বা কি?

আমার তোমার ধনাদি অপহরণের কোনও বাধা না থাকার নাম কিছু স্বাধীনতা নহে, কিন্তু আমার নিজের শরীর বা বুদ্ধি বা ধন অপরের অনিষ্ট না করিয়া যে প্রকার ইচ্ছা সে প্রকার ব্যবহার করিতে পাইব, ইহা আমার স্বাভাবিক অধিকার; এবং উক্ত ধন বা বিদ্যা বা জ্ঞানার্জনের—সকল সামাজিক ব্যক্তির সমান সুবিধা যাহাতে থাকে, তাহাও হওয়া উচিত। দ্বিতীয় কথা

এই যে, যাঁহারা বলেন, অজ্ঞ বা গরীবদিগকে স্বাধীনতা দিলে অর্থাৎ তাহাদের শরীর, ধন ইত্যাদিতে তাহাদের পূর্ণ অধিকার দিলে এবং তাহাদের সন্তানদের ধনী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সন্তানদের ন্যায় জ্ঞানার্জনের এবং আপনার অবস্থার উন্নতি করিবার সমান সুবিধা হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে, তাঁহারা কি এ কথা সমাজের কল্যাণের জন্য বলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া বলেন? ইংলণ্ডেও একথা শুনিয়াছি—'ছোটলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদের চাকুরী কে করিবে?'

মুষ্টিমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞতার অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ডুবিয়া থাকুক, তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা বিদ্যা শিখিলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে !!!

সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, এই তুমি আমি দশ জন বড় জাত !!!

আর যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলেও তোমার আমার কি অহঙ্কার যে, আমরা অন্য সকলকে পথ দেখাই? আমরা কি সবজান্তা?

'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'—আপনিই আপনার উদ্ধার কর। যে যার আপনার উদ্ধার করুক। সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ। যে-সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহাই করা উচিত। যে-সকল নিয়মের দ্বারা জীবকুল স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়, তাহার সহায়তা করা উচিত।

৩। এ জন্মে যে হঠাৎ দেখিবামাত্র তাদৃক্‌গুণাদিসম্পন্ন না হইলেও ব্যক্তি-বিশেষের উপর আমাদের আন্তরিক প্রেম আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা পূর্বজন্মজনিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৪। ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নটি বড়ই সুন্দর এবং ঐটিই বুঝিবার বিষয়। সকল ধর্মের ইহাই সার—বাসনার বিনাশ; সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় ইচ্ছারও বিনাশ হইল; কারণ বাসনা ইচ্ছাবিশেষের নামমাত্র। তবে আবার এ জগৎ কেন? এ সকল ইচ্ছার বিকাশই বা কেন? কয়েকটি ধর্ম বলেন যে, অসদিচ্ছারই নাশ হওয়া উচিত, সতের নহে। বাসনাত্যাগ ইহলোকে

পরলোকে ভোগের দ্বারা পরিপূরিত হইবে। এ উত্তরে অবশ্যই পণ্ডিতেরা সন্তুষ্ট নহেন। বৌদ্ধাদি অপর দিকে বলিতেছেন যে, বাসনা দুঃখের মূল; তাহার নাশই শ্রেয়ঃ, কিন্তু মশা মারিতে মানুষ মারার মতো বৌদ্ধাদি মতে দুঃখ নাশ করিতে নিজেকেও নাশ করিয়া ফেলিলাম।

সিদ্ধান্ত এই যে, যাহাকে আমরা ইচ্ছা বলি, তাহা তদপেক্ষা আরও উচ্চতর অবস্থার নিম্ন পরিণাম। নিষ্কাম মানে ইচ্ছাশক্তিরূপ নিম্ন পরিণামের ত্যাগ এবং উচ্চ পরিণামের আবির্ভাব। ঐরূপ [অবস্থা] মনোবুদ্ধির অগোচর, কিন্তু যেমন মোহর দেখিতে টাকা এবং পয়সা হইতে অত্যন্ত পৃথক হইলেও নিশ্চিত জানি যে, মোহর দুয়ের অপেক্ষা বড়, সেই প্রকার ঐ উচ্চতম অবস্থা বা মুক্তি বা নির্বাণ যাহাই বল, মনোবুদ্ধির অগোচর হইলেও ইচ্ছাদি সমস্ত শক্তি অপেক্ষা বড়, যদিও তাহা শক্তি নহে, কিন্তু শক্তি তাহার পরিণাম, এ জন্য সে বড়; যদিও সে ইচ্ছা নহে, কিন্তু ইচ্ছা তাহার নিম্ন পরিণাম, এজন্য তাহা বড়। এখন বোঝ, সকাম ও পরে নিষ্কামভাবে যথাযথ ইচ্ছাশক্তির পরিচালনায় ফল এই যে, ইচ্ছাশক্তিটিই তদপেক্ষা অনেক উন্নত অবস্থা লাভ করিবে।

৫। গুরুমূর্তি প্রথমে ধ্যান করিতে হয়, পরে তাহা লয় করিয়া ইষ্টমূর্তি বসাইতে হয়। এ-স্থলে প্রীতিপাত্রই ইষ্টরূপে গ্রাহ্য।

মনুষ্যে ঈশ্বর-আরোপ বড়ই মুশকিল; কিন্তু চেষ্টা করিতে করিতে নিশ্চয়ই সফল হওয়া যায়। 'প্রতি মনুষ্যে তিনি আছেন, সে জানুক বা না জানুক; তোমার ভক্তিতে সেই ঈশ্বরত্ব-উদয় তাহার মধ্যে হইবেই হইবে।

সতত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ

৩৮৫

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত)

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*

২৫শে ফেব্রুআরি, ১৮৯৮

প্রিয় শশী,

মান্দ্রাজের মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া আমরা সকলেই তোমায় অভিনন্দন জানাইতেছি। আশা করি, লোকসমাগম ভালই হইয়াছিল এবং আধ্যাত্মিক খোরাকেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল।

তোমার অতি প্রিয় মুদ্রাদি এবং ‘ক্লীঁ-ফটে’র পরিবর্তে তুমি যে মান্দ্রাজের লোকদের আত্মবিদ্যা শিখাইবার জন্য অধিকতর কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছ, তাহাতে আমরা খুব খুশী হইয়াছি। শ্রীজী[১]র সম্বন্ধে তোমার বক্তৃতা সত্যই চমৎকার হইয়াছিল—যদিও আমি খাণ্ডোয়ায় থাকা-কালে ‘মান্দ্রাজ মেল’ পত্রে ছাপা উহার একটা বিবরণ একটু দেখিয়াছিলাম মাত্র, এবং মঠে তো উহার কিছুই পায় নাই। তুমি আমাদিগকে একখানি কপি পাঠাইয়া দাও না?

শুনিতে পাইলাম, আমার পত্রাদি না পাইয়া তুমি ক্ষুণ্ণ হইয়াছ; সত্য কি? প্রকৃতপক্ষে তুমি আমায় যত চিঠি লিখিয়াছ, আমি ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে তোমায় তদপেক্ষা অধিক লিখিয়াছি। তোমার উচিত—মান্দ্রাজ হইতে প্রতি সপ্তাহে যতটা সম্ভব খবর আমাদিগকে পাঠানো। সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় হইতেছে, প্রতিদিন একখানি কাগজে কয়েক পঙ্‌ক্তি ও কয়েকটি সংবাদ টুকিয়া রাখা।

কিছুকাল যাবৎ আমার শরীর ভাল যাইতেছিল না। সম্প্রতি উহা অনেক ভাল। এখন কলিকাতায় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা একটু বেশী শীত পড়িয়াছে এবং আমেরিকা হইতে যে-সব বন্ধুরা আসিয়াছেন, তাঁহারা ইহাতে খুব আনন্দেই আছেন। যে জমি কেনা হইয়াছে, আজ আমরা উহার দখল লইব এবং যদিও এখনই ঐ জমিতে মহোৎসব করা সম্ভবপর নহে, তথাপি রবিবারে উহার উপর আমি কিছু না কিছু করাইব। অন্ততঃ শ্রীজীর ভস্মাবশেষ ঐ দিনের জন্য আমাদের নিজস্ব জমিতে লইয়া গিয়া পূজা করিতেই হইবে।

গঙ্গা এখানে আছে এবং তোমায় জানাইয়া দিতে বলিতেছে, সে যদিও ‘ব্রহ্মবাদিন্’ কাগজের জনকয়েক গ্রাহক যোগাড় করিয়াছে, তথাপি কাগজ এত অনিয়মিত ভাবে পৌঁছায় যে, তাহার ভয় হয়—তাহাদের সকলকে শীঘ্রই না হারাইতে হয়। তুমি জনৈক যুবকের সম্বন্ধে যে প্রশংসা-পত্র দিয়াছ, উহা পাইয়াছি এবং উহার সঙ্গে আছে সেই চিরন্তন কাহিনী, ‘মহাশয়, আমার জীবনধারণের কোনই উপায় নাই।’ অধিকন্তু এই কাহিনীর মান্দ্রাজী সংস্করণে এইটুকু বেশী আছে—‘আমার অনেকগুলি সন্তানও আছে।’ আমি তাহাকে

---

১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্বামীজী কখন কখন ‘শ্রী’ বা ‘শ্রীজী’ বলিয়া উল্লেখ করিতেন।

সাহায্য করিতে পারিলে খুশী হইতাম; কিন্তু সত্য বলিতে কি, আমার হাতে টাকা নাই—আমার যাহা ছিল, তাহার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত রাজার* হাতে দিয়াছি।...যাহা হউক, আমি পত্রখানি রাখালকে পাঠাইয়াছি—সে যদি কোন প্রকারে তোমার বন্ধু যুবকটিকে সাহায্য করিতে পারে। সে লিখিয়াছে যে, সে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে খৃষ্টানরা তাহাকে সাহায্য করিবে; কিন্তু সে তাহা করিবে না। তাহার হয়তো ভয় হইতেছে, পাছে তাহার ধর্মান্তর-গ্রহণে হিন্দুভারত একটি উজ্জ্বলতম রত্নকে হারায়!...

নূতন মঠে নদীতীরে বাস করিতে হওয়ায় এবং যে পরিমাণ বিশুদ্ধ ও ঠাণ্ডা হাওয়া উপভোগ করিতে হইতেছে, তাহাতে অভ্যস্ত না থাকায় এখানে ছেলেরা অনেকটা হয়রান হইয়া পড়িতেছে। সারদা দিনাজপুর হইতে ম্যালেরিয়া লইয়া আসিয়াছে।...হরিরও একটু হইয়াছিল। আমার মনে হয় ইহাতে তাদের অনেকটা মাংস ঝরিবে। ভাল কথা, আমরা এখানে আবার আমাদের নাচের ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছি; হরি, সারদা ও স্বয়ং আমাকে ওয়াল্‌ট্‌জ (waltz) নৃত্য করিতে দেখিলে তুমি আনন্দে ভরপুর হইতে। আমি নিজেই অবাক হইয়া যাই যে, আমরা কিরূপে টাল সামলাইয়া রাখি।

শরৎ আসিয়াছে এবং তাহার অভ্যাস-মত কঠোর পরিশ্রম করিতেছে। এখন আমাদের কিছু ভাল আসবাব হইয়াছে—ভাবো দেখি, সেই পুরানো মঠের চাটাই ছাড়িয়া সুন্দর টেবিল, চেয়ার ও তিনখানি খাট পাওয়া কত বড় উন্নতি! আমরা পূজার কাজটাকে অনেকটা সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিয়াছি। তোমার 'ক্লীঁ-ফট্‌', ঝাঁজ ও ঘণ্টার যেভাবে কাটছাঁট করা হইয়াছে, তাহাতে তুমি মূর্ছা যাইবে। জন্মতিথি-পূজা শুধু দিনের বেলায় হইয়াছে এবং রাত্রে সকলে আরামে ঘুমাইয়াছে। তুলসী ও খোকা কেমন আছে? তুমি তুলসীকে কাজের ভার দিয়া একবার কলিকাতায় আস না? কিন্তু উহা ভয়ানক খরচসাপেক্ষ—আর তোমাকে তো ফিরিয়াও যাইতে হইবে; কারণ মান্দ্রাজের কাজটা পুরাপুরি গড়িয়া তোলা দরকার। আমি মাসকয়েক পরেই মিসেস বুলের সঙ্গে আবার আমেরিকায় যাইতেছি। গুডউইনকে আমার ভালবাসা জানাইও এবং তাহাকে বলিও, আমরা অন্ততঃ

* স্বামী ব্রহ্মানন্দ

জাপানে যাইবার পথে তাহার সহিত দেখা করিব। শিবানন্দ এখানে আছেন এবং আমি তাঁহার হিমালয়ে চিরপ্রস্থানের প্রবল আগ্রহ কতকটা দমাইয়াছি। তুলসীও তাহাই ভাবিতেছে নাকি? আমার মনে হয়, ওখানকার বড় বড় ইঁদুরের গর্তেই তাহার গুহার সাধ মিটিতে পারে—কি বলো?

এখানে মঠ তো স্থাপিত হইল। আমি আরও সাহায্যের জন্য বিদেশে যাইতেছি।...শ্রী-মহারাজের আশীর্বাদে ভারত বাঁচিয়া উঠিবে। আমার আন্তরিক ভালবাসা জানিবে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

৩৮৬

(রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে লিখিত)

মঠ, বেলুড়*

২৫শে ফেব্রুআরি, ১৮৯৮

প্রিয় রাজাজী,

বক্তৃতার জন্য আপনার আমন্ত্রণ পেয়ে আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দিনকয়েক আগে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে এই বিষয়ে আমার আলাপ হয়েছিল এবং তার ফলে আপনাদের সমিতির জন্য একটু সময় ঠিক করতে আমি বিশেষ চেষ্টা করছি। আমি এও বলেছিলাম যে, রবিবারে তাদের সঠিক জানাব।

একজন বিশেষ বন্ধুর কাছে আমি অনেকটা ঋণী; তিনি সম্ভবতঃ আমাকে দার্জিলিং-এ নিয়ে যাবার জন্য এখানে এসেছেন। জনকয়েক আমেরিকান বন্ধুও এসেছেন এবং আমি যা কিছু সময় পাই, তার সবটাই নূতন মঠ ও তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যে নিয়োজিত হচ্ছে। তা ছাড়া আমার আশা এই যে, আগামী মাসে আমেরিকা যাত্রা ক'রব।

আপনাকে সত্যই বলছি—আপনার এই নিমন্ত্রণের সুযোগ গ্রহণের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি এবং ফলাফল শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের মারফত রবিবারে আপনাকে জানাব।

আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি

বিবেকানন্দ

৩৮৭

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত)

মার্চ, ১৮৯৮*

প্রিয় শশী,

আমি তোমায় দুইটি কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। (১) তুলসীর উচিত গুডউইনের নিকট হইতে সাঙ্কেতিক লিখন—অন্ততঃ উহার গোড়ার জিনিস—শিখিয়া লওয়া। (২) ভারতের বাহিরে থাকা-কালে আমায় প্রায় প্রতি ডাকে মান্দ্রাজে একখানি করিয়া চিঠি লিখিতে হইত। আমি ঐ-সব চিঠির নকলের জন্য লিখিয়া বিফল হইয়াছি। আমাকে ঐ সব চিঠি পাঠাইয়া দিও। আমি আমার ভ্রমণকাহিনী লিখিতে চাই। ইহাতে অন্যথা করিও না। কাজ হইয়া গেলেই আমি ঐগুলি ফেরত পাঠাইয়া দিব! 'ডন্' (Dawn) কাগজখানির প্রতি সংখ্যার জন্য ৪০৲ টাকা খরচ হইবে এবং দুই শত গ্রাহক পাইলেই উহা নিয়মিত প্রকাশিত হইতে পারিবে—ইহা একটা মস্ত খবর। 'প্রবুদ্ধ ভারত' অত্যন্ত অব্যবস্থার মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়; উহার সুশৃঙ্খলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর। বেচারা আলাসিঙ্গা! আমি তাহার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। আমি এইটুকু করিতে পারি যে, সে এক বৎসরের জন্য সকল সাংসারিক দায় হইতে মুক্ত থাকিবে, যাহাতে সে সমস্ত শক্তি দিয়া 'ব্রহ্মবাদিন্' কাগজের জন্য খাটিতে পারে। তাহাকে বলিও সে যেন চিন্তিত না হয়। তাহার কথা আমাদের সর্বদাই মনে আছে। তাহার ভক্তির প্রতিদান আমি কখনই দিতে পারিব না।

আমি ভাবিতেছি, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে আবার কাশ্মীর যাইব। তাহার পর কলিকাতায় ফিরিয়া সেখান হইতে আমেরিকা যাত্রা করিব।

মিস নোবলের মতো মেয়ে সত্যি দুর্লভ। আমার বিশ্বাস, বাগ্মিতায় সে শীঘ্রই মিসেস বেস্যাণ্টকে ছাড়াইয়া যাইবে।

আলাসিঙ্গার প্রতি একটু নজর রাখিও। আমার যেন মনে হয়, সে কাজে ডুবিয়া গিয়া নিজের শরীরপাত করিতেছে। তাহাকে বলিও, শ্রমের পর বিশ্রাম এবং বিশ্রামের পর শ্রম—এই ভাবেই সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ হইতে পারে। তাহাকে আমার ভালবাসা জানাইও। কলিকাতায় জনসাধারণের

জন্য আমাদের দুইটি বক্তৃতা হইয়াছিল—একটি মিস নোবলের এবং অপরটি আমাদের শরতের। তাহারা দুইজনেই খুব চমৎকার বলিয়াছিল। শ্রোতাদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। উহাতে মনে হয়, কলিকাতার জনসাধারণ আমাদিগকে ভুলিয়া যায় নাই। মঠের কাহারও কাহারও একটু সর্দিজ্বর হইয়াছিল। তাহারা সকলেই এখন ভাল। কাজ সুন্দর চলিয়া যাইতেছে। শ্রীমা এখানে আছেন। ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ভাবিতে পারো, মা তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে খাইয়াছিলেন!…ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়? প্রভু আমাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছেন, কোন ভয় নাই—সাহস হারাইও না, স্বাস্থ্য ঠিক রাখিও এবং কোন বিষয়ে অতি ব্যস্ত হইও না। খানিকক্ষণ জোরে দাঁড় টানিয়া তার পর দম লওয়া—ইহাই চিরন্তন পন্থা। রাখাল নূতন জমি-বাড়ি লইয়া আছে। এই বৎসরের মহোৎসবে আমি সন্তুষ্ট হই নাই।…প্রত্যেক মহোৎসব হওয়া চাই এখানকার সকল ভাবধারার একটি অপূর্ব সমাবেশ। আমরা আগামী বৎসর এই বিষয়ে চেষ্টা করিব এবং আমি ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিব। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

বিবেকানন্দ

৩৮৮

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*
২রা মার্চ, ১৮৯৮

স্নেহের মেরী,

মাদার চার্চের কাছে লেখা চিঠিতে আশা করি আমার খবর আগেই জানতে পেরেছ। তোমরা সকলে—সমস্ত পরিবারটিই—আমার প্রতি এত সদয় যে, মনে হয় পূর্বজন্মে আমি নিশ্চয় তোমাদেরই একজন ছিলাম, আমরা হিন্দুরা তো এই রকমই বলে থাকি। আমার একমাত্র আক্ষেপ যে, কোটিপতি আর জুটছে না; এই মুহূর্তে তাদের আমার খুবই প্রয়োজন; আমি গড়া ও সংগঠনের কাজ করতে করতে জরাগ্রস্ত, বৃদ্ধ ও উগ্রস্বভাব হয়ে উঠছি।

হ্যারিয়েট যদিও কোটিগুণসম্পন্ন এক জনকে লাভ করেছে, তার সঙ্গে কয়েক কোটি টাকার অর্থ-গুণ থাকলে নিশ্চয় মানাত ভাল; সুতরাং তুমি আবার যেন সেই ভুলটি ক'রে ব'সো না।

কোন তরুণযুগলের স্বামী-স্ত্রী হবার পক্ষে সব কিছুই অনুকূল ছিল, কিন্তু কনের পিতার দৃঢ় সংকল্প যে, কোটিপতি ছাড়া কাউকে তিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন না। তরুণযুগল হতাশ হয়ে প'ড়ল, এমন সময় এক চতুর ঘটক এসে কার্যোদ্ধার করলে। সে বরকে জিজ্ঞেস করলে, দশ লক্ষ মুদ্রার পরিবর্তে সে তার নাসিকা দিতে প্রস্তুত কি না। সে বললে, না। ঘটকটি তারপর কন্যার পিতার সামনে শপথ ক'রে বললে যে, বরের বহু লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি সঞ্চিত আছে। বিয়ে হয়ে গেল। হঁ্যা, তোমারও কোটিপতি জুটছে না, আর আমারও তাই টাকা মিলছে না; সে জন্য আমাকে অনেক দুর্ভাবনায় পড়তে হয়েছে এবং নিষ্ফল কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে, তাই রোগে আক্রান্ত। হঁ্যা, আসল কারণটি খুঁজে বার করা আমার মতো মাথারই কাজ—নিজেকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই!

লণ্ডন থেকে ফিরে এসে যখন আমি দক্ষিণ ভারতে, এবং যখন লোকেরা আমাকে উৎসবে ভোজে আপ্যায়িত করছে ও আমার কাছ থেকে ষোল আনা কাজ আদায় ক'রে নিচ্ছে, এমন সময় একটি বংশগত পুরানো রোগ এসে দেখা দিল। রোগের প্রবণতা (সম্ভাবনা) সব সময়ই ছিল, এখন অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে তা আত্মপ্রকাশ ক'রল। সঙ্গে সঙ্গে শরীরে এল সম্পূর্ণ ভাঙন ও চূড়ান্ত অবসাদ। আমাকে তৎক্ষণাৎ মান্দ্রাজ ছেড়ে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা উত্তরাঞ্চলে আসতে হ'ল; এক দিন দেরি করা মানে অন্য জাহাজ ধরবার জন্য সেই প্রচণ্ড গরমে আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করা। কথায় কথায় বলছি—আমি পরে জানতে পেরেছি যে, মিঃ ব্যারোজ পরদিন মান্দ্রাজ এসে পৌঁছেছিলেন এবং তাঁর প্রত্যাশা-মত আমাকে সেখানে না পেয়ে খুবই রুষ্ট হয়েছিলেন—যদিও আমি তাঁর থাকবার জায়গার ও সংবর্ধনার ব্যবস্থা ক'রে এসেছিলাম। বেচারী জানে না, আমি তখন মরণাপন্ন।

গত গ্রীষ্মকালটা হিমালয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি; দেখলাম ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যে আসতে না আসতেই সুস্থ বোধ করি, কিন্তু সমতলের গরমে যেতে না যেতে আবার শয্যাশায়ী হয়ে পড়ি। আজ থেকে কলকাতায় বেজায় গরম

পড়েছে, তাই আবার আমাকে পালিয়ে যেতে হবে। এবার সুশীতল আমেরিকায়, কারণ মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড এখন এখানে। কলকাতার কাছে গঙ্গাতীরে আমি সঙ্ঘের জন্য একখণ্ড জমি কিনেছি। এখানে একটি ছোট বাড়িতে তাঁরা এখন বাস করছেন; খুব কাছেই, যেখানে এখন মঠ স্থাপিত হয়েছে, সে বাড়িতে আমরা রয়েছি।

প্রত্যহ তাঁদের সঙ্গে দেখা করি, এতে তাঁরাও খুব আনন্দিত। এক মাস পরে তাঁদের একবার কাশ্মীর ভ্রমণে বেরোবার ইচ্ছা; যদি তাঁরা চান, আমি তাঁদের সঙ্গে যাব পরামর্শদাতা, বন্ধু ও সম্ভবতঃ দার্শনিকরূপে। তারপর আমরা সবাই সমুদ্রপথে স্বাধীনতা ও কুৎসার দেশের উদ্দেশে রওনা হবো।

তুমি আমার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ো না, কারণ রোগটা আর দুই-তিন বছর আমাকে টেনে নিয়ে যাবে। বড় জোর নির্দোষ সঙ্গীর মতো থেকে যেতে পারে। আমার কোন খেদ নেই। কেবল কাজটাকে গুছিয়ে নেবার জন্য সর্বক্ষণ কঠোর পরিশ্রম ক'রে যাচ্ছি—শুধু এইজন্য যে, আমি যখন রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে যাব, তখনও যেন যন্ত্রটি সামনের দিকে এগিয়ে চলে। বহুদিন আগে যেদিন জীবনকে বিসর্জন দিয়েছি, সেদিনই আমি মৃত্যুকে জয় করেছি। আমার একমাত্র দুশ্চিন্তা হ'ল 'কাজ', এমনকি তাও প্রভুকে সমর্পণ ক'রে দিচ্ছি, তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সতত প্রভুসমীপে তোমার
বিবেকানন্দ

৩৮৯

(মিস ম্যাকলাউডকে লিখিত)

দার্জিলিং *
১৮ই এপ্রিল, ১৮৯৮

প্রিয় জো জো,

আমি জ্বরে শয্যাগত ছিলাম। সম্ভবতঃ অত্যধিক পর্বতারোহণ এবং এই স্থানের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য এরূপ হয়ে থাকবে। আজ আমি আগের চেয়ে ভাল আছি এবং দু-এক দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাবার ইচ্ছা করি। কলকাতায় খুব গরম হলেও সেখানে আমার বেশ ঘুম হ'ত এবং ক্ষুধাও মন্দ হ'ত না। এখানে দুই-ই হারিয়েছি—এই যা লাভ!

মার্গোরাইটের সম্বন্ধে এখনও মিস মূলারের সঙ্গে দেখা ক'রে কথা বলতে পারিনি ; কিন্তু আজ তাঁকে পত্র লেখার ইচ্ছা আছে। মার্গোরাইট এখানে আসবে ব'লে তিনি সব আয়োজন করছেন। তাঁদের বাংলা শেখাবার জন্য মিঃ গুপ্তকেও আমন্ত্রণ করা হয়েছে। মিস মূলার বোধ হয় এখন মার্গোরাইটের জন্য কিছু করবেন ; তবু আমি তাঁকে লিখব।

এ দেশে থাকাকালে মার্গোরাইট যে-কোন সময়ে কাশ্মীর দেখতে যেতে পারে ; কিন্তু মিস— যদি রাজী না হন, তা হলেই আবার একটা প্রকাণ্ড গোলযোগ বাধবে, আর তাতে তাঁর ও মার্গোরাইট দু-জনেরই ক্ষতি হবে।

আবার আলমোড়া যাব কি না, তার নিশ্চয়তা নেই। মনে হয়, অধিক অশ্বারোহণের ফলে আবার রোগে পড়তে হবে নিশ্চিত। আমি তোমার জন্য সিমলায় অপেক্ষা ক'রব। ইতিমধ্যে তুমি সেভিয়ারদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সেরে নাও। কাজ শুরু ক'রে তবে এ-বিষয়ে ভেবে দেখব। মিস নোবল রামকৃষ্ণ মিশনে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন জেনে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। তোমাদের ত্রিমূর্তিকে আন্তরিক ভালবাসা জানাচ্ছি। ইতি

সতত ভগবদাশ্রিত
তোমাদের বিবেকানন্দ

৩৯০

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

দার্জিলিং
২৩শে এপ্রিল, ১৮৯৮

অভিন্নহৃদয়েষু,

সন্দুকফু (Sandukphu, 11,924 ft.) প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া অবধি শরীর অতি উত্তম ছিল, কিন্তু পুনর্বার দার্জিলিং আসিয়া অবধি প্রথম জ্বর, তাহা সারিয়া সর্দি-কাশিতে ভুগিতেছি। রোজ পালাইবার চেষ্টা করি ; ইহারা আজ কাল করিয়া দেরী করিয়া দিল। যাহা হউক, কাল রবিবার এ-স্থান হইতে যাত্রাপথে খর্সানেতে এক দিন থাকিয়া সোমবার কলিকাতায় যাত্রা। ছাড়িয়াই 'তার' পাঠাইব। রামকৃষ্ণ মিশনের একটি anniversary meeting (বাৎসরিক সভা) করা উচিত এবং মঠেরও একটি হওয়া উচিত।

তাহাতে দুই জায়গায়ই famine relief (দুর্ভিক্ষে সাহায্য)-এর হিসাব submit (পেশ) করিতে হইবে এবং famine relief-টা publish (প্রকাশ) করিতে হইবে। এই সমস্ত তৈয়ার রাখিবে।

নৃত্যগোপাল বলে, ইংরেজী কাগজটায় খরচ অল্প; অতএব প্রথম উহা বাহির করিয়া পরে বাঙলাটা দেখা যাবে। এ-সকলও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যোগেন কাগজের ভার লইতে রাজী আছে? শশী লিখছে—শরৎ যদি একবার মান্দ্রাজে যায়, তাহা হইলে তারা লেকচার tour (বক্তৃতা সফর) করে। বাবা, যে গরম এখন! শরৎকে জিজ্ঞাসা করবে—জি. সি., সারদা, শশীবাবু প্রভৃতি articles (প্রবন্ধ) তৈয়ার রেখেছেন কি না। মিসেস বুল, ম্যাকলাউড ও নিবেদিতাকে আমার love (ভালবাসা) ও blessings (শুভেচ্ছা) দিবে। আন্তরিক ভালবাসা জানিবে।

বিবেকানন্দ

৩৯১

দার্জিলিং*

২৯শে এপ্রিল, ১৮৯৮

প্রিয় জো জো,

আমার অনেক বার জ্বর হয়ে গেল—সর্বশেষে হয়েছিল ইনফ্লুয়েঞ্জা। এখন তা সেরে গেছে বটে, কিন্তু ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছি। হাঁটবার উপযুক্ত শক্তি লাভ করলেই আমি কলকাতায় নেমে আসছি।

রবিবারে দার্জিলিং ছাড়ব; পথে হয়তো দু-এক দিন কার্সিয়াং-এ কাটাব; তারপর সোজা কলকাতায়। কলকাতা এখন নিশ্চয়ই ভয়ানক গরম। তুমি সেজন্য ভেবো না—ইনফ্লুয়েঞ্জার পক্ষে তা ভালই হবে। কলকাতায় যদি প্লেগ শুরু হয়, তবে আমার কোথাও যাওয়া হবে না; তুমি তা হ'লে সদানন্দের সঙ্গে কাশ্মীর চলে যেও। বৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে তোমার কিরূপ মনে হ'ল? চন্দ্রদেবতা ও সূর্যদেবতা সমেত 'হন্‌স্ বাবা' যেমন ফিটফাট হয়ে থাকেন, ইনি অবশ্যই সেরূপ নন। অন্ধকার রাত্রে যখন অগ্নিদেবতা, সূর্যদেবতা, চন্দ্রদেবতা ও তারকাদেবীরা ঘুমিয়ে পড়েন, তখন কে তোমার অন্তর আলোকিত করে? আমি তো এইটুকু আবিষ্কার

করেছি যে, ক্ষুধাই আমার চৈতন্যকে জাগিয়ে রাখে। আহা, 'আলোকের ঐক্য'-রূপ (Correspondence of light) মহান্ মতবাদটি কি অপূর্ব! ভাবো দেখি, এই মতবাদের অভাবে জগৎ বহু যুগ ধ'রে কী অন্ধকারেই না ছিল! এ সব জ্ঞান, ভালবাসা ও কর্ম এবং যত বুদ্ধ, কৃষ্ণ ও খ্রীষ্ট—সবই বৃথা। তাঁদের জীবন ও কার্য একেবারে ব্যর্থ হয়েছে; কারণ রাত্রে যখন সূর্য ও চন্দ্র তিমিরলোকে ডুবে যায়, তখন কে যে অন্তরের আলো জ্বালিয়ে রাখে, এ তত্ত্ব তো তাঁরা আবিষ্কার করতে পারেননি!! বড়ই মুখরোচক—কি বলো?

আমি যে শহরে জন্মেছি, তাতে যদি প্লেগ এসে পড়ে, তবে আমি তার প্রতিকার-কল্পে আত্মোৎসর্গ ক'রব বলেই স্থির করেছি; আর জগতে যত জ্যোতিষ্ক আজ পর্যন্ত আলো দিয়েছে, তাদের উদ্দেশে আহুতি দেওয়ার চেয়ে আমার এ উপায়টা নির্বাণলাভের প্রকৃষ্টতর উপায়!

মান্দ্রাজের সঙ্গে বহু চিঠি আদান-প্রদানের ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে, এখনই আমাকে তাদের জন্য কোন সাহায্য পাঠাতে হবে না। প্রত্যুত আমি কলকাতায় একখানি কাগজ চালাব। তুমি যদি ঐ কাগজ চালু করতে আমায় সাহায্য কর, তবে খুবই কৃতজ্ঞ হবো। চিরকালেরই জন্য আমার অফুরন্ত ভালবাসা জানবে।

সদা প্রভুপদাশ্রিত
বিবেকানন্দ

৩৯২

আলমোড়া*
২০শে মে, ১৮৯৮

প্রিয় মিস নোবল্

...কর্তব্যের শেষ নাই; আর জগৎ বড়ই স্বার্থপর।

তুমি দুঃখ ক'রো না; 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'—(কল্যাণকারী কেহ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না)। ইতি

সতত তোমাদের
বিবেকানন্দ

৩৯৩

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

আলমোড়া

২০শে মে, ১৮৯৮

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার পত্রে সকল সমাচার অবগত হইলাম ও তোমার 'তারে'র জবাব পূর্বেই দিয়াছি। নিরঞ্জন ও গোবিন্দলাল সা কাঠগুদামে যোগীন-মার অপেক্ষা করিবে। আমি নৈনিতালে পৌঁছিলে এখান হইতে বাবুরাম ঘোড়া চড়িয়া নৈনিতালে যায় কাহারও কথা না শুনিয়া এবং আসিবার দিনও ঘোড়া চড়িয়া আমাদের সঙ্গে আসে। আমি ডাণ্ডি চড়িয়া অনেক পিছে পড়িয়াছিলাম। রাত্রে যখন ডাকবাংলায় পৌঁছি, শুনিলাম বাবুরাম আবার পড়িয়া গিয়াছে ও হাতে চোট লাগিয়াছে—ভাঙে-চুরে নাই, এবং ধমকানি খাইবার ভয়ে দেশী ডাকবাংলায় আছে; কারণ পড়িবার দরুন মিস ম্যাকলাউড তাহাকে ডাণ্ডি দিয়া নিজে তাহার ঘোড়ায় আসিয়াছে। সে-রাত্রে আর আমার সহিত দেখা হয় নাই। পরদিন ডাণ্ডির যোগাড় করিতেছি—ইতিমধ্যে শুনিলাম সে পায়ে হাঁটিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই অবধি তাহার আর কোনও খবর নাই। দু-এক জায়গায় তার করিয়াছি; কিন্তু খবর নাই। বোধ হয় কোন গ্রামে…বসিয়া আছে।

যোগীন-মার জন্য ডাণ্ডি হইবে; কিন্তু বাকী সকলকে পায়ে হাঁটিতে হইবে।

আমার শরীর অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল, কিন্তু ডিস্পেপসিয়া (অজীর্ণতা) যায় নাই এবং পুনর্বার অনিদ্রা আসিয়াছে। তুমি যদি কবিরাজী একটা ভাল ডিস্পেপসিয়ার ঔষধ শীঘ্র পাঠাও তো ভাল হয়।

ওখানে যে দুই-একটি case (রোগের আক্রমণ) এক্ষণে হইতেছে, তাহার জন্য সরকারী প্লেগ হাসপাতালে অনেক জায়গা আছে এবং ward-এ ward-এ (মহল্লায় মহল্লায়)ও হাসপাতাল হইবার কথা হইতেছে। এ সকল দেখিয়া ও আবশ্যক বুঝিয়া যাহা ভাল হয় করিবে। তবে বাগবাজারের কে কি বলছে, তাহা public opinion (জনসাধারণের মত) নহে জানিবে।…আবশ্যক-কালে অভাব যেন না হয় ও অনর্থক অর্থব্যয় না হয়—এই সকল দেখিয়া কাজ করিবে।

রামলালের জন্য বিশেষ বুঝিয়া উপস্থিত-মত জায়গা কিনিয়া দিবে রঘুবীরের নামে। তাহাতে উপস্থিত মা-ঠাকুরানী ও তাঁহার অবর্তমানে রামলাল, শিবু তাঁহাদের উত্তরাধিকারী সেবায়েত থাকে, অথবা যেমন ভাল হয় করিবে। বাড়ি তুমি যেমন ভাল বুঝ, এখনই আরম্ভ করিয়া দিবে; কারণ নূতন বাড়িতে ২।১ মাস বাস করা ঠিক নহে, damp (স্যাঁতসেঁতে) হয়।... পরে পোস্তা হইবে। কাগজের জন্য টাকার চেষ্টা হইতেছে। যে ১২০০৲ টাকা তোমায় কাগজের জন্য দিয়াছি, তাহা ঐ হিসাবেই যেন থাকে।

আর আর সকলে ভাল আছে। সদানন্দ কাল পা মুচড়াইয়া বলিতেছে, সন্ধ্যা নাগাত আরাম হইবে। এবারে আলমোড়ায় জলহাওয়া অতি উত্তম। তাহাতে সেভিয়ার যে বাংলা লইয়াছে, তাহা আলমোড়ার মধ্যে উৎকৃষ্ট। ওপারে এনি বেস্যাণ্ট চক্রবর্তীর সহিত একটি ছোট বাংলায় আছে। চক্রবর্তী এখন গগনের (গাজিপুরের) জামাই। আমি একদিন দেখা করতে গিয়াছিলাম। এনি বেস্যাণ্ট আমায় অনুনয় ক'রে বললে যে, আপনার সম্প্রদায়ের সহিত যেন আমার সম্প্রদায়ের পৃথিবীময় প্রীতি থাকে ইত্যাদি। আজ বেস্যাণ্ট চা খাইতে এখানে আসিবে। আমাদের মেয়েরা নিকটে একটি ছোট বাংলায় আছে এবং বেশ আছে। কেবল আজ মিস ম্যাকলাউড একটু অসুস্থ। হ্যারি সেভিয়ার দিন দিন সাধু বনে যাচ্ছে।...হরি ভাই-এর নমস্কার এবং সদানন্দ, অজয় ও সুরেনের প্রণাম জানিবে। আমার ভালবাসা জানিবে ও সকলকে জানাইবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুঃ—সুশীলকে আমার ভালবাসা দিও এবং কানাই প্রভৃতি সকলকে। ইতি

বি

৩৯৪

(খেতড়ির মহারাজকে লিখিত)

আলমোড়া*

৯ই জুন, ১৮৯৮

মহামান্য মহারাজ,

আপনার স্বাস্থ্য পুরোপুরি ভাল নেই জেনে খুব দুঃখিত হলাম। কয়েক দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই সেরে উঠবেন।

আগামী শনিবার আমি কাশ্মীর রওনা হচ্ছি। রেসিডেণ্টের উদ্দেশ্যে লেখা আপনার পরিচয়-পত্রখানা পেয়েছি, কিন্তু আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে রেসিডেণ্টকে এক লাইন লিখে পাঠান যে, আপনি আমাকে একটি পরিচয়-পত্র দিয়েছেন, তা হ'লে আরও ভাল হয়।

আপনি দয়া ক'রে জগমোহনকে বলবেন, সে যেন কিষনগড়ের দেওয়ানকে একথা স্মরণ করিয়ে চিঠি লেখে যে, তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন—তাঁর পণ্ডিতদের কাছ থেকে তিনি আমাকে ব্যাস-সূত্রের নিম্বার্ক-ভাষ্য ও অন্যান্য ভাষ্যের নকল সংগ্রহ ক'রে দেবেন।

ভালবাসা ও আশীর্বাদ সহ
আপনার বিবেকানন্দ

পুনঃ—বেচারা গুডউইন মারা গেছে। জগমোহন তাকে ভাল ক'রে জানে। আমার গোটা দুই ব্যাঘ্রচর্ম চাই, যদি পারি মঠে দুজন ইওরোপীয় বন্ধুকে উপহাররূপে পাঠাব। এ-রকম জিনিস উপহার পেলে পাশ্চাত্য-বাসীরা সবচেয়ে বেশী খুশী হয়।

৩৯৫

(মহম্মদ সর্ফরাজ হোসেনকে লিখিত)

আলমোড়া*
১০ই জুন, ১৮৯৮

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্রের মর্ম বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিলাম, ইহা জানিয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইয়াছি যে, ভগবান সকলের অগোচরে আমাদের মাতৃভূমির জন্য অপূর্ব আয়োজন করিতেছেন।

ইহাকে আমরা বেদান্তই বলি আর যাই বলি, আসল কথা এই যে, অদ্বৈতবাদ ধর্মের এবং চিন্তার শেষ কথা, এবং কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, উহাই ভাবী শিক্ষিত মানবসমাজের ধর্ম। হিন্দুগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র এই তত্ত্বে পৌছানোর কৃতিত্বটুকু পাইতে পারে, কারণ

তাহারা হিব্রু কিংবা আরব-জাতিগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর ; কিন্তু কর্মপরিণত বেদান্ত (practical Advaitism)—যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে—তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সর্বজনীনভাবে এখনও পুষ্টিলাভ করে নাই।

পক্ষান্তরে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, কখনও যদি কোন ধর্মাবলম্বিগণ দৈনন্দিন ব্যাবহারিক জীবনে এই সাম্যের কাছাকাছি আসিয়া থাকে, তবে একমাত্র ইসলামধর্মাবলম্বিগণই আসিয়াছে ; এইরূপ আচরণের যে গভীর অর্থ এবং ইহার ভিত্তিস্বরূপ যে-সকল তত্ত্ব বিদ্যমান, সে-সম্বন্ধে হিন্দুগণের ধারণা পরিষ্কার, এবং ইসলামপন্থিগণ সে-বিষয়ে সাধারণতঃ সচেতন নয়।

এই জন্য আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্মপরিণত ইসলাম-ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব-সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানব-জাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই—যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই ; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, সকল ধর্ম 'একত্বরূপ সেই এক-ধর্মে'রই বিবিধ প্রকাশ মাত্র, সুতরাং যাহার যেটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী সেইটিকেই সে বাছিয়া লইতে পারে।

আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।

আমি মানস চক্ষে দেখিতেছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহা মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।

ভগবান আপনাকে মানবজাতির, বিশেষ করিয়া আমাদের অতি হতভাগ্য জন্মভূমির সাহায্যের জন্য একটি মহান্ যন্ত্র-রূপে গঠিত করুন, ইহাই সতত প্রার্থনা। ইতি

ভবদীয় স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৩৯৬

(মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত)

কাশ্মীর*

৩রা জুলাই, ১৮৯৮

প্রিয় স্টার্ডি,

উভয় সংস্করণেই আমার সম্মতি ছিল, কারণ আমাদের মধ্যে ব্যবস্থা হয়েছিল যে, আমার বইগুলি যে-কেউ প্রকাশ করতে চাইলে আমরা আপত্তি ক'রব না। মিসেস বুল এ-সম্বন্ধে সব জানেন; তিনি তোমাকে লিখছেন।

মিস সুটার (Miss Souter)-এর কাছ থেকে সেদিন একখানা সুন্দর চিঠি পেয়েছি। তিনি আগের মতোই বন্ধুভাবাপন্ন।

শিশুদের, মিসেস স্টার্ডিকে ও তোমাকে ভালবাসা।

সতত প্রভুসমীপে তোমার

বিবেকানন্দ

৩৯৭

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

শ্রীনগর

১৭ই জুলাই, ১৮৯৮

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম।...সারদার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এই মাত্র যে, বাঙলা ভাষায় magazine (পত্রিকা) paying (লাভজনক) করা মুশকিল, তবে সকলে মিলিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া subscriber (গ্রাহক) যদি যোগাড় করা যায় তো সম্ভব বটে। এ বিষয়ে তোমাদের যে প্রকার মত হয়, করিবে। সারদা বেচারা একেবারে ভগ্ন-মনোরথ হইয়াছে। যে লোকটা এত কাজের এবং নিঃস্বার্থ, তার জন্য এক হাজার টাকা যদি জলেও যায় তো ক্ষতি কি? 'রাজযোগ' ছাপা হইবার কি হইল? উপেনকেই না হয় দাও on certain shares (কিছু লাভে)। টাকাকড়ি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহাই শেষ। অতঃপর দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে তুমি যেমন বিবেচনা করিবে, তাহাই করিবে।...আমি বেশ

দেখতে পাচ্ছি যে, আমার policy (কার্যধারা) ভুল, তোমারটা ঠিক—about helping others (অপরকে সাহায্য করা সম্বন্ধে), অর্থাৎ একবারে বেশী বেশী দিলে লোকে grateful (কৃতজ্ঞ) না হইয়া উলটা ঠাওরায় যে, একটা বোকা বেশ পাওয়া গেছে। I always lost sight of the demoralising influence of charity on the receiver. (দানের ফলে গ্রহীতার যে নৈতিক অবনতি হয়, সেদিকে আমার দৃষ্টি থাকে না)। দ্বিতীয়তঃ ভিক্ষের পয়সা যে উদ্দেশ্যে লোকে দেয়, তাহা হইতে একটুও এদিক-ওদিক করিবার আমাদের অধিকার নাই। কাশ্মীরের প্রধান বিচার-পতি ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির ঠিকানায় দিলেই মিসেস বুল মালা পাইবেন। মিত্র মহাশয় এবং জজ সাহেব ইঁহাদের অত্যন্ত যত্ন করিতেছেন। কাশ্মীরের জমি এখনও পাওয়া যায় নাই, শীঘ্রই হইবার সম্ভাবনা। এখানে তুমি একটা শীত কাটাইতে পারিলেই শরীর নিশ্চিত শুধরাইয়া যাইবে। যদি উত্তম ঘর হয় এবং যথেষ্ট কাঠ থাকে এবং গরম কাপড় থাকে, বরফের দেশে আনন্দ বই নিরানন্দ নাই। এবং পেটের রোগের পক্ষে শীতপ্রধান দেশ ব্রহ্মৌষধ। যোগেন-ভায়াকেও সঙ্গে আনিও; কারণ এদেশ পাহাড় নয়, এঁটেলমাটি বাঙলা দেশের মতো।

আলমোড়ায় কাগজটা বাহির করিলে অনেক কাজ এগোয়; কারণ সেভিয়ার বেচারা একটা কাজ পায় এবং আলমোড়ার লোকেও একটা পায়। সকলকে একটা একটা মনের মতো কাজ দেওয়াই বড় ওস্তাদি। কলিকাতায় নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়টি যেমন ক'রে হোক খাড়া ক'রে দিতে হবে। মাষ্টার মহাশয়কে কাশ্মীরে আনা এখনও অনেক দূরের কথা; কারণ এখানে কলেজ হ'তে এখনও ঢের দেরি। তবে তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁকে প্রিন্সিপাল ক'রে কলিকাতায় একটা কলেজ করা। হাজার টাকা initial expense (প্রারম্ভিক ব্যয়) হলেই চলবে। সে বিষয়ে নাকি তোমাদেরও বিশেষ মত। তাহাতে যাহা ভাল বিবেচনা করিবে, তাহাই করিও। আমার শরীর বেশ আছে। রাত্রে প্রায় আর উঠিতে হয় না, অথচ দু-বেলা ভাত আলু চিনি—যা পাই তাই খাই। ওষুধটা কিছু কাজের নয়—ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীরে ঔষধ ধরে না। ও হজম হয়ে যাবে—কিছু ভয় নাই।

মেয়েরা সকলে আছে ভাল ও তোমাদের ভালবাসা জানাইতেছে। শিবানন্দজীর দুই চিঠি আসিয়াছে। তাঁহার অস্ট্রেলিয়ান শিষ্যেরও এক পত্র পাইয়াছি। কলিকাতায় শুনিতেছি নাকি প্লেগ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইতি

বিবেকানন্দ

৩৯৮

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

শ্রীনগর

১লা অগস্ট, ১৮৯৮

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার বরাবর একটি বুঝিবার ভ্রম হয় এবং '—'এর প্রবল বুদ্ধির দোষে বা গুণে সেটি যায় না। সেটি এই যে, যখন আমি হিসাব-কিতাবের কথা বলি, তোমার মনে হয় যে, আমি তোমাদের অবিশ্বাস করছি।…আমার কেবল ভয় এই যে, এখন তো এক-রকম খাড়া করা গেল। অতঃপর আমরা চ'লে গেলে যাতে কাজ চলে এবং বেড়ে যায়, তাহাই দিনরাত্র আমার চিন্তা। হাজারই theoretical knowledge (তাত্ত্বিক জ্ঞান) থাকুক—হাতে-হেতড়ে না করলে কোনও বিষয় শেখা যায় না। Election (নির্বাচন) এবং টাকাকড়ির হিসাব discussion (আলোচনা) এইজন্য বারংবার আমি বলি, যাতে সকলে কাজের জন্য তৈয়ার হয়ে থাকে। একজন মরে গেলে অমনি একজন (দশজন if necessary—প্রয়োজন হ'লে) should be ready to take it up (কাজে লাগবার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত)। দ্বিতীয় কথা—মানুষের interest (আগ্রহ) না থাকিলে কেউ খাটে না; সকলকে দেখানো উচিত যে, every one has a share in the work and property, and a voice in the management (প্রত্যেকেরই কাজে ও সম্পত্তিতে অংশ আছে এবং কার্যধারা সম্বন্ধে মতপ্রকাশের ক্ষমতা আছে)—এই বেলা থেকে। Alternately (পর্যায়ক্রমে) প্রত্যেককেই responsible position (দায়িত্বপূর্ণ কাজ) দেবে with an eye to watch and control (নিয়ন্ত্রণের প্রতি দৃষ্টি রেখে), তবে লোক তৈয়ার হয় for business (কাজের জন্য)। এমন machine (যন্ত্র)টি খাড়া কর

যে, আপনি-আপনি চলে যায়, যে মরে বা যে বাঁচে। আমাদের ইণ্ডিয়ার ঐটি great defect (প্রধান দোষ), we cannot make a permanent organisation (আমরা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়তে পারি না), and the reason is because we never like to share power with others and never think of what will come after we are gone. (আর তার কারণ এই যে, আমরা অপরের সঙ্গে কখনও ক্ষমতা ভাগ ক'রে নিতে চাই না এবং আমাদের পরে কি হবে, তা কখনও ভাবি না)।

প্লেগ সম্বন্ধে সব লিখেছি। মিসেস বুল ও মূলার প্রভৃতির মত যে, যখন পাড়ায় পাড়ায় হাসপাতাল হয়ে গেল, তখন মিছে কতকগুলো টাকা খরচ কেন? We will lend our services as nurses etc. Those that pay the piper must command the tune (আমরা শুধু সেবক হিসাবে কাজ ক'রব। যারা টাকা দেয়, তাদের কথা শুনতে হয়।)

কাশ্মীরের রাজা জমি দিতে রাজী। জমি দেখেও এসেছি। এখন দু-চার দিনের মধ্যে হয়ে যাবে—প্রভুর যদি ইচ্ছা হয়। এখানে একটি ছোট বাড়ি ক'রে যাব এইবারেই। যাবার সময় leave it in the charge of Justice Mukherjee (বিচারপতি মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে রেখে যাব)। আর তুমি না হয় এসে এইখানে শীত কাটিয়ে যাও with somebody else (অপর কাকেও সঙ্গে নিয়ে); শরীরও সেরে যাবে এবং কাজও হবে। যে টাকা press (ছাপাখানা)-এর [জন্য] রেখে এসেছি, তা হলেই হবে।—তুমি যেমন বিবেচনা কর। এবার N. W. P. (উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশ), রাজপুতানা প্রভৃতিতে কতকগুলো টাকা পাব—নিশ্চিত। ভাল কথা, কয়েক জনকে··· এই ভাবে টাকা দিও। এই টাকা আমি মঠ থেকে কর্জ নিচ্ছি এবং পরিশোধ ক'রব to you with interest (তোমার কাছে সুদ সমেত)।···

আমার শরীর এক রকম ভালই আছে। বাড়ি-ঘর আরম্ভ হয়েছে—বেশ কথা। সকলকে আমার ভালবাসা দিও। ইতি

বিবেকানন্দ

৩৯৭

কাশ্মীর*

২৫শে অগস্ট, ১৮৯৮

প্রিয় মার্গট,

গত দু-মাস যাবৎ আমি অলসের মতো দিন কাটাচ্ছি। ভগবানের দুনিয়ার জমকালো সৌন্দর্যের যা পরাকাষ্ঠা হ'তে পারে, তারই মধ্য দিয়ে প্রকৃতির এই নৈসর্গিক উদ্যানে মনোরম ঝিলামের বুকে নৌকায় ভেসে বেড়াচ্ছি, এখানে পৃথিবী বায়ু ভূমি তৃণ গুল্মরাজি পাদপশ্রেণী পর্বতমালা তুষার-রাশি ও মানবদেহ—সবকিছুর অন্ততঃ বাহিরের দিকটায় ভগবানেরই সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে। নৌকাটিই আমার ঘরবাড়ি; আর আমি প্রায় সম্পূর্ণ রিক্ত—এমনকি দোয়াত-কলমও নেই বলা চলে; যখন যেমন জুটছে, খেয়ে নিচ্ছি—ঠিক যেন একটি রিপ ভ্যান উইঙ্কল্-এর ছাঁচে ঢালা তন্দ্রাচ্ছন্ন জীবন!···

কাজের চাপে নিজেকে মেরে ফেলো না যেন। ওতে কোন লাভ নেই; সর্বদা মনে রাখবে, 'কর্তব্য হচ্ছে যেন মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতো—তার তীব্র রশ্মি মানুষের জীবনী-শক্তি ক্ষয় করে।' সাধনার দিক দিয়ে ওর সাময়িক মূল্য আছে বটে, তার বেশী করতে গেলে ওটা একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। আমরা জগতের কাজে অংশ গ্রহণ করি আর নাই করি, জগৎ নিজের ভাবে চলে যাবেই। মোহের ঘোরে আমরা নিজেদের ধ্বংস ক'রে ফেলি মাত্র। এক-জাতীয় ভ্রান্ত ধারণা আছে, যা চরম নিঃস্বার্থতার মুখোস প'রে দেখা দেয়; কিন্তু সব রকম অন্যায়ের কাছে যে মাথা নোয়ায়, সে চরমে অপরের অনিষ্টই করে। নিজেদের নিঃস্বার্থপরতা দিয়ে অপরকে স্বার্থপর ক'রে তোলার কোন অধিকার আমাদের নেই। আছে কি?

তোমাদের

বিবেকানন্দ

৪০০

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

শ্রীনগর, কাশ্মীর*
২৮শে অগস্ট, ১৮৯৮

স্নেহের মেরী,

তোমাকে চিঠি লেখার কোন সুযোগ ইতিমধ্যে ক'রে উঠতে পারিনি, আর তোমারও চিঠি পাবার কোন তাগিদ ছিল না, তাই বাজে অজুহাত দেখাব না। শুনলাম মিসেস লেগেটকে লেখা মিস ম্যাকলাউডের চিঠি থেকে তুমি কাশ্মীর ও আমাদের সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ জানতে পারছ, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কথা বাড়ানোর প্রয়োজন নেই।

কাশ্মীরে হাইন্‌স্‌হোল্ড (Heinsholdt)-এর 'মহাত্মা'-সন্ধান সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে; প্রথমেই প্রতিপন্ন করতে হবে যে, সমগ্র ব্যাপারটা একটি বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে আসছে, প্রচেষ্টা খুব তাড়াতাড়ি আরম্ভ করা হয়েছে। মাদার চার্চ ও ফাদার পোপ কেমন আছেন? তোমরা কেমন আছ? একজন দল থেকে সরে পড়াতে[১] পুরানো খেলা আরও উৎসাহ সহকারে চলছে কি? ফ্লোরেন্সের কোন প্রতিমূর্তির মতো যার চেহারা, সে কেমন আছে (নামটা ভুলে গিয়েছি)?

কয়েকদিনের জন্য আমি দূরে চলে গিয়েছিলাম। এখন আমি মহিলাদের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছি। তারপর যাত্রিদলটি যাচ্ছে কোন পাহাড়ের পিছনে এক বনের মধ্যে একটি সুন্দর শান্ত পরিবেশে, যেখানে কুলকুল ক'রে ছোট নদী বয়ে চলেছে। সেখানে তারা দেবদারু গাছের নীচে বুদ্ধের মতো আসন ক'রে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকবে।

এ-রকম প্রায় মাসখানেক চলবে; তারপর যখন আমাদের সৎকর্মের ফল-ভোগ শেষ হবে, তখন আবার স্বর্গ থেকে মর্ত্যে পতন হবে। তারপর কয়েক মাস কর্মফল সঞ্চয় ক'রব ও দুষ্কর্মের জন্য আবার নরকে যেতে হবে—চীনে, এবং আমাদের কুকর্ম ক্যাণ্টন ও অন্যান্য নগরের দুর্গন্ধের মধ্যে আমাদের নিমজ্জিত করবে। তারপর জাপানের নরকে। তারপর আবার যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্গলোকে।

---

১ হ্যারিয়েটের বিবাহ এখানে উদ্দিষ্ট।

কত না সুন্দর সুন্দর জিনিস তোমাকে পাঠাতে আমার ইচ্ছা, কিন্তু হায়! শুল্ক-তালিকার কথা ভাবলে আমার আকাঙ্ক্ষা 'মেয়েদের যৌবন ও ভিখারীদের স্বপ্নের মতো' মিলিয়ে যায়।

কথাপ্রসঙ্গে বলছি, আমি খুশী যে, দিনদিন আমার চুল পাকছে। তোমার সঙ্গে পরবর্তী সাক্ষাতের পূর্বেই আমার মাথাটি পূর্ণ-বিকশিত একটি শ্বেত-পদ্মের মতো হবে।

আহা! মেরী, যদি তুমি কাশ্মীর দেখতে—শুধুই কাশ্মীর! পদ্ম ও হাঁসে ভরা চমৎকার হ্রদগুলি (হাঁস নেই, রাজহংসী আছে—এটুকু কবির স্বাধীনতা) এবং বায়ু-সঞ্চালিত সেই পদ্মগুলিতে বড় বড় কালো কালো ভ্রমর বসবার চেষ্টা করছে (আমি বলতে চাই যে পদ্মগুলি মাথা নেড়ে আপত্তি জানাচ্ছে—ইতি কবিতা)—এ দৃশ্য যদি তুমি দেখতে, তা হ'লে মৃত্যু-শয্যাতেও তোমার পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকত। যেহেতু এটা ভূস্বর্গ এবং যেহেতু তর্কশাস্ত্র বলে হাতের একটি পাখি বনের দুটির সমান, অতএব এই (ভূস্বর্গের) ক্ষণিক দর্শনও লাভজনক, কিন্তু অর্থনীতির দিক থেকে অপরটি (অর্থাৎ না-দেখাই) শ্রেয়। কোন কষ্ট নেই, পরিশ্রম নেই, কোন খরচপত্র নেই, ছেলেমানুষি ভাবপূর্ণ অতি সহজ জীবন এবং তারপর সেইটুকুই সব।

আমার চিঠিটা তোমার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠছে···সুতরাং এখানেই শেষ করছি (এ হ'ল নিছক আলস্য)। বিদায়।

আমার স্থায়ী ঠিকানা:
মঠ, বেলুড়
হাওড়া জেলা, বাংলা, ভারতবর্ষ

সতত প্রভুসমীপে তোমার
বিবেকানন্দ

৪০১

(শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রকে লিখিত)

শ্রীনগর, কাশ্মীর
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র ও তার পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যে, নির্বিঘ্নে সিন্ধি-ভাষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও।

মধ্যে আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় কিঞ্চিৎ দেরি হইয়া পড়িল, নতুবা এই সপ্তাহের মধ্যেই পঞ্জাবে যাইবার কল্পনা ছিল। এক্ষণে দেশে অতিশয় গ্রীষ্ম বলিয়া ডাক্তার যাইতে নিষেধ করিতেছেন। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ নাগাত বোধ হয় করাচি পৌঁছিব। এক্ষণে এক-রকম ভাল আছি। আমার সঙ্গে এবার কেহ নাই। দুজন আমেরিকান লেডি ফ্রেণ্ড মাত্র আছেন। তাঁহাদের সঙ্গ বোধ হয় লাহোরে ছাড়িব। তাঁহারা কলিকাতায় বা রাজপুতানায় আমার অপেক্ষা করিবেন। আমি সম্ভবতঃ কচ্ছভুজ, জুনাগড়, ভাটনগর, লিমডি ও বরোদা হইয়া কলিকাতায় যাইব। নভেম্বর বা ডিসেম্বরে চীন ও জাপান হইয়া আমেরিকায় যাইব—এই তো এখন বাসনা। পরে শ্রীপ্রভুর হাত। আমার এখানকার সমস্ত খরচপত্র উক্ত আমেরিকান বন্ধুরা দেন এবং করাচি পর্যন্ত ভাড়া প্রভৃতি তাঁহাদের নিকট হইতেই লইব। তবে যদি তোমার সুবিধা হয়, ৫০ৎ টাকা টেলিগ্রাম করিয়া C/o ঋষিবর মুখোপাধ্যায়, চিফ জজ, কাশ্মীর স্টেট, শ্রীনগর—এঁর নামে পাঠাইলে অনেক উপকার হইবে। কারণ সম্প্রতি ব্যারামে পড়িয়া বাজে খরচ কিছু হইয়াছে, এবং সর্বদা বিদেশী শিষ্যদের নিকট টাকা ভিক্ষা করিতে লজ্জা করে।

সদা শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

৪০২

(খেতড়ির মহারাজকে লিখিত)

C/o ঋষিবর মুখার্জি*
প্রধান বিচারপতি, কাশ্মীর
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮

মহামান্য মহারাজ,

এখানে আমি দু-সপ্তাহ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এখন সুস্থ হয়ে উঠেছি। আমার কিছু টাকার টান পড়েছে। যদিও আমেরিকান বন্ধুরা আমাকে সাহায্যের জন্য তাঁদের সাধ্যমত সব কিছুই করছেন, কিন্তু সব সময়ই তাঁদের কাছে হাত পাততে সঙ্কোচ হয়, বিশেষতঃ অসুখ করলে খরচের বহর

অনেক বেড়ে যায়। এই জগতে শুধু একজনের কাছেই আমার কিছু চাইতে লজ্জা হয় না এবং তিনি হলেন আপনি। আপনি দিলেন কি না দিলেন—আমার কাছে দুই সমান। যদি সম্ভব হয়, অনুগ্রহ ক'রে কিছু টাকা পাঠাবেন। আপনি কেমন আছেন? অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি আমি (এখান থেকে) নাবছি।

জগমোহনের চিঠিতে কুমার (যুবরাজ) সাহেব সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে জেনে সবিশেষ আনন্দিত হলাম। আমার সব খবর ভাল, আশা করি আপনার সব কুশল।

সতত প্রভুসমীপে আপনার
বিবেকানন্দ

৪০৩

(খেতড়ির মহারাজকে লিখিত)

লাহোর*
১৬ই অক্টোবর, ১৮৯৮

মহামান্য মহারাজ,

আমার 'তারে'র পরে যে চিঠিখানা গিয়েছে, তাতে আপনার অভিপ্রেত সংবাদ ছিল; সেজন্য আপনার 'তারে'র উত্তরে আমার স্বাস্থ্যের সংবাদ দিয়ে আর কোন 'তার' করিনি।

এ বৎসর কাশ্মীরে অনেক রোগভোগের পর এখন আরোগ্যলাভ করেছি এবং আজ সোজাসুজি কলকাতা যাচ্ছি। গত দশ বৎসর বাংলাদেশে দুর্গাপূজা দেখিনি, দুর্গাপূজা সেখানকার একটি ধুমধাম ব্যাপার। আশা করি, এ বছর পূজা দেখব।

পাশ্চাত্যদেশীয় বন্ধুগণ দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই জয়পুর দেখতে যাবেন। জগমোহন যদি সেখানে থাকে, তা হ'লে তাঁকে দয়া ক'রে নির্দেশ দেবেন, সে যেন তাঁদের একটু দেখাশোনা করে এবং শহরটি ও প্রাচীন শিল্পকীর্তিগুলি ঘুরে দেখিয়ে দেয়।

আমার গুরুভ্রাতা সারদানন্দকে নির্দেশ দিচ্ছি, জয়পুর রওনা হবার পূর্বে মুন্সীজীকে যেন লিখে জানায়।

আপনি ও যুবরাজ কেমন আছেন? যথারীতি আপনার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করছি।

আপনার প্রীতিবদ্ধ
বিবেকানন্দ

পুনঃ—আমার ভবিষ্যৎ ঠিকানা: মঠ, বেলুড়, হাওড়া জেলা, বাংলা।

৪০৪

(শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রকে লিখিত)

লাহোর
১৬ই অক্টোবর, ১৮৯৮

কল্যাণবরেষু,

কাশ্মীরে স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে এবং ৯ বৎসর যাবৎ ৺দুর্গাপূজা দেখি নাই—এ বিধায় কলিকাতা চলিলাম। আমেরিকা যাইবার সঙ্কল্প এখন পরিত্যাগ করিয়াছি এবং শীতকালের মধ্যে করাচি আসিবার অনেক সময় হইবে।

৫০৲ টাকা আমার গুরুভ্রাতা সারদানন্দ লাহোর হইতে করাচি পাঠাইবেন। দুঃখিত হইও না—সকলই প্রভুর হাত। আমি এ বৎসর তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কোথাও যাইব না নিশ্চিত। সকলকে আমার আশীর্বাদ।

সদা শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

৪০৫

(খেতড়ির মহারাজকে লিখিত)

মঠ, বেলুড়*
২৬শে অক্টোবর, ১৮৯৮

মহামান্য মহারাজ,

আপনার স্বাস্থ্যের জন্য আমি খুব উদ্বিগ্ন। আমার খুব ইচ্ছা ছিল নাবার পথে আপনাকে দেখে যাব, কিন্তু আমার স্বাস্থ্য এমনভাবে ভেঙে প'ড়ল যে,

একটুও দেরি না ক'রে আমাকে সমতলে ছুটে আসতে হ'ল। ভয় হচ্ছে, আমার হৃদ্‌যন্ত্রে কিছু গোলযোগ হয়েছে।

যা হোক, আপনার শারীরিক অবস্থা জানবার জন্য আমি খুবই ব্যগ্র। যদি আপনি ইচ্ছা করেন—খেতড়িতে আপনাকে দেখতে যাব। আপনার কল্যাণের জন্য আমি দিনরাত্রি প্রার্থনা করছি। বিপদ কিছু ঘটলে হতাশ হবেন না, 'মা'ই আপনাকে রক্ষা করবেন। আপনার বিস্তারিত সংবাদ আমাকে লিখবেন।···কুমার সাহেব কেমন আছে ?

সর্ববিধ ভালবাসা ও চিরন্তন আশীর্বাদ।

সতত প্রভুসমীপে আপনার
বিবেকানন্দ

৪০৬

(খেতড়ির মহারাজকে লিখিত)

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*
নভেম্বর (?), ১৮৯৮

মহামান্য মহারাজ,

আপনার ও কুমারের স্বাস্থ্য ভাল আছে জেনে খুব আনন্দিত হলাম। এদিকে আমার হৃদ্‌যন্ত্রটা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। বায়ু-পরিবর্তনে আমার আর কোন উপকার হবে ব'লে মনে হয় না—গত চৌদ্দ বৎসর ধরে আমি এক-নাগাড়ে কোথায়ও তিনমাস থেকেছি ব'লে মনে পড়ে না। মনে হয়, যদি কোনক্রমে বেশ কয়েক মাস কোন এক স্থানে থাকতে পারি, তবেই আমার পক্ষে ভাল হবে। তার জন্য আমার কোন মাথাব্যথা নেই। যা হোক, আমি বুঝতে পারছি, এ জীবনে আমার কাজ শেষ হয়েছে। ভাল ও মন্দ, বেদনা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে আমার জীবন-তরী বয়ে গিয়েছে। তার ফলে যে মহৎ শিক্ষাটি আমি লাভ করেছি, তা হ'ল—জীবনটা দুঃখময়, দুঃখ বই আর কিছুই নেই। 'মা'ই জানেন কোন্‌টি শ্রেয়। আমরা সকলেই কর্মের অধীন ; কর্ম তার নিজের পথ ক'রে নেয়—এর কোন ব্যতিক্রম নেই। জীবনে একটি মাত্র বস্তুই আছে, যা যে-কোন উপায়ে লাভ করতে হবে, সেটি হচ্ছে ভালবাসা। বিপুল ও অনন্ত ভালবাসা, আকাশের মতো উদার

ও সমুদ্রের মতো গভীর—সেই হ'ল জীবনে একটি বড় লাভ। যে তা পায়, সে ধন্য।

সতত প্রভুসমীপে আপনার
বিবেকানন্দ

৪০৭

৫৭, রামকান্ত বসু স্ট্রীট, কলিকাতা*
১২ই নভেম্বর, ১৮৯৮

স্নেহের জো,

আগামীকাল রবিবার কয়েকজন বন্ধুকে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করেছি।... চায়ের সময় তোমাকে আশা করছি। তখন সব কিছুই প্রস্তুত থাকবে।

শ্রীমা আজ সকালে নূতন মঠ দেখতে যাচ্ছেন। আমিও সেখানে যাচ্ছি। আজ বিকাল ৬টায় নিবেদিতা সভাপতিত্ব করবে। যদি তোমার ভাল লাগে এবং মিসেস বুলও যদি ইচ্ছা করেন, তা হ'লে চলে এস।

সতত প্রভুসমীপে তোমার
বিবেকানন্দ

৪০৮

(খেতড়ির মহারাজকে লিখিত)

মঠ, বেলুড়*
১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৯৮

মহামান্য মহারাজ,

মিঃ তুলিচাঁদের নামে ৫০০-র অর্ডার সহ আপনার সহৃদয় লিপিখানি পেলাম। আজকাল আমি কিছুটা ভাল আছি। জানি না (স্বাস্থ্যের) এই উন্নতি স্থায়ী হবে, কি না।

শুনলাম এই শীতে আপনি কলকাতা আসছেন। এ কথা কি সত্যি? নূতন বড়লাটকে সম্মান জ্ঞাপন করতে অনেক রাজা আসছেন। কাগজ দেখে জানলাম শিখরের (Sikar) মহারাজা ইতিমধ্যেই এখানে এসেছেন।

আপনার ও আপনার স্বজনদের জন্য সর্বদা প্রার্থনা জানাই।

সতত প্রভুসমীপে আপনার
বিবেকানন্দ

৪০৯

বেলুড় মঠ*

১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৯৮

প্রিয়—,

…'মা'ই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক। আর যা কিছু ঘটছে বা ঘটবে, সে-সকল তাঁরই বিধানে।…

তোমাদের

বিবেকানন্দ

৪১০

(মিসেস ওলিবুলকে লিখিত)

বৈদ্যনাথ ধাম, দেওঘর*

২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৯৮

প্রিয় ধীরামাতা,

আমি যে আপনার সহযাত্রী হ'তে পারব না, তা আপনি আগেই জেনেছেন। আপনার সঙ্গে যাবার মতো শারীরিক শক্তি আমি সংগ্রহ করতে পারছি না। বুকে যে সর্দি জমেছিল, তা এখনও আছে, আর তারই ফলে এখন আমি ভ্রমণে অক্ষম। মোটের উপর এখানে আমি ক্রমে সেরে উঠব বলেই আশা করি।

জানলাম, আমার ভগ্নী গত কয়েক বৎসর যাবৎ বিশেষ সঙ্কল্প নিয়ে নিজের মানসিক উন্নতিসাধনের চেষ্টা করছে। বাঙলা সাহিত্যের ভেতর দিয়ে যা কিছু জানা সম্ভব—বিশেষ ক'রে অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে, সে-সবই সে শিখেছে, আর তার পরিমাণও বড় কম নয়। ইতিমধ্যে সে নিজের নাম ইংরেজী ও রোমান অক্ষরে সই করতে শিখেছে। এখন তাকে অধিকতর শিক্ষাদান বিশেষ মানসিক পরিশ্রম-সাপেক্ষ; সুতরাং সে-কাজ থেকে আমি বিরত হয়েছি। আমি শুধু বিনা কাজে সময় কাটাতে চেষ্টা করছি এবং জোর করেই বিশ্রাম নিচ্ছি।

এ-যাবৎ আমি আপনাকে কেবল শ্রদ্ধাই করেছি, কিন্তু এখন ঘটনা-পরম্পরায় মনে হচ্ছে যে, মহামায়া আপনাকে আমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য নিযুক্ত করেছেন; সুতরাং এখন শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রগাঢ়

বিশ্বাস যুক্ত হয়েছে। এখন থেকে আমি আমার নিজের জীবন এবং কর্ম-প্রণালী বিষয়ে মনে ক'রব যে, আপনি মায়ের আজ্ঞাপ্রাপ্ত; সুতরাং সকল দায়িত্ববোধ নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে আপনার ভেতর দিয়ে মহামায়া যে নির্দেশ দেবেন, তাই মেনে চ'লব।

শীঘ্রই ইওরোপ কিংবা আমেরিকায় আপনার সহিত মিলিত হ'তে পারব, এই আশা নিয়ে এ চিঠি শেষ করছি। ইতি

আপনার স্নেহের সন্তান
বিবেকানন্দ

৪১১

মঠ, বেলুড়*
২রা ফেব্রুআরি, ১৮৯৯

স্নেহের জো,

তুমি নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিউইয়র্ক পৌঁছেছ এবং দীর্ঘ অনুপস্থিতির পরে আবার স্বজনদের সঙ্গে মিলেছ। এবারকার যাত্রায় ভাগ্য প্রতি পদে তোমার অনুকূল হয়েছে—এমন কি সমুদ্র পর্যন্ত স্থির ও শান্ত ছিল এবং অবাঞ্ছিত সঙ্গীও জাহাজে বড় কেউ ছিল না। আমার বেলায় ঠিক এর উলটো। তোমার সঙ্গে যেতে না পেরে আমি নিরাশ হয়ে পড়েছি। বৈদ্যনাথে বায়ু-পরিবর্তনে কোন ফল হয়নি। সেখানে আট দিন আট রাত্রি শ্বাসকষ্টে প্রাণ যায় যায়। মৃতকল্প অবস্থায় আমাকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়। এখানে এসে বেঁচে উঠবার লড়াই শুরু করেছি।

ডাঃ সরকার এখন আমার চিকিৎসা করছেন। আগের মতো হতাশ ভাব আর নেই। অদৃষ্টের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছি। এটা আমাদের পক্ষে বড় দুর্বৎসর। যোগানন্দ, যে মায়ের বাড়িতে থাকত, এক মাস ধরে ভুগছে এবং প্রতিদিনই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। মা-ই ভাল জানেন। আবার কাজে লেগেছি, ঠিক নিজে করছি না, ছেলেদের পাঠিয়ে দিচ্ছি সারা ভারতে আবার একটা আলোড়ন জাগাবার জন্য। সর্বোপরি তুমি তো জানই, অর্থাভাবই হচ্ছে প্রধান অসুবিধা। জো, তুমি এখন আমেরিকায়, আমাদের এখানকার কাজের জন্য কিছু টাকা তুলতে চেষ্টা কর।

মার্চ নাগাদ আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছি, এপ্রিলে ইওরোপ যাত্রা। বাকী মা-ই ভাল জানেন।

সারাটা জীবন শরীর ও মনের কষ্ট সয়েছি অনেক, কিন্তু মায়ের অপার করুণা। আমার পাওনার চেয়ে অনন্তগুণ বেশী আনন্দ ও আশীর্বাদ পেয়েছি। মায়ের কাজে অবিরাম সংগ্রাম করছি, মা দেখছেন। আমি সর্বদা লড়াই ক'রে চলেছি এবং যুদ্ধক্ষেত্রেই আমি শেষনিঃশ্বাস ফেলবো।

আমার অশেষ প্রীতি এবং আশীর্বাদ—তোমার জন্য চিরদিন।

সতত সত্যস্বরূপে তোমার
বিবেকানন্দ

৪১২

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

মঠ, বেলুড়, জেলা হাওড়া*
১৬ই মার্চ, ১৮৯৯

স্নেহের মেরী,

মিসেস এডাম্‌স্‌কে ধন্যবাদ ; তিনি তোমাদের—দুষ্টু মেয়েদের অবশেষে চিঠি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। 'চোখের আড়াল হলেই আর মনে থাকে না' —এ-কথা ভারতে যেমনি সত্য, আমেরিকাতেও তেমনি।···

আচ্ছা, আমার শরীর এক রকম ভালই যাচ্ছে ; তাতে কয়েক মাস যাবৎ মনে হচ্ছে, শরীরটা আরও কিছুকাল টিকবে।···

ম্যাক্সমূলারের নূতন বই 'রামকৃষ্ণ: তাঁর জীবনী ও বাণী' (Ramkrishna : His Life and Sayings) পড়েছ কি ? যদি পড়ে না থাকো, পড়ে ফেলো, এবং মাকে পড়তে দাও। মা কেমন আছেন ? তাঁকে কি বুড়ো দেখাচ্ছে ? ফাদার পোপ কেমন আছেন ?···

মার্কিন ও ইংরেজ বন্ধুদের ধন্যবাদ, তাঁদের সাহায্যেই গঙ্গার তীরে আমাদের একটি মঠ হয়েছে। মাকে মন দিয়ে দেখতে বলো—'পৌত্তলিক প্রচারক'দের দ্বারা তোমাদের ইয়াঙ্কি দেশকে প্লাবিত করতে চলেছি।

এ গ্রীষ্মে জো-র সঙ্গে আমেরিকায় যাবার খুব ইচ্ছা ; কিন্তু মানুষ সংকল্প করে, এবং কে বিধান করেন ?—সব সময়ে নিশ্চয়ই ভগবান করেন না। ভাল, যা হবার তা হোক। অভয়ানন্দ (মেরী লুই) ভারতে এসেছে,

বোম্বে ও মান্দ্রাজে তার খুব সংবর্ধনা হয়েছে। আগামী কাল সে কলকাতায় আসবে, এবং আমরাও তাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করছি।

মিস হাউ, মিসেস এডাম্স্, মাদার চার্চ ও ফাদার পোপ এবং সাত সমুদ্রের পারে অন্যান্য যে-সব বন্ধু আছে তাদের সকলকে আমার ভালবাসা জানাচ্ছি। আমরা সাত সমুদ্রে বিশ্বাস করি—দধি, দুগ্ধ, মধু, সুরা, ইক্ষুরস, লবণ, আর একটা ভুলে গেছি। তোমাদের চার বোনকে মধু-সমুদ্রের উপর দিয়ে বায়ুবেগে সঞ্চালিত করছি আমার স্নেহ।

তোমাদের চিরদিনের ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

৪১৩

বেলুড় মঠ*
১১ই এপ্রিল, ১৮৯৯

প্রিয়—,

…দু-বৎসরের শারীরিক কষ্ট আমার বিশ বৎসরের আয়ু হরণ করেছে। ভাল কথা, কিন্তু এতে আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। হয় কি? সেই আপনভোলা আত্মা একই ভাবে বিভোর হয়ে তীব্র একাগ্রতা ও আকুলতা নিয়ে ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।…

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৪১৪

(শ্রীমতী সরলা ঘোষালকে লিখিত)

বেলুড় মঠ
১৬ই এপ্রিল, ১৮৯৯

মহাশয়াসু,

আপনার পত্রে সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। যদি আমার বা আমার গুরুভ্রাতাদিগের কোনও একটি বিশেষ আদরের বস্তু ত্যাগ করিলে অনেক শুদ্ধসত্ত্ব এবং যথার্থ স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা আমাদের কার্যে সহায় হন, তাহা হইলে সে ত্যাগে আমাদের মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হইবে না বা এক ফোঁটাও

চক্ষের জল পড়িবে না, জানিবেন এবং কার্যকালে দেখিবেন। তবে এতদিন কাহাকেও তো দেখি নাই, সে প্রকার সহায়তায় অগ্রসর। দু-এক জন আমাদের hobby-র (খেয়ালের) জায়গায় তাঁহাদের hobby বসাইতে চাহিয়াছেন, এই পর্যন্ত। যদি যথার্থ স্বদেশের বা মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়, শ্রীগুরুর পূজা ছাড়া কি কথা, কোনও উৎকট পাপ করিয়া খৃষ্টিয়ানদের অনন্ত নরক-ভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি, জানিবেন। তবে মানুষ দেখতে দেখতে বৃদ্ধ হ'তে চলিলাম। এ সংসার বড়ই কঠিন স্থান। গ্রীক দার্শনিকের লণ্ঠন হাতে করিয়া অনেক দিন হইতেই বেড়াইতেছি। আমার গুরুঠাকুর সর্বদা একটি বাউলের গান গাহিতেন—সেইটি মনে প'ড়ল:

'মনের মানুষ হয় যে জনা
নয়নে তার যায় গো জানা,
সে দু এক জনা,
সে রসের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা।'

এই তো গেল আমার তরফ থেকে। আর একটিও অতিরঞ্জিত নয় জানিবেন এবং কার্যকালে দেখিবেন।

তারপর যে-সকল দেশহিতৈষী মহাত্মা গুরুপূজাটি ছাড়লেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, তাঁদের সম্বন্ধেও আমার একটুকু খুঁত আছে। বলি, এত দেশের জন্য বুক ধড়ফড়, কলিজা ছেঁড়-ছেঁড়, প্রাণ যায়-যায়, কণ্ঠে ঘড়-ঘড় ইত্যাদি—আর একটি ঠাকুরেই সব বন্ধ ক'রে দিলে?

এই যে প্রবল তরঙ্গশালিনী নদী, যার বেগে পাহাড়-পর্বত যেন ভেসে যায়, একটি ঠাকুরে একেবারে হিমালয়ে ফিরিয়ে দিলে! বলি, ও-রকম দেশ-হিতৈষিতাতে কি বড় কাজ হবে মনে করেন, বা ও-রকম সহায়তায় বড় বিশেষ উপকার হ'তে পারে? আপনারা জানেন, আমি তো কিছুই বুঝিতে পারি না। তৃষ্ণার্তের এত জলের বিচার, ক্ষুধায় মৃতপ্রায়ের এত অন্নবিচার, এত নাক সিটকানো? কে জানে কার কি মতিগতি! আমার যেন মনে হয়, ও-সব লোক গ্লাসকেসের ভিতর ভাল; কাজের সময় যত ওরা পিছনে থাকে, ততই কল্যাণ।

প্রীত ন মানে জাত কুজাত।
ভুখ ন মানে বাসী ভাত॥

আমি তো এই জানি। তবে আমার সব ভুল হ'তে পারে, ঠাকুরের আঁটিটি গলায় আটকে যদি সব মারা যায় তো না হয় আঁটিটি ছাড়িয়া দেওয়া যায়। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে অনেক কথা কহিবার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা রহিল।

এ সকল কথা কহিবার জন্য রোগ, শোক, মৃত্যু সকলেই আমায় এ পর্যন্ত সময় দিয়াছেন, বিশ্বাস—এখনও দিবেন।

এই নববর্ষে আপনার সমস্ত কামনা পূর্ণ হউক।

কিমধিকমিতি
বিবেকানন্দ

৪১৫

মঠ, আলমবাজার*
১৪ই জুন, ১৮৯৯

প্রিয় বন্ধু,

আমি এখানে যেভাবে আছি, মহামান্য (Highness) আপনাকেও সেইভাবে চাই, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা আপনার এখনই সব চেয়ে প্রয়োজন।

কয়েক সপ্তাহ আগে আপনাকে একখানা চিঠি লিখেছি, কিন্তু আপনার কোনও সংবাদ পাইনি। আশা করি, এখন আপনার স্বাস্থ্য খুব ভাল আছে। এ মাসের ২০শে আবার ইংলণ্ড যাচ্ছি।

এবারকার সমুদ্রযাত্রায় কিছু উপকার হবে, আশা করছি।

ঈশ্বর আপনাকে সকল বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করুন এবং সর্ববিধ আশীর্বাদে মণ্ডিত করুন।

প্রভুসমীপে আপনার
বিবেকানন্দ

৪১৬

পোর্ট সৈয়দ*
১৪ই জুলাই, ১৮৯৯

প্রিয় স্টার্ডি,

এইমাত্র তোমার চিঠিখানি ঠিক এসে গেছে। প্যারিসের মঁ নোবেলেরও (M. Nobel) একখানি এসেছে। মিস নোবল (Miss Noble) আমেরিকার বহু চিঠি পেয়েছেন।

নোবেল জানিয়েছেন যে, তাঁকে দীর্ঘকাল বাইরে থাকতে হবে; সুতরাং আমার লণ্ডন থেকে প্যারিসে তাঁর ওখানে যাবার তারিখ যেন পেছিয়ে দিই। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, উপস্থিত লণ্ডনে আমার বন্ধুদের অনেকেই নেই; তা ছাড়া মিস ম্যাকলাউড যাবার জন্য আমায় খুবই পীড়াপীড়ি করছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইংলণ্ডে থাকা যুক্তি-সঙ্গত মনে হচ্ছে না। অধিকন্তু আমার আয়ু ফুরিয়ে এল—অন্ততঃ আমাকে এটা সত্য ব'লে ধরে নিয়েই চলতে হবে। আমার বক্তব্য এই যে, আমরা যদি আমেরিকায় সত্যই কিছু করতে চাই, তবে এখনি আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত প্রভাবকে যথাবিধি নিয়ন্ত্রিত না করতে পারলেও অন্ততঃ একমুখী করতেই হবে। তারপর মাস-কয়েক পরেই আমি ইংলণ্ডে ফিরে আসার অবকাশ পাব এবং ভারতবর্ষে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত একমনে কাজ করতে পারবো।

আমার মনে হয়, আমেরিকার কাজকে গুছিয়ে আনার জন্য তোমার আসা একান্ত প্রয়োজন। অতএব যদি পারো তো আমার সঙ্গেই তোমার চলে আসা উচিত। তুরীয়ানন্দ আমার সঙ্গে আছে। সারদানন্দের ভাই বস্টনে যাচ্ছে।...তুমি যদি আমেরিকায় নাও আসতে পারো, তবু আমার যাওয়া উচিত—কি বলো?

৪১৭

The Lymes*
Woodsides, Wimbledon
৩রা অগস্ট, ১৮৯৯

স্নেহের জো,

অবশেষে হাজির। তুরীয়ানন্দের ও আমার সুন্দর বাসস্থান মিলেছে। সারদানন্দের ভ্রাতা মিস নোবল্-এর বাসস্থানে আছে, আগামী সোমবার রওনা হবে।

সমুদ্রযাত্রায় বেশ কিছু স্বাস্থ্যোন্নতি হয়েছে। তা ঘটেছে ডাম্বেল নিয়ে ব্যায়াম ও মৌসুমী ঝড়ে ঢেউয়ের উপর স্টীমারের ওলটপালট থেকে। অদ্ভুত,

নয় কি? আশা করি এটা বজায় থাকবে। আমাদের 'মাতা' কোথায়—ভারতের পূজনীয়া গাভীমাতা (Worshipful Brahmini Cow)? মনে হয়, তিনি নিউইয়র্কে তোমার সঙ্গেই আছেন।

স্টার্ডি বাইরে গেছে, মিসেস জনসন এবং অন্য সকলেও তাই। মার্গো এতে কিছু উদ্বিগ্ন। আগামী মাসের আগে সে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারছে না। ইতি-মধ্যেই সমুদ্রকে ভালবেসে ফেলেছি। মৎস্যাবতার আমার উপর চড়ে পড়েছেন, আশঙ্কা হয় ভালমতেই চড়েছেন, অব্যর্থভাবে—এই বাঙালির উপর।

এলবার্টা কেমন আছে? ·· বুড়োরা ও বাকী সকলে? প্রিয় মিসেস র‍্যাবিটের (Mrs. Brer Rabbit) কাছ থেকে একখানা সুন্দর চিঠি পেয়েছি; তিনি লণ্ডনে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি; আমাদের পৌঁছবার আগেই তিনি রওনা হয়েছেন।

এখানে এখন সুন্দর উষ্ণ আবহাওয়া; সকলে বলছে, একটু বেশী মাত্রায় উষ্ণ। কিছুদিনের জন্য আমি শূন্যবাদী হয়ে গেছি, কোন কিছুতেই বিশ্বাস করি না। কোন কিছুর পরিকল্পনা, কোন অনুশোচনা, প্রচেষ্টা—কিছুই নেই; কাজ-কর্মের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্বন করেছি। আর হ্যাঁ, জো, জাহাজে আমি যখন তোমার বা ভগবতী গাভীর সমালোচনা করেছি, তখনই মার্গো তোমার পক্ষ নিয়েছে। বেচারা ছেলেমানুষ, কতটুকুই বা জানে! আসল কথা হচ্ছে, জো, লণ্ডনে কোন কাজ হবে না, কারণ তুমি এখানে নেই। তুমিই দেখছি আমার নিয়তি। এককাট্টা হয়ে লেগে যাও, কর্ম থেকে কারও নিস্তার নেই। দেখো, এবারের সমুদ্রযাত্রার ফলে আমার বয়স যেন কয়েক বছর কমে গেছে। শুধু যখন বুক ধড়ফড় ক'রে ওঠে, তখন টের পাই বয়স হয়েছে। এটা কি অস্থিচিকিৎসার কোন ব্যাপার? আমার রোগ সারাতে দু-একটা পাঁজর কেটে বাদ দেবে নাকি? উঁহুঁ, তা হচ্ছে না। আমার পাঁজরা দিয়ে···তৈরী করা-টরা চলবে না। ওটা যা-ই হোক, তার পক্ষে আমার হাড় পাওয়া কঠিন হবে।. আমার হাড় গঙ্গায় প্রবাল সৃষ্টি করবে, আমার বরাতে এই লেখা আছে। এখন আমার ফরাসী শেখার ইচ্ছা—যদি তুমি প্রতিদিন আমাকে একটি ক'রে পাঠ দিয়ে যাও; কিন্তু ও-সব ব্যাকরণের বালাই একদম নয়—আমি কেবল পড়ে যাব, আর তুমি ইংরেজীতে ব্যাখ্যা ক'রে যাবে। অভেদানন্দকে আমার ভালবাসা দিও,

আর ব'লো সে যেন তুরীয়ানন্দের জন্য প্রস্তুত থাকে। আমি তাকে নিয়ে যাচ্ছি। শীঘ্র চিঠি দিও।

সর্ববিধ ভালবাসার সঙ্গে
বিবেকানন্দ

৪১৮

(মিস মেরী হেলবয়েস্টারকে লিখিত)

C/o Miss Noble*
21A High Street, উইম্বলডন
অগস্ট, ১৮৯৯

স্নেহের মেরী,

আবার লণ্ডনে হাজির। এবারে কোন ব্যস্ততা নেই, টানাহেঁচড়া নেই, চুপটি ক'রে এক কোণে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাবার প্রথম সুযোগের অপেক্ষায় আছি। বন্ধুরা প্রায় সকলেই লণ্ডনের পল্লী অঞ্চলে কিংবা অন্যত্র চলে গিয়েছেন, আর আমার শরীরও বিশেষ সবল নয়।

তা হ'লে কানাডাতে সরোবর, উদ্যান ও নির্জনতার মধ্যে বেশ আনন্দে আছ। জেনে খুশী—খুবই খুশী যে, তুমি আবার স্রোতের উপর ভেসে উঠেছ। এ অবস্থায় যেন চিরদিন থাকতে পারো!

'রাজযোগে'র অনুবাদ এখনও শেষ করতে পারোনি—বেশ তো, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। কাজটা হবার হ'লে সময় ও সুযোগ আসবেই জেনো, নইলে আমাদের চেষ্টা বৃথা।

ক্ষণস্থায়ী কিন্তু প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দেশ কানাডা এখন নিশ্চয়ই সুন্দর এবং খুব স্বাস্থ্যকর। কয়েক সপ্তাহ পরেই নিউইয়র্কে পৌছব, আশা করি; তারপরের কথা জানি না। আগামী বসন্তে হয়তো আবার ইংলণ্ডে ফিরে আসব।

আমি একান্তভাবে চাই যে কাউকেই যেন কখনও দুঃখ পেতে না হয়, কিন্তু (একথাও সত্যি যে) একমাত্র দুঃখই জীবনের গভীরে প্রবেশ করবার অন্তর্দৃষ্টি এনে দেয়। তাই নয় কি?

আমাদের বেদনার মুহূর্তে চিরদিনের মতো বন্ধ দুয়ার আবার খুলে যায় এবং অন্তরে আলোর বন্যা প্রবেশ করে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়ে। কিন্তু হায়! এ জগতে লব্ধ জ্ঞানকে আমরা কাজে লাগাতে পারি না। যে মুহূর্তে মনে হয় কিছু শিখেছি, তখনই রঙ্গমঞ্চ থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে হয়। এরই নাম মায়া!

এই খেলার জগৎ কোথায় থাকত, আর খেলাই বা কেমন ক'রে চ'লত, যদি এই খেলার মর্ম আমাদের আগে থেকেই জানা থাকত? চোখ বেঁধে আমাদের খেলা। এই খেলায় আমাদের মধ্যে কেউ শয়তানের অভিনয় করছে, কেউ বা বীরের—কিন্তু জেনো, এ-সবই নিছক খেলা। এটুকুই একমাত্র সান্ত্বনা। রঙ্গমঞ্চে সিংহ, ব্যাঘ্র, দানব এবং আরও কত জীবই না আছে, কিন্তু সকলেরই মুখে বন্ধনী আঁটা; তারা তীক্ষ্ণ শব্দ করে, কিন্তু কামড়াতে পারে না।—জগৎ আমাদের আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। যদি তুমি চাও, শরীর বিদীর্ণ হলেও বা রক্তের ধারা বইলেও অন্তরে গভীর শান্তি অনুভব করতে পারো। আর তা পাবার উপায় হ'ল নৈরাশ্য বা সকল আশা বিসর্জন দেওয়া। তুমি কি তা জানো? এটি অক্ষমের হতাশার মনোভাব নয়, বিজয়ীর বিজিত বস্তুর প্রতি যে অবহেলা, এ হ'ল তাই—কোন কিছুকে পাবার জন্য সে যেমন লড়াই করে, পাবার পর তেমনি সেটা তার অযোগ্য মনে ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এই নৈরাশ্য, নির্বাসনা ও লক্ষ্যহীনতার সঙ্গে প্রকৃতির ঐক্য আছে। প্রকৃতিতে কোন সামঞ্জস্য, যুক্তিবিচার বা পারম্পর্য নেই, যেমন বিশৃঙ্খলা আগেও ছিল, এখনও তেমনি আছে।

নিকৃষ্ট মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এই মিল যে তার চিন্তা পার্থিব, শ্রেষ্ঠ মানুষের সঙ্গেও মিল জ্ঞানের পরিপূর্ণতায়। এরা তিনজনই[১] লক্ষ্যশূন্য, প্রবাহ-তাড়িত, আশাহীন—তিনজনেই সুখী।

তুমি খোশগল্পভরা চিঠি চাও, তাই নয় কি? কিন্তু আমার ঝুলিতে বেশী গল্প নেই। মিঃ স্টার্ডি দুদিন আগে এসেছে। কাল ওয়েলস্-এ তার বাড়ীতে চলে যাবে। দু-এক দিনের মধ্যেই নিউইয়র্কের টিকিট করতে হবে।

পুরানো কোন বন্ধুর দেখা এখনও পাইনি, মিস সুটার (Miss Souter) এবং ম্যাক্স গাইসিক (Max Gysic) ছাড়া,—এঁরা এখন লণ্ডনে। এঁরা যেমন বরাবর আমার প্রতি সদয় ছিলেন, এখনও তাই।

---

১ নিকৃষ্ট, মাঝামাঝি (প্রাকৃতিক) ও শ্রেষ্ঠ।

কোন খবরই তোমাকে দেবার নেই, কারণ আমি নিজেই লণ্ডনের খবর এখনও কিছু জানি না। গারট্রুড অর্চার্ড (Gertrude Orchard) কোথায় জানি না, জানলে তার কাছে চিঠি লিখতাম। মিস কেট স্টীলও (Miss Kate Steel) বাইরে, বৃহস্পতিবার কি শনিবার আসছে।

একজন সুশিক্ষিত ফরাসী বন্ধুর কাছ থেকে পারি-তে তাঁর অতিথি হয়ে থাকবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, কিন্তু এবার যাওয়া হ'ল না। অন্য কোন সময় তাঁর সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে আসব।

কয়েকজন পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবার আশা আছে, হ'লে শুভেচ্ছা জানাব। আমেরিকায় তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে। হয় আমি বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ অটোয়া যেয়ে হাজির হবো, কিংবা তুমি আসবে নিউইয়র্কে।

বিদায়, ভাগ্য তোমার প্রতি প্রসন্ন হোক।

সতত প্রভুসমীপে তোমার

বিবেকানন্দ

৪১৯

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

লণ্ডন

১০ই অগস্ট, ১৮৯৯

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার পত্রে অনেক সংবাদ পাইলাম। আমার শরীর জাহাজে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু ডাঙায় আসিয়া পেটে বায়ু হওয়ায় একটু খারাপ। একজন বড় ডাক্তার বললে, নিরামিষ খাও, আর ডাল ছুঁয়ো না। ইনি এখানকার একজন মুরুব্বি ডাক্তার। এঁর মতে ইউরিক এসিড-গোলমালে যত ব্যারাম হয়। মাংস এবং ডাল ইউরিক এসিড বানায়; অতএব 'ত্যাজ্যং ব্রহ্মপদং' ইত্যাদি। যা হোক, আমি তাকে সেলাম ক'রে চলে এলাম। Examine (পরীক্ষা) ক'রে বললে চিনি-ফিনি নেই—আলবুমেন আছে। যাক! নাড়ী খুব জোর, বুকটাও দুর্বল বটে। মন্দ কি, দিনকতক হবিষ্যাশী হওয়া ভাল। এখানে বড় গোলযোগ—বন্ধু-বান্ধব সব গরমির দিনে বাইরে গেছে। তার উপর শরীর তত ভাল নয়—খাওয়া-দাওয়ায়ও গোলমাল। অতএব দু-চার দিনের মধ্যেই আমেরিকায় চললুম। মিসেস

বুলের জন্য একটা হিসাব পাঠাইও—কত টাকা জমি কিনতে, কত টাকা বাড়ি, খাইখরচ কত টাকা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সারদা বলে, কাগজ চলে না।··· আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত খুব advertise ক'রে (বিজ্ঞাপন দিয়ে) ছাপাক দিকি—গড় গড় ক'রে subscriber (গ্রাহক) হবে। খালি ভটচায্যিগিরি তিন ভাগ দিলে কি লোকে পছন্দ করে!

যা হোক কাগজটার উপর খুব নজর রাখবে। মনে জেনো যে, আমি গেছি। এই বুঝে স্বাধীনভাবে তোমরা কাজ কর। 'টাকাকড়ি, বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত দাদার ভরসা' হইলেই সর্বনাশ আর কি! কাগজটার পর্যন্ত টাকা আমি আনব, আবার লেখাও আমার সব—তোমরা কি করবে? সাহেবরা[১] কি করছেন? আমার হয়ে গেছে! তেমারা যা করবার কর। একটা পয়সা আনবার কেউ নেই, একটা প্রচার করবার কেউ নেই, একটা বিষয় রক্ষা করবার বুদ্ধি কারু নেই। এক লাইন লিখবার···ক্ষমতা কারুর নাই—সব খামকা মহাপুরুষ!···তোমাদের যখন এই দশা, তখন ছেলেদের হাতে ছ-মাস ফেলে দাও সমস্ত জিনিস—কাগজ-পত্র, টাকা-কড়ি, প্রচার ইত্যাদি। তারাও কিছু না পারে তো সব বেচে-কিনে যাদের টাকা তাদের দিয়ে ফকির হও। মঠের খবর তো কিছুই পাই না। শরৎ কি করছে? আমি কাজ চাই। মরবার আগে দেখতে চাই যে, আজীবন কষ্ট ক'রে যা খাড়া করেছি, তা এক-রকম চলছে। তুমি টাকাকড়ির বিষয় কমিটির সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়ে পরামর্শ ক'রে কাজ করবে। কমিটির সই ক'রে নেবে প্রত্যেক খরচের জন্য। নইলে তুমিও বদনাম নেবে আর কি! লোকে টাকা দিলেই একদিন না একদিন হিসাব চায়—এই দস্তুর। প্রতি পদে সেটি তৈয়ার না থাকা বড়ই অন্যায়।··· ঐ-রকম প্রথমে কুড়েমি করতে করতেই লোকে জোচ্চোর হয়। মঠে যারা আছে, তাদের নিয়ে একটি কমিটি করবে, আর প্রতি খরচ তারা সই না দিলে হবে না—একদম!··· আমি কাজ চাই, vigour (উদ্যম) চাই—যে মরে যে বাঁচে; সন্ন্যাসীর আবার মরা-বাঁচা কি?

---

১ সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য-প্রত্যাগত গুরুভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া এ-কথা বলা হইয়াছে।

শরৎ যদি কলিকাতা না জাগিয়ে তুলতে পারে…তুমি যদি এই বৎসরের মধ্যে পোস্তা না গাঁথতে পারো তো দেখতে পাবে তামাসা! আমি কাজ চাই—no humbug (কোন প্রতারণা নয়)! মাতাঠাকুরানীকে আমার সাষ্টাঙ্গ, ইত্যাদি। ইতি

বিবেকানন্দ

৪২০

রিজলি*

২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয়—,

জীবন হচ্ছে কতকগুলো ঘাত-প্রতিঘাত ও ভুল-ভাঙার সমষ্টি মাত্র।… জীবনের রহস্য হচ্ছে ভোগ নয়, পরন্তু অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে শিক্ষালাভ। কিন্তু হায়, যখন সবেমাত্র আমাদের প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়, ঠিক তখনি ডাক আসে। এইটিই অনেকের নিকট পরজন্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা প্রবল যুক্তি ব'লে মনে হয়।… সর্বত্রই কাজের উপর দিয়ে একটা ঘূর্ণিবায়ু বয়ে যাওয়া যেন ভাল মনে হয়—তাতে সব পরিষ্কার ক'রে দেয় এবং জিনিসের আসল রূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরে। নূতন ক'রে সে কাজ গড়ে তোলা হয়—বজ্রদৃঢ় ভিত্তির উপরে।… আমার একান্ত শুভেচ্ছা জানবে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

৪২১

(মিসেস ওলি বুলকে লিখিত)

রিজলি*

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয়—,

…আমার সম্বন্ধে তো ঐ এক কথা—মা-ই সব জানেন।…

তোমাদের

বিবেকানন্দ

৪২২

রিজলি ম্যানর*
১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় স্টার্ডি,

আমি লেগেটদের বাড়িতে শুধু বিশ্রামই উপভোগ করছি, আর কিছুই করছি না। অভেদানন্দ এখানে আছে, খুব খাটছে। দু-এক দিনের মধ্যে সে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে চলে যাবে এক মাসের জন্য। তারপর নিউইয়র্কে কাজ করতে আসবে।

তোমার প্রস্তাবিত ধারা অবলম্বনে আমি কিছু করবার চেষ্টায় আছি; কিন্তু হিন্দুদের সম্বন্ধে হিন্দুরই লেখা বই পাশ্চাত্য দেশে কতটা সমাদর পাবে জানি না।...

মিসেস জন্‌সনের মতে ধার্মিক ব্যক্তির রোগ হওয়া উচিত নয়। এখন আবার তাঁর মনে হচ্ছে, আমার ধূমপানাদিও পাপ। মিস মূলারও আমায় ছেড়ে গেছেন—ঐ রোগের জন্য। হয়তো তাঁরাই ঠিক। তুমিও জানো, আমিও জানি, আমি যা, আমি তাই। ভারতে অনেকে এই দোষের জন্য এবং ইওরোপীয়দের সঙ্গে আহার করার জন্য আপত্তি জানিয়েছেন, ইওরোপীয়দের সঙ্গে খাই ব'লে আমায় একটি পারিবারিক দেবালয় থেকে বের ক'রে দেওয়া হয়েছিল। আমার তো ইচ্ছা হয়, আমি এমন নমনীয় হই যে, প্রত্যেকের ইচ্ছানুরূপ আকারে গঠিত হ'তে পারি; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এমন লোক তো আজও দেখলাম না, যে সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারে। বিশেষতঃ যাকে বহু জায়গায় যেতে হয়, তার পক্ষে সকলকে তুষ্ট করা সম্ভব নয়।

আমি যখন প্রথম আমেরিকায় আসি, তখন প্যাণ্টালুন না থাকলে লোকে আমার প্রতি দুর্ব্যবহার ক'রত; তারপর আমাকে শক্ত আস্তিন ও কলার পরতে বাধ্য করা হ'ল—তা না হ'লে তারা আমায় ছোঁবেই না। তারা আমাকে যা খেতে দিত, তা না খেলে আমায় অদ্ভুত মনে ক'রত। এমনি সব!...

অবশ্য সবই আমার কর্মফল, আর এতে আমি খুশীই আছি। কারণ এতে যদিও সেই সময়ের মতো যন্ত্রণা হয়, তবু এতে জীবনের আর এক অভিজ্ঞতা হয় এবং তা এ-জীবনেই হোক বা পরজীবনেই হোক, কাজে লাগবে।...

আমি নিজে কিন্তু জোয়ার-ভাঁটার মধ্য দিয়েই চলেছি। আমি সর্বদা জানি এবং প্রচার ক'রে এসেছি যে, প্রত্যেক আনন্দের পশ্চাতে আসে দুঃখ— চক্রবৃদ্ধি সুদ সমেত না হলেও আসলটা তো আসবেই। আমি জগতের কাছে প্রচুর ভালবাসা পেয়েছি, সুতরাং যথেষ্ট ঘৃণার জন্যও আমায় প্রস্তুত থাকতে হবে। আর এতে আমি খুশীই আছি—কারণ আমাকে অবলম্বন ক'রে আমার এই মতবাদই প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেক উত্থানের সঙ্গে থাকে তার অনুরূপ পতন।

আমার দিক থেকে আমি আমার স্বভাব ও নীতিকে সর্বদা আঁকড়ে ধরে থাকি—একবার যাকে বন্ধু ব'লে গ্রহণ করেছি, সে সর্বদাই আমার বন্ধু। তা ছাড়া ভারতীয় রীতি অনুসারে আমি বাইরের ঘটনাবলীর কারণ আবিষ্কারের জন্য অন্তরেই দৃষ্টিপাত করি; আমি জানি যে, আমার উপর যত বিদ্বেষ ও ঘৃণার তরঙ্গ এসে পড়ে, তার জন্য দায়ী আমি এবং শুধু আমিই। এমনটি না হয়ে অন্য রকম হওয়া সম্ভব নয়।

তুমি ও মিসেস জন্‌সন যে আর একবার আমাকে অন্তর্মুখী হবার জন্য অবহিত করেছ, সেজন্য তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

চিরকালেরই মতো স্নেহ ও শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

৪২৩

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

রিজলি ম্যানর*
সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯

স্নেহের মেরী,

হ্যাঁ, এসে পৌঁছেছি। গ্রীনএকার থেকে ইসাবেল-এর একখানা চিঠি পেয়েছি। তার সঙ্গে এবং হ্যারিয়েটের সঙ্গে শীঘ্রই দেখা ক'রব। হ্যারিয়েট সমভাবে নীরব। যাই হোক, আমি অপেক্ষা ক'রব, মিঃ উলী (Mr. Woolley) ক্রোরপতি হলেই আমার টাকা দাবী ক'রব। তোমার চিঠিতে মাদার চার্চ বা ফাদার পোপের খুঁটিনাটি খবর কিছু নেই, কতকগুলি কাগজে আমার সম্বন্ধে কি লিখেছে না লিখেছে, কেবল তাই আছে। কাগজের

লেখার প্রতি আমার আগ্রহ অনেকদিন কেটে গিয়েছে; সেগুলি শুধু জনসাধারণের সামনে আমাদের তুলে ধরে ও তাতে আমার বইগুলি—তোমার মতে 'যা হোক ক'রে' বিক্রি হয়ে যায়। এখন কি করবার চেষ্টা করছি, জানো? 'ভারত ও ভারতবাসী' সম্বন্ধে একটি বই লিখছি—ছোট্ট সহজ, খোশগল্পে-ভরা একটা কিছু। ফরাসী শিখছি আবার। এ বছর শিখতে না পারলে আগামী বছর পারি-প্রদর্শনীর ব্যাপারটা ঠিকভাবে চালাতে পারব না। হ্যাঁ, এখানে বেশ খানিকটা ফরাসী শিখে নিতে চাই, চাকরেরা পর্যন্ত ফরাসীতে কথা বলে।

মিসেস লেগেটকে তুমি কখনও দেখনি, তাই নয় কি? মহিলাটি সত্যি চমৎকার। আগামী বছর আবার তাঁদের অতিথি হয়ে পারি যাচ্ছি, যেমন প্রথমবারে গিয়েছিলাম।

বর্তমানে দর্শন ও তুলনামূলক ধর্ম শিক্ষার জন্য এবং কর্মকেন্দ্ররূপে গঙ্গাতীরে একটি মঠ হয়েছে।

সারা সময়টা কি ক'রে কাটাচ্ছ? পড়াশুনা?—লেখা-লিখি? না, কিছুই করনি। এ সময়ের মধ্যে অনেক কিছুই লিখে ফেলতে পারতে। চাই কি, যদি আমাকে ফরাসীটা শেখাতে, তা হ'লে এতদিনে আমি বেশ ফ্রগি (ফরাসী) হয়ে যেতাম, আর তা না ক'রে আমাকে কিনা যত বাজে বকাচ্ছ। গ্রীনএকারে তুমি কোনদিন যাওনি; আশা করি, সেখানকার ব্যাপার প্রতি বছর বাড়ছে।

তোমার চিকিৎসা (ক্রিশ্চান সায়ান্স) দিয়ে আমাকে ভাল করতে পারলে না। তোমার রোগ-নিরাময়ের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার আস্থা বেশ কিছুটা কমে যাচ্ছে। স্যাম্ কোথায়?…

আমার চুল তাড়াতাড়ি পেকে যাচ্ছিল, এখন কোনক্রমে তা বন্ধ হয়েছে। দুঃখের বিষয় এখন সবেমাত্র কয়েকটি পাকা চুল আছে; অবশ্য ভাল ক'রে সন্ধান করলে আরও অনেক বেরিয়ে পড়বে। শুভ্র কেশ আমার বেশ পছন্দ।…

মাদার চার্চ ও ফাদার পোপ ইওরোপের দেশগুলিতে বেশ আনন্দে কাটাচ্ছিলেন, দেশে যাবার পথে আমি তা একটুখানি দেখে গেছি। আর চিকাগোতে তুমি রূপকথার সিণ্ডারেলা হয়ে বসে আছ—তা তোমার পক্ষে ভালই। আগামী বছর তোমাকে নিয়ে পারি যাব, বুড়োবুড়ীকে রাজী

করাও দেখি। সেখানে অদ্ভুত অদ্ভুত দেখবার জিনিস আছে; সকলে বলে, ফরাসীরা ব্যবসা গুটোবার আগে শেষবারের মতো একটা বড়-রকম সংগ্রামে নামছে।

হ্যাঁ, সুদীর্ঘকাল তুমি আমাকে চিঠি লেখনি। এ চিঠি তোমার প্রাপ্য নয়, কিন্তু দেখছ—আমি কত ভালমানুষ, কারও সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না, —বিশেষ ক'রে মৃত্যু যখন দ্বারে। ইসাবেল ও হ্যারিয়েটকে দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল। মনে হয়, গ্রীনএকার ইন-এ (Greenacre Inn) তারা যথেষ্ট পরিমাণ রোগনিরাময়-শক্তির সরবরাহ পাচ্ছে এবং বর্তমান স্বাস্থ্যভঙ্গ থেকে তারা আমাকে উদ্ধার করতে পারবে। আমার কালে কিন্তু সরাইখানাটি (Inn) আধ্যাত্মিক খাদ্যেই ভরতি থাকত, পার্থিব দ্রব্যের পরিমাণ ছিল অনেক কম। তুমি কি অস্থিবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জানো? নিউইয়র্কে একজন এসে বাস্তবিক অবাক কাণ্ড করছে। এক সপ্তাহ পরে তাকে দিয়ে আমার হাড়গোড় দেখানো হবে।

মিস হাউ কোথায়? সত্যি তিনি মহৎপ্রাণ, একজন অকৃত্রিম বন্ধু। মেরী, কথাপ্রসঙ্গে বলছি, ভাবতে অদ্ভুত লাগে যে তোমাদের পরিবারটি—মাদার চার্চ ও তাঁর ধর্মযাজক (Mr. Hale)—সন্ন্যাসী ও সংসারী দুই রূপেই আমার মনের উপর যে ছাপ রেখেছেন, পরিচিত আর কোন পরিবার তা পারেনি। প্রভুর আশীর্বাদ চিরদিন তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

আমি এখন বিশ্রাম নিচ্ছি। লেগেটরা খুবই সহৃদয়। এখানে আমি খুব স্বচ্ছন্দে বাস করছি। ডিউই (Dewy) শোভাযাত্রা দেখতে নিউইয়র্ক যাবার ইচ্ছা। সেখানকার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়নি।

তোমার সমস্ত খবর লিখবে, তা জানবার জন্য আমার খুব আগ্রহ। তুমি অবশ্যই জোজো-কে জানো। আমার অবিরত স্বাস্থ্যভঙ্গের ফলে তাদের ভারতভ্রমণ পণ্ড হয়েছে, কিন্তু তারা কতই না সহৃদয় ও ক্ষমাপরায়ণ! কয়েক বছর ধরে সে ও মিসেস বুল স্বর্গীয় দূতের মতো আমার তত্ত্বাবধান করেছে। আগামী সপ্তাহে মিসেস বুলের এখানে আসার সম্ভাবনা।

আগেই তিনি এখানে এসে হাজির হতেন, কিন্তু তাঁর মেয়ে (ওলিয়া) হঠাৎ অসুখে পড়ে। মেয়েটি খুব ভুগেছে, তবে এখন বিপদ কেটে গেছে। এখানে লেগেটের একখানা কুটির মিসেস বুল নিয়েছেন। অকালে শীত

না পড়লে আরও মাসখানেক এখানে আমাদের চমৎকার কাটবে। জায়গাটি সত্যি সুন্দর—বনরাজিবেষ্টিত নিখুঁত তৃণাবৃত ময়দান।

সেদিন গল্‌ফ্ খেলার একটা প্রচেষ্টা করা গেল; খেলাটা খুব কঠিন ব'লে মনে হয় না—শুধু অভ্যেস চাই। তোমার গল্‌ফ্-প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে কখনও ফিলাডেলফিয়া যাওনি? তোমার মতলবটা কি? বাকী জীবনটা কি ক'রে কাটাতে চাও বলো তো? কোন কাজের পরিকল্পনা করেছ কি? একটি বড় চিঠি লিখো, লিখবে কি? নেপলস্-এর রাজপথে চলতে চলতে তিনজন মহিলার সঙ্গে আর একজনকে যেতে দেখি—নিশ্চয়ই আমেরিকান—তোমার সঙ্গে তার এত মিল যে আমি তো প্রায় কথা বলতে যাচ্ছিলাম; কাছে এসে তবে ভুল ভাঙলো। এবারের মতো বিদায়। শীঘ্র শীঘ্র লিখো।

সতত তোমার স্নেহশীল ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

৪২৪

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

রিজলি ম্যানর*
৩রা অক্টোবর, ১৮৯৯

স্নেহের মেরী,

তোমার অত্যন্ত সহৃদয় কথাগুলির জন্য ধন্যবাদ। এখন আমি অনেক ভাল আছি এবং দিন দিন আরও ভাল হচ্ছি। কাল বা পরশু মেয়েকে নিয়ে মিসেস বুলের আসার কথা। সুতরাং আবার কিছুকাল ভাল কাটবে ব'লে মনে হয়—তোমার অবশ্য সব সময়ই ভাল কাটছে। ফিলাডেলফিয়া যাচ্ছ জেনে খুশী হয়েছি, কিন্তু সে-বারের মতো এবারে ততটা নই, সে-বার দিগন্তে ক্রোরপতি দেখা দিয়েছিল। সর্ববিধ ভালবাসা জেনো।

সতত তোমার স্নেহশীল ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

৪২৫

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

রিজলি ম্যানর*

৩০শে অক্টোবর, ১৮৯৯

স্নেহের আশাবাদী ভগিনি,

তোমার চিঠি পেয়েছি। স্রোতে-ভাসা আশাবাদীকে কর্মে প্রবৃত্ত করবার মতো কিছু একটা যে ঘটেছে, তার জন্য আনন্দিত। তোমার প্রশ্নগুলি দুঃখবাদের গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছে, বলতে হবে। বর্তমান বৃটিশ ভারতের মাত্র একটাই ভাল দিক আছে, যদিও অজান্তে ঘটেছে—তা ভারতকে আর একবার জগৎমঞ্চে তুলে ধরেছে, ভারতের উপর বাইরের পৃথিবীকে চাপিয়ে দিয়েছে জোর ক'রে। সংশ্লিষ্ট জনগণের মঙ্গলের দিকে চোখ রেখে যদি তা করা হ'ত—অনুকূল পরিবেশে জাপানের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে—তা হ'লে ফলাফল ভারতের ক্ষেত্রে আরও কত বিস্ময়কর হ'তে পারত। কিন্তু রক্তশোষণই যেখানে মূল উদ্দেশ্য, সেখানে মঙ্গলকর কিছু হ'তে পারে না। মোটের উপর, পুরানো শাসন জনগণের পক্ষে এর চেয়ে ভাল ছিল, কারণ তা তাদের সর্বস্ব লুঠ ক'রে নেয়নি এবং সেখানে অন্ততঃ কিছু সুবিচার—কিছু স্বাধীনতা ছিল।

কয়েক-শ অর্ধশিক্ষিত, বিজাতীয়, নব্যতন্ত্রী লোক নিয়ে বর্তমান বৃটিশ ভারতের সাজানো তামাশা—আর কিছু নয়। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে দ্বাদশ শতাব্দীতে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৬০ কোটি, এখন ২০ কোটিরও নীচে।

ইংরেজ-বিজয়ের কালে কয়েক শতাব্দী ধরে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলেছিল, বৃটিশ শাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণামরূপে ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এবং তার চেয়েও ভয়ানক যে-সকল দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, (দেশীয় রাজ্যে কখনও দুর্ভিক্ষ হয়নি) তা লক্ষ লক্ষ লোককে গ্রাস করেছে। তা সত্ত্বেও জনসংখ্যা অনেক বেড়েছে, কিন্তু মুসলমান শাসনের আগে দেশ যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, এখনও সেই সংখ্যায় পৌঁছয়নি। বর্তমান জনসংখ্যার অন্ততঃ পাঁচগুণ লোককে সহজেই ভরণপোষণ করার মতো জীবিকা ও উৎপাদনের সংস্থান ভারতে আছে—যদি সব কিছু তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া না হয়।

এই তো অবস্থা—শিক্ষাবিস্তারও বন্ধ ক'রে দেওয়া হচ্ছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপহৃত, (অবশ্য আমাদের নিরস্ত্র করা হয়েছে অনেক আগেই) যেটুকু স্বায়ত্তশাসন কয়েক বছরের জন্য দেওয়া হয়েছিল, অবিলম্বে তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দেখছি, আরও কী আসে! কয়েক ছত্র সমালোচনার জন্য লোককে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, বাকীরা বিনা বিচারে জেলে। কেউ জানে না, কখন কার ঘাড় থেকে মাথা উড়িয়ে দেওয়া হবে।

ভারতবর্ষে কয়েক বছর ধরে চলেছে ত্রাসের রাজত্ব। বৃটিশ সৈন্য আমাদের পুরুষদের খুন করেছে, মেয়েদের মর্যাদা নষ্ট করেছে, বিনিময়ে আমাদেরই পয়সায় জাহাজে চড়ে দেশে ফিরেছে পেনসন ভোগ করতে। ভয়াবহ নৈরাশ্যে আমরা ডুবে আছি। কোথায় সেই ভগবান? মেরী, তুমি আশাবাদী হ'তে পার, কিন্তু আমি কি পারি? ধর, এই চিঠিখানাই যদি তুমি প্রকাশ ক'রে দাও—ভারতের নূতন কানুনের জোরে ইংরেজ সরকার আমাকে এখান থেকে সোজা ভারতে টেনে নিয়ে যাবে এবং বিনা বিচারে আমাকে হত্যা করবে। আর আমি জানি, তোমাদের সব খ্রীষ্টান শাসক-সম্প্রদায় ব্যাপারটা উপভোগ করবে, কারণ আমরা যে 'হিদেন'। এর পরেও আমি নিদ্রা যাব, আর আশাবাদী থাকব? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আশাবাদীর নাম নীরো (Nero)। হায়, সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা তারা সংবাদ হিসাবেও লিখবার উপযুক্ত মনে করে না। নেহাতই যদি দরকার হয়, রয়টারের এজেন্ট এগিয়ে এসে 'আদেশ-মাফিক তৈরী' ঠিক উল্টো খবরটি বাজারে ছাড়বে। হিদেন-হনন খ্রীষ্টানদের পক্ষে অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত অবসর-বিনোদন। তোমাদের মিশনরীরা ভারতে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করতে যায়, কিন্তু ইংরেজদের ভয়ে সেখানে একটি সত্য কথা উচ্চারণ করতে পারে না; যদি করে, পরদিন ইংরেজেরা তাদের দূর ক'রে দেবে।

পূর্বতন শাসকেরা শিক্ষার জন্য যে-সব জমি ও সম্পত্তি দান করেছিলেন, সে-সকলই গ্রাস ক'রে নেওয়া হয়েছে, এবং বর্তমান সরকার শিক্ষার জন্য রাশিয়ার চেয়েও কম খরচ করে,—আর সে কী শিক্ষা! মৌলিকতার সামান্য চেষ্টাও টুঁটি টিপে মারা হয়।

মেরী, আমাদের কোন আশা নেই, যদি না সত্যি এমন কোন ভগবান থাকেন, যিনি সকলের পিতাস্বরূপ, যিনি বলবানের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষা

করতে ভীত নন, এবং যিনি কাঞ্চনের দাস নন। তেমন কোন ভগবান আছেন কি? কালেই তা প্রমাণিত হবে।

হ্যাঁ, আশা করছি—কয়েক সপ্তাহ পরে চিকাগো যেতে পারব এবং তখন সব কথা খুলে ব'লব।...

সর্ববিধ ভালবাসা-সহ সতত তোমার ভ্রাতা

বিবেকানন্দ

পুনঃ—ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে '—' এবং অন্যান্য সম্প্রদায় কতকগুলি অর্থহীন সংমিশ্রণ; ইংরেজ প্রভুর কাছে আমাদের বাঁচতে দেবার প্রার্থনা নিয়ে এরা গজিয়ে উঠেছে। আমরা এক নূতন ভারতের সূচনা করেছি—যথার্থ উন্নত ভারত, পরের দৃশ্যটুকু দেখবার অপেক্ষায় আছি। নূতন মতবাদে আমরা তখনই বিশ্বাসী, যখন জাতির তা প্রয়োজন এবং যা আমাদের পক্ষে যথার্থ সত্য হবে। অন্যদের সত্যের পরীক্ষা হ'ল 'আমাদের প্রভুরা যা অনুমোদন করেন'; আর আমাদের হ'ল, যা ভারতীয় জ্ঞানবিচারে বা অভিজ্ঞতায় অনুমোদিত, তাই। লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে, '—' ও আমাদের মধ্যে নয়, ...শুরু হয়েছে আরও কঠিন ও ভয়ঙ্কর শক্তির বিরুদ্ধে।

বি

৪২৬

C/o F. Leggett Esq.*
রিজলি ম্যানর
আলস্টার কাউন্টি, নিউইয়র্ক

প্রিয় স্টার্ডি,

ঠিকানার অসম্পূর্ণতার জন্য তোমার শেষ চিঠিখানা কয়েক জায়গা ঘুরে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে।

হ'তে পারে তোমার সমালোচনার অনেকখানি অংশ সঙ্গত ও সত্য, আবার এও সম্ভব যে, কোন একদিন তুমি দেখবে, এ-সকলই কতকগুলি লোকের প্রতি তোমার বিরাগ থেকে প্রসূত, আর আমি হয়েছি অপরের কৃত অপরাধের ফলভোগী (scapegoat)।

যা হোক, এ-সব নিয়ে তিক্ততার প্রয়োজন নেই, যেহেতু আমি যা নই, তার ভান কখনও করেছি ব'লে মনে পড়ে না। আর তা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমার ধূমপান, খারাপ মেজাজ ইত্যাদি ব্যাপার—আমার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কাটালে যে-কেউ সহজে জানতে পারে। 'মিলন-মাত্রেরই বিচ্ছেদ আছে'—এই হ'ল প্রকৃতির নিয়ম। তার জন্য কোন নৈরাশ্যের ভাব আমার মধ্যে জাগে না। আশা করি, তোমার মনে কোন তিক্ততা থাকবে না। কর্মই আমাদের মিলিয়ে দেয়, আবার কর্মই বিচ্ছিন্ন করে।

জানি তুমি কেমন লাজুকস্বভাব এবং অপরের মনোভাবে আঘাত করতে কতখানি অপছন্দ কর। আমি খুবই বুঝতে পারছি, সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শের লোকদের নিয়ে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য যখন তোমাকে যুঝতে হচ্ছিল, তখন মাসের পর মাস তোমাকে কি-রকম মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। এমন যে হবে, তা পূর্বে অনুমান করতে পারলে তোমাকে অনেক অনাবশ্যক মানসিক অশান্তি থেকে অব্যাহতি দিতে পারতাম। এও আবার সেই 'কর্ম'।

হিসেবপত্র পূর্বে পেশ করা হয়নি, কারণ কাজ এখনও সমাপ্ত হয়নি; সমস্ত ব্যাপারটা চুকে গেলে দাতার কাছে সম্পূর্ণ হিসাব দাখিল ক'রব, ভেবেছিলাম। টাকার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার ফলে কাজ মাত্র গত বছর শুরু হ'তে পেরেছে এবং আমার নীতি হ'ল, টাকার জন্য হাত না পেতে স্বেচ্ছায় দানের জন্য অপেক্ষা করা।

আমার সমস্ত কাজে এই একই নীতি মেনে চলি, কারণ আমার স্বভাব যে অনেকের কাছেই নিতান্ত অপ্রীতিকর, সে সম্বন্ধে আমি খুবই সচেতন এবং যতক্ষণ না কেউ আমাকে চায়, ততক্ষণ আমি অপেক্ষা ক'রে থাকি। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যও প্রস্তুত থাকি। আর এই বিচ্ছেদের ব্যাপারে আমার কখনও মন খারাপ হয় না কিংবা সে-সম্বন্ধে বেশী কিছু চিন্তাও করি না, কারণ আমার নিত্য ভ্রাম্যমাণ জীবনে এ জিনিস আমাকে সব সময়ই করতে হচ্ছে। তবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এর দ্বারা অন্যকে যে কষ্ট দিই, সেই আমার দুঃখ। তোমার ঠিকানায় আমার নামে কোন ডাক থাকলে দয়া ক'রে পাঠিয়ে দেবে কি?

সকল শুভাশিস তোমাদের চিরসাথী হোক—বিবেকানন্দের নিরন্তর এই প্রার্থনা।

৪২৭

রিজলি*

১লা নভেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় মার্গো,

…মনে হচ্ছে তোমার মনে যেন কি একটা বিষাদ রয়েছে। তুমি ঘাবড়িও না, কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়। যাই কর না কেন, জীবন কিছু অনন্ত নয়! আমি তার জন্য খুবই কৃতজ্ঞ। জগতের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সাহসী, যাতনাই তাদের বিধিলিপি; যদিও বা এর প্রতিকার সম্ভব হয়, তবু তা না হওয়া অবধি, ভাবী বহু যুগ পর্যন্ত এ জগতে এ ব্যাপারটা অন্ততঃ একটা স্বপ্নভঙ্গের শিক্ষারূপেও গ্রহণীয়। আমার স্বাভাবিক অবস্থায় আমি তো নিজের দুঃখ-যন্ত্রণাকে সানন্দেই বরণ করি। কাউকে না কাউকে এ জগতে দুঃখভোগ করতেই হবে; আমি খুশী যে, প্রকৃতির কাছে যারা বলি-প্রদত্ত হয়েছে, আমিও তাদের একজন।

তোমাদের

বিবেকানন্দ

৪২৮

নিউইয়র্ক*

১৫ই নভেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় মার্গো,

…মোটের উপর আমার শরীরের জন্য বিশেষ উদ্বেগের কোন কারণ আছে ব'লে মনে করি না। এ-জাতীয় স্নায়ুপ্রধান ধাতের শরীর কখন বা মহাসঙ্গীত-সৃষ্টির উপযোগী যন্ত্রস্বরূপ হয়, আবার কখন বা অন্ধকারে কেঁদে মরে।

তোমাদের

বিবেকানন্দ

৪২৯

C/o E. Guernsey, M. D.*
The Madrid, 180 W. 59
১৫ই নভেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় মিসেস বুল,

শেষ পর্যন্ত—এখনই কেম্ব্রিজে যাওয়া স্থির করেছি। যে-সব গল্প শুরু করেছিলাম, তা শেষ করতেই হবে। প্রথমটি মার্গো আমাকে ফেরত দিয়েছে ব'লে মনে হয় না।

আগামী পরশু আমার পোশাক তৈরী হয়ে যাবে, তারপরই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'তে পারব; শুধু ভয় এই—সমস্ত শীতকালটা অবিরত পার্টি আর বক্তৃতার ফলে সেখানে বিশ্রাম হবে না, উপরন্তু স্নায়ুগুলি দুর্বল হয়ে পড়বে।

যা হোক, বোধ হয় আপনি কোথায়ও একটি ঘরের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন, যেখানে ঐ-সব ব্যাপার থেকে গা-ঢাকা দিয়ে একান্তে থাকতে পারব।

যে ভাবেই হোক, এই সপ্তাহে পোশাক তৈরী হয়ে গেলেই আমি চলে আসছি। আমার জন্য আপনার নিউইয়র্কে আসবার প্রয়োজন নেই। যদি আপনার নিজের কাজ থাকে, তা হ'লে আলাদা কথা। মণ্টক্লেয়ারের মিসেস হুইলারের কাছ থেকে খুব সহৃদয় আমন্ত্রণ পেয়েছি। বস্টনে রওনা হবার আগে কয়েক ঘণ্টার জন্য অন্ততঃ মণ্টক্লেয়ারে ঘুরে যেতে হবে।

অনেক ভাল বোধ করছি এবং সুস্থ আছি। দুর্ভাবনা ছাড়া আর কিছু বালাই নেই; এবারে তাও নিশ্চয়ই সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

ভারতে লেখা আপনার চিঠিপত্রে পরোক্ষভাবেও আমার সম্বন্ধে যেন কোন সংবাদ না থাকে—আপনার কাছে শুধু এইটি চাই; কিন্তু পাব কিনা সে-বিষয়ে আমার আশঙ্কা আছে। কিছু সময়ের জন্য অথবা চিরদিনের মতো আমি গা-ঢাকা দিতে চাই। অভিশপ্ত হোক আমার প্রসিদ্ধির দিনটি!

সর্ববিধ ভালবাসা-সহ
বিবেকানন্দ

৪৩০

C/o F. H. Leggett*
21 West 34th St., New York
নভেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় স্টার্ডি,

আমার আচরণ সমর্থনের জন্য এ চিঠি নয়। যদি আমি অন্যায় কিছু ক'রে থাকি, তবে তা কথা দিয়ে মোছা যাবে না, বা কোন বিরূপ সমালোচনা ক'রে আমাকে সৎকাজ থেকে বিরত করা যাবে না।

বিলাসিতা, বিলাসিতা—গত কয় মাস থেকে কথাটি বড্ড বেশী শুনতে পাচ্ছি, পাশ্চাত্যবাসীরা নাকি তার উপকরণ যুগিয়েছে, আর সর্বক্ষণ ত্যাগের মহিমা কীর্তন ক'রে ভণ্ড আমি নাকি নিজে সেই বিলাসিতা ভোগ ক'রে আসছি। এই বিলাস-ব্যসনই নাকি আমার কাজের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্ততঃ ইংলণ্ডে। আমি এই বিশ্বাসের কুহকে পড়েছিলাম যে, আমার জীবনের উষর মরুতে অন্ততঃ ছোট্ট একটি মরূদ্যান আছে; সমগ্র জীবনের দুঃখ ও অন্ধকারের মধ্যে আলোর একটু চিহ্ন, কঠোর পরিশ্রম ও কঠোরতর অভিশাপের জীবনে এক মুহূর্তের আরাম—সেই মরূদ্যান, সেই চিহ্ন, সেই মুহূর্তটি শুধু একটু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখের ব্যাপার!!

আমি খুশীই ছিলাম, সেটুকু পেতে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের দিনে শতবার আশীর্বাদ করেছি, কিন্তু এমন সময় আকস্মিকভাবে তোমার চিঠিখানা হাতে এল, আর আমার স্বপ্নও কোথায় মিলিয়ে গেল। তোমাদের সমালোচনায় আমার আর কোন আস্থা নেই—এ-সব বিলাস-ব্যসনের কথায় আর কান দিই না, স্মৃতিতে জেগে উঠছে অন্য এক দৃশ্য। সেই কথাই লিখছি। উপযুক্ত মনে করলে এ চিঠি বন্ধুদের কাছে একে একে পাঠিয়ে দিও এবং কোথাও ভুল লিখে থাকলে শুধরে দিও।

ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ারের কথা বাদ দিলে ইংলণ্ড থেকে আমি রুমালের মতো একটুকরো বস্ত্র পেয়েছি ব'লে মনে পড়ে না। অথচ অপর পক্ষে ইংলণ্ডে আমার শরীর ও মনের উপর অবিরত পরিশ্রমের চাপের ফলেই আমার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। তোমরা—ইংরেজেরা আমাকে এই তো দিয়েছ, আর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছ অমানুষিক খাটিয়ে। এখন আবার বিলাস-ব্যসন নিয়ে

নিন্দা করা হচ্ছে!! তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে একটি কোট দিয়েছ, বলতে পারো? কেউ একটা সিগার? এক-টুকরো মাছ বা মাংস? তোমাদের মধ্যে এ-কথা বলবার দুঃসাহস কার আছে যে, তোমাদের কাছে আমি খাবার, পানীয়, সিগার, পোশাক বা টাকা চেয়েছি? জিজ্ঞেস কর, ··· ঈশ্বরের নামে বলছি, জিজ্ঞেস কর, তোমার বন্ধুদের জিজ্ঞেস কর এবং সবচেয়ে আগে জিজ্ঞেস কর তোমার নিজের 'অন্তর্যামী ভগবানকে—যিনি কখনও ঘুমান না।'

আমার কাজের জন্য তোমরা যে টাকা দিয়েছ, তার প্রতিটি পেনি সেখানেই আছে। তোমাদের চোখের সামনে আমার ভাইকে পাঠিয়ে দিতে হয়েছে, সম্ভবতঃ মৃত্যুর প্রতীক্ষায়; কিন্তু তাকে আমি একটি কানাকড়িও দিইনি, কারণ তা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না।

আর অন্যদিকে ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ারের কথা মনে পড়ে—শীতের সময় তাঁরা আমাকে বস্ত্র দিয়েছেন, আমার নিজের মার চেয়েও যত্নে আমার সেবা করেছেন, ক্লান্তি ও দুঃখের দিনে আমার সমব্যথী হয়েছেন; এবং তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু পাইনি। সেই মিসেস সেভিয়ার মান-মর্যাদার পরোয়া করেননি বলেই আজ হাজার হাজার লোকের পূজনীয়া। তাঁর লোকান্তরের পর লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে মনে রাখবে দরিদ্র ভারতবাসীর একজন অকৃত্রিম শুভার্থিনীরূপে। তাঁরা কখনও আমাকে বিলাসিতার জন্য নিন্দা করেননি, যদিও আমার ইচ্ছা বা প্রয়োজন হ'লে বিলাসিতার উপকরণ যোগাতে তাঁরা প্রস্তুত।

মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড, মিঃ ও মিসেস লেগেট সম্বন্ধে তোমাকে বলা নিষ্প্রয়োজন। আমার জন্য তাঁদের ভালবাসা ও সহৃদয়তার কথা তোমার জানা আছে; মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড আমাদের দেশে গিয়েছেন এবং জীবনের সাধারণ সুখ-সুবিধাগুলি ত্যাগ ক'রে আমাদের মধ্যে এমনভাবে বসবাস ও চলাফেরা করেছেন, যা কোন বিদেশী কখনও করেনি এবং তাঁরা তো আমার বা আমার বিলাসিতার মুণ্ডপাত করেন না, বরং আমাকে ভাল খাওয়াতে পারলে বা আমি চাইলে দামী সিগার খাইয়ে তাঁরা আনন্দ পান। আর যখন আমি তোমাদের জন্য প্রাণপাত করছিলাম এবং নোংরা গর্তে অনাহারের মধ্যে রেখে যখন তোমরা আমার গায়ের মাংস তুলে নিচ্ছিলে ও সঞ্চয় ক'রে রেখেছিলে বিলাসিতার এই অপবাদ, সেদিনও এই

লেগেট ও বুল-দের দেওয়া রুটিই আমি খেয়েছি, তাঁদের দেওয়া কাপড়ই আমি পরেছি, তাঁদের টাকাতেই আমি ধূমপান করেছি এবং বহুবার বাড়ি-ভাড়াটা পর্যন্ত মিটিয়েছেন তাঁরাই।

—'শরতের মেঘ গরজে বিপুল, নাহি ঢালে বারিধারা,
বর্ষার মেঘ স্তব্ধ নীরব ভাসায় বসুন্ধরা।'

তবেই দেখ……, যাঁরা সাহায্য করেছেন বা এখনও করছেন তাঁদের কাছ থেকে কোন বিরূপ সমালোচনা বা নিন্দা নেই; যারা কিছুই করে না এবং শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধির পথ খোঁজে, তারাই কেবল নিন্দা ও সমালোচনা করে। এ রকম মূল্যহীন, হৃদয়হীন, স্বার্থযুক্ত ও নোংরা সমালোচনার চেয়ে বড় আশীর্বাদ আমার কাছে আর নেই। এইসব চূড়ান্ত স্বার্থান্বেষীদের কাছ থেকে বহু ক্রোশ দূরে থাকা আমার যতটা কাম্য, জীবনে আর কিছুই তেমন নয়।

বিলাসিতার কথা ব'লছ! এইসব সমালোচকদের এক এক ক'রে ধর—দেখবে প্রত্যেকেরই মন পড়ে আছে দেহে, আত্মার উপলব্ধি কারও একবিন্দু নেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আগেই হোক, পরেই হোক তাদের স্বরূপ বেরিয়ে পড়ছে। আর এইসব হৃদয়হীন স্বার্থপর লোকের অভিপ্রায় অনুসারে তুমি আমার আচরণ ও কর্মধারা পরিবর্তন করতে উপদেশ দিচ্ছ, আর আমি তা করছি না ব'লে তোমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত!

আমার গুরুভ্রাতাদের উপর আমি যে কাজ চাপাই, তারা তাই করে। যদি তারা কখনও স্বার্থপরতা দেখিয়ে থাকে, তা আমার আদেশেই করেছে, নিজের খুশীমতো করেনি।

লণ্ডনে আমাকে যেমন অন্ধকার গর্তটির ভেতরে রেখেছিলে এবং সর্বক্ষণ পরিশ্রম ও অনাহারের মধ্যে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিলে, তোমার সন্তানের বেলায় তা করতে পারতে কি? মিসেস— কি তা করতে চাইবেন?…

তারা সন্ন্যাসী, তার অর্থ এই—কোন সন্ন্যাসী অকারণে শরীর ত্যাগ বা অপ্রয়োজনে কৃচ্ছ্রতা করবে না। পাশ্চাত্যদেশে এই সকল কঠোরতা করতে গিয়ে আমরা সন্ন্যাসের নিয়মই ভঙ্গ করেছি। তারা আমার ভাই, আমার সন্তান। আমার জন্য তারা গর্তের মধ্যে মারা যাক, এ আমি চাই না। সত্য ও মঙ্গলকর সমস্ত শক্তির বলে আমি চাই না—তারা তাদের এত কষ্টের বদলে অনাহারে বা খেটে মরুক, কিংবা অভিশপ্ত হোক।

আরও একটি কথা। যদি তুমি দেখাতে পারো—কোথায় আমি দেহের উপর নির্যাতনের কথা প্রচার করেছি, তা হ'লে খুশী হবো। শাস্ত্রের কথা তুললে আমি বলি, সন্ন্যাসী ও পরমহংসদের জীবনযাপনের যে নিয়ম সেখানে লিপিবদ্ধ আছে, তা আমরা পালন করিনি, আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ নিয়ে দাঁড়াতে কোন (শাস্ত্রী) পণ্ডিত যদি সাহস করেন, [তাঁর সম্মুখীন হ'তে] আমি খুবই খুশী হবো।

হ্যাঁ……, বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে আছে আমার অন্তর। এর সবই আমি বুঝি। তোমার ভেতরটা কী, তা আমি জানি, কিন্তু তুমি এমন সব লোকের কবলে পড়েছ, যারা (তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য) তোমাকে ব্যবহার করতে চায়। তোমার স্ত্রীর কথা বলছি না। তিনি সরলপ্রাণা, অনিষ্টকর কিছু তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু বৎস, তোমার গায়ে আমিষ-গন্ধ আছে—সামান্য কিছু টাকা, শকুনিরা তাই ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করছে। এই হ'ল জীবন।

প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে তুমি অনেক কথা বলেছিলে। সেই ভারত আজও বেঁচে আছে…, এখনও সে মরেনি, আজও সেই জীবন্ত ভারত নির্ভীকভাবে ধনীর অনুগ্রহের তোয়াক্কা না রেখে তার নিজস্ব বাণী প্রচার করার মনোবল রাখে; কারও মতামতের পরোয়া সে করে না, এ দেশে—যেখানে তার পায়ে শিকল আঁটা কিংবা শিকলের প্রান্তভাগ যারা ধরে আছে, সেই শাসনকর্তাদের মুখের সামনেও করে না। সেই ভারত আজও বেঁচে আছে‥, অম্লান প্রেমের, চিরস্থায়ী বিশ্বস্ততার চিরন্তন ভারতবর্ষ—শুধু রীতিনীতিতেই নয়, প্রেমে বিশ্বাসে ও বন্ধুত্বে। সেই ভারতের একজন নগণ্য সন্তান হিসাবে আমি তোমাকে ভালবাসি ভারতীয় প্রেমে, এবং এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হ'তে তোমায় সাহায্য করার জন্য আমি সহস্রবার শরীরত্যাগে প্রস্তুত।

চিরদিন তোমার
বিবেকানন্দ

৪৩১

1 East 39 St. নিউইয়র্ক*

২০শে নভেম্বর, ১৮৯৯

স্নেহের মেরী,

খুব সম্ভবতঃ কাল ক্যালিফোর্নিয়া যাত্রা করছি। পথে দু-একদিনের জন্য চিকাগোয় থাকব। যাত্রা ক'রে তোমাকে 'তার' ক'রব। কাউকে স্টেশনে পাঠিও, কারণ পথে 'ভিতর' ও 'বাহির' (in and out) খুঁজে বার করতে আমি কোন দিনই পারি না, এখন তো আরোই।

তোমার চিরদিনের ভ্রাতা

বিবেকানন্দ

৪৩২

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

আমেরিকা

২০শে নভেম্বর, ১৮৯৯

অভিন্নহৃদয়েষু,

শরতের পত্রে খবর পেলুম।...হার-জিতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই, তোমরা এইবেলা experience (অভিজ্ঞতা) ক'রে নাও।...আমার আর কোন রোগ নেই। আমি আবার...ঘুরতে চললুম জায়গায় জায়গায়। কুছ পরোয়া নেই, মাভৈঃ। সব উড়ে যাবে তোমাদের সামনে, খালি disobedient (অবাধ্য) হয়ো না, সব সিদ্ধি হবে।.. জয় মা রণরঙ্গিণী! জয় মা, জয় মা রণরঙ্গিণী! ওয়া গুরু, ওয়া গুরুকী ফতে!

...আসল কথা, ঐ কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই; কাপুরুষের উদ্ধার হয় না—এ নিশ্চিত। আর সব সয়, ঐটি সয় না। ওটি যে ছাড়বে না, তার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক চলে কি?...এক ঘা খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে... তবে মানুষ।...কাপুরুষ দয়ার আধার[১] !!

আমি আশীর্বাদ করছি, আজ এই মহামায়ীর দিনে—এই রাত্রে মা তোমাদের হৃদয়ে নাবুন, অনন্ত শক্তি তোমাদের বাহুতে আসুন! জয় কালী,

১ 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'—কবিতা দ্রষ্টব্য।

জয় কালী, জয় কালী! মা নাববেনই নাববেন—মহাবলে সর্বজয়—বিশ্ববিজয়; মা নাবছেন। ভয় কি? কাদের ভয়? জয় কালী, জয় কালী! তোমাদের এক এক জনের দাপটে ধরা কাঁপবে।···জয় কালী, জয় কালী! আবার onward, forward (এগিয়ে চল, এগিয়ে যাও)! ওয়া গুরু, জয় মা, জয় মা; কালী, কালী, কালী! রোগ, শোক, আপদ, দুর্বলতা, সব গেছে তোমাদের! মহাবিজয়, মহালক্ষ্মী, মহাশ্রী তোমাদের! মাভৈঃ মাভৈঃ। ফাঁড়া উতরে গেছে, মাভৈঃ! জয় কালী, জয় কালী!

বিবেকানন্দ

পুঃ—আমি মায়ের দাস, তোমরা মায়ের দাস—আমাদের কি নাশ আছে, ভয় আছে? অহঙ্কার—মনে যেন না আসে, ভালবাসা—যেন না যায় মন থেকে। তোমাদের কি নাশ আছে?—মাভৈঃ! জয় কালী, জয় কালী!

৪৩৩

21, West Street *
নিউ ইয়র্ক
২১শে নভেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় ব্রহ্মানন্দ,

হিসাব ঠিক আছে। আমি সে-সব মিসেস বুলের হাতে সঁপে দিয়েছি এবং তিনি বিভিন্ন দাতাকে হিসাবের বিভিন্ন অংশ জানাবার ভার নিয়েছেন। আগেকার কঠোর চিঠিগুলিতে আমি যা লিখেছি, তাতে কিছু মনে ক'রো না। প্রথমতঃ ওতে তোমার উপকার হবে—এর ফলে তুমি ভবিষ্যতে যথানিয়মে কেতাদুরস্ত হিসাব রাখতে শিখবে এবং গুরুভাইদেরও এটা শিখিয়ে নেবে। দ্বিতীয়তঃ এই সব ভৎর্সনাতেও যদি তোমরা সাহসী না হও, তা হ'লে তোমাদের সব আশা ছেড়ে দিতে হবে। আমি চাই তোমরা (কাজ করতে করতে) মরেও যাও, তবু তোমাদের লড়তে হবে। সৈন্যের মতো আজ্ঞাপালন করে মরে যাও এবং নির্বাণ লাভ কর, কিন্তু কোন প্রকার ভীরুতা চলবে না।

কিছুদিনের মতো আমার একটু গা-ঢাকা দেবার আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সে সময় যেন আমায় কেউ পত্র না লেখে এবং খোঁজ না করে। আমার

স্বাস্থ্যের জন্য এটি একান্ত আবশ্যক। আমার স্নায়ুগুলি দুর্বল হয়ে গেছে—এই মাত্র, আর কিছু নয়।

তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হোক। আমার রূঢ়তার জন্য মন খারাপ ক'রো না। মুখে যাই থাকুক—তুমি তো আমার হৃদয় জানো। তোমাদের সর্বপ্রকার শুভ হোক। বিগত প্রায় এক বৎসর আমি যেন একটা ঝোঁকে চলেছি। এর কারণ কিছু জানি না। ভাগ্যে এই নরকযন্ত্রণা ভোগ ছিল—আর তা হয়ে গেছে। আমি সত্যই এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল। প্রভু তোমাদের সহায় হোন! আমি চিরবিশ্রামের জন্য শীঘ্রই হিমালয়ে যাচ্ছি। আমার কাজ শেষ হয়েছে। ইতি

সতত প্রভুপদাশ্রিত
তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুঃ—মিসেস বুল তোমাদের তাঁর ভালবাসা জানাচ্ছেন।

৪৩৪

চিকাগো*
২৬শে নভেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় মিসেস লেগেট,

আপনার সকল সহৃদয়তা, বিশেষ ক'রে সহৃদয় পত্রটির জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আগামী বৃহস্পতিবার চিকাগো থেকে রওনা হচ্ছি, সেদিনের জন্য টিকিট ও বার্থ ঠিক করা হয়েছে।

মিস নোবল্ এখানে কাজ খুব ভালই চালাচ্ছে এবং নিজের পথ সে নিজেই তৈরি ক'রে নিচ্ছে। এলবার্টার সঙ্গে সেদিন দেখা হ'ল। এখানে অবস্থানের প্রতিটি মুহূর্ত সে উপভোগ করছে এবং সে খুব আনন্দে আছে। মিস অ্যাডাম্‌স্ (Jane Adams) যথাপূর্ব দেবীর মতো।

যাত্রার আগে জো জো-কে 'তার' ক'রব এবং সারারাত বই পড়ে কাটাব।

আপনাকে ও মিঃ লেগেটকে ভালবাসা।

আপনার চিরস্নেহের
বিবেকানন্দ

৪৩৫

(মিসেস লেগেটকে লিখিত)

চিকাগো*

৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৯

মা,

মাদাম কাল্‌ভের আগমন ছাড়া নূতন কোন খবর নেই। তিনি একজন মহীয়সী মহিলা। তাঁকে যদি আরও দেখতে পেতাম! সাইক্লোনের মুখে দাঁড়িয়ে বিশাল পাইন লড়াই ক'রে যাচ্ছে—এ একটা মহান দৃশ্য।[১] তাই নয় কি?

আজ রাত্রে এস্থান ছেড়ে যাচ্ছি। এই কয়েকটি লাইন তাড়াতাড়ি লিখছি, কারণ অ— অপেক্ষা করছে। মিসেস অ্যাডাম্‌স্ যথারীতি সহৃদয়। মার্গট চমৎকার চালিয়ে যাচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আরও লিখব।

ফ্রাঙ্কিনসেন্সকে ভালবাসা।

আপনার চিরসন্তান

বিবেকানন্দ

৪৩৬

লস্ এঞ্জেলেস্*

৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় নিবেদিতা,

তোমার ষষ্ঠ দফা এসে পৌঁছেছে, কিন্তু তাতেও আমার ভাগ্যের কোন ইতরবিশেষ ঘটেনি। স্থান-পরিবর্তনে বিশেষ কোন উপকার হবে ব'লে মনে কর কি? কারও কারও প্রকৃতিই এমন যে, তারা দুঃখ পেতেই ভালবাসে। বস্তুতঃ যাদের মধ্যে আমি জন্মেছি, যদি তাদের জন্য আমার হৃদয় উৎসর্গ না করতাম তো অন্যের জন্য করতেই হ'ত—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই হচ্ছে কারও কারও ধাত—আমি তা ক্রমে বুঝতে পারছি। আমরা সকলেই সুখের পেছনে ছুটছি সত্য, কিন্তু কেউ কেউ যে দুঃখেরই মধ্যে আনন্দ পায়—এটা খুব আশ্চর্য নয় কি? এতে ক্ষতি কিছু নেই; শুধু ভাববার বিষয়

১ কন্যার মৃত্যুতে মাদাম কাল্‌ভের মনের অবস্থাই এখানে বর্ণনার লক্ষ্য।

এই যে, সুখ-দুঃখ উভয়ই সংক্রামক। ইঙ্গারসোল একবার বলেছিলেন যে, তিনি যদি ভগবান হতেন তবে ব্যাধিকে সংক্রামক না ক'রে স্বাস্থ্যকেই সংক্রামক করতেন। কিন্তু স্বাস্থ্য যে ব্যাধি অপেক্ষা অধিক না হলেও অনুরূপভাবে সংক্রামক, তা তিনি একটুও ভাবেননি। বিপদ তো ঐখানেই। আমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখে জগতের কিছুই যায়-আসে না—শুধু অপরে যাতে সংক্রামিত না হয়, তা দেখতে হবে। কর্মকৌশল তো ঐখানেই। যখনই কোন মহাপুরুষ মানুষের দুঃখে ব্যথিত হন, তখন তিনি নিজের মুখ ভার করেন, বুক চাপড়ান এবং সকলকে ডেকে বলেন, 'তোমরা তেঁতুল-জল খাও, কয়লা চিবাও, গায়ে ছাই মেখে গোবরের গাদায় বসে থাকো, আর শুধু চোখের জলে করুণ স্বরে বিলাপ কর।' আমি দেখছি, তাঁদের সবারই ত্রুটি ছিল—সত্যি সত্যি ছিল। যদি সত্যই জগতের বোঝা স্কন্ধে নিতে তুমি প্রস্তুত হয়ে থাকো, তবে সর্বতোভাবে তা গ্রহণ কর; কিন্তু তোমার বিলাপ ও অভিশাপ যেন আমাদের শুনতে না হয়। তোমার নিজের জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ে আমাদিগকে এমন শঙ্কিত ক'রে তুলো না যে, শেষে আমাদের মনে করতে হয়, তোমার কাছে না এসে আমাদের নিজের দুঃখের বোঝা নিয়ে থাকাই বরং ছিল ভাল। যে ব্যক্তি সত্যসত্যই জগতের দায় ঘাড়ে নেয়, সে জগৎকে আশীর্বাদ করতে করতে আপন পথে চলতে থাকে। তার মুখে একটিও নিন্দার কথা, একটিও সমালোচনার কথা থাকে না, তার কারণ এ নয় যে জগতে পাপ নেই; তার কারণ এই যে, সে স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই পাপ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। যিনি পরিত্রাতা তাঁকেই সানন্দে আপন পথে চলতে হবে; যারা পরিত্রাণ পাচ্ছে, এ কাজ তাদের নয়।

আজ প্রাতে শুধু এই তত্ত্বের আলোই আমার সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে। যদি এ ভাবটি আমার মধ্যে স্থায়িভাবে এসে থাকে এবং আমার সমগ্র জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে, তবেই যথেষ্ট।

দুঃখভার-জর্জরিত যে যেখানে আছ, সব এস, তোমাদের সব বোঝা আমার উপর ফেলে দিয়ে আপন মনে চলতে থাকো, আর তোমরা সুখী হও এবং ভুলে যাও যে, আমি একজন কোনকালে ছিলাম। অনন্ত ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমার পিতা

বিবেকানন্দ

৪৩৭

১২ই ডিসেম্বর, ১৮৯৯*

প্রিয় মিসেস বুল,

আপনি ঠিকই ধরেছেন—আমি নিষ্ঠুর, বড়ই নিষ্ঠুর। আর আমার মধ্যে কোমলতা প্রভৃতি যা কিছু আছে, তা আমার ত্রুটি। এই দুর্বলতা যদি আমার মধ্যে আরও কম—অনেক কম থাকত! হায়! কোমলভাবই হ'ল আমার দুর্বলতা এবং এইটিই আমার সব দুঃখের কারণ। ভাল কথা, মিউনিসিপ্যালিটি অত্যধিক কর বসিয়ে আমাদের উচ্ছেদ করতে চায়। সেটা আমারই দোষ, কারণ আমিই ট্রাস্ট ক'রে মঠটি সাধারণের হাতে তুলে দিইনি। আমি যে মাঝে মাঝে আমার ছেলেদের প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করি, সেজন্য আমি বিশেষ দুঃখিত; কিন্তু তারাও জানে যে, সংসারে সবার চাইতে আমি তাদের বেশী ভালবাসি।

দৈবের সহায়তা সত্যই হয়তো আমি পেয়েছি; কিন্তু উঃ! এতটুকু দৈব কৃপার জন্য আমাকে কী পরিমাণেই না রক্তমোক্ষণ করতে হয়েছে। ঐটি না পেলে হয়তো আমি আরও বেশী সুখী হতাম এবং মানুষ হিসাবে আরও ভাল হতাম। বর্তমান অবস্থা অবশ্য খুবই তমসাচ্ছন্ন ব'লে মনে হয়; তবে আমি নিজে যোদ্ধা, যুদ্ধ করতে করতেই আমায় প্রাণ দিতে হবে—হাল ছেড়ে দেওয়া চলবে না; এই জন্যই তো ছেলেদের উপর আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না। আমি তো তাদের যুদ্ধ করতে ডাকছি না—আমি তাদের আমার যুদ্ধে বাধা না দিতে বলছি।

অদৃষ্টের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। কিন্তু হায়, এখন আমি চাই যে, আমার ছেলেদের মধ্যে অন্ততঃ একজন আমার পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করুক।

আপনি কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। ভারতবর্ষে কোন কাজ করতে হ'লে আমার উপস্থিতি প্রয়োজন। আমার স্বাস্থ্য এখন আগের চেয়ে অনেকটা ভাল; হয়তো সমুদ্রযাত্রায় আরও ভাল হবে। যা হোক, এবার আমেরিকায় কেবল বন্ধু-বান্ধবদের উত্ত্যক্ত করা ছাড়া আর বিশেষ কোন কাজ করিনি। আমার পাথেয় বাবদ অর্থ-সাহায্য জো-র কাছ থেকেই হয়তো পাব, তা ছাড়া মিঃ লেগেটের কাছেও আমার কিছু টাকা আছে। ভারতবর্ষে কিছু অর্থ-

সংগ্রহের আশা এখনও আমি রাখি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আমার যে-সব বন্ধু-বান্ধব আছেন, তাঁদের কাছে এখনও যাইনি। আশা করি, প্রয়োজনীয় পঞ্চাশ হাজার পুরোবার জন্য পনর হাজার টাকা সংগ্রহ করতে পারব এবং ট্রাস্টের দলিল হয়ে গেলেই মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্সও কমে যাবে। আর যদি এ অর্থ সংগ্রহ করতে নাও পারি, তবু আমেরিকায় নিরর্থক বসে থাকার চেয়ে চেষ্টা করতে করতে মরাও শ্রেয় মনে করি। আমার জীবনের ভুলগুলি খুবই বড় বটে ; কিন্তু তাদের প্রত্যেকটির কারণ খুব বেশী ভালবাসা। এখন ভালবাসার উপর আমার বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে। হায়! যদি আমার একটুও ভালবাসা না থাকত! ভক্তির কথা বলেছেন! হায়, আমি যদি নির্বিকার ও কঠোর বৈদান্তিক হ'তে পারতাম! যাক, এ জীবন শেষ হয়েছে ; পরজন্মে চেষ্টা ক'রে দেখব। আমার দুঃখ এই—বিশেষতঃ আজকাল—আমার বন্ধু-বান্ধবগণ আমার কাছ থেকে আশীর্বাদের চেয়ে অপকারই বেশী পেয়েছে। যে শান্তি ও নির্জনতা চিরদিন খুঁজছি, তা আমার অদৃষ্টে জুটল না।

বহু বৎসর আগে আমি হিমালয়ে গিয়েছিলাম, আর ফিরব না এই মনে ক'রে। এদিকে আমার বোন আত্মহত্যা ক'রল, সে-সংবাদ আমার কাছে এসে পৌছল, আমার সেই দুর্বল হৃদয় আমাকে শান্তির আশা থেকে বিচ্যুত ক'রল। সে দুর্বল হৃদয়ই আবার—আমি যাদের ভালবাসি, তাদের জন্য কিছু সাহায্য ভিক্ষা করতে আমায় ভারত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আজ তাই আমি আমেরিকায়! শান্তি আমি চেয়েছি ; কিন্তু ভক্তির আধার সেই আমার হৃদয়টি আমায় তা থেকে বঞ্চিত করেছে। সংগ্রাম ও যন্ত্রণা, যন্ত্রণা ও সংগ্রাম! যাক, তাই যখন আমার নিয়তি, তখন তাই হোক ; আর যত শীঘ্র এর শেষ হয়, ততই মঙ্গল। লোকে বলে আমি ভাবপ্রবণ, কিন্তু অবস্থার কথা ভাবুন দেখি! আপনি আমাকে কতই না ভালবাসেন—আমার প্রতি কতই না সদয়! অথচ আমিই কিনা আপনার এত বেদনার কারণ হলাম! আমি এতে দুঃখিত। কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে—এ তো অন্যথা হবার নয়! এখন আমি গ্রন্থি ছেদন করতে চাই, অথবা সে চেষ্টায় শরীরপাত ক'রব।

আপনারই সন্তান

বিবেকানন্দ

পুঃ—মহামায়ার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। স্যান ফ্র্যান্সিস্কো হয়ে ভারতবর্ষে যাবার খরচ আমি জো-র কাছে চাইব। যদি সে তা দেয়, তবে অবিলম্বে জাপান হয়ে ভারতের দিকে যাত্রা ক'রব। এতে একমাস লাগবে। ভারতের কাজ চালাবার মতো এবং হয়তো সে কাজ আরও বেশী সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সেখানে কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে পারব ব'লে আশা রাখি—অন্ততঃ কাজের যে বিশৃঙ্খল অবস্থা এখন দেখছি, তেমনি রেখে যেতে পারব। কাজের শেষটা যেন বড় তমসাচ্ছন্ন ও বড় বিশৃঙ্খল হয়ে আসছে—অবশ্য এমনি প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু ভগবানের দয়ায় এ-কথা মনে করবেন না যে, আমি মুহূর্তের জন্যও হাল ছেড়ে দেবো। কাজ ক'রে ক'রে অবশেষে রাস্তায় পড়ে মরবার জন্য ভগবান যদি আমায় তাঁর ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া ক'রে থাকেন, তবে তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। বর্তমানে আপনার চিঠি পেয়ে এত আনন্দে আছি যে, এমন আনন্দ বহুকাল পাই নি। ওয়া গুরু কি ফতে, গুরুজীর জয় হোক! হাঁ, যে অবস্থাই আসুক না কেন—সংসার আসুক, নরক আসুক, দেবতারা আসুন, মা আসুন—আমি সংগ্রাম চালিয়েই যাব, কখনও হার মানব না। স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে রাবণ তিন জন্মে মুক্তি লাভ করেছিল। মহামায়ার সঙ্গে সংগ্রাম তো গৌরবের বিষয়।

আপনার ও আপনার স্বজনবর্গের সর্বপ্রকার মঙ্গল হউক। আমি যতটুকুর যোগ্য তার চাইতে অনেক, অনেক বেশী আপনি আমার জন্য করেছেন। ক্রিষ্টিন ও তুরীয়ানন্দকে আমার ভালবাসা জানাবেন।

বিবেকানন্দ

৪৩৮

২২শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯*

প্রিয় ধীরামাতা,

আজ কলকাতার এক পত্রে জানলাম যে, আপনার চেকগুলি পৌঁছেছে; ঐ সঙ্গে বহু ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার বাণীও এসেছে।

লণ্ডনের মিস সুটার ছাপানো পত্রে নববর্ষের অভিবাদন জানিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, আপনি তাঁকে যে হিসাব পাঠিয়েছেন, ইতিমধ্যে তিনি তা

পেয়েছেন। আপনার ঠিকানায় সারদানন্দের যে-সব চিঠি এসেছে, তা দয়া ক'রে পাঠিয়ে দেবেন।

সম্প্রতি আমার আবার শরীর খারাপ হয়েছিল, তাই চিকিৎসক রগড়ে রগড়ে আমার ইঞ্চি কয়েক চামড়া তুলে ফেলেছে। এখনও আমি তার যন্ত্রণা বোধ করছি। নিবেদিতার কাছ থেকে একখানি খুব আশাপ্রদ চিঠি পেয়েছি। আমি প্যাসাডেনায় খেটে চলেছি, এবং আশা করছি যে, এখানে আমার কাজের কিছু ফল হবে। এখানে কেউ কেউ খুব উৎসাহী। 'রাজযোগ' বইখানি সত্যই এই উপকূলে চমৎকার কাজ করেছে। মনের দিক থেকে বস্তুতই খুব ভাল আছি; সম্প্রতি আমি যেমন শান্তিতে আছি, তেমন কখনও ছিলাম না। যেমন ধরুন, বক্তৃতার ফলে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। এটা একটা লাভ নিশ্চয়! কিছু লেখার কাজও করছি। এখানকার বক্তৃতাগুলি একজন সাঙ্কেতিক লেখক টুকে নিয়েছিল; স্থানীয় লোকেরা তা ছাপতে চায়।

জো-এর কাছে লেখা স্বামী—এর পত্রে খবর পেলাম যে, মঠের সব ভাল আছে এবং ভাল কাজ করছে। বরাবর যেমন হয়ে থাকে—পরিকল্পনাগুলি ক্রমে কাজে পরিণত হচ্ছে; কিন্তু আমি যেমন ব'লে থাকি, 'মা-ই সব জানেন'। তিনি যেন আমায় মুক্তি দেন এবং তাঁর কাজের জন্য অন্য লোক বেছে নেন! ভাল কথা, ফলে আসক্তি না রেখে কাজ করার যে উপদেশ গীতায় আছে, সেটি মনে মনে ঠিক ঠিক অভ্যাস করার প্রকৃত উপায় আমি আবিষ্কার ক'রে ফেলেছি। ধ্যান, মনোযোগ ও একাগ্রতার সাধন সম্বন্ধে আমি এমন আলো পেয়েছি, যার অভ্যাস করলে আমরা সর্বপ্রকার উদ্বেগ ও দুর্ভাবনার অতীত হয়ে যাব। মনটাকে ইচ্ছানুসারে এক জায়গায় ঘিরে রেখে দেওয়ার কৌশল ছাড়া এটা আর কিছু নয়। এখন আপনার নিজের অবস্থা কি—বেচারী ধীরামাতা! মা হওয়ার এই দায়, এই শাস্তি! আমরা সব শুধু নিজেদের কথাই ভাবি, মায়ের কথা কখনও ভাবি না। আপনি কেমন আছেন? আপনার কেমন চলছে? আপনার মেয়ের এবং মিসেস ব্রিগ্স্-এর খবর কি?

আশা করি, তুরীয়ানন্দ এখন সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে এবং কাজে লেগে গেছে। বেচারার ভাগ্যে শুধু দুর্ভোগ! কিন্তু ওতে কিছু মনে করবেন না। যন্ত্রণাভোগেও একটা আনন্দ আছে, যদি তা পরের জন্য হয়। তাই নয় কি?

মিসেস লেগেট ভাল আছেন, জো-ও তাই ; আর তারা বলছে, আমি ভাল আছি। হয়তো তাদেরই কথা ঠিক। যাই হোক, আমি কাজ ক'রে যাচ্ছি এবং কাজের মধ্যেই মরতে চাই—অবশ্য যদি তা মায়ের অভিপ্রেত হয়। আমি সন্তুষ্ট। ইতি

আপনার চিরসন্তান
বিবেকানন্দ

৪৩৯

(স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিত)

লস্ এঞ্জেলেস
ডিসেম্বর, ১৮৯৯

হরিভাই,

…তোমার ঠ্যাঙ জোড়া লেগেছে শুনে খুশী আছি এবং বেশ কাজ ক'রছ তাও শুনছি।…আমার শরীর ঠিক চলছে না। মোদ্দা কথা, আমারও আতুপুতু করলেই রোগ হয়। রাঁধছি, যা-তা খাচ্ছি, দিনরাত খাটছি, বেশ আছি, খুব ঘুমুচ্ছি !!

আমি আসছি নিউইয়র্কে একমাসের ভেতর। সারদার কাগজ[১] কি উঠে গেছে না কি ? ও আর তো পাই না। Awakened ('প্রবুদ্ধ ভারত')-ও ঘুমিয়েছে বুঝি ? আমায় তো আর পাঠায় না। যাক্, দেশে তো 'পিলগ্ হইছন্তি'—কে আছে, কে নেই রে রাম !! ওহে, অচু-র এক চিঠি আজ এসে হাজির। সে রাজপুতানায় শিখর রাজার রামগড় শহরে লুকিয়ে ছিল। কে বলেছে যে, বিবেকানন্দ মরে গেছে। তাই এক পত্র লিখেছে আমায় !! তাকে একখানা জবাব পাঠাচ্ছি।

আমার সকল কুশল। তোমার, তার কুশল দেবে। ইতি

দাস
বিবেকানন্দ

---

১ 'উদ্বোধন'—পত্রিকা

৪৪০

421, 21st Street, লস্ এঞ্জেলেস্*
২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় নিবেদিতা,

সত্যি আমি চৌম্বক চিকিৎসা-প্রণালীতে (magnetic healing) ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠছি। মোট কথা, এখন আমি বেশ ভালই আছি। আমার শরীরের কোন যন্ত্র কোনকালেই বিগড়ায়নি—স্নায়বিক দৌর্বল্য ও অজীর্ণতাই আমার দেহে যা-কিছু গোল বাধিয়েছিল।

এখন আমি রোজ খাবারের আগে বা পরে যে-কোন সময়েই হোক মাইলের পর মাইল বেড়িয়ে আসি। আমি বেশ ভাল হয়ে গেছি, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ভালই থাকব।

এখন চাকা ঘুরছে—মা সেই চাকা ঘোরাচ্ছেন। তাঁর কাজ যতদিন না শেষ হচ্ছে, ততদিন তিনি আমায় যেতে দিচ্ছেন না—এইটি হচ্ছে রহস্য।

দেখ, ইংলণ্ড কেমন উন্নতির দিকে এগোচ্ছে! এই রক্তারক্তির পর সেখানকার লোক এই 'ক্রমাগত লড়াই লড়াই লড়াই'-এর চেয়ে বড় ও উঁচু জিনিস ভাববার সময় পাবে। এই আমাদের সুযোগ। আমরা এখন একটু উদ্যমশীল হয়ে দলে দলে ওদের ধ'রব, প্রচুর অর্থসংগ্রহ ক'রব এবং তারপর ভারতীয় কাজটাকেও পুরাদমে চালিয়ে দেবো। চারদিকের অবস্থা বেশ আশাপ্রদ বোধ হচ্ছে, অতএব প্রস্তুত হও। চারটি ভগ্নী ও তুমি আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

৪৪১

921 West 21st Street, লস্ এঞ্জেলেস্*
২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় ধীরামাতা,

শুভ নববর্ষ আপনার নিকট আসুক এবং বহুবার এভাবে আসতে থাকুক—এই আমার আকাঙ্ক্ষা। আমার স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা আগের চেয়ে অনেক ভাল

আছে এবং আবার কাজ করবার মতো যথেষ্ট শক্তি পেয়েছি। ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছি এবং সারদানন্দকে কিছু টাকা (১৩০০৲ টাকা) পাঠিয়েছি, …দরকার হ'লে আরও পাঠাব। তিন সপ্তাহ যাবৎ সারদানন্দের কোন সংবাদ পাইনি ; আর আজ ভোরে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। বেচারা ছেলেরা! আমি মাঝে মাঝে তাদের প্রতি কত রূঢ় ব্যবহারই না করি! এ-সব সত্ত্বেও তারা জানে যে, আমি তাদের সকলের চেয়ে বড় বন্ধু।…আমি তিন সপ্তাহ আগে তাদের তার ক'রে জানিয়েছি যে, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি। আমি যদি আরও অসুস্থ না হয়ে পড়ি, তবে যেটুকু স্বাস্থ্য এখন আছে, তাতেই চলে যাবে। আমার জন্য মোটেই ভাববেন না, আমি উঠে-পড়ে কাজে লেগে গেছি।

গল্পগুলি আর লিখতে পারিনি ব'লে দুঃখিত। আমি এ ছাড়া অন্য কিছু কিছু লিখেছি এবং প্রতিদিনই কিছু লিখবার আশা রাখি। আমি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী শান্তিতে আছি এবং বুঝতে পেরেছি যে, এই শান্তি বজায় রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে অপরকে শেখানো। কাজই হচ্ছে আমার একমাত্র সেফ্‌টি ভাল্‌ভ্‌ (অতিরিক্ত গ্যাস বের ক'রে দিয়ে যন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার)। আমার দরকার হচ্ছে শুধু পরিষ্কার মাথাওয়ালা জনকয়েক লোকের, যারা চেপে কাজ ক'রে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যাপারের দেখাশুনা করবে। আমার আশঙ্কা এই যে, ভারতে এমন লোক পেতে অনেক কাল কেটে যাবে ; আর যদি তেমন কোন লোক থাকে, তা হলেও পাশ্চাত্য কারুর কাছে তার শিক্ষা নেওয়া উচিত। আবার, আমার পক্ষে কাজ করা তখনই সম্ভব হয়, যখন আমাকে সম্পূর্ণভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়। নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই আমার শক্তি খোলে বেশী। মা-র যেন তাই অভিপ্রায়। জো-এর বিশ্বাস এই যে, মায়ের মনে অনেক সব বড় বড় ব্যাপারের পরিকল্পনা চলছে—তাই যেন হয়! জো ও নিবেদিতা যেন সত্যি সত্যি ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা হয়ে পড়েছে দেখছি! আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, আমি জীবনে যা-কিছু ঘা খেয়েছি, যা-কিছু যন্ত্রণা ভোগ করেছি—সবই একটা সানন্দ আত্মত্যাগে পরিণত হবে, যদি মা আবার ভারতের দিকে মুখ তুলে চান।

মিস গ্রিন্‌স্‌টিডেল (Miss Greenstidel) আমায় একখানি চমৎকার চিঠি লিখেছেন—তার অধিকাংশই আপনার সম্বন্ধে। তিনি তুরীয়ানন্দের সম্বন্ধেও

খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। তুরীয়ানন্দকে আমার ভালবাসা জানাবেন। আমার বিশ্বাস, সে চমৎকার কাজ করবে। তার সাহস ও স্থৈর্য আছে।

আমি শীঘ্রই ক্যালিফোর্নিয়াতে কাজ করতে যাচ্ছি। ক্যালিফোর্নিয়া ছেড়ে যাবার সময়ে আমি তুরীয়ানন্দকে ডেকে পাঠাব এবং তাকে প্রশান্ত-মহাসাগরের উপকূলে কাজে লাগাব। আমার নিশ্চিত ধারণা এখানে একটা বড় কর্মক্ষেত্র আছে। 'রাজযোগ' বইটা এখানে খুব পরিচিত ব'লে মনে হচ্ছে। মিস গ্রিন্‌স্টিডেল আপনার বাড়িতে খুব শান্তি পেয়েছেন এবং বেশ আনন্দে আছেন। এতে আমি বেশ খুশী আছি। দিনে দিনে তাঁর সব বিষয়ে একটু সুরাহা হোক। তাঁর চমৎকার কার্যক্ষমতা ও ব্যবসায়বুদ্ধি আছে।

জো একজন মহিলা-চিকিৎসককে খুঁজে বের করেছে; তিনি 'হাতঘসা' চিকিৎসা করেন। আমরা দুজনেই তাঁর চিকিৎসায় আছি। জো-এর ধারণা যে, তিনি আমাকে বেশ চাঙ্গা ক'রে তুলছেন। আর সে নিজে দাবি করে যে, তার নিজের উপর অলৌকিক ফল ফলেছে। 'হাতঘসা' চিকিৎসার ফলেই হোক, ক্যালিফোর্নিয়ার 'ওজোন্' (ozone) বাষ্পের ফলেই হোক, অথবা বর্তমান কর্মের দশা কেটে যাবার ফলেই হোক, আমি সেরে উঠছি। পেটভরা খাবার পরে তিন মাইল হাঁটতে পারা একটা বিরাট ব্যাপার নিশ্চয়!

ওলিয়াকে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানাবেন এবং ডাক্তার জেম্‌স্ ও বস্টনের অপরাপর বন্ধুদের আমার ভালবাসা জানাবেন। ইতি

আপনার চিরসন্তান
বিবেকানন্দ

৪৪২

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

C/o মিসেস ব্লজেট,*
921 West 21st St., লস্ এঞ্জেলেস্,
২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয় মেরী,

আনন্দের বড়দিন, সুখের নববর্ষ, তোমার জন্মদিনের সঙ্গে জড়িত এই দিনগুলি বারে বারে ফিরে আসুক। এই শুভেচ্ছা, প্রার্থনা ও অভিনন্দন

পাঠাচ্ছি এক নিঃশ্বাসে। তুমি জেনে খুশী হবে যে, আমার রোগ সেরে গিয়েছে। এটা শুধু গরহজমের ব্যাপার, হার্ট বা কিডনীর কোন রোগ নয়—চিকিৎসকরা বলছেন ; না, আর বেশী কিছু নয়। এখন আমি রোজ রাত্রে খাওয়ার পর তিন মাইল হাঁটছি।

আর শোন, যে আমাকে সারিয়ে তুলেছে, সে ধূমপান করার উপর জোর দিচ্ছে। অতএব বেশ ক'রে পাইপ টানছি এবং তার ফল ভালই হয়েছে। সোজা কথায়, স্নায়ুদৌর্বল্য ইত্যাদি সবকিছুর কারণ হ'ল অজীর্ণতা, তা ছাড়া কিছুই না।

আমি আবার কাজেও নেবে গেছি। কাজ, কাজ—তবে কঠিন কাজ নয় ; কিন্তু আমি গ্রাহ্য করি না, এবারে কিছু টাকা করতে চাই। মার্গটকে এ কথা জানিও, বিশেষ ক'রে পাইপের ব্যাপারটা। তুমি কি জানো কে আমায় সারিয়ে তুলেছে ? কোন ডাক্তার নয়, ক্রিশ্চান সায়ান্সের 'আরোগ্য-কারী'ও নয়—একজন চৌম্বক চিকিৎসক (a magnetic healing woman)। অবাক কাণ্ড!—হাত ঘসে সে চিকিৎসা করে—ভিতরকার চিকিৎসা পর্যন্ত, তার রোগীরা আমাকে বলেছে।

রাত হয়ে যাচ্ছে। মার্গট, হ্যারিয়েট, ইসাবেল ও মাদার চার্চকে আলাদা চিঠি লেখার আশা ছাড়তে হ'ল। ইচ্ছাই তো অর্ধেক কাজ। তারা সকলে জানে, আমি তাদের কত গভীরভাবে ভালবাসি। অতএব এখনকার মতো তুমি আমার হয়ে নববর্ষের শুভবার্তা তাদের পৌঁছে দাও।

এখানে এখন ঠিক উত্তরভারতের মতো শীত, কেবল মাঝে মাঝে কয়েকটা দিন একটু গরম ; গোলাপ ফুলও আছে এবং চমৎকার পামগুলি। ক্ষেতে বার্লি ফলেছে, গোলাপ এবং অন্যান্য নানা জাতের ফুল ফুটেছে আমার কুটিরের চারপাশে। গৃহস্বামিনী মিসেস ব্লজেট চিকাগোর মহিলা—স্থুলাঙ্গী, বৃদ্ধা এবং খুবই রসিকা ও বাক্‌চতুরা। চিকাগোতে তিনি আমার বক্তৃতা শুনেছেন এবং খুব মাতৃস্বভাবা।

ইংরেজদের জন্য আমার বড় দুঃখ—তারা দক্ষিণ আফ্রিকায়[১] শক্ত পাল্লায় পড়েছে। তাঁবুর বাইরে কর্তব্যরত এক সৈনিক চীৎকার ক'রে একবার

১ 'বুয়র' যুদ্ধ-প্রসঙ্গে

জানিয়েছিল যে, সে এক তাতারকে পাকড়েছে। তাঁবুর ভিতর থেকে আদেশ হ'ল 'তাকে ভিতরে নিয়ে এস।' সৈন্য বললে, 'সে আসতে চাইছে না।' আবার কড়া আদেশ শোনা গেল, 'তা হ'লে তুমি নিজে এস।' 'সে যে আমাকেও যেতে দিচ্ছে না।' তার থেকে 'তাতার পাকড়ানো'[১] প্রবচনটি এসে গেছে। তুমি কাউকে পাকড়েছ নাকি?

ঠিক এখনই আমি সুখী এবং বাকী জীবনও সুখী থাকার আশা করছি।

বেশ কিছু টাকা করতে পারলে খুব খুশী হবো। কিছু কিছু করছি। মার্গটকে ব'লো, আমি বেশ কিছু টাকা ক'রে ফেলছি এবং জাপান, হনলুলু, চীন ও জাভার পথে দেশে ফিরব। তাড়াতাড়ি টাকা করার পক্ষে এটা চমৎকার জায়গা; এবং শুনছি, স্যান ফ্র্যান্সিস্কো এর চেয়েও ভাল। সে কি কিছু করতে পেরেছে?

কোটিপতি তুমি আর যোগাড় করতে পারলে না। তার অর্ধেক কিংবা তার সিকির জন্য চেষ্টা কর না কেন? আরে, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। আমাদের টাকা চাই, সে মিশিগান হ্রদে ডুবে মরুক, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। সেদিন এখানে সামান্য ভূমিকম্প হয়ে গেছে। ভূমিকম্পটি—আশা করি চিকাগোতেও হয়েছে এবং ইসাবেলের কাদাজল ঘুলিয়ে উপরে তুলেছে। রাত হয়ে যাচ্ছে। হাই উঠছে, সুতরাং ইতি।

বিদায়; প্রীতি ও আশীর্বাদ।

বিবেকানন্দ

৪৪৩

(মিসেস ওলিবুলকে লিখিত)

লস্ এঞ্জেলেস্*
১৭ই জানুআরি, ১৯০০

প্রিয় ধীরামাতা,

সারদানন্দের জন্য প্রেরিত কাগজপত্র সহ আপনার পত্রখানি পেয়েছি; এতে কিছু সুসংবাদ আছে। এ সপ্তাহে আরও কিছু সুসংবাদের আশায়

১ 'Catching a Tartar'

আছি। আপনি আপনার অভিপ্রায় সম্বন্ধে তো কিছু লিখলেন না। মিস গ্রিন্‌স্টিডেল আমায় একখানি পত্র লিখে আপনার প্রতি তাঁর গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন—আর কেই বা না জানিয়ে পারে? ইতিমধ্যে তুরীয়ানন্দ বেশ চালিয়ে যাচ্ছে, আশা করি।…

এখানে বা অন্য কোথাও বক্তৃতার দ্বারা বিশেষ কিছু হবে ব'লে আশা করি না। ওতে আমার খরচই পোষায় না। শুধু তাই নয়, পয়সা খরচের সম্ভাবনা ঘটলেই কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। এদেশে বক্তৃতার ক্ষেত্রটাকে বেশী চষে ফেলা হয়েছে, আর লোকেরা বক্তৃতা শোনার মনোভাব কাটিয়ে উঠেছে।…আমি এখানে প্রধানতঃ স্বাস্থ্যের জন্য এসেছিলাম; আর আমি তা পেয়েছি।…এখন আমার মনে হচ্ছে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে কাজ করবার পালা আমার ফুরিয়ে গেছে; ঐ জাতীয় কাজ ক'রে আর আমার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ করা নিষ্প্রয়োজন।

এখন আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, আমায় মঠের সব ভাবনা ছেড়ে দিতে হবে…। আর আমার কাছে এই সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগের আহ্বানও আসছে—আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নেতৃত্ব ও যশের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিতে হবে। আমার মন প্রস্তুত হয়ে আছে এবং আমায় এ-তপস্যা করতে হবে।…আমি এখন জো ও নিবেদিতার কল্পনাবিলাসকে বাস্তবতার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখেছি। তারা আমার হয়ে তাদের কল্পনাকে রূপ দান করুক—আমার কাছে ও-সব আর নাই। আমি একটা ট্রাস্ট-দলিল করতে চাই, …শরতের কাছ থেকে কাগজপত্র পেলেই তা ক'রে ফেলব। তারপর আমি শান্ত হবো। আমি চাই বিশ্রাম, একমুষ্টি অন্ন, খানকয়েক বই এবং কিছু লেখাপড়ার কাজ। মা এখন আমাকে এই আলোক স্পষ্ট দেখাচ্ছেন। অবশ্য আপনাকেই তিনি এর প্রথম আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তখন বিশ্বাস করিনি।… আমি আমার নিজের চেয়ে আপনার পরিচালনায় বেশি বিশ্বাস করি। জো ও নিবেদিতার মন অতি মহান্; কিন্তু এখন আমাকে চালিয়ে নেবার আলোক মা আপনারই হাতে তুলে দিচ্ছেন। আপনি কি আলোক পাচ্ছেন? আপনার পরামর্শ কি?…

বুঝতে পারছি যে, আমি আর বক্তৃতামঞ্চ থেকে বাণী প্রচার করতে পারব না।…এতে আমি খুশী। আমি বিশ্রাম চাই। আমি যে ক্লান্ত

হয়ে পড়েছি তা নয়; কিন্তু এর পরবর্তী অধ্যায়—কথা নয়, অলৌকিক স্পর্শ, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল।...

আপনার চিরসন্তান
বিবেকানন্দ

৪৪৪

(ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত)

লস্ এঞ্জেলেস্, ক্যালিফোর্নিয়া*
২৪শে জানুআরি, ১৯০০

প্রিয়—,

যে শান্তি ও বিশ্রাম আমি খুঁজছি, তা আসবে ব'লে তো মনে হচ্ছে না। তবে মহামায়া আমাকে দিয়ে অপরের—অন্ততঃ আমার স্বদেশের—কথঞ্চিৎ কল্যাণ করাচ্ছেন; আর এই উৎসর্গের ভাব-অবলম্বনে নিজ অদৃষ্টের সঙ্গে একটা আপস করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। আমরা সকলেই নিজের নিজের ভাবে উৎসর্গীকৃত। মহাপূজা চলছে; একটা বিরাট বলি ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এর অর্থ পাওয়া যায় না। যারা স্বেচ্ছায় মাথা পেতে দেয়, তারা অনেক যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পায়। আর যারা বাধা দেয়, তাদের জোর ক'রে দাবানো হয়, এবং তাদের দুর্ভোগও হয় বেশী। আমি এখন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে বদ্ধপরিকর। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৪৪৫

C/o Miss Meade*
447 Douglas Building
লস্ এঞ্জেলেস্, ক্যালিফোর্নিয়া
১৫ই ফেব্রুআরি, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

তোমার —তারিখের পত্র আজ প্যাসাডেনায় আমার নিকট পৌঁছল। দেখছি, জো তোমায় চিকাগোতে ধরতে পারেনি; তবে নিউইয়র্ক থেকে তাদের এ-পর্যন্ত কোন খবর পাইনি। ইংলণ্ড থেকে একরাশ ইংরেজী

খবরের কাগজ পেলাম—খামের উপর লেখা এক লাইনে আমার প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে ও সই রয়েছে 'F. H. M'। অবশ্য সেগুলির মধ্যে দরকারী বিশেষ কিছু ছিল না। আমি মিস মূলারকে একখানা চিঠি লিখতাম; কিন্তু আমি তো ঠিকানা জানি না। আবার ভয় হ'ল, চিঠি লিখলে তিনি পাছে ভয় পান!···

আমি মিসেস সেভিয়ারের কাছে খবর পেলাম যে, নিরঞ্জন কলকাতায় সাংঘাতিক রকমে পীড়িত হয়ে পড়েছে—জানি না, তার দেহত্যাগ হয়েছে কি না। যাই হোক নিবেদিতা, আমি এখন খুব শক্ত হয়েছি—আগের চেয়ে আমার দৃঢ়তা খুব বেড়েছে—আমার হৃদয়টা যেন লোহার পাত দিয়ে বাঁধানো হয়ে গেছে। আমি এখন সন্ন্যাস-জীবনের অনেকটা কাছাকাছি যাচ্ছি।

আমি দু-সপ্তাহ যাবৎ সারদানন্দের কাছ থেকে কোন খবর পাইনি। তুমি গল্পগুলি পেয়েছ জেনে খুশী হলাম। ভাল বিবেচনা কর তো তুমি নিজে ওগুলি আবার নূতন ক'রে লেখো। কোন প্রকাশককে যদি পাও, তাকে দিয়ে ওগুলি ছাপিয়ে প্রকাশ ক'রে দাও; আর যদি বিক্রি ক'রে কিছু লাভ হয়, তোমার কাজের জন্য নাও। আমার নিজের দরকার নেই। আমি এখানে কিছু অর্থ পেয়েছি। আসছে সপ্তাহে স্যান্ ফ্রান্সিস্কোয় যাচ্ছি; সেখানে সুবিধা করতে পারব—আশা করি।···

ভয় ক'রো না—তোমার বিদ্যালয়ের জন্য টাকা আসবে, আসতেই হবে। আর যদি না আসে, তাতেই বা কি আসে যায়? মা জানেন, কোন্ রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি যে-দিক দিয়ে নিয়ে যান সব রাস্তাই সমান। জানি না, আমি শীঘ্র পূর্ব অঞ্চলে[১] যাচ্ছি কিনা। যদি যাবার সুযোগ হয়, তবে ইণ্ডিয়ানায় নিশ্চিত যাব।

এই আন্তর্জাতিক মেলামেশার মতলবটা খুব ভাল—যে রকমে পারো, ওতে যোগ দাও; আর যদি তুমি মাঝে থেকে কতকগুলি ভারতরমণীদের সমিতিকে ঐতে যোগ দেওয়াতে পারো, তবে আরও ভাল হয়।···

কুছ পরোয়া নেই, আমাদের সব সুবিধা হয়ে যাবে। এই লড়াইটা

১ নিউইয়র্কের দিকে যাইবার কথা বলিতেছেন।

যেমন শেষ হবে, অমনি আমরা ইংলণ্ডে যাবো ও সেখানে খুব চুটিয়ে কাজ করবার চেষ্টা ক'রব—কি বলো? স্থিরামাতাকে লিখব কি? যদি তাঁকে লেখা ভাল মনে কর, তাঁর ঠিকানা আমায় পাঠাবে। তিনি কি তার পর তোমায় পত্রাদি লিখেছেন?

ধৈর্য ধ'রে থাকো, শক্ত ও নরম—সবই ঠিক ঘুরে আসবে। এই যে তোমার নানা রকম অভিজ্ঞতা লাভ হচ্ছে, এইটুকুই আমি চাই। আমারও শিক্ষা হচ্ছে। যে মুহূর্তে আমরা উপযুক্ত হব, তখনই আমাদের কাছে টাকা আর লোক উড়ে আসবে। এখন আমার স্নায়ুপ্রধান ধাত ও তোমার ভাবুকতা মিলে সব গোল হয়ে যেতে পারে। সেই কারণেই 'মা' আমার স্নায়ুগুলিকে একটু একটু ক'রে নীরোগ ক'রে দিচ্ছেন, আর তোমারও ভাবুকতাকে শান্ত ক'রে আনছেন। তারপর আমরা—যাচ্ছি আর কি। এইবার রাশি রাশি ভাল কাজ হবে নিশ্চিত জেনো। এইবার আমরা প্রাচীনদেশ—ইউরোপের মূল ভিত্তি পর্যন্ত তোলপাড় ক'রে ফেলব।...

আমি ক্রমশঃ ধীর, স্থির, শান্তপ্রকৃতি হয়ে আসছি—যাই ঘটুক না কেন, আমি প্রস্তুত। এইবার যে কাজে লাগা যাবে, প্রত্যেক আঘাতে বেশ কাজ হবে—একটিও বৃথা যাবে না—এই হচ্ছে আমার জীবনের আগামী অধ্যায়। আমার ভালবাসাদি জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনঃ—তোমার বর্তমান ঠিকানা লিখবে। ইতি

বি—

৪৪৬

লস্ এঞ্জেলেস্*

১৫ই ফেব্রুআরি, ১৯০০

প্রিয় ধীরামাতা,

এই চিঠি আপনার হাতে পৌঁছবার আগেই আমি স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কো যাত্রা ক'রব। কাজটার সম্বন্ধে আপনার সবই জানা আছে। বেশী কাজ করিনি, কিন্তু দিন-দিনই আমার হৃদয়—(দেহ ও মন দু-দিক দিয়ে) আরও বেশী সবল হচ্ছে। কোন কোন দিন আমার বোধ হয় যে, আমি সবই সহ্য করতে পারি এবং সব দুঃখই বরণ করতে পারি। মিস মূলার যে

কাগজের তাড়া পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। তাঁর ঠিকানা না জানায় আমি তাঁকে কিছুই লিখিনি। তা ছাড়া ভয়ও ছিল।

আমি একা থাকলেই অধিকতর ভাল কাজ করতে পারি; এবং যখন সম্পূর্ণ নিঃসহায় থাকি, তখনি আমার দেহ-মন সবচেয়ে ভাল থাকে! আমি যখন আমার গুরুভাইদের ছেড়ে আট বৎসর একাকী ছিলাম, তখন প্রায় একদিনের জন্যও অসুস্থ হইনি। এখন আবার একা থাকার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি! অবাক কাণ্ড! কিন্তু মা যেন আমায় ঐ ভাবেই রাখতে চান—জো যেমন চায় 'নিঃসঙ্গ গণ্ডারে'র মতো একাকী বেড়াতে।...বেচারা তুরীয়ানন্দ কতই না ভুগেছে, অথচ আমায় কিছুই জানায়নি—সে বড় সরলচিত্ত ও ভালমানুষ! মিসেস সেভিয়ারের পত্রে জানলাম, বেচারা নিরঞ্জনানন্দ কলকাতায় এতই সাংঘাতিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে, সে এখনও বেঁচে আছে কি না জানি না। ভাল কথা! সুখ-দুঃখ হাত ধরাধরি ক'রে চলতেই ভালবাসে। এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার! তারা যেন চক্রাকারে চলে! আমার বোনের একখানি পত্রে জানলাম যে, তার পালিতা কন্যাটি মারা গেছে। ভারতের ভাগ্যে যেন একমাত্র দুঃখই আছে। তাই হোক! সুখদুঃখে আমি যেন বোধশূন্য হয়ে গেছি! হালে আমি যেন লোহার মতো হয়ে গেছি! তাই হোক—মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!

গত দু-বৎসর যাবৎ যে দুর্বলতার পরিচয় দিয়ে আসছি, তাতে আমি বড়ই লজ্জিত। এর সমাপ্তিতে আমি খুশী। ইতি

আপনার চিরস্নেহবদ্ধ সন্তান
বিবেকানন্দ

৪৪৭

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

প্যাসাডেনা *
২০শে ফেব্রুআরি, ১৯০০

প্রিয় মেরী,

মিঃ হেলের দেহত্যাগের বেদনাদায়ক সংবাদ বহন ক'রে তোমার চিঠিখানা গতকাল পৌঁছেছে। আমি মর্মাহত হয়েছি, সন্ন্যাসের শিক্ষা

সত্ত্বেও আমার হৃদয়বৃত্তি এখনও বেঁচে আছে। তার পর যে-সব মহাপ্রাণ মানুষ আমি দেখেছি, মিঃ হেল তাঁদের একজন।

অবশ্যই তুমি দুঃখিত ও নিতান্ত ব্যথিত হয়েছ, মাদার চার্চ, হ্যারিয়েট—সবারই সেই একই অবস্থা, বিশেষত এ ধরনের শোক তোমাদের কাছে যখন এই প্রথম। জীবনে আমি অনেক সয়েছি, অনেককে হারিয়েছি, আর সেই বিয়োগের সবচেয়ে বিচিত্র যন্ত্রণা হ'ল—আমার মনে হয়েছে, যে চলে গেল আমি তার যোগ্য ছিলাম না। পিতার মৃত্যুর পর মাসের পর মাস এই যাতনায় কেটেছে—আমি তাঁর কতই না অবাধ্য ছিলাম!

তুমি খুবই কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলে; যদি তোমার ঐ ধরনের কিছু মনে হয়, তা হ'লে জেনো সেটা শোকেরই একটি রূপ।

মেরী, মনে হয়, ঠিক এখন থেকেই তোমার যথার্থ জীবনের শুরু। যতই আমরা বই পড়ি বা বক্তৃতা শুনি, বা লম্বা লম্বা কথা বলি, শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতাই একমাত্র শিক্ষক, সেই শুধু চোখ ফোটায়। অভিজ্ঞতা যে ভাবে হয়, সেই ভাবেই তা সবচেয়ে ভাল। আমরা শিখি হাসির আলোয়, শিখি চোখের জলে। জানি না কেন এমন হয়, কিন্তু তা যে হয়, তা দেখতেই পাই। সেটাই যথেষ্ট। মাদার চার্চের জন্য অবশ্য ধর্মের সান্ত্বনা আছে। আমরা সকলে যদি স্বপ্নে ডুবে থাকতে পারতাম!

জীবনে এতদিন পর্যন্ত তুমি নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছ, আর আমাকে জ্বলতে—কাঁদতে হয়েছে সারাক্ষণ। এখন ক্ষণকালের জন্য তুমি জীবনের অপর দিকটা দেখতে পেলে। এ ধরনের অবিরাম আঘাতে আঘাতে আমার জীবন তৈরী হয়েছে, এর চেয়েও শতগুণ ভয়ঙ্কর আঘাত—দারিদ্র্যের, বিশ্বাসঘাতকতার আর আমার নিজের নির্বুদ্ধিতার যন্ত্রণা। এটা নৈরাশ্যবাদ? এখন তুমি বুঝবে, কেমন ক'রে তা আসে। ঠিক, ঠিক, তোমাকে আর কি ব'লব মেরী, কথা তো সবই তোমার জানা। শুধু একটি কথা বলি এবং তার মধ্যে এতটুকু ভেজাল নেই, যদি আমাদের দুঃখ বিনিময় করা সম্ভব হ'ত, এবং তোমাকে দেবার মতো আনন্দ-ভরা মন যদি আমার থাকত, তা হ'লে নিশ্চয় বলছি, চিরদিনের জন্য তোমার সঙ্গে তা বিনিময় ক'রে নিতাম। সে-কথা মা-ই জানেন। তোমার চিরবিশ্বস্ত ভ্রাতা

বিবেকানন্দ

৪৪৮

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত)

ওঁ তৎ সৎ

ক্যালিফোর্নিয়া*

২১শে ফেব্রুআরি, ১৯০০

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রে সমস্ত সমাচার অবগত হয়ে বিশেষ আনন্দ লাভ করলুম। বিদ্যাবুদ্ধি বাড়ার ভাগ—উপরে চাকচিক্য মাত্র; সমস্ত শক্তির ভিত্তি হচ্ছে হৃদয়। 'জ্ঞানবলক্রিয়া'শালী আত্মার অধিবাস হৃদয়ে, মস্তিষ্কে নয়। 'শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ' (হৃদয়ে একশত এবং একটি নাড়ী আছে) ইত্যাদি। হৃদয়ের নিকট 'সিম্প্যাথেটিক্ গ্যাংলিয়ন্' নামক যে প্রধান কেন্দ্র, সেথায় আত্মার কেল্লা। হৃদয় যত দেখাতে পারবে, ততই জয়। মস্তিষ্কের ভাষা কেউ কেউ বোঝে, হৃদয়ের ভাষা আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলে বোঝে। তবে আমাদের দেশে, মড়াকে চেতানো—দেরী হবে; কিন্তু অপার অধ্যবসায় ও ধৈর্যবল যদি থাকে তো নিশ্চিত সিদ্ধি, তার আর কি?

ইংরেজ রাজপুরুষদের দোষ কি? যে পরিবারটির অস্বাভাবিক নির্দয়তার কথা লিখেছ, ওটি কি ভারতবর্ষে অসাধারণ, না সাধারণ? দেশশুদ্ধই ঐ রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আমাদের দেশী স্বার্থপরতা, নেহাৎ দুষ্টামি ক'রে হয়নি, বহু শতাব্দী যাবৎ বিফলতা আর নির্যাতনের ফলস্বরূপ এই পশুবৎ স্বার্থপরতা; ও আসল স্বার্থপরতা নয়—ও হচ্ছে গভীর নৈরাশ্য। একটু সিদ্ধি দেখলেই ওটা সেরে যাবে। ইংরেজ রাজপুরুষেরা ঐটিই দেখছে চারিদিকে, কাজেই প্রথমে বিশ্বাস করতে পারবে কেন? তবে যথার্থ কাজ দেখতে পেলে কেমন ওরা সহানুভূতি করে বলো! দেশী রাজপুরুষেরা অমন করে কি?

এই ঘোর দুর্ভিক্ষ, বন্যা, রোগ-মহামারীর দিনে কংগ্রেসওয়ালারা কে কোথায় বলো? খালি 'আমাদের হাতে রাজ্যশাসনের ভার দাও' বললে কি চলে? কে বা শুনছে ওদের কথা? মানুষ কাজ যদি করে—তাকে কি আর মুখ ফুটে বলতে হয়? তোমাদের মতো যদি ২০০০ লোক জেলায় জেলায় কাজ করে—ইংরেজেরা ডেকে রাজকার্যে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করবে যে!! 'স্বকার্য-

মুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ' (প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিজের কার্য উদ্ধার করিবেন)।...অ—কে centre (কেন্দ্র) খুলতে দেননি, তার বা কি? কিষনগড় দিয়েছে তো? মুখটি বুজিয়ে সে কাজ দেখিয়ে যাক—কিছু বলা-কওয়া, ঝগড়া-ঝাঁটির দরকার নাই। মহামায়ার এ কাজে যে সহায়তা করবে, সে তাঁর দয়া পাবে, যে বাধা দেবে 'অকারণাবিষ্কৃতবৈরদারুণঃ' (বিনা হেতুতে দারুণ শত্রুতাবদ্ধ) নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারবে।

'শনৈঃ পন্থাঃ' ইত্যাদি, রাই কুড়িয়ে বেল।—যখন প্রধান কাজ হয়, ভিত্তি-স্থাপন হয়, রাস্তা তৈরি হয়, যখন অমানুষ বলের আবশ্যক হয়—তখন নিঃশব্দে দু-একজন অসাধারণ পুরুষ নানা বিঘ্ন-বিপত্তির মধ্যে নিঃসাড়ে কাজ করে। যখন হাজার হাজার লোকের উপকার হয়, ঢাক-ঢোল বেজে ওঠে, দেশশুদ্ধ বাহবা দেয়—তখন কল চলে গেছে, তখন বালকেও কাজ করতে পারে, আহাম্মকেও কলে একটু বেগ দিতে পারে। এইটি বোঝ—ঐ দু-একটি গাঁয়ের উপর ঐ ২০টি অনাথ বালক সহিত অনাথাশ্রম, ঐ ১০ জন ২০ জন কার্যকরী—এই যথেষ্ট, এই বজ্রবীজ। ঐ থেকে কালে লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হবে; এখন ২।১০টা সিংহের প্রয়োজন—তখন শত শত শৃগালেরাও উত্তম কাজ করতে পারবে।

অনাথ মেয়ে হাতে পড়লে তাদের আগে নিতে হবে। নৈলে কৃশ্চানরা সেগুলিকে নিয়ে যাবে। এখন বিশেষ বন্দোবস্ত নাই তার আর কি? মায়ের ইচ্ছায় বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। ঘোড়া হলেই চাবুক আপনি আসবে। এখন মেয়ে [ও] ছেলে একসঙ্গেই রাখো। একটা ঝি রেখে দাও—মেয়েগুলিকে দেখবে, আলাদা কাছে নিয়ে শোবে; তারপর আপনিই বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। যা পাবে টেনে নেবে, এখন বাছবিচার ক'রো না—পরে আপনিই সিধে হয়ে যাবে। সকল কাজেই প্রথমে অনেক বাধা—পরে সোজা রাস্তা হয়ে যায়।

তোমার সাহেবকে আমার বহু ধন্যবাদ দিও। নির্ভয়ে কাজ ক'রে যাও —ওয়াহ্ বাহাদুর!! সাবাস, সাবাস, সাবাস!!

ভাগলপুরের যে কেন্দ্রস্থাপনের কথা লিখেছ, সে কথা বেশ—স্কুলের ছেলেপুলেকে চেতানো ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের mission (কার্য) হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভূষোর জন্য; আগে তাদের জন্য ক'রে যদি সময় থাকে তো ভদ্রলোকের জন্য। ঐ চাষাভুষোরা ভালবাসা দেখে ভিজবে; পরে

তারাই দু-এক পয়সা সংগ্রহ ক'রে নিজেদের গ্রামে মিশন start (প্রতিষ্ঠা) করবে এবং ক্রমে ওদেরই মধ্য হ'তে শিক্ষক বেরুবে।

কতকগুলো চাষার ছেলেমেয়েকে একটু লিখতে-পড়তে শেখাও ও অনেকগুলো ভাব মাথায় ঢুকিয়ে দাও—তারপর গ্রামের চাষারা চাঁদা ক'রে তাদের এক-একটাকে নিজেদের গ্রামে রাখবে। 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং' (নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবে)—সকল বিষয়েই এই সত্য। We help them to help themselves (তারা যাতে নিজেই নিজেদের কাজ করতে পারে, এইজন্য আমরা তাদের সাহায্য করছি)। ঐ যে চাষারা ডাল দিচ্ছে—ঐটুকু হচ্ছে আসল কাজ। ওরা যখন বুঝতে পারবে নিজেদের অবস্থা, উপকার এবং উন্নতির আবশ্যকতা, তখনই তোমার ঠিক কাজ হচ্ছে জানবে। তা ছাড়া পয়সাওয়ালারা দয়া ক'রে গরীবের কিছু উপকার করবে—তা চিরন্তন হয় না এবং তায় আখেরে উভয় পক্ষের অপকার মাত্র। চাষাভুষো মৃতপ্রায়; এজন্য পয়সাওয়ালারা সাহায্য ক'রে তাদের চেতিয়ে দিক—এই মাত্র! তারপর চাষারা আপনার কল্যাণ আপনারা বুঝুক, দেখুক এবং করুক। তবে ধনী-দরিদ্রের বিবাদ যেন বাধিয়ে ব'সো না। ধনীদের আদতে গাল-মন্দ দেবে না।—স্বকার্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিজের কার্য উদ্ধার করবে)। তা ছাড়া ওরা তো মহামূর্খ—অজ্ঞ ওরা কি করবে?

জয় গুরু, জয় জগদম্বে, ভয় কি? ক্ষেত্রকর্মবিধান আপনা হতেই আসবে! ফলাফল আমার গ্রাহ্য নাই, তোমরা যদি এতটুকু কাজ কর, তা হলেই আমি সুখী। বাক্যি-যাতনা, শাস্ত্র-ফাস্ত্র, মতামত—আমার এ বুড়ো বয়সে বিষবৎ হয়ে যাচ্ছে। যে কাজ করবে, সেই আমার মাথার মণি—ইতি নিশ্চিতম্। মিছে বকাবকি চেঁচামেচিতে সময় যাচ্ছে—আয়ুক্ষয় হচ্ছে, লোকহিত একপাও এগোচ্ছে না। মাভৈঃ, সাবাস বাহাদুর—গুরুদেব তোমার হৃদয়ে বসুন, জগদম্বা হাতে বসুন। ইতি

বিবেকানন্দ

৪৪৯

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

১২৫১ পাইন স্ট্রীট, স্যান্ ফ্রান্সিস্কো*

২রা মার্চ, ১৯০০

প্রিয় মেরী,

আমাকে চিকাগোয় যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লিখেছ, সেটা তোমার একান্ত সহৃদয়তা। এই মুহূর্তেই যদি আমি সেখানে চলে যেতে পারতাম! কিন্তু আমি এখন টাকা যোগাড় করতে ব্যস্ত; তবে বেশী কিছু ক'রে উঠতে পারছি না। হ্যাঁ, যে-কোন উপায়েই হোক, দেশে যাওয়ার খরচটা তোলার মতো টাকা আমায় করতেই হবে। এখানে একটা নূতন ক্ষেত্র পেয়েছি—শত শত উৎসুক শ্রোতা আসছে, আমার বই পড়ে এরা আগে থেকেই প্রস্তুত ও উদ্‌গ্রীব ছিল।

অবশ্য টাকা যোগাড় করার ব্যাপারটা যেমন মন্থর, তেমনি বিরক্তিকর। কয়েক-শ যোগাড় করতে পারলেই আমি খুব খুশী হবো। এর মধ্যে নিশ্চয়ই আমার আগের চিঠিখানা পেয়ে গিয়েছ। মাসখানেক কি মাস-দেড়েকের মধ্যে পূর্বাঞ্চলে যাব, আশা করছি।

তোমরা সকলে কেমন আছ? মাকে আমার আন্তরিক ভালবাসা দিও। তাঁর মতো মনোবল যদি আমার থাকত! খাঁটি খ্রীষ্টান তিনি। আমার স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু পূর্বের বল এখনও ফিরে পাইনি। কিন্তু এতটুকু শক্তির জন্য অনেকখানি পরিশ্রম করতে হবে। অন্তত কয়েকটা দিনের জন্যও যদি বিশ্রাম ও শান্তি পেতাম! নিশ্চয় চিকাগোয় ভগিনীদের কাছে তা পাব। তবে মা-ই সব জানেন, আমার সেই পুরানো কথা—তিনিই ভাল জানেন। গত দু-বছর বিশেষ খারাপ গেছে। মনের দুঃখে বাস করেছি। এখন কিছুটা আবরণ সরে গেছে, এখন আমি সুদিনের—আরও ভাল অবস্থার আশায় আছি। তুমি, অন্য ভগিনীরা এবং মা—সকলের উপর সর্ববিধ আশীর্বাদ। আমার ঘাত-প্রতিঘাতময় বেসুরো জীবনে মেরী, তুমি সব সময় মধুরতম সুরের মতো বেজেছ। তোমার বিশেষ সুকৃতি, তুমি অনুকূল পরিবেশের মধ্যে জীবন শুরু করতে পেরেছ। আর আমি মুহূর্তের

জন্যও শান্তিময় জীবন পাইনি। সব সময়ে দুর্বহ ভার মনের মধ্যে। প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করুন।

সতত তোমার স্নেহশীল ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

৪৫০

স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কো*
১৫০২ জোন্‌স্ স্ট্রীট
৪ঠা মার্চ, ১৯০০

প্রিয় ধীরামাতা,

এক মাস যাবৎ আপনার কাছ থেকে কোনই খবর পাইনি। আমি স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কোতে আছি। আমার লেখার ভেতর দিয়ে লোকের মন আগে থেকেই তৈরী হয়ে ছিল, আর তারা দলে দলে আসছে; কিন্তু টাকা খসাবার কথা যখন উঠবে, তখন এই উৎসাহের কতটা থাকে, তাই দ্রষ্টব্য!

রেভারেণ্ড বেঞ্জামিন ফে মিল্‌স্ আমায় ওকল্যাণ্ডে আহ্বান করেছিলেন এবং আমার বক্তব্য প্রচারের জন্য একটি শ্রোতৃমণ্ডলীর আয়োজন করেছিলেন। তিনি সস্ত্রীক আমার গ্রন্থাদি পাঠ ক'রে থাকেন এবং বরাবরই আমার খবরাখবর রেখে আসছেন।

মিস্ থার্সবির দেওয়া পরিচয়পত্রখানি আমি মিসেস হার্স্টকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি তাঁর এক সঙ্গীতবাসরে আমাকে আগামী রবিবারে নিমন্ত্রণ করেছেন।...

আমার স্বাস্থ্য প্রায় একরূপই আছে—আমি তো কোন ইতরবিশেষ দেখছি না। সম্ভবতঃ স্বাস্থ্যের উন্নতিই হচ্ছে—যদিও অজ্ঞাতসারে। আমি ৩০০০ শ্রোতাকে শোনাবার মত উঁচু গলায় বক্তৃতা দিতে পারি; ওকল্যাণ্ডে আমায় দুবার তাই করতে হয়েছিল। আর দু ঘণ্টা বক্তৃতার পরেও আমার সুনিদ্রা হয়।

খবর পেলাম, নিবেদিতা আপনার সঙ্গে আছে। আপনি ফ্রান্সে যাচ্ছেন কবে? আমি এপ্রিলে এ জায়গা ছেড়ে পূর্বাঞ্চলে যাচ্ছি। সম্ভব হ'লে মে মাসে ইংলণ্ডে যাবার বিশেষ ইচ্ছা আছে। আর একবার ইংলণ্ডে চেষ্টা না ক'রে দেশে ফেরা চলবে না কিছুতেই।

ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দের কাছ থেকে সুন্দর একখানি চিঠি এসেছে। তারা সবাই ভাল আছে। তারা মিউনিসিপ্যালিটিকে বোঝাবার চেষ্টা করছে। এতে আমি খুব খুশী। এ মায়ার সংসারে হিংসা করা ঠিক নয়; কিন্তু 'না কামড়ালেও ফোঁস করতে দোষ নেই'—এই যথেষ্ট।

সব ঠিক হয়ে আসবে নিশ্চয়—আর যদিই বা না হয়, তাও ভাল। মিসেস স্টারের কাছ থেকেও সুন্দর একখানি চিঠি পেয়েছি। তাঁরা পাহাড়ে বেশ আছেন। মিসেস—কেমন আছেন?...তুরীয়ানন্দ কেমন আছে?

আমার অসীম ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানবেন। ইতি

সতত আপনার

বিবেকানন্দ

৪৫১

স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কো*

৪ঠা মার্চ, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

আমি আর কাজ করতে চাই না—এখন বিশ্রাম ও শান্তি চাই। স্থান ও কালের তত্ত্ব আমার জানা আছে; কিন্তু আমার বিধিলিপি বা কর্মফল আমায় নিয়ে চলেছে—শুধু কাজ, কাজ! আমরা যেন গরুর পালের মতো কসাইখানার দিকে চালিত হচ্ছি; কসাইখানা অভিমুখে তাড়িত গরু যেমন পথের ধারের ঘাস এক এক খাবলা খেয়ে নেয়, আমাদের অবস্থাও ঠিক সেই রকম। আর এই হচ্ছে আমাদের কর্ম বা আমাদের ভয়—ভয়ই হচ্ছে দুঃখ ব্যাধি প্রভৃতির আকর। বিভ্রান্ত ও ভয়চকিত হয়ে আমরা অপরের ক্ষতি করি। আঘাত করতে ভয় পেয়ে আমরা আরও বেশী আঘাত করি। পাপকে এড়িয়ে চলতে একান্ত আগ্রহান্বিত হয়ে আমরা পাপেরই মুখে পড়ি।

আমাদের চারপাশে কত অকেজো আবর্জনা-স্তূপই না আমরা সৃষ্টি করি! এতে আমাদের কোন উপকারই হয় না; পরন্তু যাকে আমরা পরিহার করতে চাই, তারই দিকে—সেই দুঃখেরই দিকে আমরা পরিচালিত হই।...

আহা! যদি একেবারে নির্ভীক, সাহসী ও বেপরোয়া হ'তে পারা যেত!...

তোমাদের

বিবেকানন্দ

৪৫২

১৫০২ জোন্স্ স্ট্রীট*
স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কো
৭ই মার্চ, ১৯০০

প্রিয় জো,

মিসেস বুলের পত্রে জানলাম যে, তুমি কেম্ব্রিজে আছ। হেলেনের পত্রে আরও খবর পেলাম যে, তোমায় যে গল্পগুলি পাঠানো হয়েছিল, তা তুমি পাওনি। বড়ই আপসোসের কথা। মার্গোর কাছে এর নকল আছে, সে তোমায় দিতে পারে। আমার শরীর এক-রকম চলে যাচ্ছে। টাকা নেই, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, অথচ ফল শূন্য! লস্ এঞ্জেলেসের চেয়েও খারাপ! কিছু না দিতে হ'লে তারা দল বেঁধে বক্তৃতা শুনতে আসে—আর কিছু খরচ করতে হ'লে আসে না; এই তো ব্যাপার!

দিন কয়েক যাবৎ আমার শরীর খারাপ হয়েছে এবং বড় বিশ্রী বোধ হচ্ছে। আমার বোধ হয়, রোজ রাত্রে বক্তৃতা দেবার ফলেই এ-রকম হয়েছে। আমার আশা আছে যে, ওকল্যাণ্ডের কাজের ফলে অন্ততঃ নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত ফিরে যাবার টাকা সংগ্রহ করতে পারব; আর নিউ ইয়র্কে গিয়ে ভারতে ফেরবার টাকার যোগাড় দেখব। লণ্ডনে মাস কয়েক থাকবার মতো টাকা এখানে সংগ্রহ করতে পারলে লণ্ডনেও যেতে পারি। তুমি আমায় আমাদের জেনারেল-এর ঠিকানাটা পাঠিয়ে দিও তো। নামও দেখছি আজ-কাল মনে থাকে না।

তবে আসি। প্যারিসে তোমার সঙ্গে দেখা হতেও পারে, নাও পারে। ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুন। আমি যতটা সাহায্যের যোগ্য, তুমি তার চেয়েও বেশী সাহায্য আমায় করেছ। আমার অসীম ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

৪৫৩

১৫০২ জোন্‌স্ স্ট্রীট*
স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কো
৭ই মার্চ, ১৯০০

প্রিয় ধীরামাতা,

…আপনাকে আমি আমার জন্য আর কিছু করতে বলছি না—আমার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি যা করেছেন, তাই যথেষ্ট—আমি যতটার উপযুক্ত, তার চেয়েও ঢের বেশী করেছেন।…আপনিই আমার একমাত্র বন্ধু, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবনের ধ্রুবতারারূপে গ্রহণ করেছেন; আপনাকে আমি যে এত বিশ্বাস করি, তার রহস্য ওইখানেই। অন্যেরা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ভালবাসে। কিন্তু তাদের ধারণাও নেই যে, তারা আমাকে শ্রীরামকৃষ্ণেরই জন্য ভালবাসে। তাঁকে বাদ দিলে আমি শুধু কতকগুলি অর্থহীন ও স্বার্থ-পূর্ণ ভাবুকতার বোঝা মাত্র। যাই হোক, ভবিষ্যতে কি হবে, এই দুশ্চিন্তা এবং ভবিষ্যতে কি হওয়া উচিত, এই আকাঙ্ক্ষার পীড়া বড়ই ভয়ানক। আমি সে দায়িত্বের অনুপযুক্ত—আমার অযোগ্যতা আজ ধরা পড়ে গেছে। আমাকে এ কাজ ছেড়ে দিতে হবে। এ কাজের যদি কোন নিজস্ব জীবনী শক্তি না থাকে তো মরে যাক; আর যদি থাকে, তবে আমার মতো অযোগ্য কর্মীর জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে না।…আমি সারা জীবন মায়ের কাজ করেছি। এখন তা হয়ে গেছে—আমি এখন তাঁর চরকায় তেল দিতে নারাজ। তিনি অন্য কর্মী বেছে নিন—আমি ইস্তফা দিলাম!…

আপনার চিরসন্তান
বিবেকানন্দ

৪৫৪

স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কো
মার্চ, ১৯০০

হরিভাই,

এই মিসেস বাড়ুয্যের কাছ থেকে একটা bill of lading (মাল চালানের বিল) এসেছে। সে মহিলাটি কি ডাল-চাল পাঠিয়েছে—এটা তোমায় পাঠাচ্ছি। মিঃ ওয়াল্ডোকে দিও; সে সব আনিয়ে রাখবে—যখন আসবে।

আমি আসছে সপ্তায় এস্থান ছেড়ে চিকাগোয় যাব। তারপর নিউ-ইয়র্কে আসছি।

এক-রকম আছি।...তুমি এখন কোথায় থাক? কি কর? ইত্যাদি। ইতি

বি

৪৫৫

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কো
১২ই মার্চ, ১৯০০

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার এক পত্র পূর্বে পাই। শরতের এক পত্র কাল পেয়েছি। তার জন্মোৎসবের[১] নিমন্ত্রণপত্র দেখলাম। শরতের বাতের কথা শুনে ভয় হয়। রাম রাম! খালি রোগ শোক যন্ত্রণা সঙ্গে আছে দু-বছর। শরৎকে বলো যে, আমি বেশী খাটছি না আর। তবে পেটের খাওয়ার মতো না খাটলে শুকিয়ে মরতে হবে যে!...দুর্গাপ্রসন্ন পাঁচিলের যা হয় অবশ্যই এতদিনে ক'রে দিয়েছে।...পাঁচিল তোলা কিছু হাঙ্গাম তো নয়।...পারি তো সেই জায়গাটায় একটা ছোট বাড়ি বানিয়ে নিয়ে বুড়ো দিদিমা ও মার কিছুদিন সেবা ক'রব। দুষ্কর্ম কাউকেই ছাড়ে না, মা কাউকেই সাজা দিতে ছাড়েন না। আমার কর্ম ভুগে নিলুম। এখন তোমরা সাধু মহাপুরুষ লোক—মায়ের কাছে একটু বলবে ভাই, যে আর এ হাঙ্গাম আমার ঘাড়ে না থাকে। আমি এখন চাচ্ছি একটু শান্তি; আর কাজকর্মের বোঝা বইবার শক্তি যেন নাই। বিরাম এবং শান্তি—যে কটা দিন বাঁচব, সেই কটা দিন। জয় গুরু, জয় শ্রীগুরু!...

লেকচার-ফেকচার কিছুই নয়। শান্তিঃ! মঠ-(এর) ট্রাস্ট-ডীড শরৎ পাঠিয়ে দিলেই সই ক'রে দিই। তোমরা সব দেখো। আমি সত্য সত্য বিরাম চাই। এ রোগের নাম Neurosthenia—এ স্নায়ুরোগ। এ একবার হ'লে বৎসর কতক থাকে। তবে দু-চার বৎসর একদম rest (বিশ্রাম)

---

১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

হ'লে সেরে যায়।...এ দেশ ঐ রোগের ঘর। এইখান থেকেই উনি ঘাড়ে চড়েছেন। তবে উনি মারাত্মক হওয়া দূরে থাকুক, দীর্ঘ জীবন দেন। আমার জন্য ভেবো না। আমি গড়িয়ে গড়িয়ে যাব। গুরুদেবের কাজ এগোচ্ছে না—এই দুঃখ। তাঁর কাজ কিছুই আমার দ্বারা হ'ল না—এই আপসোস! তোমাদের কত গাল দিই, কটু বলি—আমি মহা নরাধম! আজ তাঁর জন্মদিনে তোমাদের পায়ের ধুলো আমার মাথায় দাও—আমার মন স্থির হয়ে যাবে। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। ত্বমেব শরণং মম, ত্বমেব শরণং মম (তুমিই আমার শরণ, তুমিই আমার শরণ)। এখন মন স্থির আছে, ব'লে রাখি। এই চিরকালের মনের ভাব। এ ছাড়া যেগুলো আসে, সেগুলো রোগ জানবে। আর আমায় কাজ করতে একদম দিও না। আমি এখন চুপ ক'রে ধ্যান জপ ক'রব কিছুকাল—এই মাত্র। তারপর মা জানেন। জয় জগদম্বে!

বিবেকানন্দ

৪৫৬

১৭১৯ টার্ক স্ট্রীট*
স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কো
১২ই মার্চ, ১৯০০

প্রিয় ধীরামাতা,

কেম্ব্রিজ থেকে লেখা আপনার পত্রখানি কাল এসেছিল। এখন আমার একটা স্থায়ী ঠিকানা হয়েছে—১৭১৯ টার্ক স্ট্রীট, স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কো। আশা করি। এই পত্রের উত্তরে দু লাইন লেখবার সময় পাবেন।

আপনার প্রেরিত এক পাণ্ডুলিপি আমি পেয়েছি। আপনার ইচ্ছা অনুসারে আমি সেটি ফেরত পাঠিয়েছি। এ ছাড়া আমার কাছে আর কোন হিসাব নেই। সব ঠিকই আছে। লণ্ডন থেকে মিস স্টার আমায় একখানি চমৎকার চিঠি লিখেছেন। তিনি আশা করছেন যে, মিঃ ট্রাইন তাঁর সঙ্গে নৈশ আহারে যোগ দেবেন।

নিবেদিতার অর্থ-সংগ্রহের সাফল্যের সংবাদে আমি যার-পর-নাই খুশী হয়েছি। আমি তাকে আপনার হাতে সঁপে দিয়েছি এবং নিশ্চিত জানি

যে, আপনি তার দেখাশুনা করবেন। আমি এখানে আরও কয়েক সপ্তাহ আছি; তার পরেই পূর্বাঞ্চলে যাব। শুধু গরমকালের অপেক্ষায় আছি।

টাকাকড়ির দিক দিয়ে এখানে মোটেই সফল হইনি; কিন্তু অভাবও নেই। যা হোক, বরাবরের মতো আমার দিনগুলি এক-রকম চলে যাবেই; আর যদি না চলে, তাতেই বা কি? আমি সম্পূর্ণ গা ভাসিয়ে দিয়েছি।

মঠ থেকে একখানি চিঠি পেয়েছি। কাল তাদের উৎসব হয়ে গেল। আমি প্রশান্ত মহাসাগরের পথে যেতে চাই না। কোথায় যাব বা কখন যাব—এ বিষয়ে আমি মোটেই ভাবি না। আমি সম্পূর্ণ গা ভাসিয়ে দিয়েছি—মা-ই সব জানেন। আমার ভেতরে একটা বড় রকমের পরিবর্তন আসছে—আমার মন শান্তিতে ভরে যাচ্ছে। আমি জানি, মা-ই সব ভার নেবেন। আমি সন্ন্যাসিরূপেই মৃত্যু বরণ ক'রব। আপনি আমার ও আমার আত্মীয়দের জন্য মায়ের চেয়েও বেশী করেছেন। আপনি আমার অসীম ভালবাসা জানবেন আর আপনার চিরমঙ্গল হোক বিবেকানন্দের এই সতত প্রার্থনা।

দয়া ক'রে মিসেস লেগেটকে বলবেন যে, কয়েক সপ্তাহের জন্য আমার ঠিকানা হবে—১৭১৯ টার্ক ষ্ট্রীট, স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কো।

৪৫৭

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

১৭১৯ টার্ক ষ্ট্রীট, স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কো*

১২ই মার্চ, ১৯০০

প্রিয় মেরী,

কেমন আছ? মা কেমন, ভগিনীরা কেমন? চিকাগোর হালচাল কি রকম? আমি ফ্রিস্কোতে[১] আছি, মাসখানেকের মতো এখানে থাকব। এপ্রিলের প্রথম দিকে চিকাগোয় যাব। অবশ্য তার আগে তোমাকে লিখে

১ Frisco=San Francisco

জানাব। তোমাদের সঙ্গে কয়েকদিন কাটাতে খুবই ইচ্ছা, এত কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যেতে হয়। আমার স্বাস্থ্য একপ্রকার, কিন্তু মন খুব শান্ত, কিছুদিন থেকে তাই আছে। যাবতীয় দুশ্চিন্তার ভার প্রভুর কাছে সমর্পণ ক'রে দিতে চেষ্টা করছি। আমি শুধু কর্মী বইতো নয়। আদেশমত কাজ ক'রে যাওয়াই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। বাকী তিনিই জানেন।

'সব কাজকর্ম কর্তব্যধর্ম ত্যাগ ক'রে আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সর্ববিধ পাপ থেকে উদ্ধার ক'রব। দুঃখ ক'রো না।' (গীতা—১৮।৬৬)

সেটা উপলব্ধি করার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি। শীঘ্রই যেন তা করতে পারি।

সতত তোমার স্নেহশীল ভ্রাতা

বিবেকানন্দ

৪৫৮

(মিসেস লেগেটকে লিখিত)

১৭১৯ টার্ক স্ট্রীট, স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কো*

১৭ই মার্চ, ১৯০০

মা,

আপনার সুন্দর চিঠিখানা পেয়ে খুবই আনন্দিত হলাম। হ্যাঁ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বন্ধুদের সঙ্গে আমি সংযোগ রক্ষা ক'রে যাচ্ছি। তা সত্ত্বেও বিলম্বের ক্ষেত্রে কখন কখন বিচলিত হই।

ডাঃ হিলার ও মিসেস হিলার (Dr. and Mrs. Hiller) শহরে ফিরে এসেছেন; মিসেস মিল্টনের (Mrs. Milton) চিকিৎসায় তাঁরা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। আমার বেলায় (তাঁর চিকিৎসায়) বুকে অনেকগুলি বড় বড় লাল লাল দাগ ফুটে উঠেছে। আরোগ্যের ব্যাপারে কতদূর কি হয়, পরে বিস্তারিত আপনাকে জানাব। অবশ্য আমার রোগটা এমনই যে আপনা থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরতে অনেক সময় লাগবে।

আপনি এবং মিসেস এডাম্স্ যে সহৃদয়তা দেখিয়েছেন, তার জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ। চিকাগোয় গিয়ে নিশ্চয় তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসব।

আপনার সব ব্যাপার কি-রকম চলছে? এখানে আমি চুপচাপ সহ্য করার নীতি অবলম্বন ক'রে যাচ্ছি, এ পর্যন্ত ফল মন্দ হয়নি।

তিন বোনের মেজোটি মিসেস হ্যান্‌স্‌বরো (Mrs. Hansborough) এখন এখানে। সে আমাকে সাহায্য করবার জন্যে অবিরাম কাজ ক'রে চলেছে। প্রভু তাদের হৃদয় আশীর্বাদে ভরিয়ে দিন। তিনটি বোন যেন তিনটি দেবী! আহা, তাই নয় কি? এখানে ওখানে এ-ধরনের আত্মার সংস্পর্শ পাওয়া যায় বলেই জীবনের সকল অর্থহীনতার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

আপনাদের উপর চির আশীর্বাদের জন্য আমার প্রার্থনা। এও বলি, আপনিও একজন স্বর্গের দেবী। মিস কেটকে (Miss Kate) আমার ভালবাসা।

আপনার চিরসন্তান
বিবেকানন্দ

পুনঃ—'মায়ের সন্তানটি' কেমন!

মিস স্পেন্সার কেমন আছেন? তাঁকে সর্ববিধ ভালবাসা। ইতিমধ্যে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে, আমি মোটেই ভাল চিঠি-লিখিয়ে নই—কিন্তু হৃদয় ঠিক আছে। মিস স্পেন্সারকে এ কথা জানাবেন।

বি

৪৫৯

(মিসেস লেগেটকে লিখিত)

১৭১৯ টার্ক স্ট্রীট, স্যান ফ্র্যান্সিস্কো*
১৭ই, মার্চ, ১৯০০

মা,

জো-র একটি চিঠি পেলাম; সে আমাকে চার-টুকরো কাগজে স্বাক্ষর ক'রে পাঠাতে লিখেছে, যাতে আমার হয়ে মিঃ লেগেট আমার টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখতে পারেন। তার কাছে যথাসময়ে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয় বলে, কাগজগুলি আপনার কাছে পাঠালাম।

আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে, কিছু কিছু টাকাপয়সাও হচ্ছে। বেশ সন্তুষ্ট আছি। আপনার আবেদনে যে আরও বেশী লোক সাড়া দেয়নি, তার জন্য আমি মোটেই দুঃখিত নই। জানতাম, তারা সাড়া দেবে না।

কিন্তু আপনার সহৃদয়তার জন্য আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব। আমার শুভেচ্ছা চিরকাল আপনাদের ঘিরে থাকুক।

আমার নামে চিঠিপত্র—১২৩১নং পাইন স্ট্রীটে 'হোম অব্ ট্রুথ' (Home of Truth)-এর ঠিকানায় পাঠালে ভাল হয়। আমি ঘুরে বেড়ালেও সেটি একটি স্থায়ী আস্তানা, এবং সেখানকার লোকেরা আমার প্রতি সদয়।

আপনি এখন খুব ভাল আছেন জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মিসেস ব্লজেট জানিয়েছেন যে, মিসেস মিল্টন লস এঞ্জেলেস্ ছেড়ে চলে গিয়েছেন! তিনি নিউ ইয়র্কে গিয়েছেন কি? ডক্টর হিলার ও মিসেস হিলার গত পরশু স্যান ফ্র্যান্সিস্কো ফিরে এসেছেন; তাঁরা বলছেন, মিসেস মিল্টনের চিকিৎসায় তাঁরা খুবই উপকৃত হয়েছেন। মিসেস হিলার অল্পদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের আশা করছেন।

এখানে এবং ওকল্যাণ্ডে ইতিমধ্যে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছি। ওকল্যাণ্ডের বক্তৃতাগুলিতে ভাল টাকাই পাওয়া গেছে। স্যান ফ্র্যান্সিস্কোয় প্রথম সপ্তাহে কিছু পাওয়া যায়নি, এ সপ্তাহে পাওয়া যাচ্ছে। আগামী সপ্তাহেও কিছু আশা আছে। বেদান্ত সোসাইটির জন্য মিঃ লেগেট চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন জেনে আমি খুবই আনন্দিত। সত্যি, তিনি এত সহৃদয়।

আপনার

বিবেকানন্দ

পুঃ—তুরীয়ানন্দের বিষয়ে আপনি কিছু জানেন কি? সে কি সম্পূর্ণ নিরাময় হয়েছে? বি

৪৬০

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

১৭১৯ টার্ক স্ট্রীট, স্যান ফ্র্যান্সিস্কো*

২২শে মার্চ, ১৯০০

প্রিয় মেরী,

তোমার সহৃদয় চিঠির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। তুমি ঠিকই বলেছ যে, ভারতবাসীদের বিষয় ছাড়া আমার আরও অনেক কিছু চিন্তা করবার আছে,

কিন্তু গুরুদেবের কাজই আমার জীবনের প্রধান কর্তব্য, তার তুলনায় ঐসবই গৌণ।

এই আত্মত্যাগ যদি সুখকর হ'ত! তা হয় না, ফলে স্বভাবতই কখন কখন মনে তিক্ততা আসে; কিন্তু জেনো মেরী, আমি এখনও মানুষই আছি—এবং নিজের সব কিছু একেবারে ভুলে যেতে পারি না; আশা করি, একদিন তা পারব। আমার জন্য প্রার্থনা ক'রো।

আমার বিষয়ে বা অন্য বিষয়ে মিস ম্যাকলাউড বা মিস নোবল্ বা অন্য কারও মতামতের জন্য আমি অবশ্যই দায়ী হ'তে পারি না। পারি কি? কেউ সমালোচনা করলে তুমি কখনই আমাকে বেদনা অনুভব করতে দেখনি।

দীর্ঘকালের জন্য তুমি ইওরোপ যাচ্ছ জেনে আনন্দিত হলাম। লম্বা পাড়ি দাও—অনেকদিন তো পোষা পায়রার মতো কাটালে।

আর আমার কথা যদি বলো, আমি এই অবিরাম ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তাই ঘরে ফিরে শান্তিতে কাটাতে চাই। আর কাজ করতে চাই না। জ্ঞানতপস্বীর মতো নির্জনে জীবন যাপন করাই আমার স্বভাব। সে অবসর কখনও জুটলো না! প্রার্থনা করি, এবার তা যেন পাই। এখন আমি ভগ্নস্বাস্থ্য, কর্মক্লান্ত! হিমালয়ের আশ্রম থেকে যখনই মিসেস সেভিয়ারের কোন চিঠি পাই, তখনই ইচ্ছা হয়—যেন সেখানে উড়ে চলে যাই। প্রতিনিয়ত প্ল্যাটফর্মে বক্তৃতা ক'রে, অবিরত ঘুরে বেড়িয়ে আর নিত্যনতুন মুখ দেখে দেখে আমি একেবারে ক্লান্ত।

চিকাগোতে ক্লাস করার ব্যাপার নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। ফ্রিস্কোতে টাকা পাচ্ছি এবং শীঘ্রই দেশে ফেরার টাকা যোগাড় ক'রে উঠতে পারব।

তুমি ও অন্যান্য ভগিনীরা কেমন আছ? এপ্রিলের প্রথম দিকে কোন সময়ে চিকাগো যাব—আশা করি।

তোমাদের

বিবেকানন্দ

৪৬১

স্যান ফ্র্যান্সিস্কো*
২৫শে মার্চ, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

আমি আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি এবং ক্রমশঃ বল পাচ্ছি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, খুব শীঘ্রই যেন মুক্তি পাব। গত দু-বছরের যন্ত্রণারাশি আমাকে প্রভূত শিক্ষা দিয়েছে। ব্যাধি ও দুর্ভাগ্য পরিণামে আমাদের কল্যাণই সাধন করে, যদিও তখনকার জন্য মনে হয়, বুঝি আমরা একেবারে ডুবে গেলাম।

আমি যেন ঐ অসীম নীলাকাশ; মাঝে মাঝে সে আকাশে মেঘ পুঞ্জীভূত হলেও আমি সর্বদা সেই অসীম নীল আকাশই রয়েছি।

আমি এখন সেই শাশ্বত শান্তির আস্বাদের জন্য লালায়িত, যা আমার এবং প্রত্যেক জীবের ভিতরে চিরদিন রয়েছে। এই হাড়মাসের খাঁচা এবং সুখদুঃখের মিথ্যা স্বপ্ন—এগুলি আবার কি? আমার স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে। ওঁ তৎ সৎ।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৪৬২

১৭১৯ টার্ক স্ট্রীট, স্যান ফ্র্যান্সিস্কো *
২৮শে মার্চ, ১৯০০

নিবেদিতা,

আমি তোমার সৌভাগ্যে খুব আনন্দিত হলাম। আমরা যদি লেগে থাকি, তবে অবস্থা ফিরবেই ফিরবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার যত টাকার দরকার, তা এখানে বা ইংলণ্ডে পাবে।

আমি খুব খাটছি—আর যত বেশী খাটছি, ততই ভাল বোধ করছি। শরীর অসুস্থ হয়ে আমার একটা বিশেষ উপকার হয়েছে, নিশ্চয়। আমি এখন ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি, অনাসক্তি মানে কি আর আমার আশা—অতি শীঘ্রই আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হবো।

আমরা আমাদের সমুদয় শক্তি একদিকে প্রয়োগ ক'রে একটা বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়ি; আর এই ব্যাপারেরই আর যে একটা দিক আছে, যেটা সমভাবে কঠিন হলেও সেটির দিকে আমরা খুব কমই মনোযোগ দিয়ে থাকি—সেটি হচ্ছে, মুহূর্তের মধ্যে কোন বিষয় থেকে অনাসক্ত হবার, নিজেকে আলগা ক'রে নেবার শক্তি। এই আসক্তি ও অনাসক্তি—দুই-ই যখন পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, তখন মানুষ মহৎ ও সুখী হয়।

আমি মিসেস লেগেটের ১০০০ ডলার দানের সংবাদ পেয়ে বড়ই সুখী হলাম। সবুর কর, তাঁর ভিতর দিয়ে যা কাজ হবার, সেইটা এখন প্রকাশ হচ্ছে। তিনি জানুন আর নাই জানুন, রামকৃষ্ণের কাজে তাঁকে এক মহৎ অংশ গ্রহণ করতে হবে।

তুমি অধ্যাপক গেডিসের যে বিবরণ লিখেছ, তা পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। জো-ও একজন অলৌকিকদৃষ্টিসম্পন্ন (clairvoyant) লোকের সম্বন্ধে বড় মজার বিবরণ লিখেছে।

সব বিষয় এখন আমাদের অনুকূল হ'তে শুরু করেছে। আমি যে অর্থ সংগ্রহ করছি, তা যথেষ্ট না হলেও উপস্থিত কাজের পক্ষে মন্দ নয়।

আমার মনে হয়, এ পত্রখানি তুমি চিকাগোয় পাবে। ইতিমধ্যে জো ও মিসেস বুল নিশ্চয়ই যাত্রা করেছেন।[১] জো-এর চিঠি ও টেলিগ্রামে তাদের আসার দিন সম্বন্ধে এত গরমিল ছিল যে, তা পড়ে বেশ একটু ফাঁপরে পড়েছিলাম।...

মিস সুটার-এর বিশেষ বন্ধু সুইস যুবক ম্যাক্স গেসিক-এর কাছ থেকে একখানি সুন্দর চিঠি পেয়েছি। মিস সুটারও আমায় তাঁর ভালবাসা জানিয়েছেন, আর তাঁরা আমার কাছে জানতে চেয়েছেন, আমি কবে ইংলণ্ডে যাচ্ছি। তাঁরা লিখছেন, সেখানে অনেকে ঐ বিষয়ে খবর নিচ্ছে।

সব জিনিসকেই ঘুরে আসতে হবে—বৃক্ষরূপে বিকশিত হ'তে হ'লে বীজকে কিছুদিন মাটির নীচে পড়ে পচতে হবে। গত দু-বছর চলছিল যেন এইরূপ মাটির নীচে পচা। মৃত্যুর করালগ্রাসে পড়ে আগেও যখনই আমি ছটফট করেছি, তার পরেই সমগ্র জীবনটা যেন প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এইরূপে একবার রামকৃষ্ণের কাছে উপনীত হই, আর একবার ঐরূপ হবার

১ পরবর্তী পত্রপাঠে মনে হয়, এ সময় তাঁহাদের যাওয়া হয় নাই।

পর যুক্তরাষ্ট্রে আসতে হ'ল। শেষটিই হয়েছে অন্য সবগুলির মধ্যে বৃহৎ ব্যাপার। সে-ভাব এখন চলে গেছে—এখন আমি এমন স্থির শান্ত হয়ে গেছি যে, আমার সময়ে সময়ে নিজেরই আশ্চর্য বোধ হয়। আমি এখন সকাল-সন্ধ্যা খুব খাটি, যখন যা পাই খাই, রাত্রি বারটায় শুতে যাই, আর কি গভীর নিদ্রা! আগে কখনও আমার এমন ঘুমোবার শক্তি ছিল না। তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

৪৬৩

১৭১৯ টার্ক স্ট্রীট, স্যান ফ্র্যান্সিস্কো*
৩০শে মার্চ, ১৯০০

প্রিয় জো,

বইগুলি শীঘ্র পাঠিয়েছ ব'লে তোমায় অশেষ ধন্যবাদ। আমার বিশ্বাস, এগুলি খুব তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়ে যাবে। নিজের পরিকল্পনা বদলানো সম্বন্ধে তুমি দেখছি আমার চেয়েও খারাপ। এখনও 'প্রবুদ্ধ ভারত' এল না কেন বুঝতে পাচ্ছি না। আমার আশঙ্কা, আমার ডাকের চিঠিপত্র খুবই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমি খুব খাটছি, কিছু টাকা সংগ্রহ করছি, আর স্বাস্থ্যও অপেক্ষাকৃত ভাল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটুনি; তার পর পেটভরা নৈশভোজনান্তে ১২টায় শয্যাগ্রহণ!—এবং পায়ে হেঁটে সারা শহর বেড়ানো! আর সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতি!

মিসেস মিণ্টন তা হ'লে ওখানেই আছেন। তাঁকে আমার ভালবাসা জানাবে। জানাবে তো? তুরীয়ানন্দের পা কি ভাল হয়নি?

মিসেস বুলের ইচ্ছা অনুসারে আমি মার্গোর চিঠিগুলি তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছি। মিসেস লেগেট মার্গোকে কিছু দান করেছেন জেনে বড়ই আনন্দ পেলাম। যেমন করেই হোক সব জিনিসের একটা সুরাহা হতেই হবে—তা হ'তে বাধ্য, কারণ কোন কিছুই শাশ্বত নয়।

সুবিধা দেখলে এখানে আরও দু-এক সপ্তাহ আছি; তারপর স্টকটন নামে একটা কাছাকাছি জায়গায় যাব, তার পর—জানি না। যেমন করেই

হোক চলে যাচ্ছে। আমি বেশ শান্তিতে ও নিঝঞ্ঝাটে আছি। আর কাজ-কর্ম যেমন চলে থাকে, তেমনি চলে যাচ্ছে। আমার ভালবাসা জানবে।
ইতি বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—পরিবর্তনাদি সহ 'কর্মযোগ' বইখানি সম্পাদনার জন্য মিস ওয়াল্ডোই হচ্ছেন ঠিক লোক।

বি

৪৬৪

১৭১৯ টার্ক স্ট্রীট, স্যান ফ্র্যান্সিস্কো*
এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় জো,

তোমার ফ্রান্স যাত্রার আগে এক ছত্র লিখছি। ইংলণ্ড হয়ে যাচ্ছ কি? মিসেস সেভিয়ারের কাছ থেকে একখানা সুন্দর চিঠি পেয়েছি।...

লস এঞ্জেলেস্ থেকে এখানে শারীরিক ভাল নয়, কিন্তু মানসিক অনেক ভাল আছি,—সবল ও শান্তিপূর্ণ। আশা করি, এ অবস্থা বজায় থাকবে।

তোমার কাছ থেকে আমার চিঠির উত্তর পাইনি, শীঘ্রই পাব আশা করছি। আমার নামে ভারতের একখানা চিঠি ভুল ক'রে মিসেস হুইলারের ঠিকানায় চলে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তা আমার কাছে ঠিকমত এসে পৌছেছে। সারদানন্দের কাছ থেকে সুন্দর সব বিবরণ পেয়েছি, তারা সেখানে চমৎকার কাজ চালাচ্ছে। ছেলেরা কাজে লেগে গেছে; দেখছ তো, ধমকানির দুটি দিকই আছে, এর ফলে তারা উঠে পড়ে লেগেছে।

আমরা ভারতবাসীরা এত দীর্ঘদিনের জন্য এমনই পরনির্ভরশীল ছিলাম যে, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তাদের সক্রিয় ক'রে তুলতে হ'লে বেশ কিছু কড়া কথার দরকার। একজন কুঁড়ের শিরোমণি এ বছরের জন্মতিথি উৎসবের ভার নিয়েছিল, এবং সে ভালভাবেই তা সম্পন্ন করেছে। আমার সাহায্য ছাড়াই তারা নিজেরাই দুর্ভিক্ষে সেবার পরিকল্পনা করেছে এবং সাফল্যের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

তারা নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়েছে। তা দেখে আমি সত্যি খুশী! দেখ জো, মা-ই কাজ করছেন।

মিস থার্সবির (Miss Thursby) চিঠি আমি মিসেস হার্স্টকে (Mrs. Hears') পাঠিয়ে দিয়েছি। তাঁর গানের আসরে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি যেতে পারিনি। বিশ্রী ঠাণ্ডা লেগেছিল। এই হ'ল ব্যাপার।…

জানি না, চিকাগো যাবার ভাড়া ফ্রিস্কোতে তুলতে পারব কি না। ওকল্যাণ্ডের কাজ সফল হয়েছে। ওখান থেকে ১০০ ডলার পাব, বস্। যাই হোক, আমি সন্তুষ্ট। আমি যে চেষ্টা করেছি, সেইটাই বড় কথা।…

চৌম্বক চিকিৎসক আমার কিছু করতে পারল না। যাই হোক, আমার চলে যাবে। কীভাবে যাবে তা নিয়ে ব্যস্ত নই।.. খুব শান্তিতে আছি। লস্ এঞ্জেলেস্ থেকে খবর পেলাম যে, মিসেস লেগেট আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এটা কতটা সত্য, তা জানবার জন্য নিউ ইয়র্কে 'তার' করেছি। শীঘ্রই উত্তর পাব, আশা করি।

আচ্ছা, যখন লেগেটরা ও-পারে (ইওরোপে) চলে যাবেন, তখন আমার চিঠিপত্রের কী ব্যবস্থা হবে? সেগুলি ঠিকমত আমার কাছে পৌছবে, এমন ব্যবস্থা হবে তো?

আর কিছু লেখবার নেই, তোমাদের জন্য ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা, সে তো তুমি জানোই। আমি যতটুকুর উপযুক্ত, তার চেয়ে তুমি অনেক বেশী করেছ। প্যারিসে যেতে পারব কিনা জানি না, কিন্তু মে মাসে ইংলণ্ডে অবশ্যই যাব। আরও কয়েক সপ্তাহ ইংলণ্ডকে পরখ না ক'রে দেশে ফিরছি না। ভালবাসা জেনো।

সতত প্রভুসমীপে তোমার

বিবেকানন্দ

পুনঃ—মিসেস হ্যান্স্‌বরো (Hansborough) এবং মিসেস এপেন্মুল (Mrs. Appenul) ১৭১৯ নং টার্ক স্ট্রীটে এ মাসের জন্য একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আছি এবং কয়েক সপ্তাহ থাকব।

বি

৪৬৫

১৭১৯ টার্ক স্ট্রীট, স্যান ফ্র্যান্সিস্কো*
১লা এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় ধীরামাতা,

আপনার স্নেহপূর্ণ চিঠিখানি আজ সকালে পেলাম। নিউ ইয়র্কের সব বন্ধুরা মিসেস মিল্টনের (হাতঘসা) চিকিৎসায় আরোগ্য হচ্ছেন জেনে ভারি আনন্দ হ'ল। লস্ এঞ্জেলেসে তিনি খুবই বিফল হয়েছিলেন ব'লে মনে হয়; কারণ আমরা যাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম, তারা সবাই আমাকে তাই বলেছে অনেকে হাতঘসার আগে যা ছিলেন, তার চেয়েও খারাপ বোধ করছেন। মিসেস মিল্টনকে আমার ভালবাসা জানাবেন। তাঁর চিকিৎসায় আমি অন্ততঃ সাময়িক উপকার পেতাম। বেচারা ডাক্তার হিলার! আমরা তাকে তড়িঘড়ি লস্ এঞ্জেলেসে পাঠিয়েছিলাম তার স্ত্রীকে আরাম করার জন্য। সেদিন সকালে তার সঙ্গে আপনার দেখা ও আলাপ হ'লে বেশ হ'ত। সমস্ত ডলাই-মলাইয়ের পরে মিসেস হিলারের অবস্থা মনে হচ্ছে, আগের চেয়ে বেশী খারাপ হয়ে গেছে —তার হাড় ক-খানি সার হয়েছে, তা ছাড়া ডাক্তার হিলারকে লস্ এঞ্জেলেসে ৫০০ ডলার খরচ করতে হয়েছে, আর তাতে তাঁর মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। আমি অবশ্য জো-কে এত সব লিখতে চাই না। গরীব রোগীদের যে এতখানি সাহায্য করতে পারছে, এই কল্পনায় সে মশগুল। কিন্তু হায়! সে যদি লস্ এঞ্জেলেসের লোকদের ও এই বুড়ো ডাক্তার হিলারের মত শুনতে পেত, তবে সে সেই পুরানো কথার মর্ম বুঝতে পারত যে, কারও জন্য দাওয়াই বাতলাতে নেই। ডাক্তার হিলারকে এখান থেকে লস্ এঞ্জেলেসে পাঠানোর দলে যে আমি ছিলাম না, এই ভেবেই আমি খুশী। জো আমাকে লিখেছে যে, তার কাছ থেকে এই রোগ-আরামের খবর পেয়েই ডাক্তার হিলার সাগ্রহে লস্ এঞ্জেলেসে যাবার জন্য তৈরী হয়েছিলেন। সে বুড়ো ভদ্রলোক আমার ঘরে সাগ্রহে যেমন লাফিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তা দেখাও জো-র উচিত ছিল। ৫০০ ডলার খরচ বুড়োর পক্ষে বড় বেশী হয়ে গেছে। তিনি জার্মান, লাফিয়ে বেড়ান, নিজের পকেট চাপড়ান আর বলেন, এই চিকিৎসার বোকামি না হ'লে আপনিই তো ৫০০ ডলার পেতে পারতেন? এ ছাড়া গরীব রোগীরা তো সব আছেই—যারা ডলাই-মলাইয়ের জন্য কখনও বা প্রত্যেকে ৩ ডলার খরচ

করেছে, আর এখন জো-ও আমাকে বাহবা দিচ্ছে! জো-কে এ-কথা বলবেন না। তার ও আপনার যে-কোন লোকের জন্য টাকা খরচ করবার যথেষ্ট সংস্থান রয়েছে। জার্মান ডাক্তারের সম্বন্ধেও তাই বলা চলে। কিন্তু নিরীহ গরীব বেচারাদের পক্ষে এটা বড় কঠিন ব্যাপার। বুড়ো ডাক্তারের এখন বিশ্বাস জন্মেছে যে, সম্প্রতি কতকগুলো ভূত-প্রেত মিলে তাঁর সাংসারিক ব্যাপার সব লণ্ড-ভণ্ড ক'রে দিচ্ছে। তিনি আমাকে অতিথিরূপে রেখে এর একটা প্রতিকারের ও তাঁর স্ত্রীর আরোগ্যের খুব আশা করেছিলেন; কিন্তু তাঁকে দৌড়াতে হ'ল লস্ এঞ্জেলেসে, আর তার ফলে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। আর এখন যদিও তিনি আমাকে তাঁর অতিথিরূপে পাবার জন্য খুবই চেষ্টা করছেন, আমি কিন্তু পাশ কাটিয়ে চলেছি—ঠিক তাঁর কাছ থেকে নয়, তাঁর স্ত্রী ও শ্যালিকার কাছ থেকে। তাঁর নিশ্চিত ধারণা যে, এ-সব ভূতুড়ে ব্যাপার! তিনি থিওসফি আলোচনা ক'রে থাকেন। আমি তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, মিস ম্যাকলাউডকে লিখে দিতে—কোথাও থেকে তাঁর জন্য একটি ভূতের ওঝা যোগাড় করতে, যাতে তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সেখানে ছুটে গিয়ে আবার ৫০০ ডলার খরচ করতে পারেন!

অন্যের মঙ্গল করা সব সময়ে নির্ঝঞ্ঝাট নয়।

আমার নিজের কথা বলতে গেলে, জো যতক্ষণ খরচ যোগায়, আমি ততক্ষণ মজা পেতে রাজী আছি—হাড়-মটকানো বা ডলাই-মলাইওয়ালা—যাদের কাছেই হোক না কেন! কিন্তু ডলাই-মলাই করাবার জন্য এ-সব লোককে যোগাড় ক'রে পালিয়ে যাওয়া এবং সব প্রশংসার বোঝাটা আমার ঘাড়ে তুলে দেওয়া—এ কাজটা জো-র ভাল হয়নি! সে যে বাইরের কাউকে ডলাই-মলাইয়ের জন্য নিয়ে আসছে না—এতে আমি খুশী আছি। তা না হ'লে জো-কে প্যারিসে চলে যেতে হ'ত, আর মিসেস লেগেটকে সব প্রশংসা কুড়াবার ভার নিতে হ'ত। আমি জো-র ত্রুটি সংশোধনের জন্য ডাক্তার হিলারের কাছে একজন ক্রিশ্চান সায়ান্সপন্থী (অর্থাৎ মনোবলের সাহায্যে) রোগনিরাময়কারীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম; কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাকে দেখেই দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন—এবং জানিয়ে দিলেন যে, এ-সব অদ্ভুত চিকিৎসার সঙ্গে তিনি কোন সম্পর্ক রাখবেন না। যাই হোক, আমি বিশ্বাস করি ও সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, এবার

মিসেস লেগেট সেরে উঠুন। তাঁর কামড়টা কিসের, তা কি পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে?

আমি আশা করি, উইলখানি তাড়াতাড়িই আসবে; ও-বিষয়ে আমি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। আমি আশা করেছিলাম, ভারত থেকে ট্রাস্টের একখানি খসড়াও এই ডাকেই আসবে। কিন্তু কোন কিছু আসেনি; এমন কি 'প্রবুদ্ধ ভারত'ও আসেনি—যদিও তা স্যান ফ্র্যান্সিস্কোতে পৌঁছে গেছে, দেখতে পাচ্ছি।

সেদিন কাগজে পড়লাম, কলকাতায় এক সপ্তাহে ৫০০ লোক প্লেগে মরছে! মা-ই জানেন কিসে মঙ্গল হবে।

মিঃ লেগেট দেখছি বেদান্ত সমিতিটাকে চালু ক'রে দিয়েছেন। চমৎকার!

ওলিয়া কেমন আছে? নিবেদিতা কোথায়? সেদিন আমি তাকে 21 W. 34 (st.), N. Y.—এই ঠিকানায় একখানি পত্র লিখেছি। সে কাজে এগিয়ে চলেছে দেখে আমি খুব খুশী। আমার আন্তরিক ভালবাসা জানবেন।

আপনার চিরসন্তান

বিবেকানন্দ

পুনঃ—আমার পক্ষে যতটা কাজ করা সম্ভব, ততটা বা তার চেয়েও বেশী কাজ পাচ্ছি। যেমন করেই হোক, আমি আমার পথের খরচ যোগাড় ক'রব। ওরা আমায় বেশী দিতে না পারলেও কিছু কিছু দেয়। অবিরাম পরিশ্রম ক'রে কোন রকমে আমি আমার পাথেয় যোগাড় করতে পারব, বাড়তিও কয়েক শত কিছু পাব। সুতরাং আপনি আমার জন্য মোটেই চিন্তিত হবেন না।

বি

৪৬৬

স্যান ফ্র্যান্সিস্কো*

৬ই এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

শুনে সুখী হলাম, তুমি ফিরেছ—আরও সুখী হলাম, তুমি প্যারিসে যাচ্ছ শুনে। আমি অবশ্য প্যারিসে যাব, তবে কবে জানি না।

মিসেস লেগেট বলছেন, আমার এখনই রওনা হওয়া উচিত ও ফরাসী ভাষা শিখতে লেগে যাওয়া উচিত। আমি বলি, যা হবার হবে—সুতরাং তুমি তাই কর। তোমার বইখানা শেষ ক'রে ফেলো ও তারপর আমরা প্যারিসে ফরাসীদের জয় করতে যাচ্ছি। মেরী কেমন আছে? তাকে আমার ভালবাসা জানাবে। আমার এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। মেরী ওখানে থাকলে আমি দিন পনেরর ভেতর চিকাগোয় যাচ্ছি; মেরী শীঘ্রই পূর্বাঞ্চলে যাচ্ছে। ইতি

আশীর্বাদক

বিবেকানন্দ

মন সর্বব্যাপী। যে-কোন স্থান থেকে এর স্পন্দন শোনা যেতে পারে এবং অনুভব করা যেতে পারে।

বি

৪৬৭

(জনৈক আমেরিকান বন্ধুকে লিখিত)

স্যান ফ্র্যান্সিস্কো*

৭ই এপ্রিল, ১৯০০

কিন্তু এখন আমি এত স্থির ও প্রশান্ত হয়ে গেছি, আগে কখনও এমনটি ছিলাম না। আমি এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মহানন্দে খুব খাটছি। কর্মেই আমার অধিকার, বাকী মা জানেন।

দেখ, এখানে যতদিন থাকব ব'লে মনে করেছিলাম, তার চেয়ে বেশী দিন থেকে কাজ করতে হবে দেখছি। সেজন্য বিচলিত হয়ো না; আমার সব সমস্যার সমাধান আমিই ক'রব। আমি এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি, আলোও দেখতে পাচ্ছি। হয়তো সফলতা আমাকে বিপথগামী ক'রত এবং আমি যে সন্ন্যাসী—এই সত্যটাই হয়তো মনে রাখতে পারতাম না। তাই 'মা' আমাকে এই অভিজ্ঞতা দিচ্ছেন।

আমার তরী ক্রমশঃ সেই শান্তির বন্দরের নিকটবর্তী হচ্ছে, যেখান থেকে সে আর বিতাড়িত হবে না। জয়, জয় মা। আর আমার নিজের কোন আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চাভিলাষ নাই। মায়েরই নাম ধন্য হউক। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাস। আমি যন্ত্র মাত্র—আর কিছু জানি না, জানবার আকাঙ্ক্ষাও নেই। 'ওয়া গুরুজী কী ফতে।' জয়, শ্রীগুরুমহারাজজী কী জয়।

৪৬৮

(মিসেস লেগেটকে লিখিত)

১৭১৯ টার্ক স্ট্রীট, স্যান ফ্র্যান্সিস্কো*

৭ই এপ্রিল, ১৯০০

মা,

ক্ষতের কারণ সম্পূর্ণ দূর হয়েছে, এই খবর পেয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবার যে আপনি সম্পূর্ণ সেরে উঠবেন, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

আপনার অত্যন্ত সহৃদয় পত্রখানিতে খুব উৎসাহ পেয়েছি। আমায় সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে এল কি না এল, তা নিয়ে আমি কিছু মনে করি না। ধীরে ধীরে শান্ত ও উদ্বেগশূন্য হয়ে উঠছি।

মিসেস মিল্টনকে দয়া ক'রে আমার আন্তরিক প্রীতি জানাবেন। শেষ পর্যন্ত আমি নিশ্চয়ই সেরে উঠব। মূলতঃ আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে, যদিও মাঝে মাঝে রোগের পুনরাক্রমণ ঘটে। তবে এ আক্রমণগুলি স্বল্প-কালস্থায়ী—তীব্রতাও কম।

তুরীয়ানন্দ ও সিরিকে (Siri) চিকিৎসা করানো আপনার পক্ষে উপযুক্তই হয়েছে। আপনার মহৎ হৃদয়ের জন্য ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করেছেন। সর্ববিধ আশীর্বাদ নিরন্তর আপনাকে ঘিরে থাকুক।

ফ্রান্সে গিয়ে ফরাসীদের মধ্যে কাজ করা যে উচিত, তা খুবই সত্যি। জুলাই মাসে বা তার আগেই ফ্রান্সে পৌঁছবার আশা করছি। 'মা'ই জানেন। সর্বকল্যাণ আপনি লাভ করুন—আপনার সন্তান বিবেকানন্দের নিরন্তর এই প্রার্থনা।

৪৬৯

১৭১৯ টার্ক স্ট্রীট, স্যান ফ্র্যান্সিস্কো*

৮ই এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় ধীরামাতা,

এই সঙ্গে অভেদানন্দের একখানি সুদীর্ঘ চিঠি পাঠালাম।...সে আমার আদেশের অপেক্ষা করছে। আমি তাকে বলেছি যে, সে যেন সব বিষয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এবং আমি না আসা পর্যন্ত নিউ ইয়র্কে থাকে।

আমার বোধ হয়, নিউ ইয়র্কের বর্তমান পরিস্থিতিতে ওরা আমাকে ওখানে চায়; আপনিও কি তাই মনে করেন? তা হ'লে শীঘ্রই আসব। আমার পাথেয়ের জন্য যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ করছি। পথে চিকাগো ও ডেট্রয়েটে নামব। অবশ্য ততদিনে আপনি চলে যাবেন।

অভেদানন্দ এ-যাবৎ ভাল কাজ করেছে; আর আপনি জানেন, আমি আমার কর্মীদের কাজে মোটেই হস্তক্ষেপ করি না। যে কাজের লোক, তার একটা নিজস্ব ধারা থাকে এবং তাতে কেউ হাত দিতে গেলে সে বাধা দেয়। তাই আমি আমার কর্মীদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিই। অবশ্য আপনি কার্য-ক্ষেত্রেই রয়েছেন এবং সব জানেন। কি করা উচিত, এ বিষয়ে আমায় উপদেশ দেবেন।

কলকাতায় প্রেরিত টাকা যথাসময়ে পৌঁছেছে।…

আমি ক্রমেই সুস্থ হচ্ছি, এমন কি পাহাড়-চড়াইও করতে পারি। মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য খারাপ হয়, কিন্তু অসুস্থতার স্থিতিকাল ক্রমেই কমে আসছে। মিসেস মিলটনকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সিরি গ্র্যানেণ্ডার একখানি ছোট্ট চিঠি লিখেছে। তাকে বিশ্বাস করেছি দেখে বালিকাটি খুব কৃতজ্ঞ—ঠিক যেন মিসেস লেগেটের মতো! চমৎকার, ভাল হাতে পড়লে টাকা জিনিসটা তেমন খারাপ নয়। আমি খুবই আশা করি যে, সিরি সম্পূর্ণ সেরে উঠুক—বেচারী!

প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে এ জায়গা ছাড়ব। প্রথমে স্টার ক্লোন্ নামে একটা জায়গায় যাব এবং তার পরে পূর্বাঞ্চলে যাত্রা ক'রব। হয়তো ডেনভারেও যাব।

জো-কে আন্তরিক ভালবাসা জানাচ্ছি। ইতি

আপনার চিরসন্তান
বিবেকানন্দ

পুনঃ—শেষ পর্যন্ত আমি সেরে উঠব, এ বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নেই। আমি স্টীম ইঞ্জিনের মতো কেমন কাজ ক'রে চলেছি—রাঁধছি, যা খুশী খাচ্ছি এবং তা সত্ত্বেও বেশ ঘুমুচ্ছি এবং ভাল আছি—এ আপনার দেখা উচিত ছিল!

আমি কিছু লিখিনি এ-যাবৎ, কারণ সময় নেই। মিসেস লেগেট ভাল হয়েছেন এবং স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করছেন জেনে আনন্দ হ'ল। তিনি শীঘ্র নিরাময় হউন—এই আমার আশা ও প্রার্থনা। ইতি

বি

পুনঃ—মিসেস সেভিয়ারের একখানি সুন্দর পত্রে জানলাম যে, তাঁরা বেশ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কলকাতায় ভয়ানক প্লেগ শুরু হয়েছে; কিন্তু এবার তা নিয়ে কোন হইচই নেই। ইতি

বি

৪৭০

১৭১৯ টার্ক স্ট্রীট, স্যান ফ্র্যান্সিস্কো*
১০ই এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় জো,

নিউ ইয়র্কে একটা জটলা হচ্ছে দেখছি। অ... আমায় একখানি চিঠিতে জানিয়েছে যে, সে নিউ ইয়র্ক ছেড়ে চলে যাবে। সে ভেবেছে, মিসেস বুল ও তুমি তার বিরুদ্ধে আমাকে অনেক কিছু লিখেছ। উত্তরে আমি তাকে ধৈর্য ধরে থাকতে লিখেছি, আর জানিয়েছি যে, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড আমাকে তার সম্বন্ধে শুধু ভাল কথাই লিখেন।

দেখ জো-জো, এইসব হুজ্জতের বিষয়ে আমার রীতি তো তোমার জানাই আছে—তা হচ্ছে, সমস্ত হুজ্জত এড়িয়ে চলা। 'মা'ই এই সবের ব্যবস্থা করেন। আমার কাজ শেষ হয়েছে। জো, আমি ছুটি নিয়েছি। 'মা' এখন নিজেই তাঁর কাজ চালাবেন। এই তো বুঝি!

এখন, তুমি যেমন পরামর্শ দিয়ে থাকো—আমি এখানে যা কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছি, সব পাঠিয়ে দেবো। আজই পাঠাতে পারতাম, কিন্তু হাজার পুরাবার অপেক্ষায় আছি। এই সপ্তাহ শেষ হবার আগেই স্যান ফ্র্যান্সিস্কোতে এক হাজার পুরো করবার আশা রাখি। আমি নিউ ইয়র্কের নামে একখানি ড্রাফ্‌ট কিনব, কিংবা ব্যাঙ্ককেই যথার্থ ব্যবস্থা করতে ব'লব।

মঠ ও হিমালয় থেকে অনেক চিঠি এসেছে। আজ সকালে স্বরূপানন্দের এক চিঠি পেলাম; কাল মিসেস সেভিয়ারের একখানি এসেছে।

মিস হ্যান্‌স্‌বরোকে ফটোগ্রাফগুলির কথা বলেছি। মিঃ লেগেটকে আমার নাম ক'রে বেদান্ত সোসাইটির ব্যাপারটার যথোচিত সমাধান করতে বলো।

এইটুকু শুধু আমি বুঝেছি যে, প্রতি দেশেই সেই দেশের নিজস্ব ধারা আমাদের মেনে চলতে হবে। সুতরাং তোমার কাজ যদি আমায় করতে হ'ত, তা হ'লে আমি সমস্ত সভ্য ও সমর্থকদের এক সভা আহ্বান ক'রে জিজ্ঞাসা করতাম তাঁরা কি করতে চান, কোন সংহতি চান কিনা, যদি চান তবে তা কিরূপ হওয়া আবশ্যক, ইত্যাদি। তুমি কিন্তু কাজটি নিজের চেষ্টায় কর। আমি রেহাই চাই। একান্তই যদি মনে কর যে, আমি উপস্থিত থাকলে সাহায্য হবে, তবে আমি দিন পনেরর মধ্যে আসতে পারব। আমার ওখানকার কাজ শেষ হয়েছে। তবে স্যান ফ্র্যান্সিস্কোর বাইরে স্টকটন্ একটি ছোট শহর—আমি সেখানে দিন কয়েক কাজ করতে চাই। তারপর পূর্বাঞ্চলে যাব। আমার মনে হয়, এখন আমার বিশ্রাম নেওয়া দরকার—যদিও আমি এই শহরে বরাবরই সপ্তাহে ১০০ ডলার ক'রে পেতে পারি। এবারে আমি নিউ ইয়র্কের উপর 'লাইট ব্রিগেডে'র আক্রমণ (Charge of the Light Brigade)[১] চালাতে চাই। আমার আন্তরিক ভালবাসা জানবে।

তোমার চিরস্নেহশীল

বিবেকানন্দ

পুঃ—কর্মীরা সকলেই যদি সংহতির বিরোধী হয়, তবে কি তুমি মনে কর যে, ওতে কোন ফল হবে? তুমিই জানো ভাল! যা ভাল মনে করবে, তাই করো। নিবেদিতা চিকাগো থেকে আমায় একখানি চিঠি লিখেছে। সে গোটাকয়েক প্রশ্ন করেছে—আমি উত্তর দেবো। বি

---

১ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ৬০০ অশ্বারোহী সৈন্যের প্রাণবিসর্জন

৪৭১

(জনৈক আমেরিকান বন্ধুকে লিখিত)

আলামেডা, ক্যালিফোর্নিয়া*
১২ই এপ্রিল, ১৯০০

…'মা' আবার প্রসন্না হচ্ছেন; অবস্থা অনুকূল হয়ে আসছে—তা হতেই হবে।

কর্ম চিরকালই অশুভকে সঙ্গে নিয়ে আসে। আমি নিজ স্বাস্থ্য হারিয়ে সঞ্চিত অশুভরাশির ফলভোগ করেছি। এতে আমি খুশী, এতে আমার মন হালকা হয়ে গেছে—আমার জীবনে এমন একটা স্নিগ্ধ কোমলতা ও প্রশান্তি এসেছে, যা এর আগে কখনও ছিল না। আমি এখন কেমন ক'রে একই কালে আসক্ত ও অনাসক্ত থাকতে হয়, তাই শিখছি এবং ক্রমশঃ নিজের মনের উপর আমার প্রভুত্ব আসছে।

মায়ের কাজ মা ই করছেন; সেজন্য এখন বেশী মাথা ঘামাই না। আমার মতো পতঙ্গ প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার মরছে; কিন্তু মায়ের কাজ সমভাবেই চলেছে। জয় মা!…মায়ের ইচ্ছাস্রোতে গা ভাসিয়ে একলা আজীবন চলে এসেছি। যখনই এর ব্যতিক্রম করেছি, তখনই আঘাত পেয়েছি। মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।…

আমি সুখে আছি, নিজের মনের সব দ্বন্দ্ব কাটিয়ে শান্তিতে আছি; আমার অন্তরের বৈরাগ্য আজ আগের চেয়ে অধিক সমুজ্জ্বল। আত্মীয়স্বজনের প্রতি ভালবাসা দিন দিন কমে যাচ্ছে, আর মায়ের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। দক্ষিণেশ্বরের বটবৃক্ষমূলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে সেই যে আমরা দীর্ঘ রাত্রি জেগে কাটাতাম, তারই স্মৃতি আবার মনে জাগছে। আর কর্ম? কর্ম আবার কি? কার কর্ম? আর কার জন্যই বা কর্ম ক'রব?

আমি মুক্ত। আমি মায়ের সন্তান। মা-ই সব কর্ম করেন, সবই মায়ের খেলা। আমি কেন মতলব আঁটতে যাব? আর কি মতলবই বা আঁটব? আমার পরিকল্পনার অপেক্ষা না রেখেই মা-র যেমন অভিরুচি, তেমনি ভাবে যা-কিছু আসবার এসেছে ও চলে গেছে। মা-ই তো যন্ত্রী, আমরা তাঁর হাতের যন্ত্র ছাড়া আর কি?

৪৭২

১৭ই এপ্রিল, ১৯০০ *

প্রিয় মিঃ লেগেট,

সম্পাদিত 'উইল'খানা এই সঙ্গে আপনাকে পাঠাচ্ছি। এটা তাঁর[১] ইচ্ছানুসারেই সম্পাদন করা হয়েছে এবং যথারীতি এটার ভার গ্রহণের কষ্ট স্বীকার করতে আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রথম থেকে আপনারা আমার প্রতি সমভাবে সদয়। কিন্তু প্রিয় বন্ধু, আপনি তো জানেন, যেখান থেকে আনুকূল্য পাওয়া যায় (আনুকূল্য এখন পাওয়া গিয়েছে), মানুষ সেখান থেকেই আরও বেশী ক'রে পেতে চায়, এই তার স্বভাব।

আপনার সন্তান আমিও মানুষ।

আপনি যখন এ চিঠিখানা পাবেন, তখন আমি স্যান ফ্র্যান্সিস্কো ছেড়ে চলে গিয়েছি। আপনি দয়া ক'রে আমার ভারতীয় চিঠিপত্র C/o Mrs. Hal, 10 Aster Street, Chicago (চিকাগো), এই ঠিকানায় মার্গটের কাছে পাঠিয়ে দেবেন কি? মার্গটের বিদ্যালয়ের জন্য আপনার ১০০০ ডলার দানের কথা সে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে লিখেছে।

আমাদের প্রতি আপনাদের অবিচলিত সহৃদয়তার জন্য নিরন্তর এই প্রার্থনা জানাই যে, সকল আশীর্বাদ চিরদিন আপনাদের ঘিরে থাকুক।

আপনার স্নেহাবদ্ধ

বিবেকানন্দ

পুনঃ—মিসেস লেগেট ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন জেনে আমি খুব আনন্দিত।

---

১ মিসেস বুলের

৪৭৩

আলামেডা, ক্যালিফোর্নিয়া*
১৮ই এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় জো,

এইমাত্র তোমার ও মিসেস বুলের সাদর আহ্বানপত্র পেলাম। এ চিঠি আমি লণ্ডনের ঠিকানায় লিখছি। মিসেস লেগেট নিঃসন্দেহে আরোগ্যের পথে চলেছেন জেনে আমি খুবই সুখী হয়েছি!

মিঃ লেগেট সভাপতিপদ ত্যাগ করেছেন শুনে বড়ই দুঃখিত হলাম।

আসল কথা, আর বেশী গোল পাকাবার ভয়ে আমি চুপ ক'রে আছি। তুমি তো জানই—আমার সব ভয়ানক কড়া ব্যবস্থা; একবার যদি আমার খেয়াল চাপে তো এমন চেঁচাতে শুরু ক'রব যে, অ—র মনের শান্তিভঙ্গ হবে। আমি তাকে শুধু এইটুকু লিখে জানিয়েছি যে, মিসেস বুল সম্বন্ধে তার সব ধারণা একেবারে ভুল।

কর্ম করা সব সময়েই কঠিন। আমার জন্য প্রার্থনা কর, জো, যেন চিরদিনের তরে আমার কাজ করা ঘুচে যায়; আর আমার সমুদয় মন-প্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিলে একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন।

তুমি আবার লণ্ডনে পুরানো বন্ধুদের মধ্যে গিয়ে খুবই সুখী হয়েছ নিশ্চয়। তাদের সকলকে আমার ভালবাসা জানিও। আমি ভালই আছি—মানসিক খুব ভালই। শরীরের চেয়ে মনের শান্তি-স্বচ্ছন্দতাই খুব বেশী বোধ করছি। লড়াইয়ে হার-জিত দুইই হ'ল—এখন পুঁটলি-পাঁটলা বেঁধে সেই মহান্ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা ক'রে বসে আছি। 'অব শিব পার করো মেরা নেইয়া'—হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও, প্রভু।

যতই যা হোক, জো, আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালক-ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি—আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা-কিছু করা গেছে, তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর!

—যাতে আমার প্রাণের ভিতরটা পর্যন্ত কণ্টকিত ক'রে তুলছে! বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান!—যাই, প্রভু, যাই! ঐ তিনি বলছেন, 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক[১] (সংসারের ভাল-মন্দ সংসারীরা দেখুক), তুই (ওসব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) আমার পিছু পিছু চলে আয়!' —যাই, প্রভু, যাই!

হাঁ, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি। আমার সামনে অপার নির্বাণ-সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি! সময়ে সময়ে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি, সেই অসীম অনন্ত শান্তির পারাবার—মায়ার এতটুকু বাতাস বা একটা ঢেউ পর্যন্ত যার শান্তিভঙ্গ করছে না!

আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুশী; এত যে কষ্ট পেয়েছি, তাতেও খুশী; জীবনে যে বড় বড় ভুল করেছি, তাতেও খুশী; আবার এখন যে নির্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি, তাতেও খুশী। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না; অথবা এমন বন্ধন আমিও কারও কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি না। দেহটা গিয়েই আমার মুক্তি হোক, অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মুক্ত হই, সেই পুরানো 'বিবেকানন্দ' কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে—আর ফিরছে না!

শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে কেবল সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস!

তুমি বুঝতে পারছ, কেন আমি অভেদানন্দের কাজে হাত দিচ্ছি না।

আমি কে জো, যে কারু কাজে হাত দেবো? অনেক দিন হ'ল, নেতৃত্ব আমি ছেড়ে দিয়েছি। কোন বিষয়েই 'এইটে আমার ইচ্ছা' বলবার আর অধিকার নেই। এই বৎসরের গোড়া থেকেই আমি ভারতের কাজে কোন আদেশ দেওয়া ছেড়ে দিয়েছি—তা তো তুমি জানই। তুমি ও মিসেস বুল অতীতে আমার জন্য যা করেছ, তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ। তোমাদের চির-কল্যাণ—অনন্ত কল্যাণ হোক। তাঁর ইচ্ছাস্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণ

---

১ 'Follow me, and let the dead bury their dead.'—Bible (Matthew, 8-22)

গা ঢেলে দিয়ে থাকতুম, সেই সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মুহূর্ত ব'লে মনে হয়। এখন আবার সেইরূপে গা ভাসান দিয়েছি। উপরে সূর্য তাঁর নির্মল কিরণ বিস্তার করছেন, পৃথিবী চারিদিকে শস্যসম্পদ-শালিনী হয়ে শোভা পাচ্ছেন, দিনের উত্তাপে সব প্রাণী ও পদার্থ কত নিস্তব্ধ, কত স্থির, শান্ত!—আর আমিও সেই সঙ্গে এখন ধীর-স্থির ভাবে, নিজের ইচ্ছা আর বিন্দুমাত্র না রেখে, প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিণীর সুশীতল বক্ষে ভেসে ভেসে চলেছি! এতটুকু হাত-পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙতে আমার প্রবৃত্তি বা সাহস হচ্ছে না—পাছে প্রাণের এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার ভেঙে যায়! প্রাণের এই শান্তি ও নিস্তব্ধতাই জগৎটাকে মায়া ব'লে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়! এর আগে আমার কর্মের ভিতর মান-যশের ভাবও উঠত,[১] আমার ভালবাসার ভিতর ব্যক্তিবিচার আসত, আমার পবিত্রতার পিছনে ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকত, আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রভুত্বস্পৃহা আসত। এখন সে-সব উড়ে যাচ্ছে; আর আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হয়ে তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা ভাসান দিয়ে চলেছি। যাই! মা, যাই!—তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ ক'রে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে—অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মতো ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নাই!

আহা, কি স্থির প্রশান্তি! চিন্তাগুলি পর্যন্ত বোধ হচ্ছে যেন হৃদয়ের কোন্ এক দূর, অতি দূর অন্তস্তল থেকে মৃদু বাক্যালাপের মতো ধীর অস্পষ্ট-ভাবে আমার কাছে এসে পৌঁছচ্ছে। আর শান্তি—মধুর, মধুর শান্তি—যা-কিছু দেখছি শুনছি, সব কিছু ছেয়ে রয়েছে!—মানুষ ঘুমিয়ে পড়বার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য যেমন বোধ করে—যখন সব জিনিস দেখা যায়, কিন্তু ছায়ার মতো অবাস্তব মনে হয়—ভয় থাকে না, তাদের প্রতি একটা ভালবাসা থাকে না, হৃদয়ে তাদের সম্বন্ধে এতটুকু ভাল-মন্দ ভাব পর্যন্ত জাগে না—আমার মনের এখনকার অবস্থা যেন ঠিক সেইরূপ, কেবল শান্তি, শান্তি! চারপাশে কতকগুলি পুতুল আর ছবি সাজানো রয়েছে দেখে লোকের মনে

১ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'খাদ না থাকলে গড়ন হয় না।' স্বামীজী সেই ভাব হইতে এই কথাগুলি বলিতেছেন।

যেমন শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না, এ অবস্থায় জগৎটাকে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে; আমার প্রাণের শান্তিরও বিরাম নেই। ঐ আবার সেই আহ্বান!—যাই প্রভু, যাই।

এ অবস্থায় জগৎটা রয়েছে, কিন্তু সেটাকে সুন্দরও মনে হচ্ছে না, কুৎসিতও মনে হচ্ছে না।—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ানুভূতি হচ্ছে, কিন্তু মনে 'এটা ত্যাজ্য, ওটা গ্রাহ্য'—এমন ভাবের কিছুমাত্র উদয় হচ্ছে না। আহা, জো, এ যে কি আনন্দের অবস্থা, তা তোমায় কি ব'লব! যা-কিছু দেখছি, শুনছি, সবই সমানভাবে ভাল ও সুন্দর বোধ হচ্ছে; কেন না নিজের শরীর থেকে আরম্ভ ক'রে তাদের সকলের ভিতর বড়-ছোট, ভাল-মন্দ, উপাদেয়-হেয় ব'লে যে একটা সম্বন্ধ এতকাল ধরে অনুভব করেছি, সেই উচ্চ-নীচ সম্বন্ধটা এখন যেন কোথায় চলে গেছে! আর, সব চেয়ে উপাদেয় ব'লে এই শরীরটার প্রতি এর আগে যে বোধটা ছিল, সকলের আগে সেইটাই যেন কোথায় লোপ পেয়েছে! ওঁ তৎ সৎ!

আমি আশা করি, তোমরা সকলে লণ্ডনে ও প্যারিসে বহু নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করবে—শরীর ও মনের নূতন আনন্দ, নূতন খোরাক পাবে।

তুমি ও মিসেস বুল আমার চিরন্তন ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমারই চিরবিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

৪৭৪

আলামেডা, ক্যালিফোর্নিয়া*
২০শে এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় জো,

আজ তোমার চিঠি পেলাম। গতকাল তোমাকে চিঠি লিখেছি, কিন্তু তুমি ইংলণ্ডে থাকবে ভেবে চিঠি সেখানকার ঠিকানায় পাঠিয়েছি।

মিসেস বেট্‌স্‌-কে তোমার বক্তব্য জানিয়েছি। অ—এর সঙ্গে যে ছোটখাট একটা মতান্তর হয়েছে, তার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। তুমি তার যে পত্র-খানা পাঠিয়েছ, তাও পেয়েছি। এ পর্যন্ত সে ঠিকই বলেছে, 'স্বামীজী আমাকে লিখেছেন: মিঃ লেগেট বেদান্তে উৎসাহী নন এবং আর সাহায্য করবেন না। তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াও।' টাকাপয়সার কি করা যাবে,

তার এ প্রশ্নের উত্তরে—তোমার ও মিসেস লেগেটের ইচ্ছানুসারে তাকে আমি লস এঞ্জেলেস্ থেকে নিউ ইয়র্কের সংবাদ লিখেছিলাম।

হ্যাঁ, কাজ তার নিজের রূপ নেবেই, কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার ও মিসেস বুলের মনে ধারণা যে, এ ব্যাপারে আমার কিছু করা উচিত। কিন্তু প্রথমতঃ অসুবিধা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। সেটা যে কি নিয়ে সে কথা তোমরা কেউই আমাকে কিছু লেখনি। অন্যের মনের কথা জেনে নেবার বিদ্যা আমার নেই।

তুমি শুধু সাধারণভাবে লিখেছ যে, অ— নিজের হাতে সব কিছু রাখতে চায়। এ থেকে আমি কি বুঝব? অসুবিধাগুলি কি কি? প্রলয়ের সঠিক তারিখটি সম্বন্ধে আমি যেমন অন্ধকারে, তোমাদের মতভেদের কারণ সম্বন্ধেও আমি তেমনি অন্ধকারে। অথচ মিসেস বুলের ও তোমার চিঠিগুলিতে যথেষ্ট বিরক্তিভাব। এই সব জিনিস আমরা না চাইলেও কখন কখন জটিল হয়ে পড়ে। এগুলি স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করুক।

মিসেস বুলের ইচ্ছানুসারে উইল তৈরি ক'রে মিঃ লেগেটকে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার শরীর একরূপ চলে যাচ্ছে, কখন ভাল আছি, কখন মন্দ। মিসেস মিল্টনের চিকিৎসায় আমি কিছুমাত্র উপকৃত হয়েছি, এ-কথা ঠিক বলতে পারি না। তিনি আমায় ভাল করতে চেয়েছেন, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। তাঁকে আমার প্রীতি জানাচ্ছি। আশা করি, তিনি অন্য লোকের উপকার করতে পারবেন।

এই কথাগুলি মিসেস বুলকে লেখার জন্য তাঁর কাছ থেকে চার-পাতার এক চিঠি পেয়েছি; তাতে কিভাবে আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কিভাবে ধন্যবাদ জানানো উচিত, সেই সব সম্বন্ধে লম্বা উপদেশ।

অ—এর ব্যাপার থেকে নিশ্চয়ই এ-সবের উৎপত্তি!

স্টার্ডি ও মিসেস জনসন মার্গটের জন্য বিচলিত হয়ে আমার কঠোর সমালোচনা করেছে। এখন আবার অ— মিসেস বুলকে বিচলিত করেছে এবং তার ধাক্কাও আমাকে সামলাতে হচ্ছে। এই হ'ল জীবন!

তুমি ও মিসেস লেগেট চেয়েছিলে আমি তাকে স্বাধীন ও আত্মনির্ভর হ'তে লিখি—এ-কথা লিখি যে, মিঃ লেগেট তাকে আর সাহায্য করবেন না। আমি তাই লিখেছি। এখন আমি আর কি করতে পারি?

যদি কেউ (John and Jack) তোমার কথা না শোনে, তা হ'লে তার জন্য কি আমাকে ফাঁসি যেতে হবে? এই বেদান্ত সোসাইটি সম্বন্ধে আমি কি জানি? আমি কি সেটা আরম্ভ করেছিলাম? তাতে কি আমার কোন হাত ছিল? তদুপরি, ব্যাপারটা যে কি, সে সম্বন্ধে দু-কলম লেখবার মনও কারও হয়নি।

বাস্তবিক, এ দুনিয়া খুব একটা মজা!

মিসেস লেগেট দ্রুত আরোগ্যলাভ করছেন জেনে আনন্দিত। তাঁর সম্পূর্ণ রোগমুক্তির জন্য আমি নিরন্তর প্রার্থনা করি। সোমবার চিকাগো যাত্রা ক'রব। এক সহৃদয় মহিলা তিনমাস পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে, নিউ ইয়র্কের এমন একখানা পাস (Railway pass) আমাকে দিয়েছেন। 'মা'ই আমাকে দেখবেন। সারা জীবন আগলে থাকার পরে তিনি নিশ্চয়ই এখন আমাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে দেবেন না। ইতি

তোমাদের চিরকৃতজ্ঞ
বিবেকানন্দ

৪৭৫

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

২৩শে এপ্রিল, ১৯০০ *

প্রিয় মেরী,

আজই আমার যাত্রা করা উচিত ছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে যাত্রার পূর্বে ক্যালিফোর্নিয়ার বিশাল রেড-উড বৃক্ষরাজির নীচে তাঁবুতে বাস করার লোভ আমি সংবরণ করতে পারলাম না। তাই তিন-চার দিনের জন্য যাত্রা স্থগিত রাখলাম। তা ছাড়া অবিরাম কাজের পরে এবং চারদিনের হাড়ভাঙা ভ্রমণে বেরোবার আগে ঈশ্বরের মুক্ত বায়ুতে শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন আমার ছিল।

'মেরী-পিসী'র সঙ্গে পনের দিনের মধ্যে দেখা করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা রাখবার জন্য তাগিদ দিয়ে মার্গট চিঠি লিখেছে। কথা আমি রাখব, তবে পনের দিনের জায়গায় বিশ দিন হবে, এই যা। এতে চিকাগোয় এখন যে বিশ্রী তুষার-ঝড় চলছে, তার হাত এড়াতে পারব, অধিকন্তু কিছু শক্তিসঞ্চয়ও ক'রে নেবো।

মার্গট দেখা যাচ্ছে মেরী-পিসীর দারুণ অনুরাগী।

আগামী কাল বনের দিকে যাত্রা করছি। উফ্! চিকাগো যাবার আগে ফুসফুস ওজোন (ozone)-এ ভরে নেবো। ইতিমধ্যে চিকাগোয় আমার নামে ডাক এলে রেখে দিও, লক্ষ্মী-মেয়েটির মতো সেগুলি যেন আবার এখানে পাঠিয়ে দিও না।

কাজ শেষ ক'রে ফেলেছি। রেলভ্রমণের ধকলের আগে শুধু কয়েক-দিনের—তিন কি চার দিনের—বিশ্রামের জন্য বন্ধুরা পীড়াপীড়ি করছেন।

এখান থেকে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত তিন মাস মেয়াদের একটি ফ্রী পাস (Free pass) পেয়েছি; ঘুমের কামরার খরচা ছাড়া আর কিছু খরচা নেই; অতএব, বুঝতেই পারছ—মুক্ত, মুক্ত (Free, free)!

তোমাদের স্নেহশীল

বিবেকানন্দ

৪৭৬

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

৩০শে এপ্রিল, ১৯০০ *

প্রিয় মেরী,

আকস্মিক অসুস্থতা ও জ্বরের জন্য এখনও চিকাগো যাত্রা করতে পারিনি। দীর্ঘ ভ্রমণের ধকল সহ্য করার মতো বল পেলেই রওনা হবো। মার্গটের কাছ থেকে সে-দিন একখানা চিঠি পেয়েছি। তাকে আমার ভালবাসা দিও, তুমিও আমার চিরন্তন ভালবাসা নিও। হ্যারিয়েট কোথায়? এখনও কি চিকাগোতেই? আর ম্যাক্‌কিণ্ডলি বোনেরা? সকলকে আমার ভালবাসা।

বিবেকানন্দ

৪৭৭

(মিসেস ব্লজেটকে লিখিত[১])

২রা মে, ১৯০০ *

আপনার অত্যন্ত সহৃদয় পত্রখানি পেয়েছি। ছ-মাসের কঠোর পরিশ্রমের জন্য আবার স্নায়ুরোগে ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শয্যাগত আছি। যা হোক,

১ লস্ এঞ্জেলেস্-এর মিসেস ব্লজেট। এই চিঠিতে স্বামীজী তাঁহাকে 'Dear Aunt Roxy' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

দেখলাম আমার কিডনি ও হার্ট আগের মতোই ভাল আছে। কয়েকদিনের জন্য গ্রামাঞ্চলে বিশ্রাম নিতে যাচ্ছি, তার পরই চিকাগো রওনা হবো।

মিসেস মিলওয়ার্ড এডামস্‌কে (Mrs. Milward Adams) এইমাত্র চিঠি লিখেছি এবং আমার কন্যা মিস নোবল্‌কেও একখানা পরিচয়পত্র দিয়েছি, যাতে সে মিস অ্যাডামস্‌-এর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে এবং কাজ সম্বন্ধে তাঁকে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য জানায়।

স্নেহময়ী মা আমার, ভগবানের আশীর্বাদ ও শান্তি আপনি লাভ করুন। আমিও একটু শান্তি চাই, খুবই চাই, আমার জন্য প্রার্থনা করুন। কেটকে ভালবাসা।

আপনার চিরসন্তান
বিবেকানন্দ

পুঃ—মিস স্পেন্সার প্রভৃতি বন্ধুদের ভালবাসা। ট্রিকসের মাথায় রাশি-রাশি আদরের চাপড়।

বি

৪৭৮

২রা মে, ১৯০০ *

প্রিয় নিবেদিতা,

আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম,—মাসখানেক ধরে কঠোর পরিশ্রমের ফলে আবার রোগের আক্রমণ হয়েছিল। যাই হোক, এতে আমি এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে, আমার হার্ট বা কিডনিতে কোন রোগ নাই, শুধু অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্নায়ুগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং আজ কিছু দিনের জন্য পল্লী অঞ্চলে যাচ্ছি এবং শরীর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকব; আশা করি, শীঘ্রই শরীর সুস্থ হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে প্লেগের খবর ইত্যাদিতে ভরা কোন ভারতীয় চিঠি আমি পড়তে চাই না। আমার সব ডাক (mail) মেরীর কাছে যাচ্ছে। আমি যতক্ষণ ফিরে না আসছি, ততক্ষণ মেরীর অথবা মেরী চলে গেলে তোমারই কাছে ঐসব থাকুক। আমি সব দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হ'তে চাই। জয় মা!

মিসেস হান্টিংটন নামে একজন প্রচুর বিত্তশালিনী মহিলা আমায় কিছু সাহায্য করেছিলেন; তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে ও তোমায় সাহায্য

করতে চান। তিনি ১লা জুনের মধ্যেই নিউ ইয়র্কে আসবেন। তাঁর সঙ্গে দেখা না ক'রে চলে যেও না যেন। আমার খুব শীঘ্র ফিরবার সম্ভাবনা নেই; সুতরাং তাঁর নামে তোমার একখানি পরিচয়পত্র পাঠিয়ে দেবো।

মেরীকে আমার ভালবাসা জানিও। আমি দিন-কয়েকের মধ্যেই যাচ্ছি। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী

তোমাদের বিবেকানন্দ

পুঃ—সঙ্গের চিঠিখানি তোমাকে মিসেস এডাম্‌সের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য লিখলাম; তিনি জর্জ এডাম্‌সের স্ত্রী। তাঁর সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করবে। এর ফলে হয়তো অনেক কাজ হবে। তিনি খুব পরিচিতা—তাঁর ঠিকানা খুঁজে বের কর। ইতি

বি

৪৭৯

স্যান ফ্র্যান্সিস্কো*

২৮শে মে, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

আমার অনন্ত আশীর্বাদ জেনো এবং কিছুমাত্র নিরাশ হয়ো না। শ্রী ওয়া গুরু, শ্রী ওয়া গুরু। ক্ষত্রিয়-শোণিতে তোমার জন্ম। আমাদের অঙ্গের গৈরিক বাস তো যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুসজ্জা! ব্রত-উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়া নয়। শ্রী ওয়া গুরু।

অশুভ অদৃষ্টের আবরণ তো দুর্ভেদ্য কালো। কিন্তু আমিই তো সর্বময় প্রভু! যে মুহূর্তে আমি ঊর্ধ্বে হাত তুলি—সেই মুহূর্তেই ঐ তমসা অন্তর্হিত হয়ে যায়। এ সবই অর্থহীন, এবং ভীতিই এদের জনক। আমি ভয়েরও ভয়, রুদ্রেরও রুদ্র। আমি অভীঃ, অদ্বিতীয়, এক। আমি অদৃষ্টের নিয়ামক, আমি কপালমোচন। শ্রী ওয়া গুরু। দৃঢ় হও, মা! কাঞ্চন কিংবা অন্য কিছুর দাস হয়ো না, তবেই সিদ্ধি আমাদের সুনিশ্চিত।

বিবেকানন্দ

৪৮০

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

1921 W 21 Street*

লস এঞ্জেলেস্

১৭ই জুন, ১৯০০

প্রিয় মেরী,

সত্যি আমি অনেকটা ভাল, কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিনি। যাই হোক না কেন, যারা ব্যারামে ভোগে, তাদের প্রত্যেকেরই মানসিক অবস্থা এরূপ হয়।

কালী-উপাসনা ধর্মের কোন অপরিহার্য সোপান নয়। ধর্মের যাবতীয় তত্ত্বই উপনিষদ থেকে পাওয়া যায়। কালী-উপাসনা আমার বিশেষ খেয়াল; আমাকে এর প্রচার করতে তুমি কোনদিন শোননি, বা ভারতেও তা প্রচার করেছি বলে পড়োনি। সকল মানবের পক্ষে যা কল্যাণকর, আমি তাই প্রচার করি। যদি কোন অদ্ভুত প্রণালী থাকে, যা শুধু আমার পক্ষেই খাটে, তা আমি গোপন রেখে দিই এবং সেখানেই তার ইতি। কালী-উপাসনা কি বস্তু, সে তোমার কাছে কোনমতেই ব্যাখ্যা ক'রব না, কারণ কখন কারও কাছে তা করিনি।

তুমি যদি মনে করে থাকো যে হিন্দুরা 'বসু'দের[১] পরিত্যাগ করেছে, তা হ'লে সম্পূর্ণ ভুল করেছ। ইংরেজ শাসকগণ তাঁকে কোণঠাসা করতে চায়। ভারতীয়দের মধ্যে ঐ ধরনের উন্নতি তারা কোনমতেই চায় না। তারা তাঁর পক্ষে জায়গাটা অসহ্য ক'রে তুলেছে, সেজন্যই তিনি অন্যত্র যেতে চাইছেন।

'অ্যাংগ্লিসাইজ্‌ড' (anglicised) কথাটা দ্বারা সেই সকল লোকদেরই বোঝায়, যারা তাদের স্বভাব ও আচরণের দ্বারা দেখিয়ে দেয় যে, তারা আমাদের—দরিদ্র ও সেকেলে হিন্দুদের—জন্য লজ্জিত। আমি আমার জন্ম, জাতি বা জাতীয় চরিত্রের জন্য লজ্জিত নই। এ-ধরনের লোককে যে হিন্দুরা পছন্দ করবে না, এতে আমি আশ্চর্য নই।

---

১ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু

খাঁটি উপনিষদের তত্ত্ব ও নীতিই আমাদের ধর্ম, তাতে আচার-অনুষ্ঠান, প্রতীক ইত্যাদির কোন স্থান নেই। অনেকে মনে করে, আচার-অনুষ্ঠানাদি তাদের ধর্মানুভূতির সহায়তা করে। তাতে আমার আপত্তি নেই।

শাস্ত্র, আচার্য, প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ অথবা ত্রাণকর্তাদের উপর ধর্ম নির্ভর করে না। এই ধর্ম ইহজীবনে বা অন্য কোন জীবনে অপরের উপর আমাদের নির্ভরশীল ক'রে তোলে না। এই অর্থে উপনিষদের অদ্বৈতবাদই একমাত্র ধর্ম। তবে শাস্ত্র, অনুষ্ঠান, প্রেরিত পুরুষ বা ত্রাণকর্তাদেরও স্থান আছে। সেগুলি অনেককে সাহায্য করতে পারে, যেমন কালী-উপাসনা আমাকে আমার 'ঐহিক কাজে' সাহায্য করে। এগুলি স্বাগত।

তবে 'গুরু' একটি স্বতন্ত্র ভাব। শক্তির সঞ্চারক ও গ্রহীতার মধ্যে যে সম্বন্ধ, এ হ'ল তাই, এখানে তা আত্মিক শক্তি ও জ্ঞান। শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রত্যেক জাতির একটি নির্দিষ্ট আদর্শ আছে। প্রত্যেক জাতিই অন্য জাতির ভাবধারা প্রতিনিয়ত নিজের ধাঁচের মধ্যে অর্থাৎ তার জাতীয় স্বভাবের মধ্যে গ্রহণ ক'রে তাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করছে। কোন জাতির নির্দিষ্ট আদর্শ ধ্বংস করার সময় এখনও হয়নি। শিক্ষা যে-কোন সূত্র থেকেই আসুক না কেন, যে-কোন দেশের শিক্ষাদর্শের সঙ্গে তার ভাবসামঞ্জস্য আছে; কেবল তাকে গ্রহণ করবার সময়ে জাতীয় ভাবাপন্ন ক'রে নিতে হবে অর্থাৎ সে শিক্ষা যেন জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অনুগামী হয়।

ত্যাগই হ'ল প্রত্যেক জাতির চিরন্তন আদর্শ। অন্য জাতিগুলি কেবল জানে না যে, প্রকৃতি অজান্তে তাদের দ্বারা কি করিয়ে নিচ্ছে। যুগ যুগ ধরে এই একই উদ্দেশ্য নিশ্চিতভাবে কাজ ক'রে চলেছে। এ পৃথিবী ও সূর্যের ধ্বংসের সঙ্গেই এই উদ্দেশ্যেরও শেষ হবে! আর পৃথিবীর নিত্য প্রগতি হচ্ছে বটে, না! আর অসীম জগতের কোথাও কেউই এ যাবৎ উন্নত হয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ বা আদানপ্রদান করছে না! বাজে কথা! তারা জন্মায়, একই বাহ্যরূপ দেখায় এবং একভাবেই মরে! ক্রমবর্ধমান উদ্দেশ্য বটে! শিশুগণ, তোমরা স্বপ্নরাজ্যে বাস কর!

এবার নিজের কথা। হ্যারিয়েট যাতে প্রতি মাসে আমাকে কয়েক ডলার ক'রে দেয়, তুমি নিশ্চয়ই সে বিষয়ে তাকে রাজী করাবে, এবং অন্য

কয়েকজন বন্ধুর দ্বারাও তাকে রাজী করাবার চেষ্টা ক'রব, যদি সফল হই, তা হ'লে ভারতে চলে যাচ্ছি। জীবিকার জন্য এইসব মঞ্চ-বক্তৃতার কাজ ক'রে ক'রে আমি একেবারে ক্লান্ত। এ কাজ আমার আর ভাল লাগছে না। অবসর নিয়ে কিছু লেখবার ইচ্ছা, দেখি যদি কিছু গভীর চিন্তার কাজ করতে পারি।

শীঘ্রই চিকাগো যাচ্ছি, কয়েকদিনের মধ্যে সেখানে পৌছব, আশা করি।

মেরী, আশাবাদে এমন মেতে উঠছি যে, যদি ডানা থাকত তবে হিমালয়ে উড়ে যেতাম!

মেরী, সারা জীবন আমি জগতের জন্য খেটেছি, কিন্তু সে জগৎ আমার দেহের এক খাবলা মাংস কেটে না নেওয়া পর্যন্ত এক টুকরো রুটিও আমাকে ছুঁড়ে দেয়নি।

দিনে এক টুকরা রুটি জুটলেই আমি পরিপূর্ণ অবসর নিই; কিন্তু তা অসম্ভব—।

সতত প্রভুসমীপে তোমার
বিবেকানন্দ

পুনঃ—বস্তুর অসারতা যদি কারও কাছে ধরা পড়ে থাকে, সে মানুষ এখন আমি। এইতো জগতের চেহারা—একটা কদর্য পশুর মৃতদেহ। যে ভাবে, এ জগতের উপকার ক'রব, সে একটা আহাম্মক। তবে ভাল হোক, মন্দ হোক, কাজ আমাদের ক'রে যেতে হবে—আমাদের বন্ধন ঘোচাবার জন্য। আশা করি, সে কাজ আমি করেছি। এখন প্রভু আমাকে অপর পারে নিয়ে চলুন। তাই হোক, প্রভু তাই হোক। ভারত বা অন্য কোন দেশের জন্য চিন্তা আমি ত্যাগ করেছি। এখন আমি স্বার্থপর, নিজের মুক্তি চাই।

'যিনি ব্রহ্মাকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন, এবং তাঁর কাছে বেদসকল প্রকাশ করেছেন, যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, বন্ধনমুক্তির আশা ক'রে তাঁর কাছে আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি।'[১]

১ শ্বেঃ উপনিষদ, ৬।১৮

৪৮১

নিউ ইয়র্ক *
২০শে জুন, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

…মহামায়া আবার সদয় হয়েছেন ব'লে বোধ হয়, আর চক্র ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠছে।…

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৪৮২

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

বেদান্ত সোসাইটি*
146 E 55th Street, নিউ ইয়র্ক
২৩শে জুন, ১৯০০

প্রিয় মেরী,

তোমার সুন্দর চিঠিখানির জন্য ধন্যবাদ। খুব ভাল আছি, সুখী আছি,—যেমন থাকি। জোয়ারের আগে ঢেউ আসবেই। আমার বেলায়ও তাই। তুমি যে প্রার্থনা করতে যাচ্ছ, তার জন্য আনন্দিত। মেথডিষ্টদের একটা শিবির-সভা ডাকো না কেন? তাতে আরও তাড়াতাড়ি ফল হবে নিশ্চয়।

সব রকম ভাবালুতা ও আবেগ দূর করতে আমি বদ্ধপরিকর, আমাকে আর কখনও আবেগবিহ্বল হ'তে দেখলে আমার গলায় দড়ি দিও। আমি হলাম অদ্বৈতবাদী; জ্ঞান আমাদের লক্ষ্য—ভাবাবেগ নয়, ভালবাসা নয়, কিছু নয়,—কারণ ঐসব জিনিস ইন্দ্রিয় বা কুসংস্কার বা বন্ধনের অন্তর্ভুক্ত। আমি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ।

গ্রীনএকারে তুমি নিশ্চয়ই বিশ্রামের সুযোগ পাবে। সেখানে আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকো এই চাই। আমার জন্য মুহূর্তের দুশ্চিন্তাও ক'রো না। 'মা' আমাকে দেখছেন। ভাবাবেগের নরক থেকে তিনি আমাকে উদ্ধার ক'রে আনছেন, উত্তীর্ণ ক'রে দিচ্ছেন বিশুদ্ধ যুক্তিবিচারের আলোকে। তুমি সুখী হও, এই আমার সতত শুভেচ্ছা।

তোমার ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

পুনঃ—মার্গট ২৬শে যাত্রা করবে। সপ্তাহখানেক বা সপ্তাহ-দুয়েক পরে আমিও যেতে পারি। আমার উপরে কারও কোন অধিকার নেই, কারণ আমি আত্মস্বরূপ। কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার নেই।

বি

তোমার চিঠিটা হজম করতে পারিনি, কারণ গত কয়েকদিন অজীর্ণতা কিছু বেশীরকম ছিল।

বি

সর্বসময়ে আমার অনাসক্তি বিদ্যমান ছিলই। এক মুহূর্তেই আবার তা এসে গিয়েছে। শীঘ্রই আমি এমন জায়গায় দাঁড়াচ্ছি, যেখানে কোন ভাবালুতা বা হৃদয়াবেগ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

বি

৪৮৩

নিউ ইয়র্ক *
২রা জুলাই, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

…'মা-ই সব জানেন'—এ কথা আমি প্রায়ই বলি। মায়ের নিকট প্রার্থনা কর। নেতা হওয়া বড় কঠিন। সঙ্ঘের পায়ে যথাসর্বস্ব, এমন কি নিজের সত্তা পর্যন্ত নেতাকে বিসর্জন দিতে হয়।…

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৪৮৪

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

102 E 58th St., নিউ ইয়র্ক*
১১ই জুলাই, ১৯০০

প্রিয় ভগিনি,

তোমার চিঠি পেয়ে ও গ্রীনএকার যাচ্ছ জেনে আনন্দিত হয়েছি। আশা করি, তাতে তোমার অনেক উপকার হবে। লম্বা চুল কেটে ফেলার জন্য আমি সকলের কাছে তিরস্কৃত হচ্ছি। দুঃখেরই বিষয়; তুমি জোর করেছিলে বলেই আমি তা করেছিলাম।

ডেট্রয়েট গিয়েছিলাম, গতকাল ফিরে এসেছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফ্রান্সে যেতে চেষ্টা করছি, সেখান থেকে ভারতে। এখানকার খবর প্রায় কিছুই নেই; কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আহার ও নিদ্রা নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাচ্ছি—বস্, এই পর্যন্ত।

চিরবিশ্বস্ত ও স্নেহশীল ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

পুনঃ—চিকাগোয় আমার নামে কোন চিঠিপত্র এসে থাকলে মেয়েদের লিখো পাঠিয়ে দিতে।

৪৮৫

102 East 58th St., নিউইয়র্ক*
১৮ই জুলাই, ১৯০০

প্রিয় তুরীয়ানন্দ,

তোমার চিঠি ঠিকানা-বদল হয়ে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। ডেট্রয়েটে মাত্র তিন দিন ছিলাম। নিউইয়র্কে এখন ভয়ঙ্কর গরম। গত সপ্তাহে তোমার নামে ভারতের কোন ডাক ছিল না। নিবেদিতার কাছ থেকে এখনও কোন চিঠি পাইনি।

আমাদের সব ব্যাপার একই-ভাবে চলছে। উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। অগস্ট মাসে মিস মুলার আসতে পারবেন না। তাঁর জন্য আমি অপেক্ষা ক'রব না। পরের ট্রেনটি ধ'রব। সেটা যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। মিস বুককে (Miss Boocke) ভালবাসা।

প্রভুসমীপে তোমার
বিবেকানন্দ

পুনঃ—প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে কালী পাহাড়ে চলে গেছে। সেপ্টেম্বরের আগে ফিরতে পারবে না। আমি একেবারে একা…, আমি তাই ভালবাসি। আমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেছ কি? তাদের আমার ভালবাসা।

বি

৪৮৬

102 East 58th St., নিউইয়র্ক*

২০শে জুলাই, ১৯০০

প্রিয় জো,

এ চিঠি তোমার কাছে পৌঁছবার আগেই—যে-রকম স্টীমার মিলবে সেই-মতো আমি হয়তো ইউরোপে—লণ্ডনে বা প্যারিসে—পৌঁছে যাব।

এখানে আমার কাজটা সহজ ক'রে নিয়েছি। মিঃ হুইটমার্শের পরামর্শে মিস ওয়াল্ডোর হাতে কাজগুলি দেওয়া হয়েছে।

পাথেয় এবং জাহাজ দুয়েরই ব্যবস্থা করতে হবে। বাকি 'মা' জানেন।

আমার 'অন্তরঙ্গ' বন্ধু এখনও অবতীর্ণ হননি। তিনি লিখেছেন, অগস্টের কোন এক সময়ে তিনি আসবেন; একজন হিন্দুকে দেখবার জন্য তাঁর প্রাণ কণ্ঠায় এসে ঠেকেছে এবং ভারতমাতার জন্য তাঁর আত্মা নিরন্তর পুড়ে খাক হচ্ছে।

তাঁকে লিখেছি, লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে। তাও মা জানেন। মিসেস হান্টিংটন মার্গটকে ভালবাসা জানিয়েছেন এবং তার কাছ থেকে সংবাদ আশা করছেন, অবশ্য সে যদি তার বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী নিয়ে খুব ব্যস্ত না থাকে।

ভারতের 'পবিত্র গাভীকে', তোমাকে, লেগেটদের, মিস অমুককে (কি যেন তার নাম ?), আমেরিকান রবার গাছকে—সকলকে ভালবাসা।

সতত প্রভুসমীপে তোমার

বিবেকানন্দ

৪৮৭

102 West 58th St., নিউইয়র্ক *

২৪শে জুলাই, ১৯০০

প্রিয় জো,

সূর্য = জ্ঞান; তরঙ্গায়িত জল = কর্ম; পদ্ম = প্রেম; সর্প = যোগ; হংস = আত্মা; উক্তিটি = হংস (অর্থাৎ পরমাত্মা) আমাদিগকে উহা প্রেরণ করুন।[১]

---

১ 'তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ'।

এটি হৃৎ-সরোবর। কল্পনাটি তোমার কেমন লাগে?[১] যা হোক, হংস যেন তোমায় এ সমস্ত দিয়ে পরিপূর্ণ করেন।

আগামী বৃহস্পতিবারে ফরাসী জাহাজ 'লা শ্যাম্পেন'-এ আমার যাত্রা করার কথা আছে।

Waldo and Whitmarsh কোম্পানির বইগুলি কাছে আছে এবং ছাপার মতো প্রায় প্রস্তুত হয়েছে।

আমি ভাল আছি, ক্রমে স্বাস্থ্যলাভ করছি,—আগামী সপ্তাহে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া পর্যন্ত ঠিকই থাকব। ইতি

সতত প্রভুপদাশ্রিত
তোমাদের বিবেকানন্দ

৪৮৮

102 East 58th St., নিউইয়র্ক *
২৫শে জুলাই, ১৯০০

প্রিয় তুরীয়ানন্দ,

মিসেস হ্যান্‌স্‌বার্গের একখানি চিঠিতে জানলাম যে, তুমি তাঁদের ওখানে গিয়েছিলে। তাঁরা তোমাকে খুব পছন্দ করেন এবং আমার বিশ্বাস, তুমিও বুঝতে পেরেছ তাঁদের বন্ধুত্ব কত অকৃত্রিম, পবিত্র ও স্বার্থলেশশূন্য। আমি কাল পারি (Paris) যাত্রা করছি, যোগাযোগ সব ঠিক হয়ে এসেছে। কালী এখানে নেই। আমি চলে যাচ্ছি ব'লে সে একটু ভাবিত হয়ে পড়েছে—কিন্তু এ ছাড়া উপায় কি?

6 Place Des Etats Unis, Paris, France—মিঃ লেগেটের এই ঠিকানায় অতঃপর আমায় পত্র লিখবে। মিসেস ওয়াইকফ্‌, হ্যান্‌স্‌বার্গ ও হেলেনকে আমার ভালবাসা জানাবে। সমিতিগুলির কাজ আবার একটু শুরু ক'রে দাও এবং মিসেস হ্যান্‌স্‌বার্গকে ব'লো, তিনি যেন সময়মত সব চাঁদা আদায় করেন, আর টাকা তুলে ভারতে পাঠিয়ে দেন; কারণ

১ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতীকটির ব্যাখ্যা।

সারদা জানিয়েছে, তাদের বড় টানাটানি চলছে। মিস বুককে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবে। আমার অসীম ভালবাসা জানবে। ইতি

সতত প্রভুপদাশ্রিত
তোমাদের বিবেকানন্দ

পুঃ—বলি হাঁস কেমন? 'তারা পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ।'[১]

৪৮৯

(মায়াবতী 'অদ্বৈত আশ্রমে'র জনৈক সাধুকে লিখিত)

নিউইয়র্ক
অগস্ট, ১৯০০

কল্যাণবরেষু,

তোমার এক পত্র পাইয়াছিলাম। এতদিন জবাব দিতে পারি নাই। তোমার সুখ্যাতি মিঃ সেভিয়ার তাঁর পত্রে করেছেন। তাতে আমি বিশেষ খুশী হলাম।

তোমরা কে কি কর ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখে আমায় পত্র লিখবে। তোমার মাকে পত্র লিখ না কেন? ও কি কথা? মাতৃভক্তি সকল কল্যাণের কারণ। তোমার ভাই কলকাতায় পড়ছে শুনছে কেমন?

তোদের সব আনন্দ-দের নাম মনেও থাকে না—কোন্‌টাকে কি বলি! সবগুলোকে এক সাঁটে আমার ভালবাসা দিবি। খগেনের শরীর বেশ সেরে গেছে খবর পেয়েছি—বড়ই সুখের কথা। তোদের—সেভিয়াররা যত্ন করে কিনা সব লিখবি। দীনুর শরীরও ভাল আছে—বড় সুখের বিষয়। কালী-ছোকরার একটু মোটা হবার tendency (প্রবণতা) আছে; তার পাহাড় চড়াই-উৎরাইতে সে-সব সেরে যাবে নিশ্চিত। স্বরূপকে বলবি, আমি তার কাগজ চালানোতে বিশেষ খুশী। He is doing splendid work (সে চমৎকার কাজ করছে)।

১ এই অংশ খামের উপরে বাংলায় লিখিত ছিল।
হংস—পরমাত্মা, হংসী—জীবাত্মা; এখানে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার লীলা বুঝাইতেছে

আর সকলকে আমার আশীর্বাদ ভালবাসা দিবি। আমার শরীর সেরে গেছে—সকলকে বলিস। আমি এখান থেকে ইংলণ্ড হয়ে শীঘ্রই ভারতবর্ষে যাচ্ছি।

সাশীর্বাদং

বিবেকানন্দস্য

৪৯০

প্যারিস

১৩ই অগস্ট, ১৯০০

হরি ভাই,

তোমার ক্যালিফোর্নিয়া হ'তে পত্র পেলুম। তিনজনের ভাব হ'তে লাগলো, মন্দ কি? ওতেও অনেক কাজ হয়। শ্রী-মহারাজ জানেন। যা হয় হ'তে দাও। তাঁর কাজ তিনি জানেন, তুমি আমি চাকর বই তো নই!

এ চিঠি স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কোতে পাঠাই—মিসেস পানেলের কেয়ারে।

নিউইয়র্কের সামান্য সংবাদ পেয়েছি এইমাত্র। তারা আছে ভাল। কালী প্রবাসে। তুমি স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কোতে 'কিমাসীত, প্রভাষেত, ব্রজেত, কিম্'[১] লিখো। আর মঠে টাকা পাঠাবার কথাটায় গাফিলা হয়ো না। লস্ এঞ্জেলেস, স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কো হ'তে যেন অবশ্য অবশ্য টাকা মাসে মাসে যায়।

আমি এক রকম বেশ আছি। শীঘ্রই ইংলণ্ড যাত্রা। শরতের সংবাদ পাচ্ছি। তার মধ্যে আমাশা হয়েছে। আর সকলে আছে ভাল। ম্যালেরিয়া এবার বড় কাউকে ধরেনি। গঙ্গার উপর বড় ধরেও না। এবার বর্ষা কম হওয়ায় বাংলা দেশেও আকালের ভয়।

কাজ ক'রে যাও ভায়া মায়ের কৃপায়; মা জানেন, তুমি জানো—আমি খালাস! আমি এখন জিরেন নিতে চললুম। ইতি

দাস

বিবেকানন্দ

---

১ স্বামীজী গীতার ভাবটি লইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন; উহার অর্থ—কোথায় থাকো, কি বলো, কোথায় যাও, ইত্যাদি।

৪৯১

(জন্ ফক্সকে লিখিত)

ব্যুলেভার হ্যান্স স্থয়ান্*
প্যারিস
১৪ই অগস্ট, ১৯০০

অনুগ্রহপূর্বক মহিমকে লিখে জানাবেন যে, সে যাই করুক না কেন, আমার আশীর্বাদ সে সর্বদাই পাবে। বর্তমানে সে যা করছে, তা নিশ্চয়ই ওকালতি ইত্যাদির চেয়ে ঢের ভাল। আমি বীরত্ব ও সাহসিকতা পছন্দ করি, আর আমার জাতির পক্ষে ঐরূপ তেজস্বিতার বিশেষ প্রয়োজন। তবে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছে এবং আমি বেশী দিন বাঁচবার আশা রাখি না; সুতরাং সে যেন মা ও সমস্ত পরিবারের ভার নেবার জন্য প্রস্তুত হ'তে থাকে। যে-কোন মুহূর্তে আমি চোখ বুজতে পারি। আমি তার জন্য এখন খুব গর্ব অনুভব করছি। ইতি

আপনার স্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৪৯২

প্যারিস
অগস্ট, ১৯০০

হরি ভাই,

এক্ষণে ফ্রান্স দেশের সমুদ্রতটে অবস্থান করছি। Congress of History of Religions (ধর্মেতিহাস সম্মেলন) হয়ে গেছে। সে কিছুই নয়, জন কুড়ি পণ্ডিতে পড়ে শালগ্রামের উৎপত্তি, জিহোবার উৎপত্তি ইত্যাদি বক্‌বাদ করেছে! আমিও খানিক বক্‌বাদ তায় করেছি।

আমার শরীর-মন ভেঙে গেছে। বিশ্রাম অত্যাবশ্যক। তার উপর একে নির্ভর করবার লোক কেউ নেই, তায় আমি যতক্ষণ থাকব, আমার উপর ভরসা ক'রে সকলে অত্যন্ত স্বার্থপর হয়ে যাবে।

…লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে গেলে দিনরাত মনঃকষ্ট। কাজেই…সব লিখে-পড়ে আলাদা হয়ে গেছি। এখন আমি লিখে দিচ্ছি যে, কারও

একাধিপত্য থাকবে না। সমস্ত কাজ majorityর (অধিকাংশের) হুকুমে হবে···সেই মতো ট্রাস্ট ডীড্ করিয়ে নিলেই আমি বাঁচি।

এ বৃত্তান্ত ঐ পর্যন্ত। এখন তোমরা যা হয় কর। আমার কাজ আমি ক'রে দিয়েছি, বস্। গুরুমহারাজের কাছে ঋণী ছিলাম—প্রাণ বার ক'রে আমি শোধ দিয়েছি। সে কথা তোমায় কি ব'লব?···দলিল ক'রে পাঠিয়েছে সর্বেসর্বা কত্তাত্তির! কত্তাত্তি ছাড়া বাকী সব সই ক'রে দিয়েছি!···

গঙ্গাধর, তুমি, কালী, শশী, নূতন ছেলেরা—এদের ঠেলে ঐ রাখাল ও বাবুরামকে কত্তা ক'রে দিচ্ছি। গুরুদেব বড় বলতেন। এ তাঁর কাজ। ···প্রাণ ধরে সই ক'রে দিয়েছি। এখন থেকে যা ক'রব, সে আমার কাজ।···

আমি এখন আমার কাজ করতে চললুম। গুরুমহারাজের ঋণ[১] প্রাণ বার ক'রে শুধে দিয়েছি। তাঁর আর দাবি-দাওয়া নেই।···

তোমরা যা ক'রছ, ও গুরুমহারাজের কাজ, ক'রে যাও। আমার যা করবার ক'রে দিয়েছি, বস্। ও-সব সম্বন্ধে আমায় আর কিছু লিখো না, ব'লো না, ওতে আমার মতামত একদম নেই।···এখন থেকে অন্য রকম।···ইতি

নরেন্দ্র

পুঃ—সকলকে আমার ভালবাসা। ইতি

৪৯৩

প্যারিস*

২৫শে অগস্ট, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম; সহৃদয় কথাগুলির জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি মিসেস বুলকে মঠ থেকে টাকা তুলে নেবার সুযোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি ও-বিষয়ে কিছু বললেন না, আর এদিকে ট্রাস্টের

---

১ ২৬শে মে, ১৮৯০ খৃঃ প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য।

দলিলগুলি দস্তখতের জন্য পড়ে ছিল; সুতরাং আমি ব্রিটিশ কনসালের আফিসে গিয়ে সই ক'রে দিয়েছি। কাগজপত্র এখন ভারতের পথে। এখন আমি স্বাধীন, আর কোন বাঁধাবাঁধির ভিতর নেই, কারণ কার্যব্যাপারে আমার আর কোন ক্ষমতা, কর্তৃত্ব বা পদ রাখিনি। রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতির পদও আমি ত্যাগ করেছি।

এখন মঠাদি সব আমি ছাড়া রামকৃষ্ণের অন্যান্য সাক্ষাৎ শিষ্যদের হাতে গেল। ব্রহ্মানন্দ এখন সভাপতি হলেন, তারপর উহা প্রেমানন্দ ইত্যাদির উপর ক্রমে ক্রমে পড়বে।

এখন এই ভেবে আমার আনন্দ হচ্ছে যে, আমার মাথা থেকে এক মস্ত বোঝা নেমে গেল! আমি এখন নিজেকে বিশেষ সুখী বোধ করছি।

কুড়িটি বছর রামকৃষ্ণের সেবা করলাম—তা ভুলের ভিতর দিয়েই হোক বা সাফল্যের ভিতর দিয়েই হোক—এখন আমি কাজ থেকে অবসর নিলাম। বাকী জীবন আপনভাবে কাটাব।

আমি এখন আর কারও প্রতিনিধি নই বা কারও কাছে দায়ী নই। বন্ধুদের কাছে আমার একটা অস্বাভাবিক বাধ্যবাধকতা-বোধ ছিল। এখন আমি বেশ ক'রে ভেবে-চিন্তে দেখলাম—আমি কারও কিছু ধার ধারি না। আমি তো দেখছি, প্রাণ পর্যন্ত পণ ক'রে, আমার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করেছি, পরিবর্তে পেয়েছি (বন্ধুদের) তর্জন-গর্জন, অনিষ্ট-চেষ্টা ও বিরক্তিকর ঝামেলা।...

তোমার চিঠি পড়ে মনে হ'ল, তুমি মনে করেছ, তোমার নূতন বন্ধুদের উপর আমি ঈর্ষান্বিত। আমি কিন্তু তোমাকে চিরদিনের জন্য জানিয়ে রাখছি—আমার অন্য যে-কোন দোষ থাক না কেন, জন্ম থেকেই আমার ভিতর ঈর্ষা, লোভ বা কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা নেই।

আমি আগেও কখন তোমাকে কোন আদেশ করিনি, এখন তো কাজের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই—এখন আর কি আদেশ দেবো? আমি কেবল এই পর্যন্ত জানি যে, যতদিন তুমি সর্বান্তঃকরণে মায়ের সেবা করবে, ততদিন তিনিই তোমাকে ঠিক পথে চালিয়ে নেবেন।

তুমি যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছ, তাদের সম্বন্ধে আমার কখন কোন ঈর্ষা নেই। কোন কিছুতে মেলামেশা করার জন্য আমি কখনও আমার

ভাইদের সমালোচনা করিনি। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস—পাশ্চাত্যদেশীয় লোকদের এই একটা বিশেষত্ব আছে যে, তারা নিজেরা যেটা ভাল মনে করে, সেটা অন্যের উপর জোর ক'রে চাপাবার চেষ্টা করে, তারা ভুলে যায় যে, একজনের পক্ষে যেটা ভাল, অন্যের পক্ষে সেটা ভাল নাও হ'তে পারে। আমার ভয়, তোমার নূতন বন্ধুদের সঙ্গে মেশার ফলে তোমার মন যেদিকে ঝুঁকবে, তুমি অন্যের ভিতর জোর ক'রে সেই ভাব দেবার চেষ্টা করবে। কেবল এই কারণেই আমি কখন কখন কোন বিশেষ প্রভাব থেকে তোমায় দূরে রাখার চেষ্টা করেছিলাম, এর অন্য কোন কারণ নেই। তুমি তো স্বাধীন, তোমার পছন্দমত নিজের কাজ বেছে নাও।...

আমি এইবার সম্পূর্ণ অবসর নিতে ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি মায়ের ইচ্ছা—আমি আমার আত্মীয়দের জন্য কিছু করি। ভাল, বিশ বছর আগে আমি যা ত্যাগ করেছিলাম, আনন্দের সঙ্গে আবার তা ঘাড়ে নিলাম। বন্ধু শত্রু—সকলেই তাঁর হাতের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে সুখ বা দুঃখের ভিতর দিয়ে আমাদের কর্মক্ষয় করার সাহায্য করছে। সুতরাং 'মা' তাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমার চিরস্নেহাবদ্ধ

বিবেকানন্দ

৪৯৪

প্যারিস*

২৮শে অগস্ট, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

এই তো জীবন—শুধু কঠোর পরিশ্রম! আর তা ছাড়া কীই বা আমাদের করবার আছে? কঠোর পরিশ্রম কর! একটা কিছু ঘটবে, একটা পথ খুলে যাবে। আর যদি তা না হয়—হয়তো কখনও হবে না, —তা হ'লে তার পর কী? আমাদের যা কিছু উদ্যম সবই হচ্ছে সাময়িক ভাবে সেই চরম পরিণতি মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা! অহো, মহান্ সর্বদুঃখহর মৃত্যু! তুমি না থাকলে জগতের কী অবস্থাই না হ'ত!

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, বর্তমানে প্রতীয়মান এই জগৎ সত্য নয়, নিত্যও নয়। এর ভবিষ্যৎই বা আরও ভাল হবে কি ক'রে? সেও তো বর্তমানেরই

ফলস্বরূপ ; সুতরাং আরও খারাপ না হলেও ওই ভবিষ্যৎ বর্তমানেরই অনুরূপ হবে !

স্বপ্ন, অহো! কেবলই স্বপ্ন ! স্বপ্ন দেখে চল ! স্বপ্ন—স্বপ্নের ইন্দ্রজালই এ জীবনের হেতু, আবার ওর মধ্যেই এ জীবনের প্রতিবিধানও নিহিত রয়েছে। স্বপ্ন, স্বপ্ন, কেবলই স্বপ্ন ! স্বপ্ন দিয়েই স্বপ্ন ভাঙো।

আমি ফরাসী ভাষা শিখতে চেষ্টা করছি এবং এখানে —র সঙ্গে কথা বলছি। অনেকে ইতিমধ্যেই প্রশংসা করছেন। সারা দুনিয়ার সঙ্গে এই অন্তহীন গোলকধাঁধার কথা, অদৃষ্টের এই সীমাহীন নাটাই-এর (spool) কথা—যার সুতার শেষ কেউ পায় না, অথচ প্রত্যেকে অন্ততঃ তখনকার মতো মনে করে যে, সে তা বের ক'রে ফেলেছে আর তাতে অন্ততঃ তার নিজের তৃপ্তি হয় এবং কিছুকালের মতো সে নিজেকে ভুলিয়ে রাখে—এই তো ব্যাপার ?

ভাল কথা, এখন বড় বড় কাজ করতে হবে। কিন্তু বড় কাজের জন্য মাথা ঘামায় কে ? ছোট কাজই বা কিছু করা হবে না কেন ? একটার চেয়ে অন্যটা তো হীন নয়। গীতা তো ছোটর মধ্যে বড়কে দেখতে শেখায়। ধন্য সেই প্রাচীন গ্রন্থ !···

শরীরের বিষয় চিন্তা করবার খুব বেশী সময় আমার ছিল না। কাজেই শরীর ভালই আছে—ধরে নিতে হবে। এ সংসারে কিছুই চিরদিন ভাল নয়। তবে মাঝে মাঝে আমরা ভুলে যাই—ভাল হচ্ছে শুধু ভাল হওয়া ও ভাল করা।

ভালই হোক আর মন্দই হোক, আমরা সকলেই এ সংসারে নিজ নিজ অংশ অভিনয় ক'রে যাচ্ছি। যখন স্বপ্ন ভেঙে যাবে এবং আমরা রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যাব, তখন এ-সব বিষয়ে আমরা শুধু প্রাণ খুলে হাসব। এই কথাটুকুই আমি নিশ্চয় বুঝেছি। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৪৯৫

(স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিত)

প্যারিস

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯০০

প্রেমাস্পদেষু,

তোমার পত্রে সমস্ত সমাচার অবগত হলুম। পূর্বে স্যান ফ্র্যান্সিস্কো হ'তে পুরো বেদান্তী ও 'হোম্ অব্ ট্রুথ' (Home of Truth)-দের মধ্যে কিঞ্চিৎ গোলমালের আভাস পেয়েছি, একজন লিখেছিল। ও-রকম হয়েই থাকে, বুদ্ধি ক'রে সকলকে সন্তুষ্ট রেখে কাজ চালিয়ে দেওয়াই বিজ্ঞতা।

আমি এখন কিছুদিন অজ্ঞাতবাস করছি। ফরাসীদের সঙ্গে থাকব তাদের ভাষা শিখবার জন্য। এক-রকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে, অর্থাৎ ট্রাস্ট ডীড্-ফিড্ সই ক'রে কলকাতায় পাঠিয়েছি; আমার আর কোন স্বত্ব বা অধিকার রাখি নাই। তোমরা এখন সকল বিষয়ে মালিক, প্রভুর কৃপায় সকল কাজ ক'রে নেবে।

আমার আর ঘুরে ঘুরে মরতে ইচ্ছা বড় নাই। এখন কোথাও বসে পুঁথিপাটা নিয়ে কালক্ষেপ করাই যেন উদ্দেশ্য। ফরাসী ভাষাটা কতক আয়ত্ত হয়েছে, কিন্তু দু-একমাস তাদের সঙ্গে বসবাস করলে বেশ কথাবার্তা কইতে অধিকার জন্মাবে।

এ ভাষাটা আর জার্মান—এ দুটোয় উত্তম অধিকার জন্মালে এক-রকম ইউরোপী বিদ্যায় যথেষ্ট প্রবেশ লাভ হয়। এ ফরাসীর লোক কেবল মস্তিষ্ক-চর্চা, ইহলোক-বাঞ্ছা; ঈশ্বর বা জীব—কুসংস্কার ব'লে দৃঢ় ধারণা, ও-সব কথা কইতেই চায় না !!! আসল চার্বাকের দেশ! দেখি, প্রভু কি করেন! তবে এদেশ হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার শীর্ষ। পারি নগরী পাশ্চাত্য সভ্যতার রাজধানী।

প্রচার-সংক্রান্ত সমস্ত কাজ হ'তে আমায় বিরাম দাও ভায়া। আমি ও-সব থেকে এখন তফাত, তোমরা ক'রে-কর্মে নাও। আমার দৃঢ় ধারণা 'মা' এখন আমা অপেক্ষা তোমাদের দ্বারা শতগুণ কাজ করাবেন।

কালীর এক পত্র অনেকদিন হ'ল পেয়েছিলাম। সে এতদিনে বোধ হয় নিউইয়র্কে এসেছে। মিস ওয়াল্ডো মধ্যে মধ্যে খবর নেয়।

আমার শরীর কখন ভাল, কখন মন্দ। মধ্যে আবার সেই মিসেস মিল্‌টনের হাতঘসা চিকিৎসা হচ্ছে। সে বলে, তুমি ভাল হয়ে গেছ already (ইতিমধ্যেই)! এই তো দেখছি যে—এখন পেটে বায়ু হাজার হোক—চলতে হাঁটতে চড়াই করতেও কোন কষ্ট হয় না। প্রাতঃকালে খুব ডন-বৈঠক করি। তারপর কালা জলে এক ডুব !!

কাল যার কাছে থাকব, তার বাড়ী দেখে এসেছি। সে গরীব মানুষ—scholar (পণ্ডিত); তার ঘরে একঘর বই, একটা ছ-তলার ফ্ল্যাটে থাকে। তায় এদেশে আমেরিকার মত লিফ্‌ট্‌ নেই—চড়াই-ওতরাই। ওতে কিন্তু আমার আর কষ্ট হয় না।

সে বাড়ীটির চারিধারে একটি সুন্দর সাধারণ পার্ক আছে। সে লোকটি ইংরেজী কইতে পারে না, সেইজন্য আরও যাচ্ছি। কাজে কাজেই ফরাসী কইতে হবে আমায়। এখন মায়ের ইচ্ছা। বাকী তাঁর কাজ, তিনিই জানেন। ফুটে তো বলেন না, 'গুম্ হোকে রহতী হ্যায়', তবে মাঝখান থেকে ধ্যান-জপটা তো খুব হয়ে যাচ্ছে দেখছি।

মিস বুক, মিস বেল, মিসেস এস্পিনেল, মিস বেকহাম, মিঃ জর্জ, ডাক্তার লোগান প্রভৃতি সকল বন্ধুদের আমার ভালবাসা দিও ও তুমি নিজে জেনো।

তথা লস্ এঞ্জেলেসের সকলকে আমার ভালবাসা। ইতি

বিবেকানন্দ

৪৯৬

প্যারিস

সেপ্টেম্বর, ১৯০০

প্রিয় তুরীয়ানন্দ,

Just now received your letter (এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম)। মায়ের ইচ্ছায় সমস্ত কাজ চলে যাবে, ভয় খেও না। আমি শীঘ্রই এখান হ'তে অন্যত্র যাব। বোধ হয় কনস্তান্তিনোপল্ প্রভৃতি দেশসকল দেখে বেড়াব কিছুদিন। তারপর 'মা' জানেন। মিসেস উইলমটের এক পত্র পেলুম। তাতে তো তার খুব উৎসাহ বলেই বোধ হ'ল। নিশ্চিন্ত হয়ে গট্ হয়ে বস। সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি নাদশ্রবণাদি দ্বারা কারও হানি হয়

তো ধ্যান ত্যাগ ক'রে দিন কতক মাছ-মাংস খেলেই ও পালিয়ে যাবে। শরীর যদি দুর্বল না হ'তে থাকে তো কোনও ভয়ের কারণ নাই। ধীরে ধীরে অভ্যাস।

তোমার পত্রের জবাব আসবার আগেই আমি এস্থান ত্যাগ ক'রব। অতএব এর জবাব এস্থানে আর পাঠিও না। সারদার[১] কাগজপত্র সব পেয়েছি, এবং তাকে কয়েক সপ্তাহ হ'ল বহুত লিখে পাঠানো গেছে। আরও পরে পাঠাবার উদ্দেশ্য রইল। আমার যাত্রা এখন কোথা, তার নিশ্চিত নাই। এইমাত্র যে, নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করছি।

কালীরও এক পত্র আজ পেলাম। তার জবাব কাল লিখব। শরীর এক-রকম গড়মড় ক'রে চলছে। খাটলেই খারাপ, না খাটলেই ভাল, আর কি? মা জানেন। নিবেদিতা ইংলণ্ড গেছে, মিসেস বুল আর তাতে টাকা যোগাড় করছে। কিষেনগড়ের বালিকাগুলিকে নিয়ে সেইখানেই স্কুল করবে তার ইচ্ছা। যা পারে করুক। আমি কোনও বিষয়ে আর কিছু বলি না—এই মাত্র। আমার ভালবাসা জানিবে। কিন্তু কার্য সম্বন্ধে কোনও বিষয়ে আর আমার কোন উপদেশ নাই। ইতি

দাস

বিবেকানন্দ

৪৯৭

(মিসেস লেগেটকে লিখিত)

প্যারিস*

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯০০

মা

এ বাড়িতে আমাদের একটা খেয়ালীদের কংগ্রেস হয়ে গেল। নানা দেশের প্রতিনিধি এসেছিল,—দক্ষিণে ভারত থেকে উত্তরে স্কটল্যাণ্ড পর্যন্ত, ইংলণ্ড ও আমেরিকাও তার মধ্যে ছিল।

সভাপতি-নির্বাচনের ব্যাপারে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয়েছিল, কারণ ডক্টর জেমস (Prof. William James) যদিও উপস্থিত ছিলেন, তবু তিনি

---

১ 'উদ্বোধনে'র সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

বিশ্বসমস্যা সমাধানের চেয়ে মিসেস মিন্টন (চৌম্বক আরোগ্যকারী) কর্তৃক তাঁর অঙ্গে উৎপাদিত স্ফোটকগুলি সম্বন্ধে বেশী সচেতন ছিলেন।

আমি জো-র নাম প্রস্তাব করেছিলাম, কিন্তু তিনি তাঁর নূতন গাউন যথাসময়ে এসে না পৌঁছানোর দরুন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং সুবিধাজনক জায়গা থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য এক কোণে প্রস্থান করলেন।

মিসেস বুল তৈরীই ছিলেন, কিন্তু মার্গট প্রতিবাদ ক'রে বললেন, সে ক্ষেত্রে সভাটি তুলনামূলক দর্শনের ক্লাসে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।

আমরা যখন এ-রকম সংকটাবস্থায় আছি, তখন তড়াক ক'রে এক কোণ থেকে বেঁটে খাটো গোলমত একটি মূর্তি লাফিয়ে উঠল এবং বিনা ভূমিকায় ঘোষণা ক'রল—কেবল সভাপতির সমস্যা নয়, জীবনসমস্যা পর্যন্ত সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, যদি আমরা শুধু সূর্যদেবতা ও চন্দ্রদেবতার অর্চনা করি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন, কিন্তু সেটাকে অনুবাদ করতে তাঁর শিষ্যের ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লেগেছিল। ইতিমধ্যে উক্ত শিষ্যের গুরুদেব আপনাদের বৈঠকখানার কম্বলাদি টেনে স্তুপাকার ক'রে ফেলেছিলেন এই শুভবাসনায় (যে বাসনার কথা তিনি নিজ মুখেই উচ্চারণ করেছিলেন) যে, তিনি তখনই সেখানে 'অগ্নিদেবতার' মহাশক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে চান।

সেই সন্ধিক্ষণে জো বাধা দিলেন এবং একগুঁয়েমির সঙ্গে বললেন, তাঁদের বৈঠকখানায় অগ্নি-যজ্ঞ তাঁর অভিপ্রেত নয় ; ফলে উক্ত ভারতীয় ঋষি জো-র দিকে অতি ভয়াবহ চোখে তাকালেন, তাকে তিনি অগ্নি-উপাসনায় সম্পূর্ণ দীক্ষিত ব'লে সুনিশ্চিত বিশ্বাস করেছিলেন, তার এরূপ ব্যবহারে ঋষির বিরক্তির সীমা ছিল না।

তখন ডক্টর জেম্স্ তাঁর স্ফোটকের পরিচর্যা থেকে মাত্র এক মিনিট সময় বাঁচিয়ে সেই অবসরে ঘোষণা করলেন যে, অগ্নিদেবতা এবং তাঁর ভ্রাতৃগণ সম্বন্ধে তাঁর একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বক্তব্য আছে। তা তিনি উপস্থিত করতেন, যদি স্বদেহে মিণ্টনীয় স্ফোটকের বিবর্তনের ব্যাপারে তাঁকে নিতান্ত কর্মব্যস্ত না থাকতে হ'ত। তদুপরি তাঁর মহান আচার্য হার্বার্ট স্পেন্সার বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁর পূর্বে গবেষণা করেননি বলে ডঃ জেম্স্ জানালেন, তিনি মহামূল্য নীরবতাকেই দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করবেন।

'চাটনিই সেই বস্তু'—দরজার কাছ থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আমরা সকলে পিছনে তাকালাম। দেখি মার্গট। 'তা হ'ল চাটনি'—মার্গট বললেন, 'চাটনি এবং কালীই জীবনের সর্বদুঃখ নিবারণ করবে, তা সকল মন্দকে গিলতে এবং সকল ভালকে চেখে উপভোগ করতে সাহায্য করবে।' বলতে বলতে তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন, সজোরে জানালেন, তিনি আর একটি কথাও মুখ থেকে বার করবেন না, কারণ বক্তৃতাকালে সমবেত শ্রোতাদের মধ্য থেকে জনৈক পুরুষজীবের দ্বারা তিনি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রোতাদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি জানালার দিকে মাথা ঘুরিয়ে ছিল এবং মহিলার প্রাপ্য মনোযোগ মহিলাকে দিচ্ছিল না, এবং মার্গট যদিও ব্যক্তিগতভাবে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারে বিশ্বাসী, তথাপি তিনি ঐ বিরক্তিকর লোকটির নারীজাতির প্রতি যথাবিহিত সৌজন্যের অভাবের কারণ জানতে চান। তখন সকলে জানালেন, তাঁরা মার্গটকে অখণ্ড মনোযোগ দিয়েছেন, সর্বোপরি দিয়েছেন তাঁর প্রাপ্য সমানাধিকার, কিন্তু বৃথা চেষ্টা, এই ভয়াবহ জনতার সঙ্গে মার্গটের আর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না,—মার্গট বসে পড়লেন।

তখন উঠলেন বস্টনের মিসেস বুল; তিনি বোঝাতে শুরু করলেন, নরনারীর সত্যসম্পর্ক সম্বন্ধে বোধের অভাব থেকে কিভাবে জগতের সকল সমস্যার উৎপত্তি হয়। তিনি বললেন, 'সঠিক মানুষদের মধ্যে যথার্থ বোঝাপড়া,—নরনারীর দাম্পত্য-সম্পর্কের আদর্শকে উন্নত রেখে প্রেমের মধ্যে মুক্তি এবং ঐ মুক্তির মধ্যে মাতৃত্ব ভ্রাতৃত্ব পিতৃত্ব ঈশ্বরত্ব ও স্বাধীনতার সন্ধান,—স্বাধীনতার মধ্যে প্রেম এবং প্রেমের মধ্যে স্বাধীনতা দর্শন,—এগুলির মধ্যেই আছে সর্বব্যাধির একমাত্র ঔষধ।'

এই কথায় স্কচ প্রতিনিধি প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললেন, যেহেতু শিকারী ছাগপালককে তাড়া করেছে, ছাগপালক তাড়া করেছে মেষপালককে, মেষপালক তাড়া করেছে কৃষককে, এবং কৃষক তাড়া করেছে জেলেকে, তাড়া ক'রে তাকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে, এখন আমরা গভীর সমুদ্র থেকে জেলেকে উঠিয়ে এনে কৃষকের উপর ফেলতে চাই, কৃষককে চাই মেষপালকের উপর ফেলতে ইত্যাদি; এমনি করলেই জীবনের জাল সম্পূর্ণ বোনা হবে এবং আমরা সুখী হবো—তাঁকে তাঁর এই তাড়া-করা ব্যাপারে আর বেশীক্ষণ এগোতে দেওয়া হ'ল না। মুহূর্তের মধ্যে সকলে সোজা দাঁড়িয়ে উঠল এবং

আমরা কেবলমাত্র কতকগুলি বিমিশ্র বিশৃঙ্খল চীৎকার শুনতে পেলাম—'সূর্যদেবতা ও চন্দ্রদেবতা', 'চাটনি ও কালী', 'দাম্পত্য-সম্পর্কে মাতৃত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে সঠিক বোঝাপড়ার স্বাধীনতা', 'কখনও নয়, জেলেকে তীরে ফিরে যেতেই হবে' ইত্যাদি। এই অবস্থায় জো ঘোষণা করলেন, কিছু সময়ের জন্য শিকারী হ'তে হবে, এবং পাগলামি না থামালে বাড়ির বাইরে সকলকে তাড়া ক'রে বার ক'রে দিতে তাঁর বড়ই বাসনা হচ্ছে। তখন শান্তি ও নীরবতা ফিরে এল এবং আমি অবিলম্বে আপনাকে লিখতে বসলাম।

আপনার স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৪৯৮

প্যারিস, ফ্রান্স*
১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯০০

প্রিয় এলবার্টা,

আজ সন্ধ্যায় নিশ্চয়ই যাচ্ছি; রাজকুমারী[১] ও তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে দেখা হ'লে অবশ্যই খুব আনন্দিত হবো। যদি বেশী রাত হয়ে যায় এবং এখানে ফিরে আসার অসুবিধা বুঝি, তা হ'লে তোমাদের বাড়িতে আমার শোবার একটা জায়গা ক'রে দিতে হবে।

প্রীতি ও আশীর্বাদসহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

৪৯৯

Perros Guiree, Bretagne*
২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯০০

মায়ের হৃদয়-বৃত্তি, সংকল্প বীরের,
মধুর পরশখানি কোমল ফুলের,
বেদীতলে লীলাময় পুণ্য হোমানলে
সৌন্দর্যের সাথে শক্তি নিত্য যেথা দোলে;

১ সম্ভবত Princess Demidoff

যে শক্তি চালিত করে, প্রেমে বশ হয়,
সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন—পথ ধৈর্যময় ;
আত্মায় বিশ্বাস নিত্য—সকলে তেমন,
ছোটবড় সকলেতে দেবতা দর্শন,
—এই সব আরো যাহা দেখা নাহি যায়,
জগৎ-জননী আজ দিবেন তোমায়।[১]

সদা প্রীতি ও আশীর্বাদ সহ
তোমার বিবেকানন্দ

প্রিয় এলবার্টা,

তোমার জন্মদিনের উপহার এই ছোট্ট কবিতাটি। লেখাটা ভাল হয়নি, কিন্তু আমার সকল ভালবাসা এতে ঢেলে দিয়েছি। তাই আমি নিশ্চিত যে, তোমার এটা ভাল লাগবে।

দয়া ক'রে প্রত্যেকটি পুস্তিকার এক কপি মাদাম বেসনার্ড (Madame Besnard, Clairoix, Bres Compiegne, Oise)-কে পাঠিয়ে আমায় বাধিত করবে কি?

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

৫০০

6 Place Des Etats Unis, Paris[২]
অক্টোবর, ১৯০০

প্রিয় মাদমোয়াজেল,

এখানে আমি খুব সুখী ও পরিতৃপ্ত আছি। অনেক বছর পরে ভাল সময় কাটাচ্ছি। মঁ বোয়ার (Bois) সঙ্গে আমার এখানকার জীবনযাত্রা বেশ তৃপ্ত—রাশি রাশি বই, চারিদিকে শান্তি—আমাকে পীড়িত করে এমন জিনিস এখানে নেই।

কিন্তু জানি না কোন্ নিয়তি আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

---

১ মিস এলবার্টা স্টার্জিসকে তাঁর ২৩শ জন্মদিনে লিখিত।

২ মূলপত্র ফরাসী ভাষায় লিখিত।

আমার (ফরাসী ভাষার) চিঠিটা ভারি মজার, তাই নয় কি? তবে এটা আমার প্রথম প্রয়াস।

আপনার বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

৫০১

(সিস্টার ক্রিস্টিনকে লিখিত)

প্যারিস[১]
১৪ই অক্টোবর, ১৯০০

ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রতি পদে তোমার উপর বর্ষিত হোক, প্রিয় ক্রিস্টিন, এই আমার নিরন্তর প্রার্থনা।

তোমার পরম সুন্দর শান্তিময় চিঠিখানি আমাকে নূতন শক্তি দিয়েছে, যে শক্তি আমি অনেক সময় হারিয়ে ফেলি।

আমি সুখী, হ্যাঁ, সুখী, কিন্তু এখনও মনের মেঘ কাটেনি একেবারে। সে মেঘ দুর্ভাগ্যবশতঃ ফিরে আসে মাঝে মাঝে, কিন্তু পূর্বের মতো গ্লানিকর প্রভাব নেই তার।

মঁ জুল বোয়া (M. Jules Bois) নামে একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখকের সঙ্গে আছি। আমি তাঁর অতিথি। লেখা থেকে জীবিকা অর্জন করতে হয় তাঁকে, তাই তিনি ধনী নন, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক উচ্চ উচ্চ চিন্তার ঐক্য আছে এবং আমরা পরস্পরের সাহচর্যে বেশ আনন্দে আছি।

বছর কয়েক আগে তিনি আমাকে আবিষ্কার করেন, এবং আমার কয়েকটি পুস্তিকা ইতিমধ্যেই ফরাসীতে অনুবাদ ক'রে ফেলেছেন। আমরা দু-জনেই অবশেষে একদিন আমাদের সন্ধানের বস্তুকে পেয়ে যাব, কি বলো?

এমনভাবেই মাদাম কালভে, মিস ম্যাকলাউড ও মঁ জুল বোয়ার সঙ্গে ঘুরে বেড়াব। খ্যাতনামা গায়িকা মাদাম কালভের অতিথি হবো।

কনস্তান্তিনোপল্, নিকট প্রাচ্য, গ্রীস এবং মিশরে যাব আমরা। ফেরার পথে ভিনিস দেখে আসব।

---

১ ফরাসী ভাষায় লিখিত।

ফিরে আসার পর প্যারিসে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে পারি, কিন্তু সেগুলি দেবো ইংরেজীতে, সঙ্গে দোভাষী থাকবে।

এ বয়সে একটা নূতন ভাষা শেখার মতো সময় বা শক্তি আর নেই। আমি এখন বুড়ো মানুষ, কি বলো ?

মিসেস ফাঙ্কে (Mrs. Funke) অসুস্থ। তিনি বেজায় খাটেন। আগে থেকেই তাঁর স্নায়ুর পীড়া ছিল। আশা করি শীঘ্রই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

আমেরিকায় উপার্জিত সব টাকা ভারতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি মুক্ত, পূর্বের মতো ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী, মঠের সভাপতির পদও ছেড়ে দিয়েছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি মুক্ত! এ ধরণের দায়িত্ব আর আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে না। এমনই স্নায়ুপ্রবণ হয়ে উঠেছি, আর এতই দুর্বল।

'গাছের শাখায় ঘুমন্ত পাখী রাত পোহালে যেমন জেগে উঠে গান করে, আর উড়ে যায় গভীর নীলাকাশে, ঠিক তেমনিভাবেই আমার জীবনের শেষ।'

জীবনে অনেক কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়েছি, বিরাট সাফল্যও পেয়েছি কখনও কখনও, কিন্তু এই সব বাধা ও বেদনা মূল্যহীন হয়ে গেছে আমার শেষ প্রাপ্তির কাছে,—আমি পেয়ে গিয়েছি আমার লক্ষ্যকে; আমি যে মুক্তার সন্ধানে জীবনসমুদ্রে ডুব দিয়েছিলাম, তা তুলে আনতে পেরেছি। আমার পুরস্কার আমি পেয়েছি; আমি আনন্দিত।

তাই মনে হচ্ছে, আমার জীবনের এক নূতন অধ্যায় খুলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, 'মা' আমাকে সন্তর্পণে সস্নেহে চালিয়ে নিয়ে যাবেন। বিঘ্নসঙ্কুল পথে হাঁটবার চেষ্টা আর নয়, এখন পাখির পালকের বিছানা। বুঝলে কি ? বিশ্বাস কর, তা হবেই; আমি নিশ্চিন্ত।

আমার এ-যাবৎ লব্ধ জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, ঐকান্তিকভাবে আমি যা চেয়েছি সর্বদা তা পেয়েছি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কখনও অনেক দুঃখের পরে তা পেয়েছি, কিন্তু তাতে কি আসে যায়! পুরস্কারের মধুর স্পর্শ সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। বন্ধু, তুমিও দুঃখের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছ, তোমার পুরস্কার তুমি পাবে। কিন্তু হায়! এখন তুমি যা পাচ্ছ তা পুরস্কার নয়, অতিরিক্ত দুঃখের বোঝা।

আমার বেলায় দেখছি, মেঘ হালকা হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে—আমার দুষ্কৃতির মেঘ; আর সুকৃতির জ্যোতির্ময় সূর্য উঠছে। বন্ধু, তোমার বেলায়ও তাই হবে। এই ভাষায় (ফরাসী ভাষায়) ভাবাবেগ প্রকাশ করার মতো ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু আবেগকে কোন্ ভাষাই বা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে?

সুতরাং এইখানেই ছেড়ে দিচ্ছি, আমার ভাবনাকে কোমল মধুর উজ্জ্বল হৃদয়ের ভাষায় তুমি মণ্ডিত করবে, এই আশায়। বিদায়।

তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু
বিবেকানন্দ

পুনঃ—২৯শে অক্টোবর আমরা ভিয়েনার পথে প্যারিস ছেড়ে যাব। আগামী সপ্তাহের মধ্যে মিঃ লেগেট যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাচ্ছেন। পোস্ট অফিসকে আমরা জানিয়ে যাব, তারা যেন আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থলে চিঠিগুলি পাঠিয়ে দেয়।

বিবেকানন্দ

৫০২

পোর্ট টাউফিক্*
২৬শে নভেম্বর, ১৯০০

প্রিয় জো,

জাহাজখানির আসতে দেরি হচ্ছে, তাই অপেক্ষা করছি। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, আজ জাহাজ পোর্ট সৈয়দে খালের মধ্যে ঢুকেছে। তার মানে, সব ঠিক ঠিক চললে সন্ধ্যায় জাহাজ এখানে (পোর্টে) পৌঁছবে। অবশ্য এ দুদিন যেন নির্জন কারাবাস চলেছে; আর আমি কোনরকমে ধৈর্য ধরে আছি। কিন্তু এরা বলে পরিবর্তনের মূল্য তিনগুণ বেশী। মিঃ গেজের এজেণ্ট আমায় সব ভুল নির্দেশ দিয়েছিল। প্রথমতঃ আমায় স্বাগত জানানো তো দূরের কথা, কিছু বুঝিয়ে দেবার মতো কেউই এখানে ছিল না। দ্বিতীয়তঃ আমায় কেউ বলেনি যে, অন্য জাহাজের জন্য আমাকে এজেণ্টের আফিসে গিয়ে গেজের টিকিটখানি পালটে নিতে হবে—আর তা করবার জায়গা সুয়েজ, এখানে নয়। সুতরাং জাহাজখানির দেরি হওয়ায় এক হিসাবে ভালই

হয়েছিল। এই সুযোগে আমি জাহাজের এজেণ্টের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম; আর তিনি আমায় নির্দেশ দিলেন, আমি যেন গেজের পাসখানি পালটিয়ে যথারীতি টিকিট ক'রে নিই।

আজ রাত্রে কোন এক সময়ে জাহাজে উঠব, আশা করি। আমি ভাল আছি ও সুখে আছি, আর এ মজাটা উপভোগ করছি খুব।

মাদমোয়াজেল কেমন আছেন? বোয়া (Bois) কোথায়? মাদাম কালভেকে আমার চিরকৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাবে। তিনি বড় চমৎকার মাহলা। আশা করি, তোমার ভ্রমণটি উপভোগ্য হবে।

তোমাদের সতত স্নেহশীল
বিবেকানন্দ

৫০৩

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*
১১ই ডিসেম্বর, ১৯০০

প্রিয় জো,

পরশু রাত্রে আমি এখানে পৌঁছেছি। কিন্তু হায়! এত তাড়াহুড়া ক'রে এসেও কোন লাভ হ'ল না। ক্যাপ্টেন সেভিয়ার বেচারা কয়েক দিন পূর্বেই দেহত্যাগ করেছেন। এভাবে দুজন মহাপ্রাণ ইংরেজ আমাদের জন্য—হিন্দুদের জন্য আত্মদান করলেন। শহীদ কোথাও থাকে তো—এঁরাই। মিসেস সেভিয়ারকে এইমাত্র পত্র লিখলাম তাঁর ভাবী কার্যক্রম জানবার জন্য।

আমি ভাল আছি। এখানকার সবই সবদিক দিয়ে ভালভাবেই চলছে। তাড়াতাড়ি চিঠি লিখলাম—কিছু মনে ক'রো না। শীঘ্র দীর্ঘ পত্র দেবো। ইতি

সর্বদা
তোমাদেরই বিবেকানন্দ

৫০৪

(মিসেস ওলি বুলকে লিখিত)

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*
১৫ই ডিসেম্বর, ১৯০০

মা,

কয়েক দিন আগে এখানে পৌছেছি। আমার আগমন একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল, সকলেই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল।

আমার অনুপস্থিতি-কালে আমি যতটা আশা করেছিলাম, কাজ তার চেয়েও ভালভাবে চলেছে; শুধু মিঃ সেভিয়ার দেহত্যাগ করেছেন। এটা সত্যই একটা প্রচণ্ড আঘাত—হিমালয়ে কাজের ভবিষ্যৎ যে কি হবে জানি না। মিসেস সেভিয়ার এখনও সেখানে আছেন এবং আমি রোজই তাঁর কাছ থেকে চিঠি আশা করছি।...

সারদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ আগের থেকে ভাল আছে; এ বছর এখানে ম্যালেরিয়া নাই। গঙ্গার ধারের এই ফালি জমিটা সব সময়েই ম্যালেরিয়া-মুক্ত। শুধু প্রচুর বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা হলেই অবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দর হবে। ইতি

বিবেকানন্দ

৫০৫

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*
১৯শে ডিসেম্বর, ১৯০০

প্রিয় নিবেদিতা,

মহাদেশসমূহের আর একপ্রান্ত থেকে একটি স্বর তোমায় প্রশ্ন করছে: 'কেমন আছ?' এতে তুমি অবাক হচ্ছ না কি? বস্তুতঃ আমি হচ্ছি ঋতুর সঙ্গে বিচরণকারী একটি বিহঙ্গম।

আনন্দমুখর ও কর্মচঞ্চল প্যারিস, দৃঢ়গঠিত প্রাচীন কনস্তান্তিনোপল্, চাকচিক্যময় ক্ষুদ্র এথেন্স, পিরামিড-শোভিত কায়রো—সবই পেছনে ফেলে এসেছি; আর এখন আমি এখানে, গঙ্গার তীরে মঠে আমার ঘরে বসে লিখছি। চতুর্দিকে কি শান্ত নীরবতা! প্রশস্ত নদী দীপ্ত সূর্যালোকে নাচছে; শুধু ক্বচিৎ দু-একখানা মালবাহী নৌকার দাঁড়ের শব্দে সে স্তব্ধতা ক্ষণিকের জন্য ভেঙে যাচ্ছে।

এখানে এখন শীতকাল চলেছে; কিন্তু প্রতিদিন মধ্যাহ্ন বেশ উষ্ণ ও উজ্জ্বল। এ হচ্ছে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার শীতেরই মতো। সর্বত্র সবুজ ও সোনালী রঙের ছড়াছড়ি, আর কচিঘাসগুলি যেন মখমলের মতো। অথচ বাতাস শীতল, পরিষ্কার ও আরামপ্রদ। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

৫০৬

(শ্রীমতী মৃণালিনী বসুকে লিখিত)

দেওঘর, বৈদ্যনাথ

বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০০

মা,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম; তুমি যা বুঝিয়াছ, তাহা ঠিক। 'স ঈশ অনির্বচনীয়ঃ প্রেমস্বরূপঃ'—সেই ঈশ্বর অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ, এই নারদোক্ত লক্ষণটি যে প্রত্যক্ষ এবং সর্ববাদিসম্মত, আমার জীবনের ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত। অনেকগুলি ব্যক্তির একত্র নাম 'সমষ্টি', এক-একটির নাম 'ব্যষ্টি'। তুমি আমি 'ব্যষ্টি', সমাজ 'সমষ্টি'। তুমি আমি পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্রাদি এক একটি 'ব্যষ্টি', আর এই জগৎটি 'সমষ্টি'—বেদান্তে ইহাকেই বিরাট বা হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর বলে। পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দেবী ইত্যাদি নাম।

ব্যষ্টির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে কি না এবং কত পরিমাণে হওয়া উচিত, সমষ্টির নিকট ব্যষ্টির একেবারে সম্পূর্ণ আত্মেচ্ছা, আত্মসুখ ত্যাগ করা উচিত কি না, এই প্রশ্নই সমাজের অনাদি কালের বিচার্য। এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত লইয়াই সকল সমাজ ব্যস্ত; আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে ইহাই প্রবল তরঙ্গ-রূপ ধারণ করিয়া সমুত্থিত হইয়াছে। যে মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের প্রভুতার সম্মুখে বলি দিতে চায়, তাহার ইংরেজী নাম সোশ্যালিজম্, ব্যক্তিত্বসমর্থক মতের নাম ইণ্ডিভিজুয়ালিজম্।

সমাজের নিকট ব্যক্তির—নিয়মের ও শিক্ষার শাসন দ্বারা চিরদাসত্বের ও বলপূর্বক আত্মবিসর্জনের কি ফল ও পরিণাম, আমাদের মাতৃভূমিই তাহার

জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এদেশে লোকে শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে জন্মায়, ভোজন-পানাদি আজীবন নিয়মানুসারে করে, বিবাহাদিও সেইপ্রকার; এমন কি, মরিবার সময়ও সেইসকল শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে প্রাণত্যাগ করে। এই কঠোর শিক্ষার একটি মহৎ গুণ আছে, আর সকলই দোষ। গুণটি এই যে, দুটি-একটি কার্য পুরুষানুক্রমে প্রত্যহ অভ্যাস করিয়া অতি অল্পায়াসে সুন্দর রকমে লোকে করিতে পারে। তিনখানা মাটির ঢিপি ও খানকতক কাষ্ঠ লইয়া এদেশের রাঁধুনি যে সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, তাহা আর কোথাও নাই। একটা মান্ধাতার আমলের এক টাকা দামের তাঁত ও একটা গর্তের ভিতর পা, এই সরঞ্জামে ২০৲ টাকা গজের কিংখাব কেবল এদেশেই হওয়া সম্ভব। একখানা ছেঁড়া মাদুর, একটা মাটির প্রদীপ, তায় রেড়ির তেল, এই উপাদান-সহায়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত এদেশেই হয়। খেঁদা-বোঁচা স্ত্রীর উপর সর্বসহিষ্ণু মহত্ত্ব ও নির্গুণ মহাদুষ্ট পতির উপর আজন্ম ভক্তি এদেশেই হয়! এই তো গেল গুণ।

কিন্তু এই সমস্তগুলিই মনুষ্য প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হয়ে করে; তাতে মনোবৃত্তির স্ফূর্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, তীব্র সুখানুভূতি নাই, বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই, উদ্ভাবনী-শক্তির উদ্দীপনা একেবারেই নাই, নূতনত্বের ইচ্ছা নাই, নূতন জিনিসের আদর নাই। এ হৃদয়াকাশের মেঘ কখনও কাটে না, প্রাতঃসূর্যের উজ্জ্বল ছবি কখনও মনকে মুগ্ধ করে না। এ অবস্থার অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কি না, মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎসাহের অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যায়।

নিয়মে চলিতে পারিলেই যদি ভাল হয়, পূর্বপুরুষানুক্রমে সমাগত রীতি-নীতির অখণ্ড অনুসরণ করাই যদি ধর্ম হয়, বল, বৃক্ষের অপেক্ষা ধার্মিক কে? রেলের গাড়ীর চেয়ে ভক্ত সাধু কে? প্রস্তরখণ্ডকে কে কবে প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গ করিতে দেখিয়াছে? গো-মহিষাদিকে কে কবে পাপ করিতে দেখিয়াছে?

অতি প্রকাণ্ড কলের জাহাজ, মহাবলবান্ রেলের গাড়ীর ইঞ্জিন,—তাহারাও জড়; চলে-ফেরে, ধাবমান হয়, কিন্তু জড়। আর ঐ যে ক্ষুদ্র

কীটাণুটি রেলের গাড়ীর পথ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সরিয়া গেল, ওটি চৈতন্যশালী কেন? যন্ত্রে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ নাই, যন্ত্র নিয়মকে অতিক্রম করিতে চায় না; কীটটি নিয়মকে বাধা দিতে চায়, পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের বিপক্ষে উত্থিত হয়, তাই সে চেতন। এই ইচ্ছাশক্তির যেথায় যত সফল বিকাশ, সেথায় সুখ তত অধিক, সে জীব তত বড়। ঈশ্বরে ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ সফলতা, তাই তিনি সর্বোচ্চ।

বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া?—না, নানাবিধ জ্ঞানার্জন? তাও নয়। যে শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা। এখন বোঝ, যে শিক্ষার ফলে এই ইচ্ছাশক্তি ক্রমাগত পুরুষানুক্রমে বলপূর্বক নিরুদ্ধ হইয়া এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, যাহার শাসনে নূতন ভাবের কথা দূরে থাক, পুরাতনগুলিই একে একে অন্তর্হিত হইতেছে, যাহা মনুষ্যকে ধীরে ধীরে যন্ত্রের ন্যায় করিয়া ফেলিতেছে, সে কি শিক্ষা? চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন ইচ্ছা—চৈতন্য-শক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর। আর এই মৃৎপিণ্ডপ্রায়, প্রাণহীন যন্ত্রগুলির মতো উপলরাশির ন্যায় স্তূপীকৃত মনুষ্যসমষ্টির দ্বারা যে সমাজ গঠিত হয়, সে কি সমাজ? তাহার কল্যাণ কোথায়? কল্যাণ যদি সম্ভব হইত, তবে সহস্র বৎসরের দাস না হইয়া আমরাই পৃথিবীর সর্বোচ্চ জাতি হইতাম, মহামূর্খতার আকর না হইয়া ভারতভূমিই বিদ্যার চিরপ্রস্রবণ হইত।

তবে কি আত্মত্যাগ ধর্ম নহে? বহুর জন্য একের সুখ—একের কল্যাণ উৎসর্গ করা কি একমাত্র পুণ্য নহে? ঠিক কথা, কিন্তু আমাদের ভাষায় বলে, 'ঘষে-মেজে রূপ কি হয়? ধরে-বেঁধে প্রীত কি হয়?' চিরভিখারীর ত্যাগে কি মাহাত্ম্য? ইন্দ্রিয়হীনের ইন্দ্রিয়সংযমে কি পুণ্য? ভাবহীন, হৃদয়হীন, উচ্চ-আশাহীনের, সমাজের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-জ্ঞানহীনের আবার আত্মোৎসর্গ কি? বলপূর্বক সতীদাহে কি সতীত্বের বিকাশ? কুসংস্কার শিখাইয়া পুণ্য করানোই বা কেন? আমি বলি, বন্ধন খোল, জীবের বন্ধন খোল, যতদূর পারো বন্ধন খোল। কাদা দিয়ে কাদা ধোয়া যায়? বন্ধনের দ্বারা কি বন্ধন কাটে? কার কেটেছে? সমাজের জন্য যখন সমস্ত নিজের সুখেচ্ছা বলি দিতে পারবে, তখন তো তুমিই বুদ্ধ হবে, তুমিই মুক্ত হবে, সে ঢের দূর!

আবার তার রাস্তা কি জুলুমের উপর দিয়ে? আহা!! আমাদের বিধবাগুলি কি নিঃস্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত, এমন রীতি কি আর হয়!!! আহা, বাল্য-বিবাহ কি মধুর!! সে স্ত্রী-পুরুষে ভালবাসা না হয়ে কি যায়!!! এই ব'লে নাকে কান্নার এক ধুয়া উঠেছে। আর পুরুষের বেলা অর্থাৎ যাঁদের হাতে চাবুক, তাঁদের বেলা ত্যাগের কিছুই দরকার নাই। সেবাধর্মের চেয়ে কি আর ধর্ম আছে? কিন্তু সেটা বামুন-ঠাকুরের বেলা নহে, তোমরাই কর। আসল কথা, মা-বাপ আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি এদেশের—নিজের স্বার্থের জন্য, নিজে সামাজিক অবমাননা হইতে বাঁচিবার জন্য পুত্র-কন্যাদি সব নির্মম হইয়া বলিদান করিতে পারেন, এবং পুরুষানুক্রমে শিক্ষা মানসিক জড়ত্ব বিধান করিয়া উহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। যে বীর, সেই ত্যাগ করতে পারে; যে কাপুরুষ, সে চাবুকের ভয়ে এক হাতে চোখ মুচছে আর এক হাতে দান করছে, তার দানে কি ফল? জগৎপ্রেম অনেক দূর। চারাগাছটিকে ঘিরে রাখতে হয়, যত্ন করতে হয়। একটিকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে শিখতে পারলে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা যায়। ইষ্ট-দেবতাবিশেষে ভক্তি হ'লে ক্রমে বিরাট ব্রহ্মে প্রীতি হ'তে পারে।

অতএব একজনের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারলে তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা কহা উচিত, তার আগে নয়। সকাম থেকেই নিষ্কাম হয়। কামনা না আগে থাকলে কি কখন তাহার ত্যাগ হয়? আর তার মানেই বা কি? অন্ধকার না থাকলে কি কখন আলোকের মানে হয়?

সকাম সপ্রেম পূজাই প্রথম। ছোটর পূজাই প্রথম, তারপর আপনা আপনি বড় আসবে।

মা, তুমি চিন্তিত হয়ো না। বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। কাঠ নেড়ে দিলে বেশী জ্বলে, সাপের মাথায় আঘাত লাগলে তবে সে ফণা ধরে, ইত্যাদি।[১] যখন হৃদয়ের মধ্যে মহা যাতনা উপস্থিত হয়, চারিদিকে দুঃখের ঝড় উঠে, বোধ হয় যেন এ-যাত্রা আলো দেখতে পাব না, যখন আশা-ভরসা প্রায় ছাড়ে ছাড়ে, তখনই এই মহা আধ্যাত্মিক দুর্যোগের মধ্য হইতে অন্তর্নিহিত

১ তুলনীয়: The wounded snake its hood unfurls,
The flame stirred up doth blaze, etc.
The Song of the Free

ব্রহ্মজ্যোতি স্ফূর্তি পায়। ক্ষীর-ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছেন? কাঁদতে ভয় পাও কেন? কাঁদো। কেঁদে কেঁদে তবে চোখ সাফ হয়, তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবে আস্তে আস্তে মানুষ জন্তু গাছপালা দূর হয়ে তার জায়গায় সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়। তখন—

'সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥'

—সর্বত্র সমানভাবে বিদ্যমান ঈশ্বরকে জানিয়া নিজে আর নিজেকে হিংসা করেন না (অর্থাৎ সবই তিনি), তখনই পরমা গতি প্রাপ্ত হন।

সদা শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

৫০৭

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

মঠ, বেলুড়
২৬শে ডিসেম্বর, ১৯০০

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রে সমস্ত অবগত হলুম। শরীর যদি খারাপ হয়, অবশ্য এখানে তোমার আসা উচিত নয়—এবং আমিও কল্য মায়াবতী যাচ্ছি। সেখানে আমার একবার যাওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

আলাসিঙ্গা যদি আসে, আমার প্রত্যাগমন-অপেক্ষা তাকে করতে হবে। কানাই সম্বন্ধে এরা কি করছে—তা জানি না। আমি আলমোড়া হ'তে শীঘ্রই ফিরব, তারপর মান্দ্রাজ যাওয়া হ'তে পারে। ওয়ানিয়ামবড়ি (Vaniyambadi) হ'তে এক পত্র পেয়েছি—তাদের আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিয়ে এক পত্র লিখো এবং আমি মান্দ্রাজ আসবার সময় অবশ্য সে-স্থান হয়ে আসব, এ কথা জানিও। সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে। তুমি অতিরিক্ত পরিশ্রম করবে না। আর আর সমস্ত মঙ্গল। ইতি

বিবেকানন্দ

৫০৮

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*
২৬শে ডিসেম্বর, ১৯০০

প্রিয় জো,

আজকের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম। সেই সঙ্গে মা এবং এলবার্টার চিঠিও পেলাম। এলবার্টার পণ্ডিত বন্ধুবর রাশিয়া সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা প্রায় আমার ধারণারই মতো। তার চিন্তার একটা জায়গায় শুধু মুশকিল দেখছি—সমগ্র হিন্দুজাতির পক্ষে এককালে রাশিয়ার ভাবে ভাবিত হওয়া সম্ভব কি ?

আমাদের প্রিয় বন্ধু মিঃ সেভিয়ার—আমি পৌছবার আগেই দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের পাশ দিয়ে যে নদীটি প্রবাহিত, তারই তীরে হিন্দুরীতিতে তাঁর সংকার করা হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা তাঁর পুষ্পমাল্য-শোভিত দেহ বহন ক'রে নিয়েছিল এবং ব্রহ্মচারীরা বেদধ্বনি করেছিল।

আমাদের আদর্শের জন্য ইতিমধ্যেই দু-জন ইংরেজের[১] আত্মদান হয়ে গেল। এর ফলে প্রিয় প্রাচীন ইংলণ্ড ও তার বীর সন্তানগণ আমার আরও প্রিয় হয়ে উঠেছে। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ শোণিতধারায় ভবিষ্যৎ ভারতের চারা-গাছটি মহামায়া যেন বারিসিঞ্চিত করছেন—মহামায়ারই জয় হউক।

মিসেস সেভিয়ার অবিচলিত আছেন। প্যারিসের ঠিকানায় তিনি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা এই ডাকে ফিরে এল। আগামী কাল আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পাহাড়ে যাব। ভগবান তাঁর এই প্রিয় ও সাহসী মহিলাকে আশীর্বাদ করুন।

আমি নিজে দৃঢ় এবং শান্ত আছি। আজ পর্যন্ত কোন ঘটনা কখনও আমাকে বিচলিত করতে পারেনি ; আজও মহামায়া আমাকে অবসন্ন হ'তে দেবেন না।

শীতাগমের সঙ্গে সঙ্গে এ স্থান বেশ আরামপ্রদ হয়ে উঠেছে। অনাচ্ছাদিত তুষারাবরণে হিমালয় আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।

মিঃ জনস্টন্ নামক যে যুবকটি নিউইয়র্ক থেকে রওনা হয়ে এসেছিল, সে ব্রহ্মচর্য-ব্রত গ্রহণ করেছে এবং মায়াবতীতে আছে।

---

১ মিঃ সেভিয়ার ও মিঃ গুডউইন।

টাকাটা সারদানন্দের নামে মঠে পাঠিয়ে দিও, কারণ আমি পাহাড়ে চলে যাচ্ছি। তারা তাদের সাধ্যমত ভাল কাজই করেছে। আমি খুশী এবং স্নায়বিক বিরক্তির জন্য নিজেকেই বেকুব মনে করছি। তারা বরাবরের মতো সৎ ও বিশ্বাসী আছে এবং তাদের শরীরও সুস্থ।

মিসেস বুলকে এ-সকল সংবাদ লিখো এবং ব'লো যে, তিনিই বরাবর ঠিক বলেছেন, আর আমারই ভুল হয়েছে। সে-জন্য আমি সহস্রবার তাঁর নিকট ক্ষমা চাইছি। তাঁকে ও —কে আমার অগাধ ভালবাসা দিও।

সমুখে পিছনে তাকাই যখন
দেখি সবকিছু ঠিকই আছে।
আত্মার জ্যোতি জ্বল জ্বল করে
আমার গভীর দুখের মাঝে।[১]

—কে, মিসেস —কে, প্রিয় জুল বোয়াকে আমার ভালবাসা জানাবে। প্রিয় জো, তুমি আমার প্রণাম জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

৫০৯

মায়াবতী, হিমালয়*
৬ই জানুআরি, ১৯০১

প্রিয় ধীরামাতা,

ডাক্তার বসু আপনার মারফত যে 'নাসদীয় সূক্ত' পাঠিয়েছিলেন, আমি এখনি তার অনুবাদ পাঠাচ্ছি। আমি অনুবাদটিকে যতটা সম্ভব আক্ষরিক করতে চেষ্টা করেছি। আশা করি, ডাক্তার বসু ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

মিসেস সেভিয়ার খুব দৃঢ়চিত্ত মহিলা এবং খুব শান্ত ও সবলভাবে শোক সহ্য ক'রে নিয়েছেন। তিনি এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডে যাচ্ছেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে যাচ্ছি।

এ স্থানটি অতি সুন্দর এবং তারা (আশ্রমবাসীরা) একে খুব মনোরম ক'রে তুলেছে। কয়েক একর পরিমিত বিশাল স্থানটি সযত্নে রাখা হয়েছে।

১ 'Light' কবিতা দ্রষ্টব্য।

আশা করি মিসেস সেভিয়ার ভবিষ্যতে ইহা রক্ষা করতে পারবেন। অবশ্য তিনি বরাবরই এরূপ আশা করছেন।

জো-র কাছ থেকে শেষ চিঠিতে জানতে পেলাম, সে মাদাম কালভের সঙ্গে…যাচ্ছে।

জেনে সুখী হলাম, মার্গট ভবিষ্যতে কাজে লাগাবার জন্য তার বিদ্যা রেখে দিচ্ছে। তার বইখানা এখানে খুব সমাদর লাভ করেছে, কিন্তু মনে হয় প্রকাশকেরা বিক্রির জন্য তেমন চেষ্টা করছে না।

কলকাতার প্রথম দিনের ছোঁয়াচেই আমার হাঁপানি আবার দেখা দিয়েছিল। সেখানে যে দু-সপ্তাহ ছিলাম, প্রতি রাত্রেই রোগের আক্রমণ হ'ত। হিমালয়ে বেশ ভাল আছি। এখানে খুব বরফ পড়ছে, পথে প্রবল হিমঝঞ্ঝার মধ্যে পড়েছিলাম; কিন্তু ঠাণ্ডা তত বেশী নয়। এখানে আসার পথে দুদিন ঠাণ্ডা লাগায় খুব উপকার হয়েছে ব'লে মনে হয়।

আজ মিসেস সেভিয়ারের জমিগুলি দেখতে দেখতে বরফের উপর দিয়ে মাইলখানেক চড়াই করেছি। সেভিয়ার সব জায়গায় সুন্দর রাস্তা তৈরি করেছেন। প্রচুর বাগান মাঠ ফলগাছ এবং দীর্ঘ বন তাঁর দখলে। থাকবার কুটিরগুলি কি সাদাসিদে পরিচ্ছন্ন সুন্দর, এবং সর্বোপরি কাজের উপযোগী!

আপনি কি শীঘ্রই আমেরিকা যাচ্ছেন? যদি না যান, তা হ'লে তিনমাসের মধ্যে লণ্ডনে আপনার সঙ্গে দেখা হবে, আশা করি।

অনুগ্রহ ক'রে মিস ওলককে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। এর পরে যখন মিস মূলারের সঙ্গে আপনার দেখা হবে, তাকে ও স্টার্ডিকে আমার গভীর ভালবাসা জানাবেন। কলকাতায় আমার মা, ভগ্নী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করেছি।

এখানকার সকলেই আপনাকে ভালবাসা জানাচ্ছে।

আপনার চিরস্নেহাবদ্ধ সন্তান
বিবেকানন্দ

পুনঃ—৺কালী দুটি বলি গ্রহণ করেছেন; মহৎ উদ্দেশ্যে দু-জন ইউরোপীয় শহীদ আত্মত্যাগ করেছেন, এখন কাজ অতি সুন্দরভাবে এগিয়ে চলবে। বি এলবার্টা ও —কে আমার ভালবাসা জানাচ্ছি।

চারদিকে ছ-ইঞ্চি গভীর বরফ পড়ে আছে, সূর্য উজ্জ্বল ও মহীয়ান্, আর মধ্যাহ্নে বাহিরে বসে আমরা বই পড়ছি। আমাদের চারধারেই বরফ! বরফ থাকা সত্ত্বেও শীতকাল এখানে বেশ মৃদু। বায়ু শুষ্ক ও স্নিগ্ধকর, এবং জল প্রশংসার অতীত।

৫১০

মায়াবতী, হিমালয়*
১৫ই জানুআরি, ১৯০১

প্রিয় স্টার্ডি,

সারদানন্দের কাছে খবর পেলাম যে, ইংলণ্ডের কাজের জন্য যে ১,৫২৯।/৫ পাই হাতে ছিল, তা তুমি মঠে পাঠিয়ে দিয়েছ। এ টাকা ভাল কাজেই লাগবে নিশ্চিত।

প্রায় তিন মাস আগে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার দেহত্যাগ করেছেন। তাঁরা এই পাহাড়ের উপর একটি সুন্দর আশ্রম স্থাপন করেছেন; আর মিসেস সেভিয়ারের ইচ্ছা যে, তিনি আশ্রমটি সংরক্ষণ করেন। আমি এখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি এবং হয়তো তাঁরই সঙ্গে ইংলণ্ডে যেতে পারি।

আমি প্যারিস থেকে তোমায় একখানি চিঠি লিখেছিলাম, তুমি বোধ হয় তা পাওনি।

মিসেস স্টাডির দেহত্যাগের খবরে বড়ই দুঃখিত হলাম। তিনি সাধ্বী স্ত্রী ও স্নেহময়ী মাতা ছিলেন; জীবনে এরূপ মহিলা বড় একটা চোখে পড়ে না। এ জীবন আঘাতপূর্ণ; কিন্তু সে আঘাতের ব্যথা যেমন করেই হোক চলে যায়—এই যা আশা!

আগের চিঠিতে খোলাখুলিভাবে তোমার মনোভাব প্রকাশ করেছ ব'লে যে আমি চিঠি লেখা বন্ধ করেছি—তা নয়। আমি শুধু ঢেউটা চলে যাবার অপেক্ষায় ছিলাম, এই হচ্ছে আমার রীতি। চিঠি লিখলে তিলকে তাল ক'রে তোলা হ'ত।

মিসেস জনসন্ ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হ'লে তাদের আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানিও। ইতি

চিরসত্যবদ্ধ
তোমার বিবেকানন্দ

৫১১

(মিসেস ওলি বুলকে লিখিত)

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*

• ২৬শে জানুআরি, ১৯০১

মা,

আপনার উৎসাহপূর্ণ কথাগুলির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। এখনই আমার ঐরূপ উৎসাহবাক্যের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। নূতন শতাব্দী এসেছে, কিন্তু অন্ধকার কাটেনি, বরং স্পষ্টই তা ঘন হয়ে উঠছে। মিসেস সেভিয়ারকে দেখতে মায়াবতী গিয়েছিলাম। পথে খেতড়ির রাজার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পেলাম। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, তিনি নিজব্যয়ে আগ্রার কোন পুরাতন স্থাপত্যকীর্তির সংস্কার করছিলেন, কাজ পরিদর্শনের জন্য কোন গম্বুজে উঠেছিলেন, গম্বুজটির অংশবিশেষ ভেঙে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

জো এখানে আছে, কিন্তু তার সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি।

বাংলাদেশে, বিশেষত মঠে যে মুহূর্তে পদার্পণ করি, তখনি আমার হাঁপানির কষ্টটা ফিরে আসে, এ স্থান ছাড়লেই আবার সুস্থ।

আগামী সপ্তাহে আমার মাকে নিয়ে তীর্থে যাচ্ছি। তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ করতে কয়েক মাস লাগবে। তীর্থদর্শন হ'ল হিন্দু বিধবার প্রাণের সাধ; সারা জীবন আত্মীয়স্বজনদের কেবল দুঃখ দিয়েছি। তাঁদের এই একটি ইচ্ছা অন্তত পূর্ণ করতে চেষ্টা করছি।

মার্গট সম্বন্ধে সব কিছু খবর জেনে খুবই আনন্দিত হলাম। এদেশে ফিরে আসছে জেনে সকলে তাকে স্বাগত জানাতে উৎসুক।

আশা করি, ডক্টর বসু ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছেন।

মিসেস হ্যামণ্ডের কাছ থেকেও একখানি সুন্দর চিঠি পেয়েছি। তিনি মহীয়সী নারী।

যা হোক, আমি এখন অত্যন্ত শান্ত ও আত্মস্থ; সব কিছুকে অনেক ভাল দেখছি, যা কখনও দেখবার আশা করিনি।

আপনার স্নেহের চিরসন্তান

বিবেকানন্দ

শিলং-এ স্বামীজী, ১৯০১

৫১২

(মিসেস ওলি বুলকে লিখিত)

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*
২রা ফেব্রুআরি, ১৯০১

মা,

কিছুদিন আগে আপনার একখানা চিঠি ও তার মধ্যে একখানা ১৫০৲ টাকার চেক পেয়েছিলাম। এটা আমি ছিঁড়ে ফেলব, কারণ আগের তিনটি চেক আমার এক ভগিনীকে (cousin) দিয়ে দিয়েছি।

জো এখানে ; দুবার তার দেখা পেয়েছি, সে দেখাসাক্ষাৎ নিয়ে ব্যস্ত। ইংলণ্ডে যাবার পথে মিসেস সেভিয়ারের শীঘ্রই এখানে আসার কথা। তাঁর সঙ্গে ইংলণ্ডে যাবার আশা করেছিলাম, কিন্তু এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে মাকে নিয়ে দীর্ঘ তীর্থযাত্রায় আমাকে যেতেই হচ্ছে।

বাংলাদেশে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার স্বাস্থ্য ভেঙে যায় ; যা হোক, তার জন্য আজকাল বিশেষ ভাবি না, আমি ভালই আছি, আর আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও ভাল।

মার্গটের সাফল্যের সংবাদ জেনে আনন্দিত, জো কিন্তু বলছে, টাকা পয়সা জুটছে না ; ঐখানেই গোলমাল। কেবল মাত্র ধারাবাহিকতা রক্ষা করার মূল্য সামান্যই এবং লণ্ডন থেকে কলকাতা অনেক দূর। মা-ই জানেন। মার্গটের 'কালী দি মাদার' (Kali the Mother) বইয়ের প্রশংসা সকলেই করছে। কিন্তু হায়! কেনার জন্য কেউ একটা বই পাচ্ছে না ; পুস্তক-বিক্রেতারা বিক্রয় বাড়ানোর ব্যাপারে নিতান্ত উদাসীন।

এই নূতন শতাব্দী আপনাদের আরও মহত্তর ভবিষ্যতের জন্য অপূর্ব স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য দিক—এই আপনার সন্তান বিবেকানন্দের সতত প্রার্থনা।

৫১৩

বেলুড় মঠ, হাওড়া*
১৪ই ফেব্রুআরি, ১৯০১

প্রিয় জো,

বোয়া কলকাতা আসছেন জেনে আমি এত আনন্দিত হয়েছি যে কি ব'লব। তাঁকে অবিলম্বে মঠে পাঠিয়ে দেবে। আমি এখানেই থাকব। সম্ভব হ'লে তাঁকে এখানে কয়েক দিন রাখব, তারপর আবার নেপাল যাবার জন্য ছেড়ে দেবো।

তোমার ইত্যাদি
বিবেকানন্দ

৫১৪

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*
১৭ই ফেব্রুআরি, ১৯০১

প্রিয় জো,

এইমাত্র তোমার সুন্দর ও সুদীর্ঘ চিঠিখানি পেলাম। মিস কর্নেলিয়া সোরাবজীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল ও তুমি তাঁকে পছন্দ কর জেনে আমি খুব প্রীত হয়েছি। তাঁর বাবার সঙ্গে আমার পুনাতে পরিচয় হয়; তা ছাড়া তাঁর একটি ছোট বোন আমেরিকায় ছিল, তাকেও আমি জানতাম। লিমডির ঠাকুর-সাহেবের সঙ্গে যে সন্ন্যাসী পুনাতে বাস করতেন, তাঁর কথা মনে করিয়ে দিলে হয়তো কর্নেলিয়ার মাও আমাকে চিনবেন।

আশা করি, তুমি বরোদায় গিয়ে মহারানীর সঙ্গে দেখা করবে।

আমি আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি এবং কিছুকাল এভাবে থাকব বলেই বিশ্বাস। আমি এইমাত্র মিসেস সেভিয়ারের কাছ থেকে একখানি চমৎকার চিঠি পেয়েছি; তিনি তাতে তোমার সম্বন্ধে কত সব ভাল কথাই না লিখেছেন।

মিঃ টাটার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল এবং তাঁকে খুব দৃঢ়চেতা ও সজ্জন ব'লে তোমার মনে হয়েছে জেনে বিশেষ খুশী হয়েছি।

বোম্বে যাবার মতো শক্তি যদি পাই, তবে সেখানে যাবার আমন্ত্রণ আমি অবশ্যই গ্রহণ ক'রব।

তুমি যে জাহাজে কলম্বো যাবে, সেটির নাম অবশ্যই 'তার' ক'রে জানিও। আমার আন্তরিক ভালবাসা জেনো। ইতি

তোমার স্নেহশীল
বিবেকানন্দ

৫১৫

(মিসেস ওলি বুলকে লিখিত)

ঢাকা*
২৯শে মার্চ, ১৯০১

মা,

ঢাকা থেকে লেখা আমার অপর চিঠিখানা এর মধ্যে নিশ্চয়ই পেয়েছেন। সারদানন্দ কলকাতায় জ্বরে দারুণ ভুগছিল। কলকাতা এ বছর সত্যি নরকে পরিণত হয়েছে। সারদানন্দ আরোগ্যলাভ করেছে এবং এখন মঠে আছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মঠ বাংলাদেশের অন্যতম সেরা স্বাস্থ্যকর স্থান।

জানি না, আপনার সঙ্গে আমার মায়ের কি কথাবার্তা হয়েছিল; আমি তো উপস্থিত ছিলাম না। মনে হয়, তিনি মার্গটকে দেখার জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য দেখিয়েছেন। আর কিছু নয়—বোধ হয়।

মার্গটকে পরামর্শ দিয়েছি, সে যেন ইংলণ্ডে তার পরিকল্পনাগুলি পাকা ক'রে নেয় এবং ফিরে আসার আগে সেগুলির কার্যকারিতা বেশ কিছুটা পরীক্ষা ক'রে আসে। স্থায়ী ভাল কাজ করতে হ'লে সময় লাগে।

সারদানন্দ উপযুক্ত বল পেলে দার্জিলিং-এ মিসেস ব্যানার্জির কাছে যেতে পারে। মিসেস ব্যানার্জি কয়েকদিন কলকাতায় আছেন।

জাপান থেকে জো-র এখনও কোন খবর পাইনি। মিসেস সেভিয়ারের শীঘ্রই জাহাজে ওঠার কথা। আমার মা ও তাঁর সঙ্গিনীরা পাঁচদিন আগে ঢাকা এসেছেন, ব্রহ্মপুত্রে পবিত্র স্নানের যোগে। যখনই কয়েকটি গ্রহের বিশেষ সংযোগ ঘটে, যা খুবই দুর্লভ, তখনই কোন নির্দিষ্ট স্থানে নদীতীরে বিপুল লোকসমাগম হয়। এ বৎসর এক লক্ষেরও বেশী লোক হয়েছিল; মাইলের পর মাইল নদী নৌকাতে ঢাকা ছিল।

যদিও নদী সেখানে এক মাইল চওড়া, তবু কর্দমাক্ত। কিন্তু (নদীগর্ভ) শক্ত থাকায় আমরা স্নান পূজা ইত্যাদি করতে পেরেছি।

ঢাকা তো বেশ ভালই লাগছে। আমার মা ও আর সব মেয়েদের নিয়ে চন্দ্রনাথ যাচ্ছি; সেটা পূর্ববাংলার শেষপ্রান্তে একটি তীর্থস্থান।

আমি ভালই আছি, আশা করি আপনার, আপনার কন্যার এবং মার্গটের স্বাস্থ্য খুব ভাল যাচ্ছে।

আপনার চিরস্নেহের সন্তান
বিবেকানন্দ

পুনঃ—আমার এক ভগিনী এবং মা আপনাকে ও মার্গটকে তাঁদের ভালবাসা জানিয়েছেন। বি

৫১৬

মঠ, বেলুড়*
১৫ই মে, ১৯০১

প্রিয় স্বরূপ,[১]

নৈনীতাল হ'তে লিখিত তোমার পত্র বিশেষ উদ্দীপনাপূর্ণ। আমি সবেমাত্র পূর্ববঙ্গ ও আসাম পরিভ্রমণ ক'রে ফিরেছি। অন্যান্যবারের মতো এবারেও আমি অত্যন্ত ক্লান্ত এবং ভেঙে পড়েছি।

যদি বরোদার মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে সত্যিকার কোন কাজ হয়, তবে আমি যেতে রাজী আছি; নতুবা ভ্রমণের পরিশ্রম এবং খরচের মধ্যে যেতে চাই না। সুতরাং মহারাজের সঙ্গে দেখা করলে আমাদের কাজের সাহায্য হবে কি না, সে বিষয়ে তোমার অভিমত—বিশেষ চিন্তা ক'রে এবং সংবাদাদি নিয়ে আমাকে জানাবে। আমি এইমাত্র মিসেস সেভিয়ারের কাছ থেকে সুন্দর একখানি চিঠি পেলাম। অমরনাথ ও নৈনীতালের আর সব বন্ধুদের ভালবাসা জানাবে। তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জেনো। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

---

১ স্বামী স্বরূপানন্দ

৫১৭

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*
১৮ই মে, ১৯০১

প্রিয় মেরী,

কোন বিখ্যাত নামের সঙ্গে বাঁধা পড়া কখন কখন বেশ হয়রানির ব্যাপার। আমার চিঠিখানার অদৃষ্টে ঠিক তাই ঘটেছে। ২২শে জানুআরি, ১৯০১ চিঠিখানা লিখেছ এবং একটি বিখ্যাত নাম—মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে আমাকে জুড়ে দিয়েছ। তার ফলে চিঠিখানি সারা পৃথিবী তাকে অনুসরণ ক'রে ঘুরেছে। গতকাল জাপান থেকে—মিস ম্যাকলাউড এখন জাপানে—সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছেছে; তবেই হ'ল গ্রীক পুরাণের সেই স্ফিংক্স্ (Sphinx)-এর হেঁয়ালির সমাধান: 'একটি মহৎ নামের সঙ্গে কোন ছোট নামকে যুক্ত করবে না'।

মেরী, তা হ'লে তোমরা ফ্লোরেন্স ও ইটালিকে উপভোগ ক'রছ। জানি না, এখন তোমরা কোথায়। সুতরাং স্থূলাঙ্গী বৃদ্ধা 'লেইডী' (laidy), মনরো এণ্ড কোম্পানির (Monroe & Co., 7 Rue Scribe) অনুগ্রহের ওপর এ চিঠিখানা ছেড়ে দিচ্ছি।

তা হ'লে বৃদ্ধা মহিলা, তুমি ফ্লোরেন্স ও ইটালির হ্রদে স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে কাটাচ্ছ। ভাল, যদিও তোমার কবি একে শূন্য বলে আপত্তি জানাচ্ছে।

হ্যাঁ, অনুরক্ত ভগিনি, আমার নিজের খবর কেমন? গত শরতে ভারতে ফিরেছি, সারা শীতকালটা ভুগেছি এবং এই গ্রীষ্মে বড় বড় নদী ও পাহাড় এবং ম্যালেরিয়ার দেশ পূর্ববঙ্গ ও আসামের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করেছি এবং দু-মাস কঠোর পরিশ্রমের পর আবার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙেছে। এখন আবার কলকাতায় ফিরে এসেছি এবং ধীরে ধীরে এর প্রকোপ কাটিয়ে উঠছি।

কয়েক মাস আগে খেতড়ির রাজা পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছেন। তা হলেই দেখছ, এখন আমার চারদিকে সব কিছু বিষণ্নতায় ভরা এবং আমার নিজেরও স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ। তথাপি শীঘ্রই তা নিশ্চয় ঝেড়ে ফেলছি এবং দেখছি এর পরে কি আসে।

ইচ্ছা হয় ইওরোপ গিয়ে তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্পসল্প ক'রে আবার হুট ক'রে ভারতে ফিরে আসি; কারণ মোটের উপর, আজকাল আমি একপ্রকার প্রশান্তি অনুভব করছি এবং আমার অস্থিরতার বারো আনা বিদায় দিয়েছি।

হ্যারিয়েট উলী, ইসাবেল এবং হ্যারিয়েট ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে আমার ভালবাসা এবং মাকে আমার চিরন্তন ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা। মাকে ব'লো যে 'দুর্বোধ্য হিন্দুর' কৃতজ্ঞতা বহু পুরুষ পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে।

সতত প্রভুসন্নিধানে তোমার
বিবেকানন্দ

পুনঃ—যখন ভাল লাগবে, এক ছত্র লিখো। বি

৫১৮

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত)

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
৩রা জুন, ১৯০১

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পেয়ে হাসিও পেলে, কিঞ্চিৎ দুঃখও হ'ল। হাসির কারণ এই যে, পেটগরমের কি স্বপ্ন দেখে তুমি একটা সত্য ঠাউরে নিজেকে দুঃখিত করেছ; দুঃখের কারণ এই যে, এতে বোঝা যায় তোমার শরীর ভাল নয়—তোমার স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষে বিশ্রামের একান্ত আবশ্যক।

আমি তোমাকে কস্মিন্‌কালেও শাপ দিই নাই, আজ কেন দেবো? আজন্ম আমার ভালবাসার পরিচয় পেয়ে কি আজ তোমাদের অবিশ্বাস হ'ল? অবশ্য আমার মেজাজ চিরকালই খারাপ, তায় আজকাল রোগে পড়ে মধ্যে মধ্যে বড্ডই ভয়ঙ্কর হয়—কিন্তু নিশ্চিত জেনো যে, সে ভালবাসা যাবার নয়।

আমার শরীর আজকাল আবার একটু ভাল হচ্ছে। মান্দ্রাজে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে কি? দক্ষিণে একটু বর্ষা আরম্ভ হলেই আমি বোধ হয় বম্বে, পুনা হয়ে মান্দ্রাজ যাব। বর্ষা আরম্ভ হলেই বোধ হয় দক্ষিণের প্রচণ্ড গরম থেমে যাবে।

সকলকে আমার বিশেষ ভালবাসা দিও, তুমিও জানিও।

কাল শরৎ দার্জিলিং হ'তে মঠে এসেছে—শরীর অনেক সুস্থ, পূর্বাপেক্ষা। আমি বঙ্গদেশ আর আসাম ভ্রমণ ক'রে এস্থানে পৌঁছেছি। সকল কাজেই নরম-গরম আছে—কখন অধিত্যকা, কখন উপত্যকা। আবার উঠবে। ভয় কি?...

যা হোক, আমি বলি যে তুমি কাজকর্ম কিছুদিনের জন্য বন্ধ ক'রে একদম মঠে চলে এস—এখানে মাসখানেক বিশ্রামের পর তুমি আমি একসঙ্গে will make a grand tour (বিরাট ভ্রমণে বেরুব) in Gujrat, Bombay, Poona, Hyderabad, Mysore to Madras (গুজরাট, বম্বে, পুনা, হায়দরাবাদ ও মহীশূর হয়ে মান্দ্রাজ পর্যন্ত)। Would not that be grand (ওটা কি খুব চমৎকার হবে না)? তা না যদি পারো একান্ত, মান্দ্রাজের লেকচার এখন একমাস স্থগিত থাক—তুমি দুটি দুটি খাও, আর খুব ঘুমাও। আমি দুই-তিন মাসের মধ্যে সেথা আসছি। যা হোক, পত্রপাঠ একটা বিচার ক'রে লিখবে। ইতি

সাশীর্বাদং

বিবেকানন্দস্য

৫১৯

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত)

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*

প্রিয় শশী,

আমি আমার মায়ের সঙ্গে ৺রামেশ্বর যাচ্ছি—এই তো কথা! আমি আদৌ মান্দ্রাজে যাব কি না জানি না। একান্তই যদি যাই, উহা সম্পূর্ণ গোপনে। আমার দেহ-মন একেবারে অবসন্ন, একজন লোকের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

আমি কারও সাথী হচ্ছি না; কাউকে সঙ্গে নেবার মতো শক্তি, অর্থ বা ইচ্ছা আমার নাই—তারা গুরুমহারাজের ভক্ত হোক আর না হোক, আসে-যায় না।...

তোমায় আবার বলছি—আমি এখন মরে আছি বললেই চলে এবং কারও সহিত সাক্ষাৎ করতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। এরূপ ব্যবস্থা যদি তুমি না করতে পারো, আমি মান্দ্রাজে যাব না।

শরীর বাঁচাবার জন্য আমায় একটু স্বার্থপর হ'তে হচ্ছে। যোগীন-মা প্রভৃতি নিজেদের ব্যবস্থা করুন। আমার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় আমি কাউকে সঙ্গে নিতে পারব না। আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৫২০

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*
১৪ই জুন, ১৯০১

প্রিয় জো,

জাপান—বিশেষত জাপানী শিল্প তুমি উপভোগ ক'রছ, এতে আমি খুব আনন্দিত। জাপানের কাছ থেকে আমাদের যে অনেক কিছু শিখতে হবে, এ-কথা তুমি ঠিকই বলেছ। জাপান আমাদের যে সাহায্য করবে, তার মধ্যে থাকবে সহানুভূতি ও মর্যাদা, আর অন্যদিকে পশ্চিমের সাহায্য সহানুভূতিশূন্য ও গঠনবিরোধী। ভারত ও জাপানের মধ্যে একটি যোগসূত্র-স্থাপন সত্যই অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়।

আসামে একটু অক্ষম হয়ে পড়েছিলাম। মঠের আবহাওয়া এখন আমাকে কিছুটা চাঙা ক'রে তুলছে। আসামের পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস শিলং-এ আমার জ্বর, হাঁপানি ও এলবুমেন বেড়েছিল এবং শরীর দ্বিগুণ ফুলে গিয়েছিল। যা হোক, মঠে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই রোগের লক্ষণগুলি হ্রাস পেয়েছে। এ বছর ভয়ঙ্কর গরম পড়েছে; তবে একটুখানি বৃষ্টি নেমেছে এবং আশা হয়, শীঘ্রই পূর্ণবেগে মৌসুমী এসে যাবে। এখনই আমার কোন পরিকল্পনা নেই, শুধু বম্বে প্রদেশ আমাকে দারুণভাবে চাইছে এবং শীঘ্রই সেখানে যাবার কথা ভাবছি, এই যা; প্রায় সপ্তাহখানেকের মধ্যে আমরা বম্বে অঞ্চলে ভ্রমণের জন্য যাত্রা শুরু করবার কথা চিন্তা করছি।

লেডী বেটী (Lady Betty) যে ৩০০ ডলার পাঠিয়েছেন ব'লছ, তা এখনও আমার কাছে এসে পৌঁছয়নি; জেনারেল প্যাটারসনের কাছ থেকে তার কোন সংবাদও আমি পাইনি।

স্ত্রী ও ছেলেপিলে জাহাজে ইওরোপ যাত্রা করার পর থেকে বেচারার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে; আমাকে বলেছে—তার সঙ্গে দেখা করার জন্য,

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি এত অসুস্থ হয়ে পড়েছি এবং শহরে যেতে আমার এত ভয় যে, বর্ষা আসা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

এখন প্রিয় জো, যদি আমাকে জাপান যেতে হয়, তবে এবার কাজটা চালাবার জন্য সারদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তা ছাড়া লি হুয়াং চাং-এর (Li Huang Chang) নিকট মিঃ ম্যাক্সিমের অঙ্গীকৃত পত্রখানাও আমার অবশ্যই পাওয়া চাই। বাকী 'মা' জানেন। এখনও কিছু স্থির নেই।

ভবিষ্যদ্‌বক্তাকে দেখতে তা হ'লে তুমি অ্যালানকুইনান (Alanquinan) গিয়েছিলে? সে কি তার শক্তি-টক্তি সম্বন্ধে তোমার বিশ্বাস জন্মাতে পেরেছিল? কি বললে সে? এ বিষয়ে সবিশেষ জানাবে।

নেপাল-প্রবেশে বাধা পেয়ে জুল বোয়া লাহোর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কাগজে দেখলাম, তিনি গরম সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন; তারপর জাহাজে নিরাপদ সমুদ্রযাত্রা। মঠে দেখা হবার পর তিনি আমাকে একটি ছত্রও লেখেননি। তুমিও নরওয়ে থেকে জাপান পর্যন্ত সারা পথ মিসেস বুলকে টেনে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর—হ্যাঁ, মাদমোয়াজেল, তুমিও নিঃসন্দেহে একজন পাকা জাদুকর। জো, শরীর ও আত্মাকে চাঙ্গা রাখো; অ্যালান-কুইনানের লোকটির অধিকাংশ কথাগুলিই সত্যে পরিণত হবে; গৌরব এবং সম্মান তোমার জন্য অপেক্ষা করছে—এবং মুক্তি। বিবাহের মাধ্যমে পুরুষকে অবলম্বন ক'রে ওপরে ওঠাই মেয়েদের স্বাভবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কিন্তু সে দিন অতীত হয়ে গিয়েছে। কোন পুরুষের সাহায্য ছাড়াই তুমি বড় হবে, যেমনি তুমি বড় আছ, আমাদের প্রিয় অনাড়ম্বর চিরন্তন জো!

জীবনকে আমরা যথেষ্টই দেখেছি, তাই নয় কি, জো? জীবনের কোন অনিত্য বস্তুকেই তাই আমরা আর গ্রাহ্য করি না। মাসের পর মাস আমি সমস্ত ভাবপ্রবণতা ঝেড়ে ফেলার অভ্যাস করছি; অতএব এখানেই বিরত হলাম। এখন বিদায়। আমরা একসঙ্গে কাজ ক'রব—এ 'মায়ে'র আদেশ; এতে ইতিমধ্যেই বহু লোকের কল্যাণ হয়েছে; আরও অনেক লোকের কল্যাণ সাধিত হবে; তাই হোক। মতলব আঁটা, উঁচুতে ওঠা, সবই বৃথা; 'মা' তাঁর নিজের পথ ক'রে নেবেন; ...তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সতত প্রীতি ও আশীর্বাদসহ

বিবেকানন্দ

পুনঃ—এইমাত্র মিঃ ওকাকুরার কাছ থেকে ৩০০৲ টাকার একটি চেক এবং আমন্ত্রণ এল। এ খুবই লোভনীয়, কিন্তু তথাপি 'মা'-ই জানেন।

বি

৫২১

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*
১৮ই জুন, ১৯০১

প্রিয় জো,

তোমার চিঠির সঙ্গে মিঃ ওকাকুরার টাকার রসিদ পাঠালাম। তোমার সব রকম চাতুরীর জন্যই আমি প্রস্তুত।

যা হোক, আমি যাবার জন্য সত্যই চেষ্টা করছি। কিন্তু জানই তো—যেতে এক মাস, ফিরতে এক মাস, আর থাকতে হবে দিন কয়েক! তা হোক, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি; তবে আমার দুর্বল স্বাস্থ্য এবং কিছু আইনঘটিত ব্যাপার প্রভৃতির জন্য একটু দেরী হ'তে পারে। ইতি

সতত স্নেহশীল
বিবেকানন্দ

৫২২

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*
১৯০১

প্রিয় জো,

তোমার কাছে আমি যে বিপুল কৃতজ্ঞতা-ঋণে ঋণী, কল্পনাতেও তা পরিশোধ করতে পারি না। তুমি যেখানেই থাকো না কেন, আমার মঙ্গলকামনা করতে কখনও ভুলো না। আর তুমি হচ্ছ একমাত্র ব্যক্তি, যে এ-সব শুভেচ্ছার উপরেও আমার সব ভার বহন কর এবং আমার সব রকম আবেগজনিত বিস্ফোরণ সহ্য কর।

তোমার জাপানী বন্ধু বড়ই সহৃদয়তা দেখিয়েছেন; কিন্তু আমার স্বাস্থ্য এতই খারাপ যে, আশঙ্কা হয়—আমি হয়তো জাপানের জন্য সময় করতে পারব না। আর কিছু না হোক, শুধু সহৃদয় বন্ধু-বান্ধবদের খবর নেবার জন্যও নিজেকে একবার বোম্বে প্রেসিডেন্সির ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে।

তা ছাড়া (জাপানে) যেতে-আসতেই দু-মাস কেটে যাবে, আর থাকতে পারব মাত্র এক মাস; এ তো আর কাজ করার পক্ষে তেমন সুবিধাজনক নয়—কি বলো? সুতরাং তোমার জাপানী বন্ধু আমার পাথেয় বাবদ যে টাকা পাঠিয়েছেন, তাকে তুমি দিয়ে দিও; তুমি যখন নভেম্বরে ভারতে আসবে, তখন আমি তা শোধ ক'রব।

আসামে আমার রোগ আবার ভীষণভাবে দেখা দেয়; ক্রমে সেরে উঠছি। বোম্বের লোকেরা আমার জন্য অপেক্ষা ক'রে ক'রে হয়রান হয়ে গেছে; এবার তাদের দেখতে যাব।

এ-সব সত্ত্বেও যদি তুমি চাও যে, আমার যাওয়া উচিত, তবে তোমার পত্র পেলেই আমি যাত্রা ক'রব।

মিসেস লেগেট লণ্ডন থেকে এক পত্র লিখে জানতে চেয়েছেন যে, তাঁদের প্রেরিত ৩০০ পাউণ্ড আমি পেয়েছি কি না। ঐ টাকা এসেছে এবং পূর্ব নির্দেশানুযায়ী আমি এক সপ্তাহ আগে বা তারও আগে 'মনরো এণ্ড কোং, প্যারিস'—এই ঠিকানায় তাঁকে তা জানিয়ে দিয়েছি।

তাঁর শেষ যে চিঠিখানি এসেছে, তার খামটা কে নির্লজ্জভাবে ছিঁড়ে দিয়েছে। ভারতের ডাক-বিভাগ আমার চিঠিগুলি একটু ভদ্রভাবে খুলবারও চেষ্টা করে না!

তোমার চিরস্নেহশীল

বিবেকানন্দ

৫২৩

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*

৫ই জুলাই, ১৯০১

প্রিয় মেরী,

তোমার সুদীর্ঘ সুন্দর চিঠিখানির জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ; বিশেষত আমার মনের প্রফুল্লতার জন্য এখনই এ-রকম একটি চিঠির প্রয়োজন ছিল। আমার স্বাস্থ্য খুব খারাপ যাচ্ছে। কিছুদিনের জন্য আরোগ্যলাভ করি, তারপরেই আসে অবশ্যম্ভাবী ভাঙ্গন। যাই হোক এই হ'ল রোগটার প্রকৃতি।

সম্প্রতি আমি পূর্ববাংলা ও আসাম পরিভ্রমণ করছিলাম। কাশ্মীরের পরেই আসাম ভারতের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা, কিন্তু খুবই অস্বাস্থ্যকর।

দ্বীপময় বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ পাহাড়-পর্বতের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে, এ দৃশ্য দেখবার মতো।

তুমি জানো, আমার এই দেশকে বলা হয় জলের দেশ। কিন্তু তার তাৎপর্য পূর্বে কখনও এমন ভাবে উপলব্ধি করিনি। পূর্ববাংলার নদীগুলি যেন তরঙ্গসংকুল স্বচ্ছ জলের সমুদ্র, নদী মোটেই নয়, এবং সেগুলি এত দীর্ঘ যে স্টীমার—সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাদের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে।

মিস ম্যাকলাউড এখন জাপানে। দেশটি দেখে সে একান্ত মুগ্ধ। আমাকে যেতে লিখেছে, কিন্তু এরূপ দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা আমার শরীর সইতে পারবে না ব'লে বিরত হয়েছি। জাপান আমার পূর্বেই দেখা আছে।

তা হ'লে তুমি ভিনিসে আনন্দ উপভোগ ক'রছ। বৃদ্ধটি নিশ্চয়ই খুব আমোদপ্রিয় ; তবে বৃদ্ধ শাইলকের বাড়িও ছিল ভিনিসে, তাই নয় কি ?

স্যাম এ বছর তোমার সঙ্গে আছে—তাতে আমি খুবই আনন্দিত। উত্তরাঞ্চলের নিরানন্দ অভিজ্ঞতার পর সে নিশ্চয়ই ইউরোপের ভাল জিনিসগুলি উপভোগ করবে। বর্তমানে কোন নূতন চিত্তাকর্ষক বন্ধু আমার জোটেনি, পুরানো যাদের কথা তুমি জানো, তাঁরা প্রায় সকলেই ইহজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন, এমনকি খেতড়ির রাজা পর্যন্ত। সেকেন্দ্রায় সম্রাট আকবরের সমাধির একটি উঁচু চূড়া থেকে পড়ে গিয়ে তিনি মারা গিয়েছেন। আগ্রার এই পুরাতন রমণীয় স্থাপত্যকীর্তিটি তিনি নিজব্যয়ে সংস্কার করছিলেন, কাজটা পরিদর্শন করতে গিয়ে একদিন পা পিছলে গিয়ে একেবারে কয়েক-শ ফুট নীচে পড়ে যান। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের প্রতি অত্যধিক আগ্রহের ফলে এভাবে মাঝে মাঝে আমাদের দুঃখ পেতে হয়। সাবধান, মেরী, তুমি ভারতীয় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষটির সম্বন্ধে খুব বেশী আগ্রহান্বিত হয়ো না।

মিশনের শীলমোহরে সাপটি হ'ল রহস্যবিদ্যার (mysticism) প্রতীক ; সূর্য জ্ঞানের ; তরঙ্গায়িত জল কর্মের ; পদ্ম প্রেমের ; সকলের মাঝখানে হংসটি হ'ল আত্মার প্রতীক।

স্যাম এবং মাকে ভালবাসা।

সদা প্রীতিবদ্ধ

বিবেকানন্দ

পুনঃ—আমার চিঠি সংক্ষিপ্ত করতে হ'ল; আমি সর্বদাই অসুস্থ; এই হ'ল শরীর!

৫২৪

(ভগিনী ক্রিস্টিনকে লিখিত)

মঠ, বেলুড়*

৬ই জুলাই, ১৯০১

এক-একবার এক-একটা কাজের ঝোঁক যেন আমাকে পেয়ে বসে। আজ লেখার নেশায় আছি। তাই সর্বাগ্রে তোমাকেই কয়েক পংক্তি লিখছি। দুর্নাম আছে, আমার ধাত স্নায়ু-প্রধান—আমি অল্পেতেই ব্যাকুল হয়ে পড়ি। কিন্তু প্রিয় ক্রিস্টিন, এ বিষয়ে তুমিও তো আমার চেয়ে নেহাত কম ব'লে মনে হয় না। আমাদের জনৈক কবি লিখেছেন, 'হয়তো পর্বত নিশ্চিহ্ন হবে, অগ্নিও শীতল হবে, কিন্তু মহতের হৃদয় কখনও মহত্ত্ব হারাবে না'। আমি ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু আমি জানি যে তুমি মহৎ, আর তোমার মহত্ত্বে আমার সর্বদা আস্থা আছে। অন্য সকলের বিষয়ে ভাবনা হলেও তোমার সম্পর্কে আমার একটুও দুশ্চিন্তা নেই।

জগজ্জননীর কাছে তোমাকে সমর্পণ করেছি। তিনিই তোমাকে সর্বদা রক্ষা করবেন ও পথ দেখাবেন। এ কথা নিশ্চয় জানি যে, কোন অনিষ্ট তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না—কোন বাধাবিঘ্ন মুহূর্তের জন্যও তোমাকে নিরুৎসাহ করতে পারবে না। ইতি

ভগবদাশ্রিত

বিবেকানন্দ

৫২৫

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*

২৭শে অগস্ট, ১৯০১

প্রিয় মেরী,

তুমি যেমন চেয়েছিলে, আমার শরীরের অবস্থা যদি তেমন থাকত—অন্তত তোমাকে একটি বড় চিঠি লেখার মতো! বস্তুত, দিন দিন শরীর আরও

খারাপের দিকে চলেছে এবং সে ছাড়াও কত সব জটিল ও বিরক্তিকর উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। সে-সব লক্ষ্য করা আমি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি।

সুইজারল্যাণ্ডের রমণীয় কাঠের কুটীরে তোমাদের সর্ববিধ আনন্দলাভ হোক, এই আমার শুভাকাঙ্ক্ষা—চমৎকার স্বাস্থ্য, উত্তম ক্ষুধা, এবং চাঙ্গা হবার জন্য সুইজারল্যাণ্ডের বা অন্যান্য প্রাচীন কীর্তির একটু আধটু চর্চা। তুমি পর্বতের মুক্ত বায়ু সেবন ক'রছ জেনে খুব আনন্দিত, কিন্তু স্যামের শরীর খুব সুস্থ নেই জেনে দুঃখিত। তবে তার জন্য কোন উদ্বেগের কারণ নেই, তার শরীরের গঠন এতই সুন্দর!···

'নারীর মনোভাব ও পুরুষের ভাগ্য—দেবতারাও জানেন না, মানুষ কোন্ ছার?'[১] আমার সহজাত প্রকৃতি অনেকটা নারীসুলভ হ'তে পারে, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি যা নিয়ে চিন্তিত, তা হ'ল—তোমার মধ্যে কিছুটা পৌরুষ সঞ্চারিত হোক। অহো মেরী, তোমার মেধা স্বাস্থ্য সৌন্দর্য সবই শুধু একটি প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—তা হ'ল ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা। তোমার ঔদ্ধত্য, উৎসাহ ইত্যাদি সব কিছুই অর্থহীন ও কৃত্রিম, তুমি বড়জোর একটি বোর্ডিং-স্কুলের মেয়ে—মেরুদণ্ডহীন, মেরুদণ্ডবিহীন!

হায়! জীবনভোর এই শিশু-হাঁটানোর প্রচেষ্টা! কথাটা খুবই রূঢ়, খুবই নির্দয়, কিন্তু উপায় নেই। মেরী, তোমাকে আন্তরিক ও অকপট স্নেহ করি; ভাবপ্রবণ বাক্যের মিছরি দিয়ে তোমার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারি না। সে-সব আমার কখনও আসে না।

তারপর আবার, আমি এখন মৃত্যুপথযাত্রী। ভাঁড়ামি করবার সময় আমার নেই। জাগো, বালিকা। তোমার কাছ থেকে এখন আমি কঠোর সমালোচনাপূর্ণ চিঠি আশা করছি; সোজাসুজি আঘাত কর, বেশ খানিকটা জাগানো চাই আমাকে।

ম্যাকভী-রা (Mac Veaghs) যখন এখানে ছিলেন, তখন আমি তাদের কোন খবর পাইনি। নিবেদিতা বা মিসেস বুলের কাছ থেকে সোজাসুজি কোন সংবাদ পাইনি, কিন্তু মিসেস সেভিয়ারের পত্র নিয়মিত পাই। তাঁরা সকলে এখন নরওয়েতে মিসেস বুলের অতিথি।

---

১ স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ?

নিবেদিতা কবে ভারতে আসবে, কিম্বা আদৌ আসবে কিনা, জানি না।

এক অর্থে আমি এখন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি; 'আন্দোলন' কি রকম চলছে, তার অনেক কিছুরই আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখি না; তবে 'আন্দোলন' জোরালো হচ্ছে—একজন লোকের পক্ষে তার সব কিছু খুঁটিনাটি জানা সম্ভব নয়।

আহার ও নিদ্রার চেষ্টা ছাড়া এখন আর কিছুই করছি না, বাকী সময়টা শরীরের শুশ্রূষা ক'রে কাটাই। প্রিয় মেরী, বিদায়; আশা করি এ জীবনে আমরা আবার কোথায়ও মিলিত হবো; তবে দেখা হোক বা নাই হোক, আমি সতত তোমার স্নেহশীল ভ্রাতা

বিবেকানন্দ

৫২৬

(শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত)

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*
২৯শে অগস্ট, ১৯০১

স্নেহাশীর্বাদভাজনেষু,

আমার শরীর ক্রমেই সুস্থ হচ্ছে, যদিও এখনও আমি খুবই দুর্বল।…সুগার বা এলবুমেন নেই দেখে সকলেই অবাক। বর্তমান অস্বস্তি শুধু স্নায়বিক। যাই হোক, আমি ক্রমে সেরে উঠছি।

মা-ঠাকরুন দয়া ক'রে যে প্রস্তাব করেছেন, তাতে আমি বিশেষ কৃতার্থ হয়েছি। কিন্তু মঠের সবাই বলছে যে, নীলাম্বর বাবুর বাড়ি, এমন কি গোটা বেলুড় গ্রামই এ মাসে ও পরের মাসে ম্যালেরিয়ায় ছেয়ে যায়। তার পর ভাড়াও অত্যধিক। সুতরাং মা-ঠাকরুন যদি আসতে চান, তবে আমি তাঁকে এই পরামর্শ দিই যে, তিনি কলকাতায় একটি ছোট বাড়ি ঠিক করুন। আমিও সম্ভবতঃ কলকাতায় গিয়েই থাকব; কারণ বর্তমান শারীরিক দুর্বলতার উপর আবার ম্যালেরিয়া হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। আমি এখনও সারদানন্দ বা ব্রহ্মানন্দের মত লই নাই। তারা দু-জনেই কলকাতায় আছে। এ দু-মাস কলকাতার স্বাস্থ্য অনেকটা ভাল এবং খরচও অনেক কম।

ফল কথা, প্রভু তাঁকে যেরূপ চালান, তিনি সেরূপই চলবেন। আমরা শুধু প্রস্তাব করতে পারি; আমরা যা ব'লব, তা একেবারে ভুলও হ'তে পারে। তিনি যদি থাকার জন্য নীলাম্বর বাবুর বাড়িই পছন্দ করেন, তবে ভাড়া ইত্যাদি

আগে থেকেই ঠিক ক'রে রেখো। মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক—আমি তো এইটুকুই বুঝি।

আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জেনো। ইতি

সতত প্রভুপদাশ্রিত
বিবেকানন্দ

৫২৭

(শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত)

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১

স্নেহাশীর্বাদভাজনেষু,

ব্রহ্মানন্দ ও অপর সকলের মতামত জানা আবশ্যক হওয়ায়, এবং তারা সকলেই কলকাতায় থাকায় তোমার শেষ পত্রের উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল।

সারা বছরের জন্য বাড়ি নেওয়ার সিদ্ধান্তটা ভেবে-চিন্তে করতে হবে। একদিকে যেমন এ মাসে বেলুড়ে ম্যালেরিয়া হবার ভয় আছে, অন্যদিকে তেমনি কলকাতায় প্লেগের ভয়। তা ছাড়া কেউ যদি গাঁয়ের ভেতরে যাওয়া সম্বন্ধে সাবধান থাকে, তবে ম্যালেরিয়া থেকে বেঁচে যেতে পারে; কারণ নদীর ধারে ম্যালেরিয়া মোটেই নেই। প্লেগ এখনও নদীর ধারে আসেনি; আর প্লেগের এই প্রকোপ-কালে এ গাঁয়ে যে-কটা বাড়ি ছিল, সবই মাড়োয়ারিদের দ্বারা ভরতি।

তা ছাড়া, সব চেয়ে বেশী তুমি কত ভাড়া দিতে পারো তা জানাও, আমরা তদনুযায়ী বাড়ি দেখব। আর একটা প্রস্তাব হচ্ছে, বাড়িটি কলকাতায় নেওয়া। আমি নিজে এখন কলকাতায় বিদেশী বললেই হয়, তোমার পছন্দমত বাড়ি অন্যেরা দেখে দেবে। যত শীঘ্র সম্ভব এ দুটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত করতে পারো ততই ভালো: (১) মা বেলুড়ে থাকবেন, না কলকাতায়? (২) যদি কলকাতায় থাকেন, তবে ভাড়া কত এবং কোন্ পাড়ায় থাকা তাঁর পক্ষে ভাল? তোমার উত্তর পেলে এ কাজটা ঝট ক'রে হয়ে যাবে।

আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানবে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

মিসেস ব্যাগলির বাটী, ডেট্রয়েট

পুনঃ—এখানে আমরা সবাই ভাল আছি। এক সপ্তাহ কলকাতায় থেকে মতি ফিরে এসেছে। গত তিন দিন এখানে দিনরাত বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের ছুটি গরুর বাচ্চা হয়েছে।

৫২৮

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১

প্রিয় নিবেদিতা,

আমরা সকলেই সাময়িক আবেগে চলি—অন্ততঃ এ-কাজটার বেলায় তাই। আমি স্প্রিংটি (কাজের ঝোঁকটি) চেপে রাখতে চাই ; কিন্তু এমন একটা কিছু ঘটে যায়, যার ফলে স্প্রিং অবিরত শব্দ করতে থাকে ; আর তাই দেখতেই তো পাচ্ছ—এই চিন্তা চলছে, স্মরণ হচ্ছে, লেখা হচ্ছে, আঁচড় কাটা হচ্ছে—আরও কত কিছু !

বর্ষার কথা বলতে গেলে বলতে হয় পূর্ণবেগে তা এসে গেছে, আর দিনরাত চলেছে মুষলধারে বর্ষণ, কেবল বৃষ্টি—বৃষ্টি—আর বৃষ্টি। নদী সব ফুলে উঠে দু-কূল ভাসিয়ে চলেছে, দীঘি-পুকুর সব ভরপুর।

মঠের জমিতে যে বর্ষার জল দাঁড়ায়, তার নিষ্কাশনের জন্য একটি গভীর নরদমা কাটা হচ্ছে। সেই কাজে খানিকটা খেটে আমি এইমাত্র ফিরলাম। কোন কোন জায়গায় বৃষ্টির জল কয়েক ফুট দাঁড়িয়ে যায়। আমার সেই বিশালকায় সারসটি এবং হংস-হংসীগুলি খুব স্ফূর্তিতেই আছে। আমার পোষা কৃষ্ণসার (হরিণ)-টি মঠ থেকে পালিয়েছিল এবং তাকে খুঁজে বের করতে আমাদের দিন-কয়েক বেশ উদ্বেগে কাটাতে হয়েছে। আমার একটি হংসী দুর্ভাগ্যক্রমে কাল মারা গেছে। প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। আমাদের একজন হাস্যরসিক বৃদ্ধ সাধু তাই বলছিলেন, 'মশায়, এই কলিযুগে যখন জল-বৃষ্টিতে হাঁসেরও সর্দি লাগে, আর ব্যাঙও হাঁচতে শুরু করে, তখন আর বেঁচে থেকে লাভ নেই।'

একটি রাজহংসীর পালক খসে যাচ্ছিল। আর কোন প্রতিকার জানা না থাকায় একটা টবে খানিকটা জলের সঙ্গে একটু কার্বলিক এসিড মিশিয়ে তাতেই কয়েক মিনিটের জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল—উদ্দেশ্য ছিল যে,

হয় সেরে উঠবে, না হয় মরে যাবে; তা হংসীটি এখন ভাল আছে। ইতি

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৫২৯

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*
৮ই অক্টোবর, ১৯০১

প্রিয় নিবেদিতা,

…জীবনের স্রোতে উঠছি, পড়ছি। আজ যেন কতকটা অবতরণের পথে…।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

৫৩০

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*
৮ই নভেম্বর, ১৯০১

প্রিয় জো,

Abatement (উপশম)—কথাটার ব্যাখ্যাসমেত যে চিঠিখানি গেছে, তা তুমি ইতিমধ্যে পেয়েছ নিশ্চয়। আমি নিজে সে চিঠি লিখিনি, আর টেলিগ্রামও পাঠাইনি। আমি তখন এত অসুস্থ ছিলাম যে, দুটোর একটাও করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণের পর থেকে শয্যাগত আছি বললেই হয়। দৃষ্টিশক্তির হ্রাস—এই আর একটি উপসর্গ জোটায় এখন আমি আগের চেয়েও খারাপ। এ-সব বিষয় আমি লিখতুম না; কিন্তু কেউ কেউ দেখছি সব খুঁটিনাটি চায়।

যা হোক, তুমি তোমার জাপানী বন্ধুদের নিয়ে আসছ জেনে বেশ আনন্দিত হলাম। আমার ক্ষমতায় যতটা কুলায়, আমি তাঁদের খাতির-যত্ন ক'রব। খুব সম্ভব আমি তখন মাদ্রাজে থাকব। আমি ভাবছি যে, আগামী সপ্তাহে কলকাতা ছাড়ব এবং ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে এগিয়ে যাব।

তোমার জাপানী বন্ধুদের সঙ্গে উড়িষ্যার মন্দিরগুলি দেখা সম্ভব হবে কিনা, জানি না। আমি ম্লেচ্ছদের খাবার খেয়েছি ব'লে আমাকেই ঢুকতে দেবে কিনা, জানি না। লর্ড কার্জনকে ভেতরে যেতে দেয়নি।

যা হোক, আমার পক্ষে যতটা করা সম্ভব, তা আমি তোমার বন্ধুদের জন্য করতে সর্বদা প্রস্তুত। মিস মূলার কলকাতায় আছেন, অবশ্য তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি।

সতত স্নেহশীল
তোমাদের বিবেকানন্দ

৫৩১

গোপাললাল ভিলা*
বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট
৯ই ফেব্রুআরি, ১৯০২

প্রিয় স্বরূপ,

মিসেস বুলের কণ্ঠাস্থি (Collar-bone)-র অবস্থা জেনে বড় কষ্ট হ'ল। আশা করি, চলে-ফিরে বেড়াবার মতো শক্তি তিনি পাবেন। তাঁকে আমার আন্তরিক ভালবাসা জানাবে। চারুর চিঠি সম্বন্ধে উত্তর এই, তাকে বলবে সে যেন 'ব্রহ্মসূত্র' নিজে নিজে পড়ে। 'ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধধর্মের প্রসঙ্গ আছে'—চারুর এ-কথার অর্থ কি? অবশ্য সে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যগুলিকে লক্ষ্য করেই এ-কথা বলেছে; আর সেগুলিকে লক্ষ্য করেই বলা উচিত; ভাষ্যকারদের মধ্যে শঙ্কর তো শুধু শেষ ভাষ্যকার। বৌদ্ধসাহিত্যে অবশ্য বেদান্তের উল্লেখ আছে, আর বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখা তো অদ্বৈতপন্থী। বৌদ্ধ অমরসিংহ বুদ্ধদেবের একটি নাম 'অদ্বয়বাদী' ব'লে উল্লেখ করলেন কেন? চারু লিখেছে, উপনিষদে 'ব্রহ্ম' শব্দের উল্লেখ নাই!! কি আহাম্মকি!

আমার মতে বৌদ্ধধর্মের শাখাদ্বয়ের মধ্যে মহাযান প্রাচীনতর। মায়াবাদ ঋক্‌সংহিতার মতোই প্রাচীন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যে 'মায়া' শব্দ আছে, সেটি 'প্রকৃতি'র ভাব থেকে ক্রমশঃ বিকশিত হয়েছে। আমার মতে ঐ উপনিষদ্ অন্ততঃ বৌদ্ধধর্ম থেকে প্রাচীনতর।

সম্প্রতি আমি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক নূতন আলো পেয়েছি। আর আমি প্রমাণ করতে প্রস্তুত আছি:

(১) নানা আকারের শিবপূজা বৌদ্ধদের আগেই প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধগণ শৈবদের স্থানগুলি দখল করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে

অকৃতকার্য হয়ে সেই আবেষ্টনীরই মধ্যে নিজেদের নূতন নূতন স্থান ক'রে নিয়েছিল—যেমন বুদ্ধগয়ায় ও সারনাথে।

(২) অগ্নিপুরাণে গয়াসুর সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে, তাতে (যেমন ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত) বুদ্ধদেবকে মোটেই লক্ষ্য করা হয়নি, ওটি কেবল পূর্বপ্রচলিত একটি উপাখ্যান মাত্র।

(৩) বুদ্ধ যে গয়শীর্ষ পর্বতে বাস করতে গিয়েছিলেন, তাতেই ঐ স্থানের পূর্বাস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

(৪) আগে থেকেই গয়াতে পিতৃপুরুষের উপাসনা প্রচলিত ছিল, আর বৌদ্ধেরা হিন্দুদের কাছ থেকে পদচিহ্ন-উপাসনার অনুকরণ করেছিল।

(৫) বারাণসী সম্বন্ধে বক্তব্য এই : এটি শিবোপাসনার একটি প্রধান স্থান ছিল, ইত্যাদি কথা প্রাচীনতম লিপি প্রভৃতি থেকেও প্রমাণিত হয়।

আমি বুদ্ধগয়া ও বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করেছি। চারুকে ব'লো, সে নিজে নিজে পড়ুক, মূর্খদের মত দ্বারা যেন প্রভাবিত না হয়।

আমি এখানে বারাণসীতে বেশ ভালই আছি। যদি ধীরে ধীরে এ ভাবেই স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'তে থাকে, তবে বিশেষ লাভই হবে।

বৌদ্ধধর্ম ও আধুনিক হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ-বিষয়ে আমার মতের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। আমি এ বিষয়ে যে একটু-আধটু আলোক পেয়েছি, তা বিশেষভাবে বুঝাবার আগেই আমার শরীর যেতে পারে; কিন্তু কি ভাবে এ বিষয়ে অগ্রসর হ'তে হবে, তা আমি দেখিয়ে দিয়ে যাব; তোমাকে ও তোমার গুরুভাইদের তা কার্যে পরিণত করতে হবে। তুমি আমার বিশেষ ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

৫৩২

(মিসেস ওলি বুলকে লিখিত)

গোপাললাল ভিলা, বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট*

১০ই ফেব্রুআরি, ১৯০২

মাতা ও কন্যাকে ভারতে আবার স্বাগত জানাচ্ছি। জো-র সৌজন্যে মান্দ্রাজের একখানি সংবাদপত্র পেয়ে আমি বিশেষ আনন্দিত হয়েছি;

নিবেদিতা মান্দ্রাজে যে অভ্যর্থনা পেয়েছে, তা নিবেদিতা ও মান্দ্রাজ উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর। তার ভাষণ যথার্থই সুন্দর হয়েছিল।

সুদীর্ঘ ভ্রমণ শেষ ক'রে—আশা করি, আপনি এখন ভালভাবে বিশ্রাম নিচ্ছেন, এবং নিবেদিতাও বিশ্রাম নিচ্ছে। আমার একান্ত ইচ্ছা যে আপনারা কয়েক ঘণ্টার জন্য কলকাতার পশ্চিমের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে কাঠ, বাঁশ, বেত, অভ্র ও খড়ের তৈরী পুরাতন বাংলার চালাঘর দেখে আসুন। এই বাংলোগুলি অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন। হায়! আজকাল শুয়োরের খোঁয়াড়ের মত ঘরগুলোরও 'বাংলো' নাম দেওয়া হয়।

প্রাচীনকালে কোন ব্যক্তি যখন প্রাসাদ নির্মাণ করতেন, তার সঙ্গে অতিথি-আপ্যায়নের জন্য একটি বাংলোও তৈরি করতেন। সেই শিল্প লুপ্ত হ'তে চলেছে। নিবেদিতার সমগ্র বিদ্যালয়টি যদি সেই ছাঁচে তৈরি ক'রে দিতে পারতাম! তবে এখনও যে ক-টি অবশিষ্ট আছে, তাই দেখে রাখা ভাল, অন্তত একটিও। ব্রহ্মানন্দ তার ব্যবস্থাদি করবেন; আপনাদের কাজ শুধু কয়েক ঘণ্টার ভ্রমণ।

ছোটখাটো একটু ভ্রমণে মিঃ ওকাকুরা বেরিয়ে পড়েছেন—আগ্রা, গোয়ালিয়র, অজন্তা, ইলোরা, চিতোর, উদয়পুর, জয়পুর এবং দিল্লী দেখার অভিপ্রায় নিয়ে। বারাণসীর এক সুশিক্ষিত ধনী যুবা—যার পিতার সঙ্গে ছিল আমাদের অনেক দিনের বন্ধুত্ব—গতকাল এই শহরে এসেছে। শিল্প সম্বন্ধে তার বিশেষ আগ্রহ; লুপ্তপ্রায় ভারতীয় শিল্প পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় সে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে প্রচুর অর্থব্যয় করছে। মিঃ ওকাকুরার চলে যাবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাঁকে শিল্পময় ভারত (অর্থাৎ যতটুকু অবশিষ্ট আছে) দেখাবার সে-ই উপযুক্ত লোক এবং শিল্প সম্বন্ধে ওকাকুরার নির্দেশে সে নিশ্চয়ই বিশেষ উপকৃত হবে। ওকাকুরা এখানে ভৃত্যদের ব্যবহারের একটি সাধারণ টেরাকোটার জলের পাত্র দেখতে পেয়েছিলেন। সেটির আকৃতি ও ক্ষোদিত কারুকার্য দেখে তিনি একেবারে মুগ্ধ। কিন্তু এটি একটি সাধারণ মৃৎপাত্র এবং পথের ধাক্কা সহ্য করার অনুপযোগী, তাই তিনি আমাকে অনুরোধ করে গিয়েছেন, পিতল দিয়ে অবিকল সেরূপ আর একটি তৈরি করাতে। কি করা যায় ভেবে ভেবে আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে আমার যুবক বন্ধুটি

আসে, সে সেটা ক'রে দিতে রাজী তো হয়েছেই, আবার বলেছে, ওকাকুরার পছন্দ ওই জিনিসটির চেয়ে বহুগুণ ভাল ক্ষোদিত কারুকার্যবিশিষ্ট কয়েক-শ টেরাকোটার পাত্র সে দেখাতে পারে।

সেই অপূর্ব পুরাতন শৈলীতে আঁকা প্রাচীন চিত্রাবলীও সে দেখাবে বলেছে। প্রাচীন রীতিতে আঁকতে পারে, এরূপ একটি মাত্র পরিবার বারাণসীতে টিকে আছে। তাদের মধ্যে একজন একটি মটর-দানার উপর শিকারের একটি সম্পূর্ণ চিত্র এঁকেছেন,—খুঁটিনাটি বর্ণনাসহ একেবারে নিখুঁত কাজ। পর্যটন শেষ ক'রে ওকাকুরা আশা করি আবার এই শহরে ফিরে আসবেন, তখন এই ভদ্রলোকের অতিথি হয়ে অবশিষ্ট দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি কিছু কিছু দেখে যাবেন।

মিঃ ওকাকুরার সঙ্গে নিরঞ্জন গিয়েছে। তিনি জাপানী বলে কোন মন্দিরে তাঁর প্রবেশ করা নিয়ে কেউ আপত্তি করে না। মনে হয়, তিব্বতী ও অন্যান্য উত্তরদেশীয় বৌদ্ধগণ বরাবরই শিবপূজার উদ্দেশ্যে এখানে আসছেন।

তাঁরা তাঁকে শিবের প্রতীক স্পর্শ করতে ও পূজা করতে দিয়েছে। মিসেস এনি বেস্যাণ্ট একবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বেচারী যদিও খালি পায়ে শাড়ি পরে পুরোহিতদের সামনে দীনহীনভাবে ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিলেন, তথাপি তাঁকে মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। আমাদের বড় বড় মন্দিরগুলির কোনটাতেই বৌদ্ধদের অহিন্দু বলে মনে করা হয় না।

আমার এখনও কিছু স্থির হয়নি ; শীঘ্রই এ স্থান ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে পারি। শিবানন্দ ও ছেলেরা (শিষ্যেরা) আপনাকে তাদের স্বাগত, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাচ্ছে।

আপনার চিরদিনের
অশেষ স্নেহের সন্তান
বিবেকানন্দ

৫৩৩

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

গোপাললাল ভিলা, বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট

১২ই ফেব্রুআরি, ১৯০২

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রে সবিশেষ জানিয়া আনন্দিত হলাম। নিবেদিতার স্কুল সম্বন্ধে যা আমার বলবার ছিল, তাকে লিখেছি। বলবার এই যে, তার যা ভাল বিচার হয়, করবে।

আর কোন বিষয়ের মতামত আমায় জিজ্ঞাসা ক'রো না। তাতে আমার মাথা খারাপ হয়। তুমি কেবল ঐ কাজটা ক'রে দিও—এই পর্যন্ত। টাকা পাঠিয়ে দিও; কারণ উপস্থিত দু-চার টাকা মাত্র আছে।

কানাই মাধুকরী খায়, ঘাটে জপ করে, রাত্রে এসে শোয়; ন্যাদা poor man's work (গরীবদের সেবা) করে; রাত্রে এসে শোয়। খুড়ো (Okakura) আর নিরঞ্জন আগ্রায় গেছে; আজ তাদের পত্র আসতে পারে।

যেমন প্রভু করাবেন ক'রে যেও। এদের-ওদের মতামত কি? সকলকে আমার ভালবাসা জানিও এবং ছেলেদের। ইতি

বিবেকানন্দ

৫৩৪

(ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত)

বেনারস*

১২ই ফেব্রুআরি, ১৯০২

সর্বপ্রকার শক্তি তোমাতে উদ্বুদ্ধ হোক, মহামায়া স্বয়ং তোমার হৃদয়ে এবং বাহুতে অধিষ্ঠিতা হোন! অপ্রতিহত মহাশক্তি তোমাতে জাগ্রত হোক এবং সম্ভব হ'লে সঙ্গে সঙ্গে অসীম শান্তিও তুমি লাভ কর—এই আমার প্রার্থনা।...

যদি শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য হন, তবে যেমনভাবে তিনি আমাকে জীবনে পথ দেখিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে কিংবা তার চেয়ে সহস্রগুণ স্পষ্টভাবে তোমাকেও যেন তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।

৫৩৫

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

গোপাললাল ভিলা, বেনারস ছাউনী
১৮ই ফেব্রুআরি, ১৯০২

অভিন্নহৃদয়েষু,

কাল তোমায় যে পত্র লিখেছি টাকার প্রাপ্তিস্বীকার সহিত, তাহা এতক্ষণে নিশ্চিত পেয়েছ। আজ এ পত্র লেখবার প্রধান উদ্দেশ্য…—সম্বন্ধে। তুমি পত্রপাঠ তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আসবে।…তারপর রোগ কি, গয়ায় কেমন ছিল ইত্যাদি; … সুযোগ্য ডাক্তার ডাকিয়ে রোগটি বেশ নির্ণয় ক'রে নেবে। তারপর রামবাবুর বড় মেয়ে বিষ্টুমোহিনী এখন কোথায়?—যে সম্প্রতি বিধবা হয়েছে…।

রোগের চেয়ে ভাবনা বড়! দু-দশ টাকা যা দরকার হয় দেবে। যদি একজনের মনে—এ সংসার-নরককুণ্ডের মধ্যে একদিনও একটু আনন্দ ও শান্তি দেওয়া যায়, সেইটুকুই সত্য, এই তো আজন্ম ভুগে দেখছি—বাকি সব ঘোড়ার ডিম।…

অতি শীঘ্র জবাব দেবে। খুড়ো (Okakura বা অক্রূর খুড়ো) আর নিরঞ্জন গোয়ালিয়র হ'তে পত্র লিখেছে।…এখন এথায় ক্রমে গরম পড়ে আসছে। বোধগয়া অপেক্ষা এথায় শীত অধিক ছিল। …নিবেদিতার ৺সরস্বতীপূজার ধুমধাম শুনে বড়ই খুশী হলাম। নিবেদিতা শীঘ্রই স্কুল খোলে খুলুক।…পাঠ, পূজো, পড়াশুনা সকলের যাতে হয়, সে-চেষ্টা করবে। তোমরা আমার ভালবাসা জানবে।

বিবেকানন্দ

৫৩৬

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

গোপাললাল ভিলা, বেনারস
২১শে ফেব্রুআরি, ১৯০২

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার এক পত্র এইমাত্র পাইলাম।…মা, দিদিমা যদি আসতে চান পাঠিয়ে দিও। এই প্লেগ আসবার সময়টা কলকাতা হ'তে সরে এলেই

ভাল। এলাহাবাদে বড্ড প্লেগ চলেছে। এবার কাশীতে আসবে কিনা জানি না। তবে প্লেগ গেল বৎসর এই সময়ে কাশীতে এসেছিল।...মিসেস বুলকে আমার নাম ক'রে ব'লো যে, ইলোরা-ফিলোরা মহা কষ্টের পথ এবং ভারী গরম। তাঁর এত tired (ক্লান্ত) শরীর যে, ভ্রমণে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। খুড়োর (Okakura) ক-দিন হ'ল চিঠিপত্র পাইনি। অজন্তা গেছে—এই খবর। মহান্তও কোন খবর দেন নাই। তবে রাজা প্যারীমোহনের পত্রের জবাবে যদি দেয়...।

নেপালের minister (মন্ত্রী)-এর ব্যাপারটা সবিশেষ লিখবে। মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতি সকলকে আমার বিশেষ ভালবাসা, আশীর্বাদাদি দিবে; আর তুমি, বাবুরাম প্রভৃতি সকলে আমার নমস্কার ও ভালবাসা ইত্যাদি জানবে। গোপাল-দাদা চিঠি পেয়েছেন কি না? ছাগলটাকে একটু দেখো। ইতি

বিবেকানন্দ

ছেলেরা সকলে সাষ্টাঙ্গ জানাচ্ছে।

৫৩৭

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

গোপাললাল ভিলা, বেনারস

২৪শে ফেব্রুআরি, ১৯০২

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার প্রেরিত একটি আমেরিকান ছোট পার্শেল আজ প্রাতঃকালে পেলুম। রেজেষ্ট্রি-করা যে পত্রের কথা লিখেছ, তা কেন, কোন পত্রই পাইনি। নেপালওয়ালা এল কি না, কি বৃত্তান্ত, এ-সব তো কিছুই জানতে পারলুম না।...একখানা চিঠি লিখতে হলেই এত হাঙ্গাম আর দেরী!!...এখন হিসেবটা পেলে যে বাঁচি! তাও আবার ক-মাসে পাই!...

বিবেকানন্দ

৫৩৮

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*
২১শে এপ্রিল, ১৯০২

প্রিয় জো,

মনে হচ্ছে যেন জাপান যাবার সঙ্কল্পটা ফেঁসে গেল। মিসেস বুল চলে গেলেন; তুমিও যাচ্ছ। আমার সঙ্গে জাপানীদের তেমন পরিচয় নেই।

সদানন্দ নেপালীদের সঙ্গে নেপালে গেছে; কানাইও গেছে। মার্গট এই মাস শেষ হওয়ার আগে যেতে পারবে না ব'লে ক্রিষ্টিন আগে যাত্রা করতে পারলো না।

লোকে বলে, আমি বেশ আছি; কিন্তু এখনও বড় দুর্বল, আর জল-পান একেবারে নিষিদ্ধ। তবে এইটুকু হয়েছে যে, রাসায়নিক বিশ্লেষণে অনেকটা উন্নতি দেখা গেছে। পায়ের ফোলা প্রভৃতি একেবারে গেছে।

লেডি বেটি, মিঃ লেগেট, এলবার্টা ও হলিকে আমার অসীম ভালবাসা জানাবে। খুকুর উপর আমার আশীর্বাদ তো তার জন্মের আগে থেকেই আছে, আর চিরকাল থাকবে।

মায়াবতী তোমার কেমন লাগলো? এ-বিষয়ে আমায় এক ছত্র লিখো।

চিরস্নেহাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

৫৩৯

মঠ, বেলুড়, হাওড়া*
১৫ই মে, ১৯০২

প্রিয় জো,

মাদাম কালভেকে লিখিত পত্রখানি পাঠালাম।...

আমি অনেকটা ভালই আছি; অবশ্য যতটা আশা করেছিলাম, তার তুলনায় কিছুই নয়। নিরিবিলি থাকার একটা প্রবল আগ্রহ আমার হয়েছে—আমি চিরকালের মতো অবসর নেবো, আর কোন কাজ আমার থাকবে না। যদি সম্ভব হয় তো আবার আমার পুরাতন ভিক্ষাবৃত্তি শুরু ক'রব।

জো, তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল হোক—তুমি দেবতার মতো আমায় রক্ষণাবেক্ষণ ক'রছ।

চিরস্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৫৪০

(মিসেস ওলি বুলকে লিখিত)

মঠ*
১৪ই জুন, ১৯০২

মা,

আপনার স্নেহপূর্ণ চিঠিখানির উত্তর আরও আগে দিতে পারলে ভাল হ'ত।

ডাক্তার জেন্‌সের সম্বন্ধে একখানি বই আমার কাছে এসেছে, কিন্তু কিছু লিখবার নির্দেশসহ কোন পত্র সঙ্গে না থাকায় আমাদের অতি শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করতে সাহস হ'ল না। যা হোক, আপনার বর্তমান অভিপ্রায় অনুসারে আমি মিঃ ফক্সকে যথাসম্ভব সত্বর লিখব।

আমি এক রকম আছি; আর সব ভাল। নিবেদিতা পাহাড়ে আছে। ওকাকুরা শহরে ফিরে এসে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র ঠাকুরের অতিথি হয়েছেন, একদিন মঠে এসেছিলেন; কিন্তু আমি বাইরে গিয়েছিলাম। আশা করি, শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে এবং তাঁর ভবিষ্যৎ অভিপ্রায় জানতে পারব।

(জাপানী) যুবক হেরির এখানে জ্বর হয়েছিল; সে দিন-কয়েকের মধ্যেই সেরে উঠে কিছু দিনের জন্য ওকাকুরার সঙ্গে গেছে। তার ধর্মভাব দেখে সবাই তাকে ভালবাসে। ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে তার ধারণাগুলি খুব উচ্চ এবং তার অভিলাষ এই যে, জাপানে সে খাঁটি ব্রহ্মচর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ স্থাপন করবে। কিন্তু আমার মনে হয়, কোন জাতিকে পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হ'লে সর্বপ্রথমে বিবাহের পবিত্রতা ও অবিচ্ছেদ্যতার মধ্য দিয়ে মাতৃত্বের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব অর্জন করতে হবে। রোমান ক্যাথলিক এবং হিন্দুগণ বিবাহবন্ধনকে পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য মনে করেন, তাই তাঁরা ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত মহাশক্তিমান্ পবিত্র বহু নরনারীর জন্ম দিতে পেরেছেন। আরবগণের দৃষ্টিতে বিবাহ একটা চুক্তি অথবা বলপূর্বক অধিকারের ব্যাপার মাত্র; ইচ্ছামাত্র সে বন্ধন ছিন্ন করা যেতে পারে।

ফলে কুমারী কিংবা ব্রহ্মচারীর কোন আদর্শ তাদের মধ্যে বিকশিত হতে পারেনি।

আধুনিক বৌদ্ধধর্ম এমন সব জাতের হাতে গিয়ে পড়েছে, যাদের মধ্যে বিবাহ-প্রথার পূর্ণ অভিব্যক্তি না হওয়ায় তারা সন্ন্যাস-আশ্রমকে একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার ক'রে তুলেছে। সুতরাং যতদিন না জাপানীদের মধ্যে শুধু পরস্পরের প্রতি দৈহিক আকর্ষণ ও ভালবাসা ছাড়াও বিবাহের উচ্চ ও পবিত্র আদর্শ গড়ে উঠছে, ততদিন তাদের মধ্যে বড় সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীর উদ্ভব কেমন ক'রে সম্ভব হবে, তা আমি বলতে পারি না। আপনি যেমন বুঝতে পেরেছেন যে, সতীত্বই জীবনের একমাত্র গৌরব, তেমনি আমার দৃষ্টিও এ বিষয়ে খুলে গেছে যে, আমরণ সাধুচরিত্র জনকয়েক মহাশক্তিশালী ব্যক্তির জন্ম দিতে হ'লে জনসাধারণের একটি বৃহত্তম অংশকেও এই সুমহান্ পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত করা অত্যাবশ্যক।

অনেক কিছু লিখব ভেবেছিলাম; কিন্তু শরীর বড় দুর্বল। মেরী লুই এখানে শ্রীচৈতন্যের ভক্তরূপে এসেছে এবং শুনতে পাচ্ছি যে, জনকয়েক ধনী তাকে লুফে নিয়েছে। সে যেন এবারে প্রচুর অর্থ পায়—এই আমার আকাঙ্ক্ষা। 'আমাকে যে যে-ভাবে উপাসনা করে, আমি সে-ভাবেই তাকে অনুগ্রহ করি।[১]' —সে টাকা চেয়েছিল; ভগবান তাকে প্রচুর টাকা দিন।

আপনার চিরস্নেহবদ্ধ সন্তান
বিবেকানন্দ

...পাশ্চাত্যের এই সমস্ত জাঁকজমক নিতান্ত নিষ্ফল, শুধু আত্মার বন্ধন-স্বরূপ। আমার জীবনে এর চেয়ে স্পষ্টতর ভাবে জগতের নিষ্ফলতা কখন অনুভব করিনি। ভগবান সকলের বন্ধন মোচন করুন, সকলেই মায়ামুক্ত হোক—এই আমার চিরপ্রার্থনা। ইতি

বিবেকানন্দ

১ গীতা—৪।১১

পত্রাবলী—পরিশিষ্ট

৫৪১

(মিস ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে লিখিত)

এনিস্‌কোয়াম*

২০শে অগস্ট, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনি,

তোমার অত্যন্ত সহৃদয় লিপিখানি এনিস্‌কোয়ামে আমার কাছে যথাসময়ে এসে পৌঁছেছে। আমি পুনরায় ব্যাগলিদের সঙ্গে আছি। তাঁরা যথারীতি সহৃদয়। অধ্যাপক রাইট এখানে ছিলেন না। তবে গত পরশু তিনি এসেছেন এবং একসঙ্গে আমাদের খুব ভাল কাটছে। এভানস্টনের মিঃ ব্র্যাডলি, যাঁর সঙ্গে তোমার এভানস্টনে সাক্ষাৎ হয়েছিল, এখানে ছিলেন। কয়েকদিন বেশ নৌকাভ্রমণ করা গেছে এবং একদিন সন্ধ্যায় নৌকা উল্টিয়ে কাপড় জামা ও সবকিছু ভিজে একশেষ।

গ্রীনএকারে আমার চমৎকার কেটেছে। তাঁরা সকলেই নিষ্ঠাপরায়ণ ও সহৃদয়। ফ্যানী হার্টলি (Fanny Hartley) ও মিসেস মিল্‌স্ (Mrs. Mills) মনে হয় এতদিনে বাড়ী ফিরে গিয়েছেন।

ভাবছি এখান থেকে নিউ ইয়র্ক ফিরে যাব, অথবা বস্টনে মিসেস ওলি বুলের কাছেও যেতে পারি। সম্ভবতঃ তুমি এদেশের বিখ্যাত বেহালা-বাদক মিঃ ওলি বুলের কথা শুনেছ। ইনি তাঁর বিধবা পত্নী। মহিলাটি খুবই ধর্মশীলা। তিনি কেম্ব্রিজে বাস করেন এবং ভারত থেকে আনা কারুকার্যময় কাঠ দিয়ে তৈরী তাঁর একখানা সুন্দর বৈঠকখানা আছে। তিনি চান আমি যে-কোন সময়ে তাঁর কাছে যাই এবং তাঁর বৈঠকখানাটি বক্তৃতার জন্য ব্যবহার করি। বস্টন অবশ্য সব-কিছুর জন্যই একটি বৃহৎ ক্ষেত্র, কিন্তু বস্টনের লোকেরা কোন-কিছু যেমন তৎপরতার সঙ্গে গ্রহণ করে, আবার তেমনি তৎপরতার সঙ্গে ত্যাগ করে। অন্য দিকে নিউইয়র্ক-বাসীরা একটু ঢিলে হলেও যখন তারা কোন জিনিস ধরে, তখন খুব শক্ত করেই ধরে।

আমার স্বাস্থ্য বরাবর বেশ ভাল যাচ্ছে এবং আশা করি, ভবিষ্যতেও যাবে। আমার সঞ্চয় থেকে খরচ করবার কোন কারণ এখনও ঘটেনি, তবু আমি

বেশ ভালভাবেই কাটাচ্ছি। অর্থকরী সকল পরিকল্পনা আমি ত্যাগ করেছি, এখন শুধু একটুকরো খাদ্য ও মাথার ওপর একটু আচ্ছাদন পেলেই সম্পূর্ণ তৃপ্ত থাকব এবং কাজ ক'রে যাব।

আশা করি গ্রীষ্মাবাসে আনন্দ উপভোগ ক'রছ। দয়া ক'রে আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা মিস হাউ (Miss Howe) এবং মিঃ ফ্র্যাঙ্ক হাউকে জানিও।

সম্ভবতঃ পূর্বের চিঠিতে তোমাকে বলা হয়নি যে, আমি কেমন ক'রে গাছের নীচে ঘুমিয়েছি, থেকেছি এবং ধর্মপ্রচার করেছি এবং অন্ততঃ কয়েকদিনের জন্য আর একবার স্বর্গীয় পরিবেশের মধ্যে নিজেকে পেয়েছি।

খুব সম্ভবতঃ আগামী শীতে নিউ ইয়র্ককেই আমার কেন্দ্র ক'রব ; এবং তা স্থির করেই তোমাকে জানাব। এদেশে আরও থাকার বিষয়ে এখনও কিছু স্থির করতে পারিনি। আমি এ-সকল ব্যাপার স্থির করতে পারি না। সময়ের অপেক্ষায় থাকব। প্রভু তোমাদের সকলকে চিরকাল আশীর্বাদ করুন, এই হ'ল তোমাদের সদা-স্নেহশীল ভ্রাতার নিরন্তর প্রার্থনা—

বিবেকানন্দ

৫৪২

(ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে লিখিত)

বস্টন*

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনি,

ভারতের ডাক ও তোমার চিঠি এইমাত্র পেলাম। ভারত থেকে বেশ কিছু সংবাদপত্রের অংশ কেটে আমার কাছে পাঠানো হয়েছে। তুমি সেগুলি প'ড়ে নিরাপদ স্থানে রেখে দেবে, তাই সেগুলি তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ভারতে চিঠি লেখার ব্যাপারে গত কয়েকদিন ধরে ব্যস্ত আছি। আরও দিন কয়েক বস্টনে থাকব। প্রীতি ও আশীর্বাদ।

সদা স্নেহবদ্ধ

বিবেকানন্দ

৫৪৩

৫৪১ ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো*
৩রা জানুআরি, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস বুল,

গত রবিবার ব্রুকলিনে বক্তৃতা দিয়েছি। সন্ধ্যায় পৌছলে মিসেস হিগিন্স আমায় একটু সম্বর্ধনা করেন, এবং ডক্টর জেন্‌স্ (Janes) প্রভৃতি এথিক্যাল সোসাইটি (Ethical Society)-র কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কয়েকজন মনে করেন যে, এরূপ প্রাচ্যদেশীয় ধর্মপ্রসঙ্গ ব্রুকলিনের জনসাধারণের উপভোগ্য হবে না।

কিন্তু প্রভুর কৃপায় বক্তৃতা খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ব্রুকলিনের প্রায় আটশত গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করেন; যাঁরা মনে করেছিলেন বক্তৃতা সফল হবে না, তাঁরাই ব্রুকলিনে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন করছেন। আমার নিউ ইয়র্কের বক্তৃতামালা প্রায় প্রস্তুত, কিন্তু মিস থার্সবি নিউ ইয়র্কে না আসা পর্যন্ত তারিখ ঠিক করতে চাই না। এভাবে মিস ফিলিপ্‌স্—যিনি মিস থার্সবির বন্ধু, এবং যিনি আমার নিউ ইয়র্কের বক্তৃতামালার আয়োজন করছেন—মিস্ থার্সবির সহযোগিতায় প্রয়োজনবোধে সেখানে কিছু বন্দোবস্ত করতে চান।

হেল পরিবারের কাছে আমি বিশেষরূপে ঋণী এবং নববর্ষের প্রথম দিনে তাদের কাছে হঠাৎ এসে হাজির হবো, ভেবেছিলাম। এখানে একটি নতুন পাগড়ি যোগাড় করবার চেষ্টাতেও আছি। পুরানো পাগড়িটি এখানে আছে। কিন্তু বারবার কাচার ফলে সেটা এত ঢিলে হয়ে গিয়েছে যে, সেটা প'রে লোকের কাছে যাওয়া যায় না। চিকাগোয় ঠিক তেমনি একটা পাগড়ি পাব বলে মনে হয়।

আশা করি আপনার পিতা ইতিমধ্যে ভাল হয়েছেন। মিস ফার্মার, মিঃ ও মিসেস গিবন্স এবং ধার্মিক পরিবারটির সকলকে আমার প্রীতি জানাবেন।

সতত স্নেহের
বিবেকানন্দ

পুনঃ—ব্রুকলিনে মিস কুরিং-এর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনি বরাবরই সদয়। তাঁকে শীঘ্র চিঠি লিখলে আমার প্রীতি জানাবেন।

৫৪৪

(ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে লিখিত)

54 W. 33 St. N.Y.*

২৭শে মার্চ, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনি,

তোমার চিঠিখানা পেয়ে এত আনন্দ হয়েছে যে, তা প্রকাশ করা যায় না। আমিও অনায়াসে চিঠিখানা আগাগোড়া পড়তে পেরেছি। অবশেষে কমলারঙ ঠাওরিয়ে সেই রঙের একটা জামা পেয়েছি, কিন্তু গরমের দিনে ব্যবহারের উপযোগী কোন জামা এ-পর্যন্ত পাইনি। যদি পাও, আমাকে অনুগ্রহ ক'রে জানিও। এখানে নিউ ইয়র্কে তৈরি ক'রে নেবো। তোমার সেই অদ্ভুত ডিয়ারবর্ন এভিনিউ-এর অযোগ্য দরজি সাধু-সন্ন্যাসীর জামাও প্রস্তুত করতে জানে না।

ভগিনী লক্ এক লম্বা চিঠি লিখেছে এবং হয়তো উত্তরের দেরি দেখে আশ্চর্য হয়েছে। উৎসাহে সে অভিভূত হয়ে যায়; তাই আমি অপেক্ষা করছি এবং কি লিখব, জানি না। অনুগ্রহ ক'রে তাকে বলবে—এই মুহূর্তে কোন স্থান নির্ধারিত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মিসেস পীক্ সদাশয়া মহীয়সী ও অত্যন্ত ধর্মশীলা হলেও বৈষয়িক ব্যাপারে আমার মতোই বুদ্ধিমান্, তবে আমি দিনদিন বুদ্ধিমান্ হচ্ছি। ওয়াশিংটনে মিসেস পীকের জানা কে একজন তাকে গ্রীষ্মাবাসের জন্য একটি জায়গা দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন।

কে জানে, সে প্রতারিত হবে কি না? প্রতারণার এ এক অদ্ভুত দেশ; অন্যের ওপর সুবিধা নেওয়ার কোন-না-কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে শতকরা নিরানব্বই জনের। যদি কেউ মুহূর্তের জন্য কেবল একটু চোখ বন্ধ করে, তবেই তার সর্বনাশ! ভগিনী জোসেফাইন অগ্নিশর্মা। মিসেস পীক সাদাসিদে ভাল মহিলা। এখানকার লোকেরা আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছে যে, কিছু করবার আগে কয়েক ঘণ্টা আমাকে চারদিকে তাকাতে হয়। সবই ঠিক হয়ে যাবে। ভগিনী জোসেফাইনকে একটু ধৈর্য ধরতে ব'লো। একজন বৃদ্ধার সংসার চালানোর চেয়ে প্রতিদিন কিণ্ডারগার্টেন তোমার নিশ্চয়ই আরও ভাল লাগছে। মিসেস বুলকে দেখেছ; তাঁকে এত নিরীহ ও শান্ত দেখে তুমি নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছ। মিসেস

এডাম্‌সের সঙ্গে মাঝে মাঝে তোমার দেখা হয় কি? তার উপদেশে মিসেস বুল খুব উপকৃত হয়েছেন। আমিও কিছু উপদেশ গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু কোন কাজে লাগলো না; মিসেস এডাম্‌স্‌ যেমন চাইছে, তাতে সামনের ক্রমবর্ধমান বোঝা নোয়ানো যায় না। হাঁটবার সময় যদি সামনে ঝুঁকবার চেষ্টা করি, তা হ'লে ভারকেন্দ্র পাকস্থলীর উপরিভাগে আসে; কাজেই পুরোভাগে ডিগবাজি খেয়ে চলি।

ক্রোরপতি কেউ আসছে না, 'কয়েক-সহস্র'পতিও নয়! দুঃখিত, খুব দুঃখিত!!! কি করতে পারি—যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমার ক্লাসগুলি যে মহিলাতেই ভরতি।··· বেশ, ধৈর্য ধর। আমি চোখ মেলে রাখবো, কখন সুযোগ হারাব না। তুমি যদি কাকেও না পাও, অন্তত আমার কুঁড়েমির জন্য তা নয়, জেনো।

সেই পুরানো পথেই জীবন চলেছে। ক্রমাগত বক্তৃতা ও ধর্মপ্রসঙ্গ ক'রে অনেক সময় বিরক্তি আসে, দিনের পর দিন চুপ ক'রে থাকতে ইচ্ছা হয়।

তোমার স্বপ্ন শুভ হোক, কারণ সুখী হবার এটাই একমাত্র পথ।

সতত তোমার স্নেহের ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

৫৪৫

54 W. 33 St. New York*
মে, ১৮৯৫

প্রিয়,

তোমাকে চিঠি লেখবার পর আমার ছাত্রেরা আবার এসেছে আমায় সাহায্য করবার জন্য; ক্লাসগুলি এখন খুবই সুন্দরভাবে চলবে, সন্দেহ নেই।

এতে আমি খুব খুশী হয়েছি, কারণ শেখানো ব্যাপারটা আমার জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাদ্য ও বিশ্রাম যেমন প্রয়োজন, আমার জীবনে এও তেমনি প্রয়োজন।

তোমার
বিবেকানন্দ

পুনঃ—আমি ইংরেজী পত্রিকা 'The Borderland'-এ —এর বিষয়ে অনেক কিছু পড়েছি। — ভারতে খুব ভাল কাজ করছে এবং হিন্দুরা

যাতে তাদের ধর্ম বুঝতে পারে, সে বিষয়ে চেষ্টা করছে। আমি —র লেখায় কোনপ্রকার পাণ্ডিত্য দেখতে পাইনি, ...অথবা কোন আধ্যাত্মিকতাও নয়। যাই হোক, যে জগতের ভাল করতে চায়, তার উদ্দেশ্য সফল হোক।

কত সহজেই এ সংসার ধাপ্পাবাজিতে ভুলে যায়! এবং সভ্যতার সূচনা থেকেই কত যে জুয়াচুরি বেচারা মানুষের মাথার ওপর জমেছে!

৫৪৬

U. S. A.*

মে (?), ১৮৯৫

(খেতড়ির মহারাজাকে লিখিত)[১]

'যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি ধর্মের গৌরব পুনঃস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হই'—হে মহারাজ, ইহা পবিত্র গীতামুখে উচ্চারিত সেই সনাতন ভগবানের বাক্য, এই কথাগুলি জগতে আধ্যাত্মিক শক্তি-তরঙ্গের উত্থান-পতনের মূল সুর।

ধর্মজগতে এই পরিবর্তন বারংবার তাহার নূতন নূতন বিশিষ্ট ছন্দে প্রকাশিত হইতেছে; যদিও অন্যান্য বিরাট পরিবর্তনের ন্যায় নিজস্ব এলাকার মধ্যগত প্রত্যেকটি বস্তুর উপর এই পরিবর্তনগুলিও প্রভাব বিস্তার করে, তথাপি শক্তি-ধারণে সমর্থ বস্তুর উপরেই তাহাদের কার্যকারিতা সমধিক প্রকাশ পায়।

বিশ্বগতভাবে যেমন জগতের আদিম অবস্থা ত্রিগুণের সাম্যভাব, এই সাম্যভাবের চ্যুতি ও তাহা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য সমুদয় চেষ্টা লইয়াই এই প্রকৃতির বিকাশ বা বিশ্বজগৎ; যতদিন না এই সাম্যাবস্থা পুনরায় ফিরিয়া আসে, ততদিন এইভাবেই চলিতে থাকে। সীমাবদ্ধভাবে তেমনি আমাদের এই পৃথিবীতে যতদিন মনুষ্যজাতি এইভাবেই থাকিবে, ততদিন এই বৈষম্য ও তাহার অপরিহার্য পরিপূরক এই সাম্যলাভের চেষ্টা—দুইই পাশাপাশি বিরাজ

১ রাজপুতানার অন্তর্গত খেতড়ির মহারাজার ৪ঠা মার্চ ১৮৯৫ তারিখে লিখিত অভিনন্দন-পত্রের উত্তর।

করিবে। তাহাতে পৃথিবীর সর্বত্র ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিতর, উপজাতিগুলির ভিতর, এমন কি প্রত্যেকটি ব্যক্তিতে সুস্পষ্ট বিশেষত্ব থাকিবে।

অতএব নিরপেক্ষভাবে এবং সাম্য রক্ষা করিয়া সকলকে শক্তি প্রদত্ত হইলেও প্রত্যেক জাতিই যেন একটি বিশেষ প্রকার শক্তিসংগ্রহ ও বিতরণের উপযোগী এক-একটি অদ্ভুত যন্ত্রস্বরূপ; ঐ জাতির অন্যান্য অনেক শক্তি থাকিলেও সেই শক্তিটিই তাহার বিশেষ লক্ষণরূপে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়। মনুষ্যপ্রকৃতিতে একটি ভাবের তরঙ্গ উঠিলে, তাহার প্রভাব অল্প-বিস্তর সকলেই অনুভব করিলেও ঐ ভাব যে-জাতির বিশেষ লক্ষণ এবং সাধারণতঃ যে-জাতিকে কেন্দ্র করিয়া ঐ ভাবের আরম্ভ, সেই জাতির অন্তস্তল পর্যন্ত উহা দ্বারা আলোড়িত হয়। এই কারণেই ধর্মজগতে কোন আলোড়ন উপস্থিত হইলে তাহার ফলে ভারতে অবশ্যই নানাপ্রকার গুরুতর পরিবর্তন হইতে থাকিবে, ভারতকে কেন্দ্র করিয়াই বহুবিস্তৃত ধর্মতরঙ্গসমূহ বারংবার উত্থিত হইয়াছে, কারণ সর্বোপরি ভারত ধর্মের দেশ।

যাহা দ্বারা আদর্শলাভের সহায়তা হয়, মানুষ কেবল সেটিকেই বাস্তব বলে। সাংসারিক মানুষের নিকট যাহা কিছুর বিনিময়ে টাকা পাওয়া যায়, তাহাই বাস্তব; যাহার বিনিময়ে টাকা হয় না, তাহা অবাস্তব। প্রভুত্ব যাহার আকাঙ্ক্ষা, তাহার নিকট যাহাদ্বারা সকলের উপর প্রভুত্ব করিবার বাসনা চরিতার্থ হয়, তাহাই বাস্তব, বাকি সব কিছুই নয়। যাহা জীবনে বিশেষ প্রীতির প্রতিধ্বনি করে না, তাহার মধ্যে মানুষ কিছুই দেখিতে পায় না।

যাহাদের একমাত্র লক্ষ্য জীবনের সমুদয় শক্তির বিনিময়ে কাঞ্চন নাম বা অপর কোনরূপ ভোগসুখ অর্জন করা, যাহাদের নিকট সমরসজ্জায় সজ্জিত সৈন্য-দলের যুদ্ধযাত্রাই শক্তি-বিকাশের একমাত্র লক্ষণ, যাহাদের নিকট ইন্দ্রিয়সুখই জীবনের একমাত্র সুখ, তাহাদের নিকট ভারত সর্বদাই একটা বিশাল মরুভূমির মতো প্রতীয়মান হইবে; তাহাদের কাছে জীবনের বিকাশ বলিয়া যাহা পরিচিত, তাহার পক্ষে ঐ মরুভূমির প্রতিটি দমকা বাতাস মারাত্মক।

কিন্তু যাঁহাদের জীবনতৃষ্ণা ইন্দ্রিয়জগতের অতি দূরে অবস্থিত অমৃতনদীর সলিলপানে একেবারে মিটিয়া গিয়াছে, যাঁহাদের আত্মা সর্পের জীর্ণত্বক্‌মোচনের ন্যায় কাম, কাঞ্চন ও যশঃস্পৃহারূপ ত্রিবিধ বন্ধনকে দূরে ফেলিয়া দিয়াছে,

যাঁহারা চিত্তৈশ্বর্যের উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়া তথা হইতে—ইন্দ্রিয়-বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিগণের 'ভোগ' বলিয়া কথিত আপাতমনোহর বস্তুর জন্য নীচজনোচিত কলহ, বিবাদ, দ্বেষহিংসার প্রতি প্রীতি ও প্রসন্নতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সঞ্চিত সৎকর্মের ফলে চক্ষু হইতে অজ্ঞানের আবরণ খসিয়া পড়ায় যাঁহারা অসার নামরূপের পারে প্রকৃত সত্যদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা যেখানেই থাকুন না কেন, আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি ও অফুরন্ত খনি ভারতবর্ষ তাঁহাদের দৃষ্টিতে ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়; শূন্যে বিলীয়মান ছায়ার মতো এই জগতে যিনি একমাত্র প্রকৃত সত্তা, তাঁহার সন্ধানরত প্রত্যেকটি সাধকের নিকট ভারত আশার আলোকরূপে প্রতীত হয়।

অধিকাংশ মানব তখনই শক্তিকে শক্তি বলিয়া বুঝিতে পারে, যখন অনুভবের উপযোগী করিয়া স্থূল আকারে উহা তাহাদের সম্মুখে ধরা হয়। তাহাদের নিকট যুদ্ধের উত্তেজনা শক্তির প্রত্যক্ষ বিকাশ বলিয়া প্রতীত হয়; আর যাহা কিছু ঝড়ের মতো আসিয়া সম্মুখের সব কিছু উড়াইয়া লইয়া যায় না, উহা তাহাদের দৃষ্টিতে মৃত্যু-স্বরূপ। সুতরাং শত শত শতাব্দী-ব্যাপী যে ভারতবর্ষ কোনরূপ বাধাদানে নিশ্চেষ্ট হইয়া বিদেশী বিজেতৃগণের পদতলে পতিত, জনতা যেখানে একতাহীন, স্বদেশপ্রেমের ভাবও যেখানে এতটুকু নাই—সেই ভারত তাহাদের নিকট বিকৃত অস্থিপূর্ণ দেশ, প্রাণহীন পচনশীল পদার্থের স্তূপ বলিয়া প্রতীত হইবে।

বলা হয়, যোগ্যতমই কেবল জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া থাকে। তবে সাধারণ ধারণানুসারে যে-জাতি সর্বাপেক্ষা অযোগ্য, সে-জাতি দারুণ দুর্ভাগ্য সহ্য করিয়াও কেন বিনাশের কিছুমাত্র চিহ্ন প্রদর্শন করিতেছে না? তথাকথিত বীর্যবান্ ও কর্মপরায়ণ জাতিসমূহের শক্তি দিনদিন কমিয়া আসিতেছে, আর এদিকে 'দুর্নীতিপরায়ণ (?)' হিন্দুর শক্তি সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা কিরূপে হইতেছে? এক মুহূর্তের মধ্যে যাহারা জগৎকে শোণিতসাগরে প্লাবিত করিয়া দিতে পারে, তাহারা খুব প্রশংসা পাইবার যোগ্য! যাহারা জগতের কয়েক লক্ষ লোককে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য পৃথিবীর অর্ধেক লোককে অনাহারে রাখিতে পারে, তাহারাও মহৎ গৌরবের অধিকারী! কিন্তু যাহারা অপর কাহারও মুখ হইতে অন্ন কাড়িয়া না লইয়া লক্ষ লক্ষ মানুষকে সুখে ও শান্তিতে রাখিতে পারে, তাহারা কি

কোনরূপ সম্মান পাইবার যোগ্য নয়? শত শত শতাব্দী ধরিয়া অপরের উপর বিন্দুমাত্র অত্যাচার না করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্য পরিচালনা করাতে কি কোনরূপ শক্তি প্রদর্শিত হয় না?

সকল প্রাচীন জাতির পুরাণেই দেখা যায়, বীরপুরুষদের প্রাণ তাঁহাদের শরীরের কোন বিশেষ ক্ষুদ্র অংশে ঘনীভূত ছিল। যতদিন সেখানে হাত পড়িত না, ততদিন তাঁহারা দুর্ভেদ্য থাকিতেন। বোধ হয় যেন প্রত্যেক জাতিরও এইরূপ একটি বিশেষ কেন্দ্রে জীবনীশক্তি সঞ্চিত আছে; তাহাতে হাত না পড়া পর্যন্ত কোন দুঃখবিপদই সেই জাতিকে বিনষ্ট করিতে পারে না।

ধর্মেই ভারতের এই জীবনীশক্তি। যতদিন হিন্দুরা তাহাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান বিস্মৃত না হইতেছে, ততদিন জগতে কোন শক্তি তাহাদের ধ্বংস করিতে পারিবে না।

যে ব্যক্তি সর্বদাই স্বজাতির অতীতের দিকে ফিরিয়া তাকায়, আজকাল সকলেই তাহাকে নিন্দা করিয়া থাকে। অনেকে বলেন, এইরূপ ক্রমাগত অতীতের আলোচনাই হিন্দুজাতির নানারূপ দুঃখের কারণ। কিন্তু আমার বোধ হয়, ইহার বিপরীতটিই সত্য; যতদিন হিন্দুরা তাহাদের অতীত ভুলিয়া ছিল, ততদিন তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া অসাড় অবস্থায় পড়িয়াছিল। যতই তাহারা অতীতের আলোচনা করিতেছে, ততই চারিদিকে নূতন জীবনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অতীতের ছাঁচেই ভবিষ্যৎকে গড়িতে হইবে, এই অতীতই ভবিষ্যৎ হইবে।

অতএব হিন্দুগণ যতই তাঁহাদের অতীত আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ ততই গৌরবময় হইবে; আর যে-কেহ এই অতীতকে প্রত্যেকের কাছে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই স্বজাতির পরম হিতকারী। আমাদের পূর্বপুরুষগণের রীতিনীতিগুলি মন্দ ছিল বলিয়া যে ভারতের অবনতি হইয়াছে, তাহা নহে; এই অবনতির কারণ, ঐ রীতিনীতিগুলির যে ন্যায়সঙ্গত পরিণতি হওয়া উচিত ছিল, তাহা হইতে দেওয়া হয় নাই।

প্রত্যেক বিচারশীল পাঠকই জানেন, ভারতের সামাজিক বিধানগুলি যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রথম হইতেই এই নিয়মগুলি এক বিরাট পরিকল্পনার প্রতিফলনের চেষ্টাস্বরূপ ছিল, কালক্রমে ধীরে ধীরে এগুলি বিকশিত হইবার কথা। প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ এত দূরদর্শী ছিলেন যে,

তাঁহাদের জ্ঞানের মহত্ত্ব বুঝিতে জগৎকে এখনও অনেক শতাব্দী অপেক্ষা করিতে হইবে। আর তাঁহাদের বংশধরগণের এই মহান্ উদ্দেশ্যের পূর্ণভাব ধারণা করিবার অক্ষমতাই ভারতের অবনতির একমাত্র কারণ।

শত শত শতাব্দী ধরিয়া প্রাচীন ভারত তাহার প্রধান দুই জাতির—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উচ্চাভিলাষপূর্ণ অভিসন্ধি-সাধনের যুদ্ধক্ষেত্র ছিল।

একদিকে পুরোহিতগণ সাধারণ প্রজাদের উপর রাজাদের অবৈধ সামাজিক অত্যাচার নিবারণে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই প্রজাগণকে ক্ষত্রিয়-গণ আপনাদের 'ন্যায়সঙ্গত ভক্ষ্য'রূপে ঘোষণা করিতেন। অপর দিকে ক্ষত্রিয়গণই ভারতে একমাত্র শক্তিসম্পন্ন জাতি ছিলেন, যাঁহারা পুরোহিতগণের আধ্যাত্মিক অত্যাচার ও সাধারণ মানুষকে বন্ধন করিবার জন্য তাঁহারা যে ক্রমবর্ধমান নূতন নূতন ক্রিয়াকাণ্ড প্রবর্তন করিতেছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া কিছুপরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই উভয় জাতির এই সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। সমগ্র শ্রুতির ভিতরেই ইহা অতি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। সাময়িকভাবে এই বিরোধ মন্দীভূত হইল, যখন ক্ষত্রিয়দের এবং জ্ঞানকাণ্ডের নেতা শ্রীকৃষ্ণ সামঞ্জস্যের পথ দেখাইয়া দিলেন। তাহার ফল গীতার শিক্ষা, যাহা ধর্ম দর্শন ও উদারতার সারস্বরূপ। কিন্তু বিরোধের কারণ তখনও বর্তমান ছিল, সুতরাং তাহার ফলও অবশ্যম্ভাবী।

সাধারণ দরিদ্র মূর্খ প্রজার উপর প্রভুত্ব করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্বোক্ত দুই জাতির মধ্যেই বর্তমান ছিল, সুতরাং বিরোধ আবার প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিল। আমরা সেই সময়কার যে সামান্য সাহিত্য পাই, তাহা সেই প্রাচীনকালের প্রবল বিরোধের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র, কিন্তু অবশেষে ক্ষত্রিয়ের জয় হইল, জ্ঞানের জয় হইল, স্বাধীনতার জয় হইল আর কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য রহিল না, ইহার অধিকাংশই চিরকালের জন্য চলিয়া গেল।

এই উত্থানের নাম বৌদ্ধ সংস্কার। ধর্মের দিকে উহা কর্মকাণ্ড হইতে মুক্তি সূচনা করিতেছে, আর রাজনীতির দিকে ক্ষত্রিয় দ্বারা পুরোহিত-প্রাধান্যের বিনাশ সূচিত হইতেছে।

বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রাচীন ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ যে দুই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়েই—কৃষ্ণ ও বুদ্ধ—ক্ষত্রিয়

ছিলেন। ইহা আরও বেশী লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই দুই দেবমানবই স্ত্রী-পুরুষ জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের জন্যই জ্ঞানের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন।

অদ্ভুত নৈতিক বল সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন মত ধ্বংস করিতে অত্যধিক সমুৎসুক ছিল। উহার অধিকাংশ শক্তিই নেতিমূলক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হওয়াতে বৌদ্ধধর্মকে উহার জন্মভূমি হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইতে হইল; আর যেটুকু অবশিষ্ট রহিল, তাহাও বৌদ্ধধর্ম যে-সকল কুসংস্কার ও ক্রিয়াকাণ্ড নিবারণে নিয়োজিত হইয়াছিল, তদপেক্ষা শতগুণ ভয়ানক কুসংস্কার ও ক্রিয়াকাণ্ডে পূর্ণ হইয়া উঠিল। যদিও উহা আংশিকভাবে বৈদিক পশুবলি নিবারণে কৃতকার্য হইয়াছিল, কিন্তু উহা সমুদয় দেশ মন্দির, প্রতিমা, প্রতীক, যন্ত্র ও সাধুসন্তের অস্থিতে ভরিয়া ফেলিল।

সর্বোপরি বৌদ্ধধর্মের জন্য আর্য মঙ্গোলীয় ও আদিম প্রভৃতি ভিন্ন প্রকৃতির জাতির যে মিশ্রণ হইল, তাহাতে অজ্ঞাতসারে কতকগুলি বীভৎস বামাচারের সৃষ্টি হইল। প্রধানতঃ এই কারণেই সেই মহান্ আচার্যের উপদেশাবলীর এই বিকৃত পরিণতিকে শ্রীশঙ্কর ও তাঁহার সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় ভারত হইতে বিতাড়িত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এইরূপে মনুষ্যদেহধারিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক প্রবর্তিত জীবন-প্রবাহও পূতিগন্ধময় বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হইল; ভারতকে কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করিতে হইল, যতদিন না ভগবান্ শঙ্করের আবির্ভাব এবং কিছু পরে-পরেই রামানুজ ও মধ্বাচার্যের অভ্যুদয় হইল।

ইতিমধ্যে ভারতেতিহাসের এক সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি অন্তর্হিত হইয়াছে। হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যবর্তী আর্যভূমি, যেখানে কৃষ্ণ ও বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহা মহামান্য রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণের শৈশবের লীলাভূমি ছিল, তাহা এখন নীরব; আর ভারত উপদ্বীপের সর্বশেষ প্রান্ত হইতে, ভাষা ও আকারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক জাতি হইতে, প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের বংশধর বলিয়া গৌরবকারী বংশসমূহ হইতে বিকৃত বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল।

আর্যাবর্তের সেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ কোথায় গেলেন? তাঁহারা একেবারে বিলুপ্ত, কেবল এখানে ওখানে ব্রাহ্মণত্ব- বা ক্ষত্রিয়ত্ব-অভিমানী কতকগুলি মিশ্র জাতি বাস করিতেছে। আর তাঁহাদের 'এতদ্দেশপ্রসূতস্য

সকাশাদগ্রজন্মনঃ' পৃথিবীর সকল মানুষ আপন আপন চরিত্র শিক্ষা করিবে,[১] এইরূপ অহঙ্কৃত, আত্মশ্লাঘাময় উক্তি সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে অতি বিনয়ের সহিত দীনবেশে দাক্ষিণাত্যবাসীদের পদতলে বসিয়া শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে ভারতে পুনরায় বেদের অভ্যুদয় হইল—বেদান্তের পুনরুত্থান হইল; এইরূপ বেদান্তের চর্চা আর কখন হয় নাই, গৃহস্থেরা পর্যন্ত আরণ্যক-পাঠে নিযুক্ত হইলেন।

বৌদ্ধধর্ম-প্রচারে ক্ষত্রিয়েরাই প্রকৃত নেতা ছিলেন এবং দলে দলে তাঁহারাই বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। সংস্কার ও ধর্মান্তর-করণের উৎসাহে সংস্কৃত ভাষা উপেক্ষিত হইয়া লোকপ্রচলিত ভাষাসমূহের চর্চা প্রবল হইয়াছিল। আর অধিকাংশ ক্ষত্রিয়ই বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃত শিক্ষার বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং দাক্ষিণাত্য হইতে যে এই সংস্কার-তরঙ্গ আসিল, তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণেরই উপকার হইল। কিন্তু উহা ভারতের অবশিষ্ট লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে অধিকতর ও নূতনতর বন্ধনের কারণ হইয়াছিল।

ক্ষত্রিয়গণ চিরকালই ভারতের মেরুদণ্ড-স্বরূপ, সুতরাং তাঁহারাই বিজ্ঞান ও স্বাধীনতার পরিপোষক। দেশ হইতে কুসংস্কার দূরীভূত করিবার জন্য বারংবার তাঁহাদের বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হইয়াছে, আর ভারতেতিহাসের প্রথম হইতে তাঁহারাই পুরোহিতকুলের অত্যাচার হইতে সাধারণকে রক্ষা করিবার অভেদ্য প্রাচীররূপে দণ্ডায়মান।

যখন তাঁহাদের অধিকাংশ ঘোর অজ্ঞানে নিমগ্ন হইলেন, এবং অপরাংশ মধ্য এসিয়ার বর্বর জাতিগুলির সহিত শোণিতসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ভারতে পুরোহিতগণের প্রাধান্য-স্থাপনে তরবারি নিয়োজিত করিল, তখনই ভারতে পাপের মাত্রা পূর্ণ হইয়া আসিল, আর ভারতভূমি একেবারে ডুবিয়া গেল। যতদিন না ক্ষত্রিয়-শক্তি জাগরিত হইয়া নিজেকে মুক্ত করে এবং অবশিষ্ট জাতির চরণ-শৃঙ্খল মোচন করিয়া দেয়, ততদিন আর ভারত উঠিবে না। পৌরোহিত্যই ভারতের সর্বনাশের মূল। নিজ ভ্রাতাকে অবনমিত করিয়া মানুষ স্বয়ং কি অবনত না হইয়া থাকিতে পারে?

১ এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ। স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ॥ মনু —এই আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণের নিকট পৃথিবীর সকলে শিক্ষা করিবে।

জানিবেন, রাজাজী, আপনার পূর্বপুরুষগণের দ্বারা আবিষ্কৃত সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য : বিশ্বজগতের একত্ব। কোন ব্যক্তি নিজের কিছুমাত্র অনিষ্ট না করিয়া কি অপরের অনিষ্ট করিতে পারে? এই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের অত্যাচার-সমষ্টি চক্রবৃদ্ধিহারে তাঁহাদেরই উপর ফিরিয়া আসিয়াছে, এই সহস্রবর্ষব্যাপী দাসত্ব ও অপমানে তাহারা অনিবার্য কর্মফলই ভোগ করিতেছে।

আপনাদেরই একজন পূর্বপুরুষ বলিয়াছিলেন, 'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।'[১]—যাঁহাদের মন সাম্যে অবস্থিত, তাঁহারা জীবদ্দশাতেই সংসার জয় করিয়াছেন। তাঁহাকে লোকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে, আমরা সকলেই ইহা বিশ্বাস করি। তবে তাঁহার এই বাক্য কি অর্থহীন প্রলাপমাত্র? যদি তাহা না হয়, আর আমরা জানি তাঁহার বাক্য প্রলাপ নয়, তবে জাতি লিঙ্গ—এমন কি গুণ পর্যন্ত বিচার না করিয়া সমুদয় সৃষ্ট জগতের এই পূর্ণ সাম্যের বিরুদ্ধে যে-কোন চেষ্টা ভয়ানক ভ্রমাত্মক; আর যতদিন না এই সাম্যভাব আয়ত্ত হইতেছে, ততদিন কেহ কখনই মুক্ত হইতে পারে না।

অতএব হে রাজন্, আপনি বেদান্তের উপদেশাবলী পালন করুন—অমুক ভাষ্যকারের বা টীকাকারের ব্যাখ্যানুসারে নহে, আপনার অন্তর্যামী আপনাকে যেরূপ বুঝাইয়াছেন, সেইভাবে। সর্বোপরি এই সর্বভূতে সর্ববস্তুতে সমজ্ঞানরূপ মহান্ উপদেশ পালন করুন—সর্বভূতে সেই এক ভগবান্‌কে দর্শন করুন।

ইহাই মুক্তির পথ; বৈষম্যই বন্ধনের পথ। কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি বাহিরের একত্ব-জ্ঞান ব্যতীত বাহিরের স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না, আর সকলের মানসিক একত্ব-জ্ঞান ব্যতীত মানসিক স্বাধীনতাও লাভ করিতে পারে না।

অজ্ঞান অসাম্য ও বাসনা—এই তিনটিই মানবজাতির দুঃখের কারণ, আর উহাদের মধ্যে একটির সহিত অপরটির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। একজন মানুষ নিজেকে অপর কোন মানুষ হইতে, এমন কি পশু হইতেও শ্রেষ্ঠ ভাবিবে কেন? বাস্তবিক সর্বত্রই তো এক বস্তু বিরাজিত। 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি

---

১ গীতা, ৫।১৯।

ত্বং কুমার উত বা কুমারী।[১]—তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার আবার তুমিই কুমারী।

অনেকে বলিবেন, 'এরূপ ভাবা সন্ন্যাসীর পক্ষে ঠিক বটে, কিন্তু আমরা যে গৃহস্থ!' অবশ্য গৃহস্থকে অন্যান্য অনেক কর্তব্য করিতে হয় বলিয়া সে পূর্ণভাবে এই সাম্য-অবস্থা লাভ করিতে না পারে, কিন্তু ইহা তাহাদেরও আদর্শ হওয়া উচিত। এই সমত্বভাব লাভ করাই সমগ্র সমাজের, সমুদয় জীবের ও সমগ্র প্রকৃতির আদর্শ। কিন্তু হায়, লোকে মনে করেঃ বৈষম্যই এই সমজ্ঞান-লাভের উপায়; অন্যায় কাজ করিয়া তাহারা যেন ন্যায়ের লক্ষ্যে—সত্যে পৌঁছিতে পারে!

ইহাই মনুষ্যপ্রকৃতিতে বিষবৎ কার্য করে; মনুষ্যজাতির উপর অভিশাপ-স্বরূপ, সকল দুঃখের মুল কারণ—এই বৈষম্য। ইহাই শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ববিধ বন্ধনের মুল।

'সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥'[২]

—ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না, সুতরাং পরম গতি লাভ করেন। এই একটি শ্লোকে অল্প কথার মধ্যে সকলের উপযোগী মুক্তির উপায় বলা হইয়াছে।

রাজপুত আপনারা প্রাচীন ভারতের গৌরবস্বরূপ। আপনাদের অবনতি হইতেই জাতীয় অবনতি আরম্ভ হইল। লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা ভাগ করিয়া লইবার জন্য নহে, জ্ঞানহীনগণকে জ্ঞানদানের জন্য ও পূর্বপুরুষগণের পবিত্র বাসভূমির প্রনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য যদি ক্ষত্রিয়দের বংশধরগণ ব্রাহ্মণের বংশধরগণের সহিত সমবেত চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হন, তবেই ভারতের উন্নতি সম্ভব।

আর কে বলিতে পারে, ইহা শুভ মুহূর্ত নহে? কালচক্র আবার ঘুরিয়া আসিতেছে, পুনর্বার ভারত হইতে সেই শক্তিপ্রবাহ বাহির হইয়াছে, যাহা অনতিদূরকালমধ্যে নিশ্চয়ই জগতের দূরতম প্রান্তে পৌঁছিবে। এক মহাবাণী উচ্চারিত হইয়াছে, যাহার প্রতিধ্বনি প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, প্রতিদিনই

---

১ শ্বেতাশ্বতর উপ, ৪।৩

২ গীতা, ১৩।২৯

যাহা অধিক হইতে অধিকতর শক্তিসংগ্রহ করিতেছে, আর এই বাণী পূর্ববর্তী সকল বাণী হইতে অধিকতর শক্তিশালী, কারণ ইহা পূর্ববর্তী বাণীগুলির সমষ্টিস্বরূপ। যে বাণী একদিন সরস্বতীতীরে ঋষিগণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহার প্রতিধ্বনি নগরাজ হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে কৃষ্ণ বুদ্ধ ও চৈতন্যের ভিতর দিয়া সমতল প্রদেশে নামিয়া সমগ্র দেশ প্লাবিত করিয়াছিল, তাহাই আবার উচ্চারিত হইয়াছে। আবার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে; সকলে আলোর রাজ্যে প্রবেশ করুন—দ্বার আবার উদ্ঘাটিত হইয়াছে!

আর হে প্রিয় মহারাজ, আপনি সেই (ক্ষত্রিয়) জাতির বংশধর, যাঁহারা সনাতন ধর্মের জীবন্ত স্তম্ভস্বরূপ, অঙ্গীকারবদ্ধ রক্ষক ও সাহায্যকারী; আপনি রাম ও কৃষ্ণের বংশধর। আপনি কি এই কর্তব্য পালন না করিয়া দূরে থাকিবেন? আমি জানি, তাহা কখনই হইতে পারে না। আমার নিশ্চয় ধারণা, পুনরায় ধর্মের সাহায্যে আপনারই হস্ত প্রথমে প্রসারিত হইবে। হে রাজা অজিত সিং, যখনই আমি আপনার কথা ভাবি—যাঁহার মধ্যে আপনাদের বংশের সর্বজনবিদিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সহিত এমন পবিত্র চরিত্র (যাহা থাকিলে একজন সাধুও গৌরবান্বিত হইতে পারেন) এবং সকল মানবের জন্য অসীম প্রেম যুক্ত হইয়াছে—যখন এইরূপ ব্যক্তিগণ সনাতন ধর্মের পুনর্গঠনে ইচ্ছুক, তখন আমি ইহার মহাগৌরবময় পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী না হইয়া থাকিতে পারি না।

চিরকালের জন্য আপনার উপর ও আপনার স্বজনগণের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ বর্ষিত হউক, আর আপনি পরের হিতের জন্য ও সত্যপ্রচারের জন্য দীর্ঘকাল জীবিত থাকুন, ইহাই সর্বদা বিবেকানন্দের প্রার্থনা।

৫৪৭

(মিঃ লেগেটকে লিখিত)

Thousand Island Park, N. Y.*
C/o Miss Dutcher
১৮ই জুন, ১৮৯৫

প্রিয় বন্ধু,

রওনা হওয়ার পূর্বদিন মিসেস স্টার্জিস্-এর এক চিঠি পেয়েছি, ৫০ ডলারের একখানা চেকও সঙ্গে আছে। পরদিনই তার কাছে প্রাপ্তি-স্বীকার পৌছিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি এর পর যখন তাঁকে চিঠি লিখবে, তখন আমার ধন্যবাদ ও প্রাপ্তি-স্বীকারটা তাঁকে জানিয়ে দিও।

প্রাচীন হিন্দু প্রবচন 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'-ছাড়া এখানে বেশ সময় কাটছে। একই কথা, আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে। অগস্টের প্রথম ভাগে চিকাগো যাচ্ছি। তুমি কখন রওনা হচ্ছ?

এখানকার বন্ধুরা সকলেই তোমাকে অভিবাদন জানাচ্ছে। তোমার সর্বাঙ্গীণ সুখ শান্তি ও স্বাস্থ্য কামনা করি।

তোমার স্নেহের
বিবেকানন্দ

৫৪৮

(মিসেস স্টার্জিস্কে লিখিত)

Thousand Island Park*
২৯শে জুলাই, ১৮৯৫

মা,

আপনার গৌরবময় সময় এসেছে। আপনি নিশ্চয়ই সুস্থ আছেন।...

এখানে বেশ ভালভাবে সময় কাটছে। দু-জন মহিলা সরাসরি ডেট্রয়েট থেকে এখানে এসেছেন আমাদের সঙ্গে থাকতে। তাঁরা বেশ পবিত্র ও ভাল। আমি থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড থেকে ডেট্রয়েটে এবং সেখান থেকে চিকাগোয় যাচ্ছি।

নিউ ইয়র্কে আমাদের ক্লাস চলছে। আমার অনুপস্থিতিতেও তারা বেশ সাহসের সঙ্গে ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছে। ভাল কথা, ডেট্রয়েট থেকে যে দু-জন মহিলা এসেছেন, তাঁরা ক্লাসে যোগদান করেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের ভূতের ভয়। তাঁদের কে শিখিয়েছে, জ্বলন্ত এলকোহলের শিখায় একটু নুন দিলে যদি কালো তলানি পড়ে, তা হ'লে সেটা হবে ভূতের অস্তিত্বের প্রমাণ। যা হোক, মহিলা দুটি বেশ ভূতের ভয় পেয়েছিলেন। লোকে বলে, এই রকম ভূত বিশ্বজগতে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। পিতা লেগেট আপনার অনুপস্থিতিতে নিশ্চয়ই খুব নিরুৎসাহ হয়েছেন। কারণ আজ পর্যন্ত তাঁর কোন চিঠি পাইনি। বেশ, দুঃখ আসে আসুক, বিচলিত না হওয়াই শ্রেয়। কাজেই তাঁকে নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছি না।

জো জো-র সমুদ্রযাত্রা খুবই ভয়ঙ্কর হয়ে থাকবে। শেষ রক্ষাই রক্ষা।

শিশুরা[১] জার্মানিতে বেশ আনন্দেই আছে, নিশ্চয়। তাদের জাহাজ-ভরতি ভালবাসা জানাবেন।

এখানকার সকলের ভালবাসা জানবেন। ভবিষ্য বংশধরদের নিকট আপনার জীবন আলো-বর্তিকার মতো হোক—এই কামনা করি।

আপনার পুত্র
বিবেকানন্দ

৫৪৯

High View, Caversham, Reading*
C/o E. T. Sturdy, Esq.,
১৮৯৬

প্রিয়,

প্রত্যেকে পূর্ণ উদ্যম প্রকাশ না করলে কি কোন কাজ সম্পন্ন হয়? 'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ'—সিংহহৃদয় কাজের মানুষের কাছেই লক্ষ্মীদেবী এসে থাকেন।

পেছন ফিরে তাকানোর প্রয়োজন নেই। আগে চল! আমাদের চাই অনন্ত শক্তি, অফুরন্ত উৎসাহ, সীমাহীন সাহস, অসীম ধৈর্য, তবেই আমরা বড় বড় কাজ করতে পারবো। ইতি

তোমাদের স্নেহশীল
বিবেকানন্দ

১ মিসেস স্টার্জিসের কন্যা হলিস্টার ও এলবার্টা তখন জার্মানিতে পড়াশুনা করিতেছিল।

৫৫০

ওঁ তৎ সৎ

England

মে (?) ১৮৯৬

প্রিয় শশী,

পূর্বপত্রে যদি ভুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই পত্রে লিখি যে, কালী যে দিবস start (যাত্রা) করিবে, সেদিন কিম্বা তাহার আগে যেন E. T. Sturdy (স্টার্ডি)-কে চিঠি লেখে, যাহাতে সে যাইয়া তাহাকে জাহাজ হইতে লইয়া আসে। এ লণ্ডন শহর মানুষের জঙ্গল—দশ পনেরটা কলকাতা একত্রে—অতএব ঐ প্রকার না করিলে গোলমাল হয়ে যাবে। আসতে দেরি যেন না হয়, পত্রপাঠ চলে আসতে বলবে। শরতের বেলার মতো যেন না হয়। বাকি বুঝে-সুঝে ঠিক ক'রে নেবে।...

কালীকে যাই হোক সত্বর পাঠাবে। যদি শরতের বেলার মতো দেরি হয় তো কাহাকেও আসতে হবে না; ও-রকম গড়িমসির কাজ নয়। মহা রজোগুণের কাজ, আমাদের দেশময় খালি তমস্, আমাদের দেশে রজস্ চাই—তারপর সত্ত্ব, সে ঢের দূরের কথা। ইতি

নরেন্দ্র

৫৫১

(ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষকে লিখিত)[1]

বেলুড় মঠ, হাওড়া*

৬ই মার্চ, ১৮৯৯

প্রিয় মহাশয়,

আপনার অত্যন্ত সানুগ্রহ আমন্ত্রণের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আপনার পত্রের উত্তর দিতে এত দেরি হ'ল ব'লে বিশেষ দুঃখিত।

আমি সে-সময় খুব অসুস্থ ছিলাম এবং যাঁর উপর পত্রের উত্তর দেবার ভার ছিল, তিনি তা দেননি বলেই মনে হয়। আমি এইমাত্র তা জানতে পেরেছি।

---

১ ঢাকায় শুভাগমনের জন্য নাগরিকগণের পক্ষ হইতে অনুরোধের উত্তরে।

আপনাদের সানুগ্রহ আহ্বানের সুযোগ গ্রহণের জন্য আমি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইনি। এই শীতকালেই আপনাদের ঐ অঞ্চল (পূর্ববঙ্গ) দেখব ব'লে সংকল্প করেছিলাম। কিন্তু আমার কর্মের গতি অন্যরূপ। প্রাচীন বাংলার সভ্যতার কেন্দ্র দেখবার আনন্দ পাবার জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

আপনাদের সহৃদয়তার জন্য আবার ধন্যবাদ।

শুভার্থী
বিবেকানন্দ

৫৫২

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

১৭১৯ টার্ক স্ট্রীট, স্যান ফ্র্যান্সিস্কো*
২৮শে মার্চ, ১৯০০

আশীর্বাদভাজন মেরী,

তোমাকে জানাচ্ছি, আমি খুব আনন্দে আছি। তার মানে এ নয় যে, একটা কুহেলিকাময় সুখবাদের দিকে আমি চলেছি, তবে দুঃখকে সহ্য করবার শক্তি আমার বেড়ে যাচ্ছে। এই দুনিয়ার সুখদুঃখের পূতিগন্ধময় বাষ্পের ঊর্ধ্বে আমি উঠে যাচ্ছি, এগুলি আমার কাছে অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। এটা একটা স্বপ্নের রাজ্য, এখানে আনন্দ-উপভোগই বা কি, আর কান্নাই বা কি; সে-সব স্বপ্ন বই তো নয়। তাই অচিরেই হোক, বিলম্বেই হোক সেগুলি ভাঙবেই। ওখানে তোমাদের সব কেমন চলছে? হ্যারিয়েট প্যারিসে খুব আনন্দে কাটাচ্ছে। তার সঙ্গে সেখানে নিশ্চয়ই দেখা ক'রব। আমি একখানা ফরাসী অভিধান কণ্ঠস্থ করছি! কিছু টাকাও করছি; সকাল-সন্ধ্যা কঠোর পরিশ্রম চলছে, তা সত্ত্বেও আগের তুলনায় ভাল। সুনিদ্রা, সুপরিপাক ও সম্পূর্ণ অনিয়ম চলেছে।

তোমরা পূর্বাঞ্চলে যাচ্ছ। এপ্রিলের শেষে চিকাগো যাব ব'লে মনে করছি। যদি না পারি, তবে নিশ্চয়ই তোমাদের চলে যাবার আগেই পূর্বাঞ্চলে তোমাদের সঙ্গে দেখা ক'রব।

ম্যাক্‌কিণ্ডলি-ভগিনীরা এখন কি করছে? আঙুরের রস খেয়ে খেয়ে বুঝি মোটা হয়ে উঠছে? এগিয়ে যাও, জীবনটা স্বপ্ন ছাড়া আর কি!

আর তাই ব'লে তুমি কি খুশী নও? আর আমি! লোকে চায় চিরন্তন স্বর্গ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, স্বয়ং তিনি ছাড়া আর কিছুই শাশ্বত নয়। আমি নিশ্চিত যে, একমাত্র তিনিই চিরন্তন স্বর্গ সহ্য করতে পারেন। এইসব বাজে জিনিসের চিরস্থায়িত্ব!

আমার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি। শীঘ্রই তা গর্জন শুরু করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি অচঞ্চল থাকব। এখনই তোমার চারপাশে কোন গুঞ্জন নেই। খুব দুঃখিত, অর্থাৎ দুঃখিত হবার চেষ্টা করছি, কারণ কোন-কিছুর জন্যই আর দুঃখিত হ'তে পারি না। সকল বোধের অতীত এক শান্তি আমি লাভ করেছি, তা আনন্দ বা দুঃখের কোনটাই নয়, অথচ দুয়েরই ঊর্ধ্বে। মাকে সে-কথা ব'লো। গত দু-বছর ধরে মৃত্যু-উপত্যকার উপর দিয়ে শারীরিক ও মানসিক যাত্রা আমাকে এ বিষয়ে সহায়তা করেছে। এখন আমি সেই শান্তির—সেই চিরন্তন নীরবতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সকল বস্তুকে তার নিজের স্বরূপে আমি দেখছি, সব কিছুই সেই শান্তিতে বিধৃত, নিজের ভাবে পরিপূর্ণ। 'যিনি আত্মতুষ্ট, যিনি আত্মরতি, তাঁরই যথার্থ শিক্ষালাভ হয়েছে'—এ জগতে এই বড় শিক্ষাটি আমাদের জানতে হয় অসংখ্য জন্ম এবং স্বর্গ ও নরকের মধ্য দিয়ে—আত্মা ছাড়া আর কিছুই কামনা বা আকাঙ্ক্ষার বস্তু নেই। 'আত্মাকে লাভ করাই হ'ল শ্রেষ্ঠ লাভ', 'আমি মুক্ত', অতএব আমার আনন্দের জন্য দ্বিতীয় কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। 'চির একাকী, কারণ আমি মুক্ত ছিলাম, এখনও মুক্ত এবং চিরকাল মুক্ত থাকব'—এই হ'ল বেদান্তবাদ। এতকাল আমি এই তত্ত্বটি প্রচার করছি। তবে আঃ, কী আনন্দ!—প্রিয় ভগিনী মেরী, এখন প্রতিটি দিন তা উপলব্ধি করছি। হ্যাঁ, তাই—'আমি মুক্ত'। আমি একা—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

সচ্চিদানন্দে মগ্ন তোমার চিরকালের

বিবেকানন্দ

পুনঃ—এখন আমি সত্যিকারের বিবেকানন্দ হ'তে চলেছি। তুমি কখন মন্দকে উপভোগ করেছ? হাঃ! হাঃ! বোকা মেয়ে, সবই ভাল! যত সব বাজে। কিছু ভাল, কিছু মন্দ। ভাল-মন্দ দুই-ই আমার উপভোগ্য। আমিই ছিলাম যীশু এবং আমিই ছিলাম জুডাস ইস্ক্যারিয়ট; দুই-ই আমার

খেলা, আমারই কৌতুক"। 'যতদিন দুই আছে, ততদিন ভয় তোমাকে ছাড়বে না।' উটপাখীর মতো বালির মধ্যে মুখ লুকিয়ে ভাবছ, কেউ তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না। সব কিছুই ভাল। সাহসী হও, সব কিছুর সম্মুখীন হও; ভাল আসুক, মন্দ আসুক, দুটিকেই বরণ ক'রে নাও, দুই-ই আমার খেলা। আমার লভ্য ভাল বস্তু কিছুই নেই, ধরে থাকবার মতো কোন আদর্শ নেই, পূর্ণ করবার মতো উচ্চাভিলাষও নেই; আমি হীরের খনি, ভাল-মন্দের নুড়ি নিয়ে খেলা করছি। ভাল-মন্দ দুই-ই ভাল। মন্দ, তুমি এস, ভালর জন্য; ভাল, তুমিও এস। আমার সামনে দুনিয়াটা উল্টে-পাল্টে গেলেই বা আমার কি আসে যায়? আমি বুদ্ধির অতীত শান্তি; বুদ্ধি আমাদের কেবল ভাল-মন্দই দিতে পারে। আমি তার বাইরে, আমি শান্তি।

বি—

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ

রামায়ণ

১৯০০ খৃঃ ৩১ জানুআরি ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত প্যাসাডেনায়
'সেক্সপীয়র সভায়' প্রদত্ত বক্তৃতা

সংস্কৃত ভাষায় দুইখানি প্রাচীন মহাকাব্য আছে ; অবশ্য আরও শত শত বীরত্বব্যঞ্জক কাব্য বিদ্যমান। যদিও প্রায় দুই সহস্র বর্ষের উপর হইল সংস্কৃত আর কথোপকথনের ভাষা নাই, তথাপি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সেই প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিয়াছে। আমি আপনাদের সমক্ষে সেই রামায়ণ ও মহাভারত নামক অতি প্রাচীন কাব্যদ্বয়ের বিষয় বলিতে যাইতেছি। ঐ দুইটিতে প্রাচীন ভারতবাসিগণের আচার, ব্যবহার, সভ্যতা, তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ আছে। উহাদের মধ্যে আবার রামায়ণ প্রাচীনতর, উহাকে রামের জীবন-চরিত বলা যায়। রামায়ণের পূর্বেও ভারতে পদ্য-সাহিত্য ছিল। হিন্দুদের পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ বেদের অধিকাংশ ভাগ একপ্রকার ছন্দে রচিত; কিন্তু ভারতে সর্বসম্মতিক্রমে এই রামায়ণই আদিকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

রামায়ণের কবির নাম মহর্ষি বাল্মীকি। পরবর্তী কালে অপরের রচিত অনেক আখ্যানমূলক কবিতা, ঐ প্রাচীন কবি বাল্মীকির পরিচিত নামের সহিত জড়িত হইয়াছে। শেষে এমন দেখা যায় যে, অনেক শ্লোক বা কবিতা তাঁহার রচিত না হইলেও সেগুলি তাঁহারই রচিত বলিয়া মনে করা একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল প্রক্ষিপ্ত অংশ থাকিলেও আমরা এখন উহা যে আকারে পাইতেছি, তাহাও অতি সুন্দরভাবে গ্রথিত, জগতের সাহিত্যে উহার তুলনা নাই।

* * *

অতি প্রাচীন কালে এক স্থানে জনৈক যুবক বাস করিত। সে কোনরূপে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতে পারিত না। তাহার শরীর অতিশয় দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল। আত্মীয়বর্গের ভরণপোষণের উপায়ান্তর না দেখিয়া সে অবশেষে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল। পথিমধ্যে কাহাকেও দেখিতে

পাইলেই সে তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিত এবং ঐ দস্যুবৃত্তিলব্ধ ধনদ্বারা পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদির ভরণপোষণ করিত। এইরূপে বহুদিন যায়—দৈবক্রমে একদিন দেবর্ষি নারদ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন ; দস্যু তাঁহাকে দেখিবামাত্র আক্রমণ করিল। দেবর্ষি দস্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কেন আমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তুমি কি জানো না, দস্যুতা ও নরহত্যা মহাপাপ ? তুমি কি জন্য আপনাকে এই পাপের ভাগী করিতেছ?' দস্যু উত্তরে বলিল, 'আমি এই দস্যুবৃত্তিলব্ধ ধনদ্বারা আমার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিয়া থাকি।' দেবর্ষি বলিলেন, 'আচ্ছা, তুমি কি মনে কর, তুমি যাহাদের জন্য এই ঘোর পাপাচরণ করিতেছ, তাহারা তোমার এই পাপের ভাগ লইবে?' দস্যু বলিল, 'নিশ্চয়ই, তাহারা অবশ্যই আমার পাপের ভাগ গ্রহণ করিবে।' তখন দেবর্ষি বলিলেন, 'আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর। আমাকে এখানে বাঁধিয়া রাখিয়া যাও, তাহা হইলে আমি আর পলাইতে পারিব না। তার পর তুমি বাড়ী গিয়া পরিবারবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস : তাহারা যেমন তোমার ধনের ভাগ গ্রহণ করে, তেমনি তোমার পাপের ভাগ গ্রহণ করিতে তাহারা প্রস্তুত কি না?' দেবর্ষির বাক্যে সম্মত হইয়া দস্যু তাঁহাকে সেইস্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। গৃহে পৌঁছিয়াই প্রথমে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'পিতা, আমি কিরূপে আপনাদের ভরণপোষণ করি, তাহা কি আপনি জানেন?' পিতা উত্তর দিলেন, 'না, আমি জানি না।' তখন পুত্র বলিল, 'আমি দস্যুবৃত্তি দ্বারা আপনাদের ভরণপোষণ করিয়া থাকি। আমি লোককে মারিয়া ফেলিয়া তাহার সর্বস্ব অপহরণ করি।' পিতা এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কি! তুই এইরূপে ঘোরতর পাপাচরণে লিপ্ত থাকিয়াও আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস করিস্, এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ। তুই পতিত, তোকে আজ হইতে ত্যাজ্য পুত্র করিলাম।' তখন দস্যু তাহার মাতার নিকট গিয়া তাঁহাকেও ঐ প্রশ্ন করিল। সে কিরূপে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করে, তৎসম্বন্ধে মাতাও পিতার ন্যায় নিজ অজ্ঞতা জানাইলে দস্যু তাঁহাকে নিজের দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যার কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। মাতা ঐ কথা শুনিবামাত্র ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'উঃ, কি ভয়ানক কথা!'

দস্যু তখন কম্পিতকণ্ঠে বলিল, 'শোন মা, স্থির হও। ভয়ানকই হউক আর যাহাই হউক, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে—তুমি কি আমার পাপের ভাগ লইবে?' মাতা তখন যেন দশ হাত পিছাইয়া অম্লান বদনে বলিল, 'কেন, আমি তোর পাপের ভাগ লইতে যাইব কেন? আমি তো কখনও দস্যুবৃত্তি করি নাই।' তখন সে তাহার পত্নীর নিকট গমন করিয়া তাহাকেও পূর্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল; বলিল, 'শোন প্রিয়ে, আমি একজন দস্যু; অনেক কাল ধরিয়া দস্যুবৃত্তি করিয়া লোকের অর্থ অপহরণ করিতেছি, আর সেই দস্যুবৃত্তিলব্ধ অর্থদ্বারাই তোমাদের সকলের ভরণপোষণ করিতেছি; এখন আমার জিজ্ঞাস্য—তুমি কি আমার পাপের অংশ লইতে প্রস্তুত?' পত্নী মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়াই উত্তর দিল, 'কখনই নহে। তুমি আমার ভর্তা, তোমার কর্তব্য আমার ভরণপোষণ করা। তুমি যেরূপেই আমার ভরণপোষণ কর না কেন, আমি তোমার পাপের ভাগ কেন লইব?'

দস্যুর তখন জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। সে ভাবিল: এই তো দেখিতেছি সংসারের নিয়ম! যাহারা আমার পরম আত্মীয়, যাহাদের জন্য আমি এই দস্যুবৃত্তি করিতেছি, তাহারা পর্যন্ত আমার পাপের ভাগী হইবে না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দেবর্ষিকে যেখানে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল, সেখানে উপস্থিত হইয়া অবিলম্বে বন্ধন মোচন করিয়া দিল এবং তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া সকল কথা তাঁহার নিকট বর্ণনা করিল। পরে সে কাতরভাবে তাঁহার নিকট বলিল, 'প্রভো, আমায় উদ্ধার করুন, বলিয়া দিন—আমি কি করিব।' তখন দেবর্ষি তাহাকে বলিলেন, 'বৎস, তুমি এই দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ কর। তুমি তো দেখিলে, পরিবারবর্গের মধ্যে কেহই তোমায় যথার্থ ভালবাসে না, অতএব ঐ পরিবারবর্গের প্রতি আর মায়া কেন? যতদিন তোমার ঐশ্বর্য থাকিবে, ততদিন তাহারা তোমার অনুগত থাকিবে; আর যে-দিন তুমি কপর্দকহীন হইবে, সেই দিনই উহারা তোমায় পরিত্যাগ করিবে। সংসারে কেহই কাহারও দুঃখ কষ্ট বা পাপের ভাগী হইতে চায় না, কিন্তু সকলেই সুখের বা পুণ্যের ভাগী হইতে চায়। একমাত্র যিনি সুখদুঃখ, পাপপুণ্য সকল অবস্থাতেই আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, তুমি তাঁহারই উপাসনা কর। তিনি কখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না, কারণ

যথার্থ ভালবাসায় বেচাকেনা নাই, স্বার্থপরতা নাই, যথার্থ ভালবাসা অহেতুক।'

এই সকল কথা বলিয়া দেবর্ষি তাহাকে সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিলেন। দস্যু তখন সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দিবারাত্র প্রার্থনায় ও ধ্যানে নিযুক্ত হইল। ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে দস্যুর দেহজ্ঞান এতদূর লুপ্ত হইল যে, তাহার দেহ বল্মীকস্তূপে আচ্ছন্ন হইয়া গেলেও সে তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। অনেক বর্ষ এইরূপে অতিক্রান্ত হইলে দস্যু শুনিল, কে যেন গম্ভীরকণ্ঠে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, 'মহর্ষি, ওঠ।' দস্যু চমকিত হইয়া বলিল, 'মহর্ষি কে? আমি তো দস্যুমাত্র।' গম্ভীরকণ্ঠে আবার উচ্চারিত হইল: তুমি এখন আর দস্যু নহ। তোমার হৃদয় পবিত্র হইয়াছে, তুমি এখন মহর্ষি। আজ হইতে তোমার পুরাতন নাম লুপ্ত হইল। এখন তুমি 'বাল্মীকি' নামে প্রসিদ্ধ হইবে, যেহেতু তুমি ধ্যানে এত গভীরভাবে নিমগ্ন হইয়াছিলে যে, তোমার দেহের চারিদিকে যে বল্মীকস্তূপ হইয়া গিয়াছিল, তাহা তুমি লক্ষ্য কর নাই।—এইরূপে সেই দস্যু মহর্ষি বাল্মীকি হইল।

এই মহর্ষি বাল্মীকি কিরূপে কবি হইলেন, এখন সেই কথা বলিতেছি। একদিন মহর্ষি পবিত্র ভাগীরথীসলিলে অবগাহনের জন্য যাইতেছেন, দেখিলেন এক ক্রৌঞ্চমিথুন পরস্পরকে চুম্বন করিয়া পরমানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মহর্ষি ক্রৌঞ্চমিথুনের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, তাহাদের আনন্দ দেখিয়া তাঁহারও হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইল, কিন্তু মুহূর্তমধ্যেই এই আনন্দের দৃশ্যটি শোকদৃশ্যে পরিণত হইল, কোথা হইতে একটা তীর তাঁহার পার্শ্ব দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। সেই তীরে বিদ্ধ হইয়া পুংক্রৌঞ্চটি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। তাহার দেহ ভূমিতে পতিত হইবামাত্র ক্রৌঞ্চী কাতরভাবে তাহার সঙ্গীর মৃতদেহের চতুর্দিকে ঘুরিতে লাগিল। মহর্ষির অন্তর এই শোকদৃশ্য দেখিয়া পরম করুণার্দ্র হইল। কে এই নিষ্ঠুর কর্ম করিল, তাহা জানিবার জন্য তিনি ইতস্তত: নিরীক্ষণ করিবামাত্র এক ব্যাধকে দেখিতে পাইলেন।

তখন তাঁহার মুখ হইতে যে শ্লোক নির্গত হইল তাহার ভাবার্থ:

রে ব্যাধ, তুই কি পাষণ্ড, তোর একবিন্দুও দয়ামায়া নাই! ভালবাসার খাতিরেও তোর নিষ্ঠুর হস্ত এক মুহূর্তের জন্যও হত্যাকার্যে বিরত নহে!

শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়াই মহর্ষির মনে উদিত হইল, 'এ কি? এ আমি কি উচ্চারণ করিতেছি! আমি তো কখন এমনভাবে কিছু বলি নাই।' তখন তিনি এক বাণী শুনিতে পাইলেন: বৎস, ভীত হইও না, তোমার মুখ হইতে এইমাত্র যাহা বাহির হইল, ইহার নাম 'শ্লোক'। তুমি জগতের হিতের জন্য এইরূপ শ্লোকে রামের চরিত বর্ণনা কর।—এইরূপে কবিতার প্রথম আরম্ভ হইল। আদি কবি বাল্মীকির মুখ হইতে প্রথম শ্লোক করুণাবশে স্বতঃ নির্গত হইয়াছিল। ইহার পর তিনি পরম মনোহর কাব্য রামায়ণ অর্থাৎ রামচরিত রচনা করিলেন।

* * *

ভারতে অযোধ্যা নামে এক প্রাচীন নগরী ছিল, উহা এখনও বর্তমান। এখনও ভারতের যে প্রদেশে ঐ নগরীর স্থান নির্দিষ্ট হয়, তাহাকে আউধ বা অযোধ্যা প্রদেশ বলে এবং আপনারাও অনেকে ভারতের মানচিত্রে ঐ প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। উহাই সেই প্রাচীন অযোধ্যা। অতি প্রাচীন কালে সেখানে দশরথ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার তিন রানী ছিলেন, কিন্তু কোন রানীরই সন্তান-সন্ততি হয় নাই। তাই স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর আচারের অনুবর্তী হইয়া রাজা ও রানীগণ সন্তানকামনায় ব্রতোপবাস, দেবারাধনা প্রভৃতি নিয়ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে তাঁহাদের চারিটি পুত্র জন্মিল, সর্বজ্যেষ্ঠ রাম। ক্রমে এই রাজপুত্রগণ যথাবিধি সর্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন।

জনক নামে আর একজন রাজা ছিলেন, তাঁহার সীতা নামে এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। সীতাকে একটি শস্যক্ষেত্রের মধ্যে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল, অতএব সীতা পৃথিবীর কন্যা ছিলেন, জনক-জননী ছাড়াই তিনি ভূমিষ্ঠ হন। প্রাচীন সংস্কৃতে 'সীতা' শব্দের অর্থ হলকৃষ্ট ভূমিখণ্ড। তাঁহাকে ঐরূপ স্থানে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার এই নামকরণ হইয়াছিল। ভারতের প্রাচীন পৌরাণিক ইতিহাসে এরূপ অলৌকিক জন্মের কথা অনেক পাঠ করা যায়। কাহারও পিতা ছিলেন, মাতা ছিলেন না; কাহারও মাতা ছিলেন, পিতা ছিলেন না। কাহারও বা পিতামাতা কেহই ছিলেন না, কাহারও জন্ম যজ্ঞকুণ্ড হইতে, কাহারও বা শস্যক্ষেত্রে ইত্যাদি ইত্যাদি—ভারতের পুরাণে এ-সকল কথা আছে।

পৃথিবীর দুহিতা সীতা নিষ্কলঙ্কা ও পরম শুদ্ধস্বভাবা ছিলেন। রাজর্ষি জনকের দ্বারা তিনি প্রতিপালিত হন। তাঁহার বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রম হইলে রাজর্ষি তাঁহার জন্য উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ভারতে প্রাচীনকালে স্বয়ংবর নামক এক প্রকার বিবাহপ্রথা ছিল—তাহাতে রাজকন্যাগণ নিজ নিজ পতি নির্বাচন করিতেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্নদেশীয় রাজপুত্রগণ নিমন্ত্রিত হইতেন। সকলে সমবেত হইলে রাজকন্যা বহুমূল্য বসন-ভূষণে বিভূষিতা হইয়া বরমাল্যহস্তে সেই রাজপুত্রগণের মধ্য দিয়া গমন করিতেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে একজন ভাট যাইত। সে পাণিগ্রহণার্থী প্রত্যেক রাজকুমারের গুণাগুণ বংশমর্যাদাদি কীর্তন করিত। রাজকন্যা যাঁহাকে পতিরূপে মনোনীত করিতেন, তাঁহারই গলদেশে ঐ বরমাল্য অর্পণ করিতেন। তখন মহাসমারোহে পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। এই সকল স্বয়ংবরস্থলে কখন কখন ভাবী বরের বিদ্যা-বুদ্ধি-বল পরীক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ পণ নির্দিষ্ট থাকিত।

অনেক রাজপুত্র সীতাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। 'হরধনু' নামক এক প্রকাণ্ড ধনু যে ভাঙিতে পারিবে, সীতা তাঁহাকেই বরমাল্য প্রদান করিবেন, এ স্বয়ংবরে ইহাই ছিল পণ। সকল রাজপুত্রই এই বীর্যপরিচায়ক কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য হইলেন। অবশেষে রাম ঐ দৃঢ় ধনু হস্তে লইয়া অবলীলাক্রমে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। হরধনু ভগ্ন হইলে সীতা রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের গলে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। মহামহোৎসবে রাম-সীতার পরিণয় সম্পন্ন হইল। রাম বধূকে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিলেন।

কোন রাজার অনেকগুলি পুত্র থাকিলে রাজার দেহান্তে যাহাতে সিংহাসন লইয়া রাজকুমারগণের মধ্যে বিরোধ না হয়, সেজন্য প্রাচীন ভারতে রাজার জীবদ্দশাতেই জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। রামচন্দ্রের বিবাহের পর রাজা দশরথ ভাবিলেন: আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, রামও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সময় আসিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি অভিষেকের সমুদয় আয়োজন করিতে লাগিলেন। সমগ্র অযোধ্যা এই অভিষেক-সংবাদে মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে দশরথের প্রিয়তমা

মহিষী কৈকেয়ীর জনৈক পরিচারিকা—বহুকাল পূর্বে রাজা রানীকে যে দুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল। এক সময়ে কৈকেয়ী রাজা দশরথকে এতদূর সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি যে-কোন দুইটি বর প্রার্থনা কর, যদি আমার সাধ্যাতীত না হয়, আমি তোমাকে তৎক্ষণাৎ উহা দান করিব!' কিন্তু কৈকেয়ী তখন রাজার নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন নাই। তিনি ঐ বরের কথা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দুষ্টস্বভাবা দাসী তাঁহাকে এক্ষণে বুঝাইতে লাগিল, রাম সিংহাসনে বসিলে তাঁহার কোন ইষ্ট সিদ্ধ হইবে না; বরং তাঁহার পুত্র ভরত রাজা হইলে তাঁহার সুখের অন্ত থাকিবে না। এইরূপে সে কৈকেয়ীর হিংসাবৃত্তি উত্তেজিত করিতে লাগিল। দাসীর পুনঃ পুনঃ মন্ত্রণায় রানীর হৃদয়ে প্রবল ঈর্ষার উদ্রেক হইল, তিনি অবশেষে ঈর্ষাবশে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। তখন সেই দুষ্টা দাসী রাজার বরদান-অঙ্গীকারের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিল, 'সেই অঙ্গীকৃত বর-প্রার্থনার ইহাই উপযুক্ত সময়। তুমি এক বরে তোমার পুত্রের রাজ্যাভিষেক ও অপর বরে রামের চতুর্দশ বর্ষ বনবাস প্রার্থনা কর।'

বৃদ্ধ রাজা রামচন্দ্রকে প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন। এদিকে কৈকেয়ী যখন রাজার নিকট ঐ দুইটি অনিষ্টকর বর প্রার্থনা করিলেন, তখন রাজা বুঝিলেন, তিনি কখন নিজ সত্য ভঙ্গ করিতে পারিবেন না। সুতরাং তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু রাম আসিয়া তাঁহাকে এই উভয় সঙ্কট হইতে রক্ষা করিলেন। রাম পিতৃসত্য রক্ষার জন্য স্বয়ং স্বেচ্ছাপূর্বক রাজ্যত্যাগ করিয়া বনগমনে প্রস্তুত হইলেন। এইরূপে রাম চতুর্দশ বর্ষের জন্য বনে গমন করিলেন, সঙ্গে চলিলেন প্রিয়তমা পত্নী সীতা ও প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ। ইহারা কিছুতেই রামের সঙ্গ ছাড়িতে চাহিলেন না।

আর্যগণ সে-সময় ভারতের গভীর অরণ্যের অধিবাসিগণের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। তখন তাঁহারা বন্য জাতিদিগকে 'বানর' নামে অভিহিত করিতেন। আর এই তথাকথিত 'বানর' অর্থাৎ বন্য জাতিদের মধ্যে

যাহারা অতিশয় বলবান ও শক্তিশালী হইত, তাহারা আর্যগণ কর্তৃক 'রাক্ষস' নামে অভিহিত হইত।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এইরূপে বানর- ও রাক্ষসগণ-অধ্যুষিত অরণ্যে গমন করিলেন। যখন সীতা রামের সহিত যাইতে চাহিলেন, তখন রাম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি রাজকন্যা হইয়া কিরূপে এই সকল কষ্ট সহ্য করিবে? অরণ্যে কখন কি বিপদ উপস্থিত হইবে, কিছুই জানা নাই। তুমি কিরূপে সেখানে আমার সঙ্গে যাইবে?' সীতা তাহাতে উত্তর দেন: আর্যপুত্র যেখানে যাইবেন, সীতাও সেখানে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। আপনি আমাকে 'রাজকন্যা', 'রাজবংশে জন্ম' এ-সব কথা কি বলিতেছেন! আমাকে সঙ্গে লইতেই হইবে।—অগত্যা সীতা সঙ্গে চলিলেন। আর রামগতপ্রাণ কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণও রামের মুহূর্তমাত্র বিরহ সহ্য করিতে পারিতেন না, সুতরাং তিনিও কিছুতেই রামের সঙ্গ ছাড়িলেন না। অরণ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে তাঁহারা চিত্রকূট পর্বতে কিছুদিন বাস করিলেন। পরে গভীর হইতে গভীরতর অরণ্যে গমন করিয়া গোদাবরীতীরবর্তী পরম রমণীয় পঞ্চবটী প্রদেশে কুটির বাঁধিয়া তাঁহারা বাস করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে মৃগয়া করিতেন ও ফলমূল আহার করিতেন। তাহাতে তাঁহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হইত। এইরূপে কিছুকাল বাস করিবার পর একদিন সেখানে এক রাক্ষসী আসিয়া উপস্থিত হইল, সে লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগিনী। যদৃচ্ছাক্রমে অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে সে রামের দর্শন পাইল এবং তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইল। কিন্তু রাম মনুষ্যমধ্যে পরম শুদ্ধস্বভাব ছিলেন, তা-ছাড়া তিনি বিবাহিত; সুতরাং রাক্ষসীর প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। রাক্ষসী প্রতিহিংসা-বশতঃ তাহার ভ্রাতা রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট গিয়া রামভার্যা পরমা সুন্দরী সীতার বিষয় তাঁহাকে সবিস্তার জানাইল।

মনুষ্যমধ্যে রাম সর্বাপেক্ষা বীর্যবান্ ছিলেন। রাক্ষস, দৈত্য, দানব, কাহারও এত শক্তি ছিল না যে, বাহুবলে রামকে পরাস্ত করে। সুতরাং সীতাহরণের জন্য রাবণকে মায়া অবলম্বন করিতে হইল। সে অপর একটি রাক্ষসের সহায়তা গ্রহণ করিল। সেই রাক্ষস পরম মায়াবী ছিল। রাবণের অনুরোধে সে স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া রামের কুটিরের নিকট মনোহর নৃত্য

অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। সীতা ঐ মায়ামৃগের রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং তাঁহার জন্য ঐ মৃগটিকে ধরিয়া আনিতে রামকে অনুরোধ করিলেন। রাম লক্ষ্মণকে সীতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া মৃগটিকে ধরিবার জন্য বনে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ তখন কুটিরের চতুর্দিকে একটি মন্ত্রপূত গণ্ডি কাটিয়া সীতাকে বলিলেন, 'দেবি, আমার বোধ হইতেছে—আজ আপনার কিছু অশুভ ঘটিতে পারে। অতএব আপনাকে বলিতেছি, আপনি আজ কোনক্রমে এই মন্ত্রপূত গণ্ডির বাহিরে যাইবেন না।' ইতিমধ্যে রাম সেই মায়ামৃগকে বাণবিদ্ধ করিলেন; সেই মৃগও তৎক্ষণাৎ তাহার স্বাভাবিক রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

ঠিক সেই সময়ে কুটিরে এক গভীর আর্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল—যেন রাম চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, 'লক্ষ্মণ ভাই, এস, আমায় রক্ষা কর।' সীতা শুনিয়া অমনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'লক্ষ্মণ, তুমি অবিলম্বে বনমধ্যে গমন করিয়া আর্যপুত্রকে সাহায্য কর।' লক্ষ্মণ বলিলেন, 'এ তো রামচন্দ্রের স্বর নহে।' কিন্তু সীতার বারংবার সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকে রামের অন্বেষণে যাইতে হইল। লক্ষ্মণ যেমন বাহির হইয়া কিছুদূরে গিয়াছেন, অমনি রাক্ষসরাজ রাবণ ভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়া কুটিরের সম্মুখে আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। সীতা বলিলেন, 'আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমার স্বামী এখনই ফিরিবেন; তিনি আসিলেই আমি আপনাকে যথেষ্ট ভিক্ষা দিব।' সন্ন্যাসী বলিল, 'শুভে, আমি আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। আমি বড়ই ক্ষুধার্ত, অতএব কুটিরে যাহা কিছু আছে, এখনই আমাকে তাহা প্রদান কর।' এই কথায় সীতা আশ্রমে যে ফলমূল ছিল সেগুলি আনিয়া ভিক্ষুকে গণ্ডির ভিতরে আসিয়াই তাহা লইতে বলিলেন। কিন্তু কপট ভিক্ষু তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল—ভিক্ষাজীবীর নিকট তাঁহার ভয়ের কোন কারণ নাই, অতএব গণ্ডি লঙ্ঘন করিয়া তাহার নিকট আসিয়া অনায়াসে ভিক্ষা দিতে পারেন। ভিক্ষুর পুনঃ পুনঃ প্ররোচনায় সীতা যেমনি গণ্ডির বাহির হইয়াছেন, অমনি সেই কপট সন্ন্যাসী নিজ রাক্ষসদেহ পরিগ্রহ করিয়া সীতাকে বাহুদ্বারা বলপূর্বক ধারণ করিল এবং নিজ মায়ারথ আহ্বান করিয়া তাহাতে রোরুদ্যমানা সীতাকে বলপূর্বক বসাইয়া তাঁহাকে লইয়া লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল। আহা! সীতা তখন নিতান্ত নিঃসহায়া, এমন কেহ সেখানে ছিল না, যে

আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করে। যাহা হউক, রাবণের রথে যাইতে যাইতে সীতা নিজ অঙ্গ হইতে কয়েকখানি অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া মধ্যে মধ্যে ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

রাবণ সীতাকে তাহার নিজ রাজ্য লঙ্কায় লইয়া গেল, সীতাকে তাহার মহিষী হইবার জন্য অনুরোধ করিল এবং তাঁহাকে সম্মত করিবার জন্য নানাবিধ প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। কিন্তু সীতা সতীত্ব-ধর্মের সাকার বিগ্রহ ছিলেন, সুতরাং তিনি তাহার সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত করিলেন না। রাবণ সীতাকে শাস্তি দিবার ইচ্ছায়, যতদিন না তিনি তাহার পত্নী হইতে স্বীকৃত হন, ততদিন তাঁহাকে দিবারাত্র এক বৃক্ষতলে বসিয়া থাকিতে বাধ্য করিলেন।

রাম-লক্ষ্মণ কুটিরে ফিরিয়া আসিয়া যখন দেখিলেন, সেখানে সীতা নাই, তখন তাঁহাদের শোকের আর সীমা রহিল না। সীতার কি দশা হইল, তাঁহারা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন দুই ভ্রাতা মিলিয়া চারিদিকে সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার কোনই সন্ধান পাইলেন না। অনেক দিন এইরূপ অনুসন্ধানের পর একদল 'বানরের' সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল, তাহাদের মধ্যে দেবাংশসম্ভূত হনুমানও ছিলেন। আমরা পরে দেখিব, এই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান রামের পরম বিশ্বস্ত অনুচর হইয়া সীতা-উদ্ধারে রামকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। রামের প্রতি তাঁহার ভক্তি এত গভীর ছিল যে, হিন্দুগণ এখনও তাঁহাকে প্রভুর আদর্শ সেবকরূপে পূজা করিয়া থাকেন। আপনারা দেখিতেছেন, 'বানর' ও 'রাক্ষস' শব্দে দাক্ষিণাত্যের আদিম অধিবাসিগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এইরূপে অবশেষে 'বানর'গণের সহিত রামের মিলন হইল। তাহারা তাঁহাকে বলিল যে, আকাশ দিয়া একখানি রথ যাইতে তাহারা দেখিয়াছিল, তাহাতে একজন 'রাক্ষস' বসিয়াছিল, সে এক রোরুদ্যমানা পরমা সুন্দরী রমণীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল; আর যখন রথখানি তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া যায়, তখন সেই রমণী তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিজগাত্র হইতে একখানি অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া তাহাদের নিকট ফেলিয়া দেন। এই বলিয়া তাহারা রামকে সেই অলঙ্কার দেখাইল। প্রথমে লক্ষ্মণই সেই অলঙ্কার লইয়া দেখিলেন, কিন্তু তিনি উহা চিনিতে পারিলেন না।

তখন রাম তাঁহার হস্ত হইতে অলঙ্কারটি লইয়া তৎক্ষণাৎ উহা সীতার বলিয়া চিনিলেন। ভারতে অগ্রজের পত্নীকে এতদূর ভক্তি করা হইত যে, লক্ষ্মণ সীতার বাহু বা গলদেশের দিকে কখনও চাহিয়া দেখেন নাই, সুতরাং বানরগণ-প্রদর্শিত অলঙ্কারটি সীতার কণ্ঠহার ছিল বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। এই আখ্যানটিতে ভারতের প্রাচীন প্রথার আভাস পাওয়া যায়।

সেই সময়ে বানর-রাজ বালীর সহিত তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবের বিবাদ চলিতেছিল। বালী সুগ্রীবকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করে। রাম সুগ্রীবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বালীর নিকট হইতে সুগ্রীবের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিলেন। সুগ্রীব এই উপকারের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রামকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। সীতা-অন্বেষণের জন্য সুগ্রীব সর্বত্র বানরসৈন্য প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কোন সন্ধান পাইল না। অবশেষে হনুমান এক লম্ফে সাগর লঙ্ঘন করিয়া ভারতের উপকূল হইতে লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হইলেন। কিন্তু তথায় সর্বত্র অন্বেষণ করিয়াও সীতার কোন সন্ধান পাইলেন না।

রাক্ষসরাজ রাবণ দেব মানব সকলকে, এমন কি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত জয় করিয়াছিল। সে জগতের বহু সুন্দরী রমণী সংগ্রহ করিয়া বলপূর্বক তাহার উপপত্নী করিয়াছিল। হনুমান ভাবিতে লাগিলেন, 'সীতা কখনও তাহাদের সহিত রাজপ্রাসাদে থাকিতে পারেন না। ওরূপ স্থানে বাস অপেক্ষা তিনি নিশ্চয় মৃত্যুকেও শ্রেয় জ্ঞান করিবেন।' এই ভাবিয়া হনুমান অন্যত্র সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি দেখিতে পাইলেন—সীতা এক বৃক্ষতলে উপবিষ্টা; তাঁহার শরীর অতিশয় কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ, তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন দ্বিতীয়ার শশিকলা আকাশে সবেমাত্র উদিত হইতেছে। হনুমান তখন একটি ক্ষুদ্র বানরের রূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই বৃক্ষের উপর বসিলেন; সেখান হইতে দেখিতে লাগিলেন, রাবণপ্রেরিতা রাক্ষসীগণ আসিয়া সীতাকে নানাপ্রকারে ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সীতা রাবণের নাম পর্যন্ত শুনিতেছেন না।

চেড়ীগণ প্রস্থান করিলে হনুমান নিজরূপ ধারণ করিয়া সীতার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'দেবি, রামচন্দ্র আপনার অন্বেষণের জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার দূত হইয়া এখানে আসিয়াছি।' এই

বলিয়া তিনি সীতার প্রত্যয়-উৎপাদনের জন্য চিহ্নস্বরূপ রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক তাঁহাকে দেখাইলেন। তিনি সীতাকে আরও জানাইলেন যে, সীতা কোথায় আছেন জানিতে পারিলেই রামচন্দ্র সসৈন্যে লঙ্কায় আসিয়া রাক্ষসরাজকে জয় করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন। এই সকল কথা সীতাকে নিবেদন করিয়া হনুমান অবশেষে করজোড়ে বলিলেন, 'দেবীর যদি ইচ্ছা হয় তো দাস আপনাকে স্কন্ধে লইয়া এক লম্ফে সাগর পার হইয়া রামচন্দ্রের নিকট পৌঁছিতে পারে।' কিন্তু সীতা মূর্তিমতী পবিত্রতা; সুতরাং হনুমানের অভিপ্রায়মত কার্য করিতে গেলে পতি ব্যতীত অন্য পুরুষের অঙ্গস্পর্শ হইবে বলিয়া তিনি হনুমানের সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। হনুমান যথার্থই সীতার সন্ধান পাইয়াছেন, রামচন্দ্রের এই বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তিনি শুধু তাঁহাকে নিজ মস্তক হইতে চূড়ামণি প্রদান করিলেন। হনুমান ঐ চূড়ামণি লইয়া রামচন্দ্রের নিকট প্রস্থান করিলেন।

হনুমানের নিকট হইতে সীতার সংবাদ অবগত হইয়া রামচন্দ্র একদল বানরসৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভারতের সর্বশেষ প্রান্তে উপনীত হইলেন। সেখানে রামের বানরগণ এক প্রকাণ্ড সেতু নির্মাণ করিল। উহার নাম 'সেতুবন্ধ'— ঐ সেতু ভারতের সহিত লঙ্কার সংযোগসাধন করিয়া দিয়াছে। খুব ভাঁটার সময় এখনও ভারত হইতে লঙ্কায় বালুকাস্তূপের উপর দিয়া হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।

অবশ্য রাম ঈশ্বরাবতার ছিলেন, নতুবা তিনি এ-সকল দুষ্কর কর্ম কিরূপে সম্পাদন করিলেন? হিন্দুদের মতে রামচন্দ্র ঈশ্বরের অবতার ছিলেন। ভারত-বাসিগণ তাঁহাকে ঈশ্বরের সপ্তম অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে।

বানরগণ সেতুবন্ধনের সময় এক একটা প্রকাণ্ড পাহাড় উৎপাটন করিয়া আনিয়া সমুদ্রে স্থাপন করিল এবং তাহার উপর রাশীকৃত শিলাখণ্ড ও মহীরুহ নিক্ষেপ করিয়া প্রকাণ্ড সেতু প্রস্তুত করিতেছিল। তাহারা দেখিল, একটা কাঠবিড়াল বালুকার উপর গড়াগড়ি দিতেছে, তারপর সেতুর উপর আসিয়া এদিক ওদিক করিতেছে এবং নিজের গা ঝাড়া দিতেছে। এইরূপে সে নিজের সামর্থ্যানুসারে বালুকা প্রদান করিয়া রামচন্দ্রের সেতু-নির্মাণকার্যে সাহায্য করিতেছিল। বানরগণ তাহার এই কার্য দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিল। তাহারা এক-একজন এক-একবারেই এক-একটা পাহাড়, এক-একটা জঙ্গল ও রাশীকৃত বালুকা লইয়া আসিতেছিল, সুতরাং কাঠবিড়ালটির ঐরূপ বালুকার

উপর গড়াগড়ি ও গা ঝাড়া দেওয়া দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। রামচন্দ্র ইহা লক্ষ্য করিয়া বানরগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'কাঠ-বিড়ালটির মঙ্গল হউক, সে তাহার প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার কার্যটুকু করিতেছে, অতএব সে তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, তাহার সমান।' এই বলিয়া তিনি আদর করিয়া তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইলেন। এখনও কাঠবিড়ালের পৃষ্ঠে যে লম্বালম্বি দাগ দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে বলে উহাই রামচন্দ্রের অঙ্গুলির দাগ।

সেতুনির্মাণকার্য শেষ হইলে রাম ও তাঁহার ভ্রাতা কর্তৃক পরিচালিত হইয়া সমুদয় বানরসৈন্য লঙ্কায় প্রবেশ করিল। তারপর কয়েক মাস ধরিয়া রামচন্দ্রের সহিত রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ হইল ; অজস্র রক্তপাত হইতে লাগিল ; অবশেষে রাক্ষসাধিপ রাবণ পরাজিত ও নিহত হইল। তখন সুবর্ণময় প্রাসাদাদি-ভূষিত রাবণের রাজধানী রামচন্দ্রের হস্তগত হইল। ভারতের সুদূর পল্লী-গ্রামে ভ্রমণ করিতে করিতে সেখানকার লোকদিগকে 'আমি লঙ্কায় গিয়াছি' বলিলে তাহারা বলিত, 'আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, সেখানকার সমুদয় গৃহ সুবর্ণ-নির্মিত।' যাহা হউক, এই স্বর্ণময়ী লঙ্কা রামচন্দ্রের হস্তগত হইল। রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ যুদ্ধকালে রামের পক্ষ লইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই সাহায্যের প্রতিদানস্বরূপ রামচন্দ্র বিভীষণকে এই সুবর্ণময়ী লঙ্কা প্রদান করিলেন এবং রাবণের স্থানে তাঁহাকে লঙ্কার সিংহাসনে বসাইলেন। বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে আরোহণ করিলে সীতা ও অনুচরবর্গের সঙ্গে রাম লঙ্কা পরিত্যাগ করিলেন।

রাম যখন অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন, তখন রামের অনুজ কৈকেয়ীতনয় ভরত মাতুলালয়ে ছিলেন, সুতরাং তিনি রামের বনগমনের বিষয় কিছুই জানিতেন না ; অযোধ্যায় আসিয়া যখন সকল কথা শুনিলেন, তখন তাঁহার আনন্দ হওয়া দূরে থাকুক, শোকের সীমা রহিল না। বৃদ্ধ রাজা দশরথও এই সময়ে রামের শোকে অধীর হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ভরত ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া অরণ্যে রামসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে পিতার স্বর্গগমনবার্তা নিবেদন করিলেন এবং রাজ্যে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাম তাহাতে

কোনমতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, 'চতুর্দশ বর্ষ বনে বাস না করিলে পিতৃসত্য কোনরূপে রক্ষিত হইবে না।' চতুর্দশ বর্ষ পরে তিনি ফিরিয়া গিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবেন। রামচন্দ্র ভরতকে রাজ্যপালনের জন্য বারবার অনুরোধ করিতে থাকিলে অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে রামের আজ্ঞা পালন করিতে হইল। কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি পরম অনুরাগ ও ভক্তিবশতঃ স্বয়ং সিংহাসনে বসিতে কোনমতে সম্মত হইলেন না; সিংহাসনের উপর রামচন্দ্রের কাষ্ঠপাদুকা স্থাপন করিয়া স্বয়ং তাঁহার প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

সীতা-উদ্ধারের পরই রামচন্দ্রের চতুর্দশ বর্ষ বনবাসের সময় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং ভরত তাঁহার প্রত্যাবর্তনের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন জানিতে পারিয়া তিনি প্রজাবর্গের সহিত অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সকলের অনুরোধে রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। মহাসমারোহে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রাচীনকালে সিংহাসনে আরোহণের সময় প্রজাগণের কল্যাণার্থ রাজাকে যে-সকল ব্রত গ্রহণ করিতে হইত, রাম যথাবিধানে সেগুলি গ্রহণ করিলেন। তখনকার রাজগণ প্রজাবর্গের সেবকস্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রজাবর্গের মতামতের অধীন হইয়া চলিতে হইত। আমরা এখনই দেখিব, এই প্রজারঞ্জনের জন্য রামচন্দ্রকে নিজ প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর বস্তুকে কেমন মমতাশূন্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। রাম অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং কিছুকাল সীতার সহিত পরম সুখে কাটাইলেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে একদিন রামচন্দ্র চরমুখে অবগত হইলেন যে, রাক্ষস কর্তৃক অপহৃতা সমুদ্রপারনীতা সীতাকে তিনি গ্রহণ করায় প্রজাবর্গ অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। রাবণবিজয়ের পরই রামচন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করিবার পূর্বে সকলকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্বয়ং তাঁহাকে বিশুদ্ধস্বভাবা জানিয়াও সমবেত বানর ও রাক্ষসগণের সম্মুখে অগ্নিপরীক্ষা করিয়াছিলেন। সীতা যখন অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন, তখন রামচন্দ্র এই ভাবিয়া শোকে মুহ্যমান হইলেন বুঝি সীতাকে হারাইলাম, কিন্তু পরক্ষণেই সকলে বিস্মিত হইয়া

দেখিল, অগ্নিদেব স্বয়ং সেই অগ্নিমধ্য হইতে উত্থিত হইতেছেন। তাঁহার মস্তকে এক হিরণ্ময় সিংহাসন, তদুপরি সীতাদেবী উপবিষ্টা। ইহা দেখিয়া রামচন্দ্রের এবং সমবেত সকলেরই আনন্দের আর সীমা রহিল না। রাম পরম সমাদরে সীতাকে গ্রহণ করিলেন। অযোধ্যার প্রজাবর্গ এই অগ্নিপরীক্ষার বিষয় অবগত ছিল, কিন্তু তাহারা উহা দেখে নাই, তাহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিত, সীতা রাবণগৃহে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন, তিনি যে সেখানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধস্বভাবা ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? রাজা এইরূপ অবস্থায় সীতাকে গ্রহণ করিয়া ধর্মবিগর্হিত কার্য করিতেছেন; হয় সর্বসমক্ষে আবার পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা তাঁহাকে বিসর্জন করাই রাজার পক্ষে শ্রেয়।

প্রজাগণের সন্তোষের জন্য সীতা অরণ্যে নির্বাসিতা হইলেন। যে স্থানে সীতা পরিত্যক্তা হইলেন, তাহার অতি নিকটেই আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম ছিল। মহর্ষি তাঁহাকে একাকিনী রোরুদ্যমানা দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া তাঁহাকে নিজ আশ্রমে স্থান দিলেন। সীতা তখন আসন্নপ্রসবা ছিলেন; ঐ আশ্রমেই তিনি দুইটি যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। উপযুক্ত বয়স হইলে মহর্ষি তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করাইয়া যথাবিধানে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তিনি রামায়ণ নামক কাব্য রচনা করিয়া উহাতে স্বর-তাল সংযোজন করেন।

ভারতে নাটক ও সঙ্গীত অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এগুলিকে লোকে ধর্মসাধনের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। লোকের ধারণা—প্রেমসঙ্গীতই হউক বা যাহাই হউক, সঙ্গীতমাত্রেই যদি কেহ তন্ময় হইয়া যাইতে পারে, তবে তাহার অবশ্যই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস—ধ্যানের দ্বারা যে ফল লাভ হয়, সঙ্গীতেও তাহাই হইয়া থাকে।

যাহা হউক, বাল্মীকি রামায়ণে স্বর-তাল সংযোগ করিয়া রামের পুত্রদ্বয়কে উহা গাহিতে শিখাইলেন।

ভারতে প্রাচীন রাজগণ মধ্যে মধ্যে অশ্বমেধাদি বড় বড় যজ্ঞ করিতেন, রামচন্দ্রও তদনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তখন গৃহস্থ ব্যক্তির পত্নী ব্যতীত কোন ধর্মানুষ্ঠান করিবার অধিকার ছিল না, ধর্ম-

কার্যের সময় পত্নী অবশ্যই সঙ্গে থাকিবে। সেই জন্য পত্নীর অপর একটি নাম সহধর্মিণী—যাঁহার সহিত একত্রে মিলিত হইয়া ধর্মকার্য অনুষ্ঠান করিতে হয়। হিন্দু গৃহস্থকে শত শত প্রকার ধর্মানুষ্ঠান করিতে হইত, কিন্তু ধর্মানুষ্ঠানকালে পত্নী সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার কর্তব্যটুকু না করিলে কোন ধর্মকার্যই বিধিমত অনুষ্ঠিত হইত না।

যাহা হউক, সীতাকে বনে বিসর্জন দেওয়াতে রাম কিরূপে বিধিপূর্বক সস্ত্রীক অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন, এখন এই প্রশ্ন উঠিল। প্রজাগণ তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু রামচন্দ্র জীবনে এই প্রথমবার প্রজাগণের মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বলিলেন, 'তাহা কখনও হইতে পারে না। আমি সীতাকে বিসর্জন দিয়াছি বটে, কিন্তু আমার হৃদয় সীতার নিকট পড়িয়া আছে।' সুতরাং শাস্ত্রবিধি রক্ষা করিবার জন্য সীতার প্রতিনিধিরূপে তাঁহার এক সুবর্ণময়ী মূর্তি নির্মিত হইল। এই যজ্ঞমহোৎসবে সর্বসাধারণের ধর্মভাব ও আনন্দবর্ধনের জন্য সঙ্গীতের আয়োজনও হইয়াছিল; কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকি নিজ শিষ্য দুইটিকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, উহারা রামের অজ্ঞাত তাঁহারই পুত্র লব ও কুশ। সভাস্থলে একটি রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল এবং বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ-গানের জন্য সকল আয়োজন সম্পূর্ণ ছিল।

সভাস্থলে রাম ও তদীয় অমাত্যবর্গ এবং অযোধ্যার প্রজাবৃন্দ শ্রোতৃ-মণ্ডলীরূপে আসন গ্রহণ করিলেন। বিপুল জনতার সমাবেশ হইল। বাল্মীকির শিক্ষামত লব ও কুশ রামায়ণ গান করিতে লাগিল; তাহাদের মনোহর রূপলাবণ্য-দর্শনে ও মধুরস্বর-শ্রবণে সমগ্র সভামণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ হইল। সীতার প্রসঙ্গ বার বার শ্রবণ করিয়া রাম উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন, আর যখন সীতার বিসর্জন-প্রসঙ্গ আসিল, তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মহর্ষি রামকে বলিলেন, 'আপনি শোকার্ত হইবেন না, আমি সীতাকে আপনার সমক্ষে লইয়া আসিতেছি।' এই বলিয়া বাল্মীকি সভাস্থলে সীতাকে আনিলেন। সীতাকে দেখিয়া অতিশয় বিহ্বল হইলেও প্রজাবর্গের সন্তোষের জন্য রামকে সভাসমক্ষে সীতার বিশুদ্ধতার পুনরায় পরীক্ষাদানের প্রস্তাব করিতে হইল। বারংবার তাঁহার উপর এরূপ নিষ্ঠুর

অবহেলা হতভাগিনী সীতা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি নিজ বিশুদ্ধতার প্রমাণ দিবার জন্য দেবগণের নিকট ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন হঠাৎ পৃথিবী দ্বিধা হইল। সীতা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'এই আমার পরীক্ষা।' এই কথা বলিয়া তিনি পৃথিবীর বক্ষে অন্তর্হিতা হইলেন। প্রজাবর্গ এই অদ্ভুত ও শোচনীয় ব্যাপার-দর্শনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল। রাম শোকে মুহ্যমান হইলেন।

সীতার অন্তর্ধানের কিছুকাল পরে দেবগণের নিকট হইতে জনৈক দূত আসিয়া রামকে বলিলেন, 'পৃথিবীতে আপনার কার্য শেষ হইয়াছে। অতএব আপনি এক্ষণে স্বধাম বৈকুণ্ঠে চলুন।' এই বাক্যে রামের স্বরূপ-স্মৃতি জাগরিত হইল। তিনি অযোধ্যার নিকট সরিদ্বরা সরযূর জলে দেহ বিসর্জন করিয়া বৈকুণ্ঠে সীতার সহিত মিলিত হইলেন।

ভারতের প্রাচীন শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক কাব্য রামায়ণের আখ্যায়িকা অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। রাম ও সীতা ভারতবাসীর আদর্শ। ভারতের বালকবালিকাগণ, বিশেষতঃ বালিকামাত্রেই সীতার পূজা করিয়া থাকে। ভারতীয় নারীগণের সর্বাপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষা—পরমশুদ্ধস্বভাবা, পতিপরায়ণা, সর্বংসহা সীতার মতো হওয়া। এই সকল চরিত্র আলোচনা করিবার সময় আপনারা পাশ্চাত্যের আদর্শ হইতে ভারতীয় আদর্শ কতদূর ভিন্ন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। সমগ্র ভারতবাসীর সমক্ষে সীতা যেন সহিষ্ণুতার উচ্চতম আদর্শরূপে আজও বর্তমান। পাশ্চাত্য দেশের বক্তব্য, 'কর্ম কর, কর্ম করিয়া তোমার শক্তি দেখাও।' ভারতের বক্তব্য 'দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া তোমার শক্তি দেখাও।' মানুষ কত অধিক বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে, পাশ্চাত্য এই সমস্যা পূরণ করিয়াছে; মানুষ কত অল্প লইয়া থাকিতে পারে, ভারত এই সমস্যা পূরণ করিয়াছে। এই দুইটি আদর্শই এক এক ভাবের চরম সীমা। সীতা যেন ভারতীয় ভাবের প্রতিনিধিস্বরূপা, যেন মূর্তিমতী ভারতমাতা। সীতা বাস্তবিক ছিলেন কি না, সীতার উপাখ্যানের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না, এ বিষয় লইয়া আমরা বিচার করিতেছি না, কিন্তু আমরা জানি—সীতাচরিত্রে যে আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই আদর্শ ভারতে এখনও বর্তমান। সীতাচরিত্রের আদর্শ যেমন সমগ্র ভারতে অনুস্যূত

হইয়াছে, যেমন সমগ্র জাতির জীবনে—সমগ্র জাতির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, যেমন উহার প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে, অন্য কোন পৌরাণিক উপাখ্যানে বর্ণিত চরিত্রের আদর্শ তেমন করে নাই। ভারতে যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু বিশুদ্ধ, যাহা কিছু পুণ্য, 'সীতা' নামটি তাহারই পরিচায়ক। নারীগণের মধ্যে আমরা যে-ভাবকে নারীজনোচিত বলিয়া শ্রদ্ধা ও আদর করিয়া থাকি, সীতা বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ যখন নারীকে আশীর্বাদ করেন, তিনি তাহাকে বলিয়া থাকেন, 'সীতার মতো হও'; বালিকাকে আশীর্বাদ করিবার সময়ও তাহাই বলা হয়। ভারতীয় নারীগণ সকলেই সীতার সন্তান। তাঁহারা সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি, সর্বংসহা, সদা পতিপরায়ণা, নিত্য-পবিত্র সীতার মতো হইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। তিনি এত দুঃখ সহিয়াছেন, কিন্তু রামের উদ্দেশ্যে একটি কর্কশ বাক্যও তাঁহার মুখ দিয়া কখনও নির্গত হয় নাই। এ-সকল দুঃখকষ্ট সহ্য করা তিনি নিজ কর্তব্যরূপে মনে করিয়া লইয়াছেন এবং স্থির শান্তভাবে উহা সহ্য করিয়া গিয়াছেন। অরণ্যে সীতার নির্বাসন-ব্যাপার তাঁহার প্রতি কি ঘোর অবিচার ভাবিয়া দেখুন, কিন্তু সেজন্য তাঁহার চিত্তে বিন্দুমাত্র বিরক্তি নাই। এইরূপ তিতিক্ষাই ভারতের বিশেষত্ব। ভগবান বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন, 'আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করিলে সেই আঘাতের কোন প্রতিকার হইল না, উহাতে কেবল জগতে একটি পাপের বৃদ্ধিমাত্র হইবে।' ভারতের এই বিশেষ ভাবটি সীতার প্রকৃতিগত ছিল, তিনি আঘাতের প্রতিঘাত করিবার চিন্তা পর্যন্ত কখনও করেন নাই।

কে জানে, এই দুইটি আদর্শের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ—পাশ্চাত্য-মতানুযায়ী এই আপাতপ্রতীয়মান শক্তি ও তেজ, অথবা প্রাচ্যদেশীয় কষ্টসহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষা?

পাশ্চাত্যবাসীরা বলেন দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার করিয়া, উহা নিবারণ করিয়া 'আমরা দুঃখ কমাইবার চেষ্টা করিতেছি।' ভারতবাসী বলেন, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া 'আমরা উহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি। এইরূপ সহ্য করিতে করিতে আমাদের পক্ষে দুঃখ বলিয়া আর কিছু থাকিবে না, উহাই আমাদের পরম সুখ হইয়া দাঁড়াইবে।' যাহাই হউক, এই দুইটি আদর্শের কোনটিই হেয় নহে। কে জানে—পরিণামে কোন্ আদর্শের জয়

হইবে? কে জানে—কোন্ ভাব অবলম্বন করিয়া মানবজাতির যথার্থ কল্যাণ সর্বাপেক্ষা অধিক হইবে? কে জানে, কোন্ ভাব অবলম্বন করিলে পশুভাবকে বশীভূত করিয়া তাহার উপর আধিপত্য করা সম্ভব হইবে?—সহিষ্ণুতা বা ক্রিয়াশীলতা, অপ্রতিকার বা প্রতিকার?

পরিণামে যাহাই হউক, ইতিমধ্যে যেন আমরা পরস্পরের আদর্শ নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা না করি। আমরা উভয় জাতিই এক ব্রতে ব্রতী—সেই ব্রত সম্পূর্ণ দুঃখনিবৃত্তি। আপনারা আপনাদের ভাবে কার্য করিয়া যান, আমরা আমাদের পথে চলি। কোনও আদর্শকে, কোনও প্রণালীকে, কোনও পথকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমি পাশ্চাত্যগণকে এ কথা কখনও বলি না, 'আপনারা আমাদের প্রণালী অবলম্বন করুন'; কখনই নহে। লক্ষ্য একই, কিন্তু উপায় কখন এক হইতে পারে না। অতএব আমি আশা করি—আপনারা ভারতের আদর্শ, ভারতের সাধন-প্রণালীর কথা শুনিয়াই ভারতকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন, 'আমরা জানি, আমাদের উভয় জাতির লক্ষ্য একই, এবং আমাদের উভয়ের ঐ লক্ষ্যে পঁহুছিবার যে দুইটি উপায়, তাহাও আমাদের পরস্পরের ঠিক উপযোগী। আপনারা আপনাদের আদর্শ, আপনাদের প্রণালী অনুসরণ করুন, ঈশ্বরেচ্ছায় আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হউক।' আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতিকে বলি, বিভিন্ন আদর্শ লইয়া বিবাদ করিও না, যতই বিভিন্ন প্রতীয়মান হউক, তোমাদের উভয়ের লক্ষ্য একই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলন-চেষ্টাই আমার জীবনব্রত। জীবনের উপত্যকার আঁকাবাঁকা পথে চলিবার সময় আমরা যেন পরস্পরকে বলিতে পারি, 'তোমার যাত্রা সফল হউক'।

মহাভারত

১৯০০ খৃঃ ১লা ফেব্রুআরি ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত প্যাসাডেনার
'সেক্সপীয়র সভা'য় প্রদত্ত বক্তৃতা

গতকাল আমি রামায়ণ মহাকাব্য-সম্বন্ধে আপনাদিগকে কিছু শুনাইয়াছি। অদ্যকার সান্ধ্যসভায় অপর মহাকাব্য 'মহাভারত' সম্বন্ধে কিছু বলিব। রাজা দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে রাজা ভরত জন্মগ্রহণ করেন। রাজা ভরত হইতে যে বংশ প্রবর্তিত হয়, মহাভারতে সেই বংশীয় রাজাদের উপাখ্যান আছে। উক্ত ভরত রাজা হইতেই ভারতবর্ষের নাম হইয়াছে, এবং তাঁহার নাম হইতেই এই মহাকাব্যের নাম 'মহাভারত' হইয়াছে। মহাভারত শব্দের অর্থ—মহান্ অর্থাৎ গৌরবসম্পন্ন, ভারত অর্থাৎ ভারতবর্ষ; অথবা মহান্ ভরতবংশীয়গণের উপাখ্যান। কুরুদিগের প্রাচীন রাজ্যই এই মহাকাব্যের রঙ্গক্ষেত্র, আর এই উপাখ্যানের ভিত্তি—কুরুপাঞ্চাল মহাসংগ্রাম। অতএব এই বিবাদের সীমাক্ষেত্র খুব বিস্তৃত নহে। এই মহাকাব্য ভারতে সর্বসাধারণের বড়ই আদরের সামগ্রী। হোমরের কাব্য গ্রীকদের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, মহাভারতও ভারতবাসীর উপর সেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কালক্রমে মূল মহাভারতের সহিত অনেক অবান্তর বিষয় সংযোজিত হইতে লাগিল, শেষে উহা প্রায় লক্ষশ্লোকাত্মক এক বিরাট গ্রন্থে পরিণত হইল। কালে কালে মূল মহাভারতে নানাবিধ আখ্যায়িকা, উপাখ্যান, পুরাণ, দার্শনিক নিবন্ধ, ইতিহাস, নানাবিধ বিচার প্রভৃতি বিষয় সংযোজিত হইয়াছে, পরিশেষে উহা এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই সমুদয় অবান্তর প্রসঙ্গ থাকিলেও সমুদয় গ্রন্থের ভিতর মূল উপাখ্যানটি অনুস্যূত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাভারতের মূল উপাখ্যানটি ভারত-সাম্রাজ্যের জন্য কৌরব ও পাণ্ডব নামক একবংশজাত জ্ঞাতিগণের মধ্যে যুদ্ধ।

আর্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভারতে আসেন। ক্রমে আর্যগণের এই সকল বিভিন্ন শাখা ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। শেষে আর্যগণই

ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসনকর্তা হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে একই বংশের দুই বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রভুত্বলাভের চেষ্টা হইতে এই যুদ্ধের উৎপত্তি। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা গীতা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি সৈন্যদলের অধিকৃত যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাই মহাভারতের যুদ্ধ।

•

কুরুবংশীয় মহারাজ বিচিত্রবীর্যের দুই পুত্র ছিলেন—জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, কনিষ্ঠ পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুসারে—অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ এবং ক্ষয়রোগ বা অন্য কোন প্রকার জন্মগত ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তি পৈতৃক ধনের অধিকারী হইতে পারে না, সে কেবল নিজ ভরণপোষণের ব্যয় মাত্র পাইতে পারে। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হইলেও সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিলেন না, পাণ্ডুই রাজা হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্র ছিল এবং পাণ্ডুর মাত্র পাঁচটি। অল্প বয়সে পাণ্ডুর দেহত্যাগ হইলে ধৃতরাষ্ট্রের উপরই রাজ্যভার পড়িল, তিনি পাণ্ডুর পুত্রগণকে নিজ পুত্রগণের সহিত লালন-পালন করিতে লাগিলেন। পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহাধনুর্ধর বিপ্র দ্রোণাচার্যের উপর তাঁহাদের শিক্ষাভার অর্পিত হইল; দ্রোণাচার্যের নিকট তাঁহারা ক্ষত্রিয়োচিত নানাবিধ অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেন। রাজপুত্রগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠিরের ধর্মপরায়ণতা ও বহুবিধ গুণগ্রাম এবং তাঁহার ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের শৌর্যবীর্য ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অপরিসীম ভক্তি-দর্শনে অন্ধ রাজার পুত্রগণের হৃদয়ে বিষম ঈর্ষার উদয় হইল এবং তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ দুর্যোধনের চাতুরীতে এক ধর্মমহোৎসব-দর্শনের ছলে পঞ্চ পাণ্ডব বারণাবত নগরে প্রেরিত হইলেন। তথায় দুর্যোধনের উপদেশানুসারে তাঁহাদের জন্য শণ, জতু, লাক্ষা, ঘৃত, তৈল ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থ দ্বারা এক প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল। সেই জতুগৃহে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। সেখানে তাঁহারা কিছুকাল বাস করিলে পর সেই গৃহে এক রাত্রে গোপনে অগ্নি প্রদত্ত হইল। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধর্মাত্মা বিদুর—দুর্যোধন ও তাঁহার অনুচরবর্গের এই দুরভিসন্ধির বিষয় পূর্বেই অবগত হইয়া, পাণ্ডবগণকে এই ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহারা সকলের

অজ্ঞাতসারে প্রজ্বালিত জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। কৌরবগণ যখন সংবাদ পাইলেন যে, জতুগৃহ দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইয়াছে, তখন তাঁহারা পরম আনন্দিত হইলেন ; ভাবিলেন, এতদিনে আমরা নিষ্কণ্টক হইলাম, এখন আমাদের সকল বাধাবিঘ্ন দূরীভূত হইল। তখন ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

জতুগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পঞ্চপাণ্ডব জননী কুন্তীর সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। গভীর অরণ্যমধ্যে তাঁহাদিগকে অনেক দুঃখকষ্ট, দৈবদুর্বিপাক সহ্য করিতে হইল, কিন্তু তাঁহারা শৌর্যবীর্য ও সহিষ্ণুতাবলে সর্ববিধ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে শুনিতে পাইলেন, শীঘ্র নিকটবর্তী পাঞ্চাল দেশের রাজকন্যার স্বয়ংবর হইবে।

আমি গত রাত্রে এই স্বয়ংবরপ্রথার বিষয় একবার[১] উল্লেখ করিয়াছি। কোন রাজকন্যার স্বয়ংবরের সময় চতুর্দিক হইতে নানা দেশের রাজপুত্রগণ স্বয়ংবর-সভায় আহূত হইতেন। এই সকল সমবেত রাজকুমারদের মধ্য হইতে রাজকুমারীকে ইচ্ছামত বর মনোনীত করিতে হইত। ভাট রাজপরিচারকগণ মাল্যহস্তে রাজকুমারীর অগ্রে অগ্রে যাইয়া প্রত্যেক রাজকুমারের সিংহাসনের নিকট গিয়া তাঁহার নাম ধাম বংশমর্যাদা শৌর্যবীর্যের বিষয় উল্লেখ করিত। রাজপুত্রদের মধ্যে যাঁহাকে পতিরূপে মনোনীত করিতেন, রাজকন্যা তাঁহারই গলদেশে ঐ বরমাল্য অর্পণ করিতেন। তখন মহাসমারোহে পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ একজন প্রবল-পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার কন্যা দ্রৌপদীর রূপগুণের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পাণ্ডবেরা শুনিলেন, সেই দ্রৌপদীই স্বয়ংবরা হইবেন।

স্বয়ংবরে প্রায়ই রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থীকে সাধারণতঃ কোন প্রকার শৌর্যবীর্যের পরিচয়, অস্ত্রশিক্ষার কৌশলাদি দেখাইতে হইত। দ্রুপদরাজ স্বয়ংবর-সভায় তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণার্থিগণের বলপরীক্ষার এইরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন : অতি ঊর্ধ্বদেশে আকাশে এক কৃত্রিম মৎস্য লক্ষ্যরূপে

---

১ 'রামায়ণ'-প্রসঙ্গে সীতার স্বয়ংবর

স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নিম্নদেশে সতত ঘূর্ণমান মধ্যভাগে ছিদ্রযুক্ত একটি চক্র স্থাপিত ছিল, আর নিম্নে একটি জলপাত্র। জলপাত্রে মৎস্যের প্রতিবিম্ব দেখিয়া চক্রছিদ্রের মধ্য দিয়া বাণদ্বারা মৎস্যের চক্ষু যিনি বিঁধিতে পারিবেন, তিনিই রাজকুমারীকে লাভ করিবেন। এই স্বয়ংবর-সভায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে রাজা ও রাজকুমারগণ সমবেত হইয়াছিলেন। সকলেই রাজকুমারীর পাণিগ্রহণের জন্য সমুৎসুক, সকলেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না।

আপনারা সকলেই ভারতের বর্ণচতুষ্টয়ের বিষয় অবগত আছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণ, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পৌরোহিত্য বা যাজনাদি তাঁহাদের কার্য; ব্রাহ্মণের নীচেই ক্ষত্রিয়—রাজা ও যোদ্ধাগণ এই ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্ভুক্ত; তৃতীয়—বৈশ্য অর্থাৎ ব্যবসায়ী; চতুর্থ—শূদ্র বা সেবক। অবশ্য এই রাজকুমারী ক্ষত্রিয়বর্ণভুক্তা ছিলেন।

যখন রাজপুত্রগণ একের পর এক চেষ্টা করিয়া কেহ লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিলেন না, তখন দ্রুপদরাজপুত্র সভামধ্যে উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ক্ষত্রিয়েরা লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে অকৃতকার্য হইয়াছেন, এক্ষণে অন্য ত্রিবর্ণের মধ্যে যে কেহ লক্ষ্যবিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে পারেন; ব্রাহ্মণই হউন, বৈশ্যই হউন, এমন কি শূদ্রই হউন, যিনি লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন, তিনিই দ্রৌপদীকে লাভ করিবেন।'

ব্রাহ্মণগণমধ্যে পঞ্চপাণ্ডব সমাসীন ছিলেন, তন্মধ্যে অর্জুনই পরম ধনুর্ধর। দ্রুপদপুত্রের পূর্বোক্ত আহ্বান-শ্রবণে তিনি উঠিয়া লক্ষ্য বিঁধিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্মণজাতি সাধারণতঃ অতি শান্তপ্রকৃতি ও কিঞ্চিৎ নম্রস্বভাব। শাস্ত্রবিধানানুসারে তাঁহাদের কোন অস্ত্রশস্ত্র স্পর্শ করা বা সাহসের কর্ম করা নিষিদ্ধ। ধ্যান, ধারণা, স্বাধ্যায় ও আত্মসংযমে সতত নিযুক্ত থাকাই তাঁহাদের শাস্ত্রসঙ্গত ধর্ম। অতএব তাঁহারা কিরূপ শান্তপ্রকৃতি ও শান্তিপ্রিয়, ভাবিয়া দেখুন। ব্রাহ্মণেরা যখন দেখিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন উঠিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, তখন তাঁহারা ভাবিলেন, এই ব্যক্তির আচরণে ক্ষত্রিয়গণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সকলকে সমূলে ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। এই ভাবিয়া তাঁহারা ছদ্মবেশী অর্জুনকে তাঁহার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়, অতএব তাঁহাদের কথায় নিবৃত্ত হইলেন না।

তিনি অবলীলাক্রমে ধনু তুলিয়া উহাতে জ্যা রোপণ করিলেন। পরে ধনু আকর্ষণ করিয়া অনায়াসে চক্রছিদ্রের মধ্য দিয়া বাণ ক্ষেপণ করিয়া লক্ষ্যবস্তু—মৎস্যটির চক্ষু বিদ্ধ করিলেন।

তখন সভাস্থলে তুমুল আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। রাজকুমারী দ্রৌপদী অর্জুনের নিকট অগ্রসর হইয়া তদীয় গলদেশে মনোহর বরমাল্য অর্পণ করিলেন। কিন্তু এদিকে রাজগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। এই মহতী সভায় সমবেত রাজা ও রাজকুমারগণকে অতিক্রম করিয়া একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূতা পরমা সুন্দরী রাজকুমারীকে লইয়া যাইবে, এ চিন্তাও তাঁহাদের অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া বলপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে দ্রৌপদীকে কাড়িয়া লইবেন, স্থির করিলেন। পাণ্ডবগণের সহিত রাজাদের তুমুল যুদ্ধ হইল, কিন্তু পাণ্ডবেরা কোনমতে পরাভূত হইলেন না, অবশেষে জয়লাভ করিয়া দ্রৌপদীকে নিজেদের গৃহে লইয়া গেলেন।

পঞ্চভ্রাতা এক্ষণে রাজকুমারীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের বাসস্থানে জননী কুন্তীসমীপে ফিরিয়া আসিলেন। ভিক্ষাই ব্রাহ্মণের উপজীবিকা, সুতরাং ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করাতে তাঁহাদিগকেও বাহিরে গিয়া ভিক্ষাদ্বারা খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইত। ভিক্ষালব্ধ বস্তু গৃহে আসিলে কুন্তী উহা তাঁহাদিগকে ভাগ করিয়া দিতেন। পঞ্চভ্রাতা যখন দ্রৌপদীকে লইয়া মাতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা কৌতুকবশে জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দেখ মা, আজ কেমন মনোহর ভিক্ষা আনিয়াছি।' কুন্তী না দেখিয়াই বলিলেন, 'যাহা আনিয়াছ, পাঁচজনে মিলিয়া ভোগ কর।' এই কথা বলিবার পর যখন রাজকুমারীর দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'একি! এ আমি কি কথা বলিলাম, এ যে এক কন্যা!' কিন্তু এখন আর কি হইবে? মাতৃ-বাক্য লঙ্ঘন করা তো যায় না, মাতৃ-আজ্ঞা অবশ্যই পালন করিতে হইবে। তাঁহাদের জননী জীবনে কখন মিথ্যা কথা উচ্চারণ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার বাক্য কখন ব্যর্থ হইতে পারে না। এইরূপে দ্রৌপদী পঞ্চভ্রাতার সাধারণ সহধর্মিণী হইলেন।

আপনারা জানেন, সমাজের সামাজিক রীতিনীতির ক্রমবিকাশের বিভিন্ন সোপান আছে। এই মহাকাব্যের ভিতর প্রাচীন ইতিহাসের কিছু কিছু

আশ্চর্য আভাস পাওয়া যায়। পঞ্চভ্রাতা মিলিয়া যে এক নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, মহাভারত-প্রণেতা এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহাকে কোনরূপ সামাজিক প্রথা বলিয়া নির্দেশ না করিয়া উহার বিশেষ কারণ দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। মাতৃ-আজ্ঞা—তাঁহাদের জননী এই অদ্ভুত পরিণয়ে সম্মতিদান করিয়াছেন—ইত্যাদি নানা যুক্তি দিয়া মহাভারতকার এই ঘটনাটির উপর টীকা করিয়াছেন। কিন্তু আপনাদের জানা আছে, সকল সমাজে এমন এক অবস্থা ছিল, যখন বহুপতিত্ব অনুমোদিত ছিল—এক পরিবারের সকল ভ্রাতা মিলিয়া এক নারীকে বিবাহ করিত। ইহা সেই অতীত বহুপতিক যুগের একটা পরবর্তী আভাসমাত্র।

যাহা হউক, এদিকে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে লইয়া প্রস্থান করিলে তাঁহার ভ্রাতার মনে নানাবিধ আন্দোলন হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'যে পঞ্চ ব্যক্তি আমার ভগিনীকে লইয়া গেল, ইহারা কাহারা! আমার ভগিনী যাহার গলে বরমাল্য অর্পণ করিল, যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইবে, সেই বা কে! ইহাদের তো অশ্ব রথ বা অন্য কোনরূপ ঐশ্বর্যের চিহ্ন দেখিতেছি না। ইহারা তো পদব্রজেই চলিয়া গেল দেখিলাম।' মনে মনে এই সকল বিতর্ক করিতে করিতে তিনি তাঁহাদের যথার্থ পরিচয় জানিবার জন্য দূরে দূরে থাকিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে গোপনে রাত্রে তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া তাঁহারা যে যথার্থ ক্ষত্রিয়, এ বিষয়ে তাঁহার কোন সংশয় রহিল না। তখন দ্রুপদরাজ তাঁহাদের যথার্থ পরিচয় পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন।

অনেকে প্রথমে এইরূপ বিবাহে ঘোরতর আপত্তি করিলেন বটে, কিন্তু ব্যাসের উপদেশে সকলে বুঝিলেন যে, এক্ষেত্রে এইরূপ বিবাহ দোষাবহ হইতে পারে না। সুতরাং দ্রুপদরাজকেও এইরূপ বিবাহে সম্মত হইতে হইল; রাজকুমারী পঞ্চপাণ্ডবের সহিত পরিণয়পাশে বদ্ধ হইলেন।

পরিণয়ের পর পাণ্ডবগণ দ্রুপদগৃহে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁহাদের বলবীর্য বর্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহারা জীবিত আছেন, দগ্ধ হন নাই—ক্রমে এ সংবাদ কৌরবগণের নিকট পৌঁছিল। দুর্যোধন ও তাঁহার অনুচরবর্গ পাণ্ডবগণের বিনাশের জন্য নূতন নূতন ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি বর্ষীয়ান্ মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গের

পরামর্শে রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে হস্তিনাপুরে লইয়া আসিলেন। বহুদিনের পর প্রজাবর্গ পাণ্ডবগণকে দর্শন করিয়া পরমানন্দে মহোৎসব করিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে অর্ধরাজ্য প্রদান করিলেন। তখন পঞ্চভ্রাতায় মিলিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ নামক মনোহর নগর নির্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁহারা আপনাদের রাজ্য ক্রমে বাড়াইতে লাগিলেন, চতুষ্পার্শ্বস্থ বিভিন্ন প্রদেশের রাজগণকে বশীভূত করিয়া কর প্রদান করিতে বাধ্য করিলেন। অতঃপর সর্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নিজেকে ভারতের তদানীন্তন সমস্ত রাজগণের সম্রাটরূপে ঘোষণা করিবার জন্য রাজসূয় যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই যজ্ঞে পরাজিত রাজগণকে কর সহ আসিয়া সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে হয় ও প্রত্যেককে যজ্ঞোৎসবের এক একটি কার্য-ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া যজ্ঞকার্যে সাহায্য করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের আত্মীয় এবং বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের নিকট আসিয়া রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনে নিজ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু যজ্ঞা-নুষ্ঠানে একটি বিষম বিঘ্ন ছিল। জরাসন্ধ নামক জনৈক রাজা একশত রাজাকে বলি দিয়া নরমেধ যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে ছিয়াশি জন রাজাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে আক্রমণ করিবার পরামর্শ দিলেন। এই পরামর্শ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন জরাসন্ধের নিকট যাইয়া তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। জরাসন্ধও সম্মত হইলেন। চতুর্দশ দিবস ক্রমাগত দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর ভীম জরাসন্ধকে পরাভূত করিলেন। তখন বন্দী রাজগণকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

ইহার পর যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ চারি ভ্রাতা সৈন্যসামন্ত লইয়া প্রত্যেকে এক এক দিকে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন ও সমস্ত রাজন্যবর্গকে যুধিষ্ঠিরের বশে আনয়ন করিলেন। তাঁহারা রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া জয়লব্ধ অগাধ ধনসম্পত্তি ঐ বিরাট যজ্ঞের ব্যয় নির্বাহের জন্য যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্পণ করিলেন।

এইরূপে পাণ্ডবগণ কর্তৃক পরাজিত এবং জরাসন্ধের কারাগার হইতে মুক্ত রাজগণ রাজসূয় যজ্ঞে আসিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার যথোচিত সম্মান করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তৎপুত্রগণও এই

যজ্ঞে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যজ্ঞাবসানে যুধিষ্ঠির সম্রাটের মুকুট পরিধান করিলেন এবং রাজচক্রবর্তী বলিয়া ঘোষিত হইলেন। এই সময় হইতেই কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে নূতন বিরোধের বীজ উপ্ত হইল। পাণ্ডবগণের রাজ্য ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি দুর্যোধনের অসহ্য মনে হইল, সুতরাং তিনি যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রবল ঈর্ষার ভাব লইয়া রাজসূয় যজ্ঞ হইতে ফিরিলেন। এইরূপে ঈর্ষাপরবশ হইয়া তিনি মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন কিরূপে ছলে ও কৌশলে পাণ্ডবগণের সর্বনাশ সাধন করিতে পারেন। কারণ, তিনি জানিতেন বলপূর্বক পাণ্ডবগণকে পরাভূত করা তাঁহার সাধ্যাতীত। রাজা যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন। অতি অশুভ ক্ষণে তিনি চতুর অক্ষবিদ্ ও দুর্যোধনের কুমন্ত্রণাদাতা শকুনির সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতে আহূত হইলেন।

প্রাচীন ভারতে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, কোন ক্ষত্রিয় যুদ্ধের জন্য আহূত হইলে সর্ববিধ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নিজ মানরক্ষার জন্য তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইত; এইরূপে দ্যূতক্রীড়ার জন্য আহূত হইয়া ক্রীড়া করিলেই মানরক্ষা হইত, আর ক্রীড়ায় অসম্মত হইলে তাহা অতি অযশস্কর বলিয়া পরিগণিত হইত। মহাভারত বলেন, রাজা যুধিষ্ঠির সর্ববিধ ধর্মের মূর্তিমান্ বিগ্রহ ছিলেন, কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে সেই রাজর্ষিকেও দ্যূতক্রীড়ায় সম্মত হইতে হইয়াছিল। শকুনি ও তাহার অনুচরবর্গ কপট পাশা প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহাতেই যুধিষ্ঠির যতবার পণ রাখিতে লাগিলেন, ততবারই হারিতে লাগিলেন। বার বার এইরূপে পরাজিত হওয়াতে তিনি অন্তরে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া জয়লাভের আশায় একে একে তাঁহার যাহা কিছু ছিল সমুদয় পণ রাখিতে লাগিলেন এবং একে একে সকলই হারাইলেন। তাঁহার রাজ্য, ঐশ্বর্য সর্বস্ব এইরূপে নষ্ট হইল। অবশেষে যখন তাঁহার রাজ্য ঐশ্বর্য কৌরবগণকর্তৃক বিজিত হইল, অথচ তিনি বার বার দ্যূতক্রীড়ার জন্য আহূত হইতে লাগিলেন, তখন দেখিলেন নিজ ভ্রাতৃগণ, নিজে স্বয়ং এবং সুন্দরী দ্রৌপদী ব্যতীত পণ রাখিবার তাঁহার আর কিছুই নাই। এইগুলিও তিনি একে একে পণ রাখিলেন এবং একে একে সমস্তই হারাইলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ সম্পূর্ণরূপে কৌরবগণের বশীভূত হইলেন। কৌরবগণ তাঁহাদিগকে অবমাননা করিতে আর কিছুই বাকী রাখিল না; বিশেষতঃ তাহারা দ্রৌপদীকে যেরূপ অবমানিতা করিল, মানুষের প্রতি মানুষ

কখন সেরূপ ব্যবহার করিতে পারে না। অবশেষে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কৃপায় পাণ্ডবগণ কৌরবদের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজ্যশাসনে অনুমতি দিলেন। দুর্যোধন দেখিল বড় বিপদ, তাহার সব কৌশল বুঝি ব্যর্থ হয়; সুতরাং সে পিতাকে আর একবার মাত্র অক্ষক্রীড়ার অনুমতি দিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিল। অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র সম্মত হইলেন। এবার পণ রহিল—যে-পক্ষ হারিবে, সে-পক্ষকে দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। কিন্তু যদি এই অজ্ঞাতবাসের সময় জয়ী পক্ষ অজ্ঞাতবাসকারীদের কোন সন্ধান পায়, তবে পুনরায় ঐরূপ দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। কিন্তু বিজিত পক্ষ যদি অজ্ঞাতবাসের সম্পূর্ণ কাল অজ্ঞাতভাবে যাপন করিতে পারে, তবে তাহারা আবার রাজ্য পাইবে।

এই শেষ খেলাতেও যুধিষ্ঠিরের হার হইল; তখন পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর সহিত নির্বাসিত গৃহহীনদের ন্যায় বনে গমন করিলেন। তাঁহারা অরণ্যে ও পর্বতে কোনরূপে দ্বাদশ বর্ষ যাপন করিলেন। এই সময়ে তাঁহারা ধার্মিক ও বীরপুরুষোচিত অনেক কঠিন কঠিন কার্যের অনুষ্ঠান করেন, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘকাল তীর্থভ্রমণ করিয়া বহু প্রাচীন ও পবিত্র স্মৃতি-উদ্দীপক স্থানসমূহ দর্শন করেন। মহাভারতের এই বনপর্বটি বড়ই মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ, ইহা নানাবিধ উপাখ্যান ও আখ্যায়িকায় পূর্ণ। ইহাতে প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক মনোহর অপূর্ব উপাখ্যান আছে। মহর্ষিগণ পাণ্ডবগণকে এই নির্বাসনের সময় দর্শন করিতে আসিতেন এবং তাঁহারা যাহাতে নির্বাসনদুঃখ অক্লেশে সহিতে পারেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে প্রাচীন ভারতের অনেক মনোহর উপাখ্যান শুনাইতেন। তন্মধ্যে একটি উপাখ্যান আমি আপনাদিগকে বলিব।

অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন, সাবিত্রী নামে তাঁহার এক পরমা সুন্দরী গুণবতী কন্যা ছিল। হিন্দুদের এক অতি পবিত্র মন্ত্রের নাম 'সাবিত্রী'। এই কন্যার এত গুণ ও রূপ ছিল যে, তাঁহারও সাবিত্রী নাম রাখা হইয়াছিল। সাবিত্রী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে পিতা তাঁহাকে স্বামী মনোনীত করিতে বলিলেন।

আপনারা দেখিতেছেন, ভারতে প্রাচীন রাজকন্যাগণের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। অনেক সময়েই তাঁহারা পাণিগ্রহণার্থী রাজকুমারগণের মধ্যে হইতে নিজেরাই পতি নির্বাচন করিতেন।

সাবিত্রী পিতৃবাক্যে সম্মতা হইয়া সুবর্ণ-রথে আরোহণ করিয়া পিতৃরাজ্য হইতে অতি দূরবর্তী স্থানসমূহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পিতা কয়েকজন রক্ষী ও বৃদ্ধ সভাসদ্‌কে তাঁহার সঙ্গে দিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের সঙ্গে অনেক রাজসভায় যাইয়া রাজকুমারগণকে দেখিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার চিত্ত জয় করিতে পারিল না। অবশেষে তিনি বনের মধ্যে এক পবিত্র তপোবনে উপনীত হইলেন। প্রাচীনকালে এই সকল অরণ্যে পশুগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিত। সেখানে কোন জীবকে হত্যা করিতে দেওয়া হইত না; এইজন্য সেখানে পশুগণ মানুষকে ভয় করিত না। এমন কি—সরোবরের মৎস্যকুল পর্যন্ত মানুষের হাত হইতে নির্ভয়ে খাদ্য লইয়া যাইত। সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া এই সকল অরণ্যে কেহ কোন জীবহত্যা করে নাই। মুনি ও বৃদ্ধগণ সেখানে মৃগ ও পক্ষীদের মধ্যে আনন্দে বাস করিতেন। এমন কি—কোন গুরুতর অপরাধীও এই সকল স্থানে যাইলে তাহার উপর কোন অত্যাচার করিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। গার্হস্থ্যজীবনে যখন আর সুখ পাইত না, তখন লোকে এই সকল অরণ্যে গিয়া বাস করিত; সেখানে মুনিগণের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গে ও তত্ত্বচিন্তায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিত।

দ্যুমৎসেন নামক জনৈক রাজা পূর্বোক্ত তপোবনে বাস করিতেন। তিনি জরাগ্রস্ত ও দৃষ্টিশক্তিহীন হইলে শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণপূর্বক তাঁহাকে পরাভূত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিল। এই বৃদ্ধ অসহায় অন্ধ রাজা তাঁহার মহিষী ও পুত্রের সহিত এই তপোবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানে অতি কঠোর তপস্যায় তিনি জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম সত্যবান।

সাবিত্রী অনেক রাজসভা দর্শন করিয়া অবশেষে এই পবিত্র আশ্রমে উপনীত হইলেন। প্রাচীনকালে এই তপোবনবাসী ঋষি-তপস্বিগণের উপর সকলেই এত শ্রদ্ধাভক্তির ভাব পোষণ করিতেন যে, সম্রাটও এই সমস্ত তপোবন বা আশ্রমের নিকট দিয়া যাইবার সময় ঋষি-মুনিগণকে পূজা করিবার জন্য আশ্রমে প্রবেশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এখনও ভারতে

এই ঋষিমুনিগণের প্রতি লোকের এতদূর শ্রদ্ধার ভাব আছে যে, ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাটও অরণ্যবাসী ফলমূলভোজী চীরপরিহিত কোন ঋষির বংশধর বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বরং পরম গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিবেন। আমরা সকলেই ঋষির বংশধর। এই-রূপেই ভারতে ধর্মের প্রতি অতিশয় সম্মান ও শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে; অতএব রাজগণ যে তপোবনের নিকট দিয়া যাইবার সময় উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া সেই তপোবনবাসী ঋষিগণকে পূজা করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি! যদি তাঁহারা অশ্বারোহণে আসিয়া থাকেন, তবে আশ্রমের বাহিরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে আশ্রমে প্রবেশ করিবেন। আর যদি তাঁহারা রথারোহণে আসিয়া থাকেন, তবে রথ ও বর্মাদি বাহিরে রাখিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে। বিনীত শমগুণসম্পন্ন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির ন্যায় না যাইলে কোন যোদ্ধারই আশ্রমে প্রবেশাধিকার ছিল না।

এইরূপে সাবিত্রী রাজকন্যা হইয়াও এই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে রাজতপস্বী দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে দর্শন করিলেন। সত্যবানকে দর্শন করিয়াই সাবিত্রী মনে মনে তাঁহাকে হৃদয় সমর্পণ করিলেন। সাবিত্রী কত রাজপ্রাসাদে, কত রাজসভায় গিয়াছিলেন, কিন্তু কোন স্থানে কোন রাজকুমার তাঁহার চিত্ত হরণ করিতে পারেন নাই। এখানে রাজা দ্যুমৎসেনের অরণ্যাবাসে তাঁহার পুত্র সত্যবান তাঁহার হৃদয় হরণ করিলেন।

সাবিত্রী পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলে পিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎসে সাবিত্রি, তুমি তো নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া আসিলে; বলো দেখি, তুমি কোথাও এমন কাহাকেও দেখিয়াছ কি, যাহার সহিত তুমি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা কর? বলো মা, কিছুমাত্র গোপন না করিয়া হৃদয়ের কথা খুলিয়া বলো।' তখন সাবিত্রী লজ্জানম্রবদনে মৃদুস্বরে বলিলেন, 'হাঁ, পিতা, দেখিয়াছি।' পিতা কহিলেন, 'বৎসে, যে রাজকুমার তোমার চিত্ত হরণ করিয়াছে, তাহার নাম কি?' তখন সাবিত্রী বলিলেন, 'তাঁহাকে ঠিক রাজকুমার বলিতে পারা যায় না, কারণ তাঁহার পিতা দ্যুমৎসেন রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য অপহরণ করিয়াছে। অতএব তিনি

রাজকুমার হইলেও রাজ্যের অধিকারী নহেন, তিনি তপস্বিভাবে জীবনযাপন করিতেছেন, বনজাত ফলমূল সংগ্রহ করিয়া কুটিরবাসী বৃদ্ধ জনকজননীর সেবায় নিরত রহিয়াছেন।'

সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। রাজা অশ্বপতি তাঁহাকে সাবিত্রীর পতি-নির্বাচন-বৃত্তান্ত বলিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বলিলেন, 'এই নির্বাচন বড়ই অশুভ হইয়াছে।' কথাগুলি শুনিয়া রাজা তাঁহাকে এইরূপ বলিবার কারণ স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, 'অদ্য হইতে দ্বাদশ মাস পরে সত্যবান নিজ কর্মানুসারে দেহত্যাগ করিবে।' নারদের এই কথা শুনিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে রাজা কন্যাকে বলিলেন, 'সাবিত্রি, শুনিলে তো, অদ্য হইতে দ্বাদশ মাস পরে সত্যবান দেহত্যাগ করিবে; অতএব তুমি তাহাকে বিবাহ করিলে অল্প বয়সেই বিধবা হইবে, একবার এই কথা বেশ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। বৎসে, তুমি সত্যবানের বিষয় আর হৃদয়ে স্থান দিও না, এরূপ অল্পায়ু আসন্নমৃত্যু বরের সহিত তোমার কোনমতে বিবাহ হইতে পারে না।' সাবিত্রী কহিলেন, 'পিতঃ, সত্যবান অল্পায়ুই হউক বা আসন্নমৃত্যুই হউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। আমার হৃদয় সত্যবানের প্রতি অনুরাগী, আমি মনে মনে সেই সাধুচরিত্র বীর সত্যবানকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি। অতএব আপনি অন্য ব্যক্তিকে পতিরূপে বরণ করিতে আমাকে বলিবেন না, তাহা হইলে আমি দ্বিচারিণী হইব। কুমারীর পতিনির্বাচনে একবার মাত্র অধিকার আছে। একবার সে যাহাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছে, তাহাকে ছাড়া আর কাহাকেও তাহার মনে কখন স্থান দেওয়া উচিত নহে।' রাজা যখন দেখিলেন, সাবিত্রী সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিতে দৃঢ়নিশ্চয়, তখন তিনি এই বিবাহ অনুমোদন করিলেন। সাবিত্রী সত্যবানের সহিত যথাবিধানে বিবাহিতা হইয়া তাঁহার মনোনীত পতির সহিত বাস করিবার জন্য ও শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবার জন্য পিতার রাজপ্রাসাদ হইতে অরণ্যমধ্যে তাঁহাদের আশ্রমে গমন করিলেন।

নারদের মুখ হইতে শুনিয়া সাবিত্রী সত্যবানের ঠিক কোন্ দিন দেহত্যাগ হইবে তাহা অবগত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি উহা সত্যবানের নিকট গোপন রাখিয়াছিলেন। সত্যবান প্রতিদিন গভীর অরণ্যে গিয়া কাষ্ঠ এবং

ফলমূল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় কুটিরে ফিরিয়া আসিতেন। সাবিত্রী রন্ধনাদি গৃহকার্য করিয়া বৃদ্ধ শ্বশুর ও শাশুড়ীর সেবা করিতেন। এইরূপে তাঁহাদের জীবন সুখে দুঃখে অতিবাহিত হইতে লাগিল, অবশেষে সত্যবানের দেহত্যাগের দিন অতি নিকটবর্তী হইল। তিন দিন মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে সাবিত্রী এক কঠোর ব্রত গ্রহণ করিলেন। উপবাসে থাকিয়া রাত্রিজাগরণ করিয়া তিনি ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই তিন রাত্রি তিনি পতির আসন্ন মৃত্যু চিন্তা করিয়া কত গভীর দুঃখে কাটাইয়াছিলেন, অপরের অজ্ঞাতসারে কত অশ্রু মোচন করিয়াছিলেন, দেবতার নিকট পতির শুভকামনায় কাতরভাবে কত প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

অবশেষে সেই কালদিবসের প্রভাত উপস্থিত হইল। সেদিন আর সাবিত্রীর —পতিকে এক মুহূর্তের জন্যও নয়নের অন্তরাল করিতে সাহস হইল না। অতএব সত্যবানের অরণ্যে কাষ্ঠ ও ফলমূল সংগ্রহ করিতে যাইবার সময় সাবিত্রী সেদিন পতির সঙ্গে যাইতে শ্বশুর ও শাশুড়ীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং অনুমতি লাভ করিয়া সত্যবানের সঙ্গে অরণ্যে গেলেন। হঠাৎ সত্যবান বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে পত্নীকে বলিলেন, 'প্রিয়ে সাবিত্রি, আমার মাথা ঘুরিতেছে, আমার ইন্দ্রিয়সকল অবসন্ন বোধ হইতেছে, আমার সর্বশরীর যেন নিদ্রাভারাক্রান্ত হইতেছে, আমি কিছুকাল তোমার পার্শ্বে বিশ্রাম করিব।' সাবিত্রী ভয়বিজড়িত ও কম্পিত স্বরে উত্তর দিলেন, 'প্রভো, আপনি আমার অঙ্কদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া বিশ্রাম করুন।' তখন সত্যবান নিজ উত্তপ্ত মস্তক সাবিত্রীর অঙ্কদেশে স্থাপন করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার শ্বাস উপস্থিত হইল, তিনি দেহত্যাগ করিলেন। সাবিত্রী গলদশ্রুলোচনে পতিকে আলিঙ্গন করিয়া সেই জনশূন্য অরণ্যে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে যমদূতগণ সত্যবানের সূক্ষ্ম দেহ গ্রহণ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু সাবিত্রী যেখানে পতির মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, তাহারা তাঁহার নিকটেই আসিতে পারিল না। তাহারা দেখিল সাবিত্রীর চতুষ্পার্শ্বে অগ্নির গণ্ডি রহিয়াছে, যমদূতগণের মধ্যে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারিল না, সাবিত্রীর সান্নিধ্য হইতে পলাইয়া গিয়া তাহারা যমরাজের নিকট উপস্থিত হইল এবং সত্যবানের আত্মাকে আনিতে না পারার কারণ নিবেদন করিল।

তখন মৃত ব্যক্তিগণের বিচারক মৃত্যুদেবতা যমরাজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লোকের বিশ্বাস—পৃথিবীতে প্রথম মানুষ যিনি মরেন, তিনিই মৃত্যুদেবতা অর্থাৎ তৎপরবর্তী মৃত ব্যক্তিগণের অধিপতি হইয়াছেন। মৃত্যুর পর কাহাকে পুরস্কার অথবা কাহাকে শাস্তি দিতে হইবে, তিনিই তাহা বিচার করেন। সেই যমরাজ এখন স্বয়ং আসিলেন। অবশ্য যমরাজ দেবতা, অতএব সাবিত্রীর চতুষ্পার্শ্বস্থ সেই অগ্নির ভিতর অনায়াসে প্রবেশ করিবার অধিকার তাঁহার ছিল। তিনি সাবিত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'মা, তুমি এই শবদেহ পরিত্যাগ কর। কারণ, জানিও মর্ত্যমাত্রকেই দেহত্যাগ করিতে হয়, ইহাই বিধির বিধান। মর্ত্যগণের মধ্যে আমিই প্রথম মরিয়াছি, তারপর হইতে সকলকেই মরিতে হয়। মৃত্যুই মানবের নিয়তি।' যমরাজ এই কথা বলিলে সাবিত্রী সত্যবানের শবদেহ ত্যাগ করিয়া কিছু দূরে সরিয়া গেলেন, তখন যম সত্যবানের দেহ হইতে তাঁহার জীবাত্মাকে বাহির করিয়া লইলেন। যম এইরূপে সেই যুবকের জীবাত্মাকে লইয়া স্বীয় পুরী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে তিনি শুনিলেন, তাঁহার পশ্চাতে শুষ্ক পত্রের উপর কাহার পদশব্দ হইতেছে। শুনিয়া তিনি ফিরিয়া দেখেন—সাবিত্রী। তখন তিনি সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মা সাবিত্রি, বৃথা কেন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ? সকল মর্ত্যজনেরই অদৃষ্টে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।' সাবিত্রী বলিলেন, 'পিতঃ, আমি আপনার অনুসরণ করিতেছি না। কিন্তু আপনি যেমন বলিলেন, মর্ত্যগণের পক্ষে মৃত্যুই বিধির বিধান, সেইরূপ বিধির বিধানেই নারীও তাহার প্রিয় পতির অনুসরণ করিয়া থাকে, আর বিধির সনাতন বিধানেই পতিব্রতা ভার্যাকে কখন তাহার প্রিয় পতি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে না।' তখন যমরাজ বলিলেন, 'বৎসে, তোমার বাক্য-শ্রবণে পরম প্রীত হইয়াছি, অতএব তুমি তোমার পতির পুনর্জীবন ব্যতীত আমার নিকট হইতে যাহা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর।' তখন সাবিত্রী বলিলেন, 'হে প্রভু যমরাজ, যদি আপনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমায় এই বর দিন যে, আমার শ্বশুর যেন পুনরায় তাঁহার চক্ষু লাভ করেন ও সুখী হইতে পারেন।' যম বলিলেন, 'প্রিয় বৎসে, আমি ধর্মজ্ঞ, তোমার এই ধর্মসঙ্গত বাসনা পূর্ণ হউক।' এই বলিয়া যমরাজ সত্যবানের জীবাত্মাকে লইয়া আবার নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে

লাগিলেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতে তিনি পূর্ববৎ আবার পশ্চাতে পদশব্দ শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া আবার সাবিত্রীকে দেখিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, 'বৎসে সাবিত্রি, তুমি এখনও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ?' সাবিত্রী উত্তর দিলেন, 'হাঁ, পিতঃ, আমি আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছি বটে। আমি যে না আসিয়া থাকিতে পারিতেছি না, কে যেন আমায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি ফিরিবার জন্ম বার বার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমার মনপ্রাণ যে আমার স্বামীর নিকট পড়িয়া আছে, স্থতরাং যেখানে আমার স্বামীকে লইয়া যাইতেছেন, সেখানে আমার দেহও যাইতেছে। আমার আত্মা তো পূর্বেই গিয়াছে—কারণ, আমার আত্মা আমার স্বামীর আত্মাতেই অবস্থিত। স্থতরাং আপনি যখন আমার আত্মাকেই লইয়া যাইতেছেন, তখন আমার দেহ যাইবেই। উহা না গিয়া কি করিয়া থাকিবে?' যম কহিলেন, 'সাবিত্রি, আমি তোমার বাক্যশ্রবণে পরম প্রীত হইলাম। আমার নিকট হইতে তোমার স্বামীর জীবন ব্যতীত আর একটি বর প্রার্থনা কর।' সাবিত্রী কহিলেন, 'দেব, আপনি যদি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি যে, আমার শ্বশুর যেন তাঁহার নষ্ট রাজ্য ও ঐশ্বর্য ফিরিয়া পান।' যম কহিলেন, 'প্রিয় বৎসে, তোমায় এই বরও দান করিলাম। কিন্তু এখন তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, কারণ জীবিত মানুষ কখন যমরাজের সহিত যাইতে পারে না।' এই বলিয়া যম আবার চলিতে লাগিলেন। যম যদিও বারংবার সাবিত্রীকে ফিরিতে বলিলেন, তথাপি সেই নম্রস্বভাবা পতিপরায়ণা সাবিত্রী তাঁহার মৃত স্বামীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যম আবার ফিরিয়া সাবিত্রীকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'হে সাবিত্রি, হে মহানুভবে, তুমি এরূপ তীব্র শোকে বিহ্বল হইয়া পাগলের মতো স্বামীর অনুসরণ করিও না।' সাবিত্রী কহিলেন, 'আমার মনের উপর আমার কোন কর্তৃত্ব নাই, আপনি আমার প্রিয়তম স্বামীকে যেখানে লইয়া যাইবেন, আমি সেখানেই তাঁহার অনুসরণ করিব।' যম বলিলেন, 'আচ্ছা সাবিত্রি, মনে কর তোমার স্বামী ইহলোকে অনেক পাপ করিয়াছে, তাহার ফলে তাহাকে নরকে যাইতে হইবে; তাহা হইলেও কি তুমি তোমার প্রিয়তম পতির সহিত যাইতে প্রস্তুত?' পতির প্রতি পরম অনুরাগিণী সাবিত্রী কহিলেন, 'আমার পতি

যেখানে যাইবেন—জীবনই হউক, মৃত্যুই হউক, স্বর্গই হউক, নরকই হউক—আমি পরমানন্দে সেখানে যাইব।' যম কহিলেন, 'বৎসে, তোমার কথাগুলি অতি মনোহর ও ধর্মসঙ্গত, আমি তোমার উপর পরম প্রীত হইয়াছি; তুমি আরও একটি বর প্রার্থনা কর, কিন্তু জানিও মৃত ব্যক্তি কখন আবার জীবিত হয় না।' সাবিত্রী কহিলেন, 'যদি আমার উপর আপনি এতদূর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমায় এই বর দান করুন, যেন আমার শ্বশুরের রাজবংশের লোপ না হয়, যেন সত্যবানের পুত্রগণ তাঁহার রাজ্য লাভ করে।' তখন যমরাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'বৎসে, তোমার মনস্কামনা সফল হউক, এই তোমার পতির জীবাত্মাকে পরিত্যাগ করিলাম। তোমার পতি আবার জীবিত হইবে। সত্যবানের ঔরসে তোমার অনেক পুত্র জন্মিবে, কালে তাহারা রাজপদ লাভ করিবে। এক্ষণে গৃহে ফিরিয়া যাও। প্রেম মৃত্যুকেও জয় করিল। পূর্বে কোন নারী পতিকে এমন ভালবাসে নাই, আর আমি—সাক্ষাৎ মৃতুদেবতাও অকপট অব্যভিচারী প্রেমের শক্তির নিকট পরাজিত হইলাম।'

সাবিত্রী-উপাখ্যান সংক্ষেপে কথিত হইল। ভারতে প্রত্যেক বালিকাকে সাবিত্রীর ন্যায় সতী হইতে শিক্ষা দেওয়া হয়—মৃত্যুও যে সাবিত্রীর প্রেমের নিকট পরাভূত হইয়াছিল, যে সাবিত্রী ঐকান্তিক প্রেমবলে যমরাজের নিকট হইতেও স্বীয় স্বামীর আত্মাকে ফিরাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মহাভারত এই সাবিত্রীর উপাখ্যানের মতো শত শত মনোহর উপাখ্যানে পূর্ণ। আমি আপনাদিগকে প্রথমেই বলিয়াছি, জগতের মধ্যে মহাভারত একখানি বিরাট গ্রন্থ। ইহা অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত এবং প্রায় লক্ষশ্লোকে পূর্ণ।

যাহা হউক, এক্ষণে মূল আখ্যানের সূত্র আবার ধরা যাউক। পাণ্ডবগণ রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়া বনে বাস করিতেছেন, এই অবস্থায় আমরা পাণ্ডবদিগকে ফেলিয়া আসিয়াছি। সেখানেও তাঁহারা দুর্যোধনের কুমন্ত্রণা-প্রসূত নানাবিধ অত্যাচার হইতে একেবারে মুক্ত হন নাই, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও দুর্যোধন কখনই তাঁহাদের বিশেষ অনিষ্টসাধনে কৃতকার্য হয় নাই।

অরণ্যে বাসকালে পাণ্ডবগণের একদিনের ঘটনা আমি আপনাদের নিকট বলিব। একদিন তাঁহারা বড়ই তৃষ্ণার্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেবকে জল অন্বেষণ করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। তিনি দ্রুতপদে যাইয়া অনেক অন্বেষণের পর একস্থানে একটি অতি নির্মলসলিল সরোবর দেখিতে পাইলেন। তিনি যেমন জলপানের জন্য সরোবরে অবতরণ করিবেন, শুনিলেন—কে যেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, 'বৎস, জল পান করিও না। অগ্রে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দাও, পরে এই জল যথেচ্ছা পান করিও।' কিন্তু সহদেব অতিশয় তৃষ্ণার্ত থাকাতে এই বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া ইচ্ছামত জল পান করিলেন, জল পান করিবামাত্র তিনি দেহত্যাগ করিলেন। সহদেবকে অনেকক্ষণ ফিরিতে না দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে তাহার সন্ধানে ও জল আনয়নের জন্য পাঠাইলেন।

নকুলও ইতস্তত: অন্বেষণ করিতে করিতে উক্ত সরোবর সমীপে যাইয়া ভ্রাতা সহদেবকে মৃত অবস্থায় নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। নকুল তৃষ্ণার্ত থাকায় জলের দিকে যেমন অগ্রসর হইলেন, অমনি তিনিও সহদেবের মতো শুনিলেন, 'বৎস, অগ্রে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দাও, পশ্চাৎ জল পান করিও।' তিনিও ঐ বাক্য অমান্য করিয়া জল পান করিলেন ও জল পান করিয়াই সহদেবের মতো মানবলীলা সংবরণ করিলেন। পরে অর্জুন ও ভীম ঐরূপে ভ্রাতৃগণের অন্বেষণে ও জল আনিবার জন্য প্রেরিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারাও কেহ ফিরিলেন না। তাঁহাদেরও নকুল সহদেবের মতো অবস্থা হইল। তাঁহারাও জল পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অবশেষে যুধিষ্ঠির স্বয়ং উঠিয়া ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের অন্বেষণে গমন করিলেন। অনেকক্ষণ ইতস্তত: ভ্রমণের পর পরিশেষে সেই মনোহর সরোবরের সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে মৃত অবস্থায় ভূতলে শয়ান দেখিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ শোকভারাক্রান্ত হইল, তিনি ভ্রাতৃগণের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন; সেই সময় হঠাৎ শুনিলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে, 'বৎস, দুঃসাহস করিও না। আমি একজন যক্ষ—বকরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য খাইয়া জীবনধারণ করি এবং এই সরোবরে বাস করি; এই সরোবর আমার অধিকৃত। আমার দ্বারাই তোমার ভ্রাতারা প্রেতলোকে নীত হইয়াছে। হে রাজন্, যদি তুমিও তোমার ভ্রাতাদের মতো আমার প্রশ্নগুলির উত্তর

না দিয়া জল পান কর, তবে ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পার্শ্বে পঞ্চম শবরূপে তোমাকেও শয়ন করিতে হইবে। হে কুরুনন্দন, প্রথমে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়া স্বয়ং যথেচ্ছা জল পান কর ও অন্যত্র লইয়া যাও।' যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আমি আপনার প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। আপনি আমাকে যথাভিরুচি প্রশ্ন করুন।' তখন যক্ষ তাঁহাকে একে একে অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, যুধিষ্ঠিরও প্রশ্নগুলির সদুত্তর প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে দুইটি প্রশ্ন ও যুধিষ্ঠিরপ্রদত্ত উত্তর আপনাদের নিকট বলিতেছি। যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিমাশ্চর্যম্?' —জগতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার কি? যুধিষ্ঠির তদুত্তরে বলিলেন:

প্রতিমুহূর্তে আমরা দেখিতেছি, আমাদের চারিদিকে প্রাণিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কিন্তু যাহারা এখনও মরে নাই, তাহারা ভাবিতেছে যে তাহারা কখনও মরিবে না। জগতের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার—মৃত্যু অহরহঃ সম্মুখে থাকিলেও কেহ বিশ্বাস করে না যে, সে মরিবে।[১]

যক্ষের আর এক প্রশ্ন ছিল, 'কঃ পন্থাঃ?' —কোন্ পথ অনুসরণ করিলে মানবের যথার্থ শ্রেয়োলাভ হয়? যুধিষ্ঠির ঐ প্রশ্নের এই উত্তর প্রদান করেন:

তর্কের দ্বারা কিছুই নিশ্চয় হইতে পারে না। কারণ, জগতে নানা মত-মতান্তর রহিয়াছে। বেদও নানাবিধ—উহার এক ভাগ যাহা বলিতেছে, অপর ভাগ তাহারই প্রতিবাদ করিতেছে। এমন দুইজন মুনি বাহির করিতে পারা যায় না, যাঁহাদের পরস্পর মতভেদ নাই। ধর্মের রহস্য যেন গুহায় নিহিত রহিয়াছে। অতএব মহাপুরুষগণ যে পথে চলিয়াছেন, সেই পথই অনুসরণীয়।[২]

যক্ষ যুধিষ্ঠিরের সমুদয় উত্তর শ্রবণ করিয়া অবশেষে বলিলেন, 'হে রাজন্, আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি বকরূপী ধর্ম। আমি তোমায় পরীক্ষা করিবার জন্যই এইরূপ করিয়াছি। তোমার ভ্রাতৃগণের

---

১ 'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্॥

২ তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ। নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

মধ্যে কেহই মরে নাই। আমার মায়াবলেই তাহারা মৃত প্রতীয়মান হইতেছে। হে ভরতর্ষভ, তুমি যখন ধনলাভ ও সম্ভোগ অপেক্ষা অনৃশংসতাকে মহত্তর বিবেচনা করিয়াছ, তখন তোমার ভ্রাতৃবর্গ জীবিত হউক।' এই কথা বলিবামাত্র ভীমাদি পাণ্ডবচতুষ্টয় জীবিত হইয়া উঠিলেন।

এই উপাখ্যান হইতে রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রকৃতির অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। যক্ষের প্রশ্নগুলির উত্তর হইতে আমরা দেখিতে পাই, রাজার ভাব অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞ ও যোগীর ভাবই তাঁহার মধ্যে অধিক ছিল।

এদিকে পাণ্ডবদিগের দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের কাল শেষ হইয়া অজ্ঞাতবাস করিবার ত্রয়োদশ বর্ষ নিকটবর্তী হইতেছিল। এই কারণে যক্ষ তাঁহাদিগকে বিরাটের রাজ্যে গমন করিয়া তথায় যাহার যেরূপ অভিরুচি, সেইরূপ ছদ্মবেশে থাকিবার উপদেশ দিলেন।

এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের পর তাঁহারা বিভিন্ন ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর কাটাইলেন এবং বিরাটরাজ্যে গমন করিয়া সেখানে রাজার অধীনে সামান্য সামান্য কার্যে নিযুক্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির বিরাট রাজার দ্যূতজ্ঞ সভাসদ্ হইলেন। ভীম পাচকের কাজে নিযুক্ত হইলেন। অর্জুন নপুংসকবেশে রাজকন্যা উত্তরার নৃত্য ও সঙ্গীতশিক্ষার শিক্ষক হইয়া রাজার অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন। নকুল রাজার অশ্বশালার অধ্যক্ষ হইলেন এবং সহদেব গোশালার তত্ত্বাবধানকার্যে নিযুক্ত হইলেন। দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী-বেশে রাজ্ঞীর অন্তঃপুরে পরিচারিকারূপে গৃহীতা হইলেন। এইরূপে ছদ্মবেশে পাণ্ডবভ্রাতৃগণ এক বৎসর নিরাপদে অজ্ঞাতবাসের কাল অতিবাহিত করিলেন। দুর্যোধন তাঁহাদের অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোনমতে কৃতকার্য হইতে পারিল না। বর্ষ পূর্ণ হইবার ঠিক পরেই কৌরবগণ তাঁহাদের সন্ধান পাইল।

এইবার যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এক দূত পাঠাইলেন। দূত ধৃতরাষ্ট্রসমীপে যাইয়া যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন যে, তাঁহারা ধর্মতঃ ও ন্যায়তঃ অর্ধরাজ্যের অধিকারী; অতএব তাঁহাদিগকে যেন এক্ষণে অর্ধরাজ্য প্রদান করা হয়। কিন্তু দুর্যোধন পাণ্ডবগণের প্রতি অতিশয় দ্বেষ পোষণ করিত, সুতরাং সে কিছুতেই পাণ্ডবগণের এই ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনায় সম্মত হইল না। পাণ্ডবেরা রাজ্যের অতি অল্পাংশ একটি প্রদেশ, এমন কি

পাঁচখানি গ্রাম পাইলেই সন্তুষ্ট হইবেন, বলিলেন। কিন্তু উদ্ধতস্বভাব দুর্যোধন বলিল যে, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও পাণ্ডবগণকে দেওয়া হইবে না। ধৃতরাষ্ট্র সন্ধি করিবার জন্য দুর্যোধনকে অনেক বুঝাইলেন। কৃষ্ণও কৌরবসভায় গিয়া এই আসন্ন যুদ্ধ ও জ্ঞাতিক্ষয় যাহাতে না হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরাদি কৌরবরাজসভার বৃদ্ধগণ দুর্যোধনকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু সন্ধির চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। সুতরাং উভয় পক্ষেই যুদ্ধের উদ্যোগ চলিতে লাগিল এবং ভারতের সকল ক্ষত্রিয়ই এই যুদ্ধে যোগদান করিলেন।

এই যুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের প্রাচীন প্রথা ও নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হইয়াছিল। একদিকে যুধিষ্ঠির, অপর দিকে দুর্যোধন—উভয়েই নিজ নিজ পক্ষে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ভারতের সকল রাজগণের নিকট দূত পাঠাইতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, যাঁহার অনুরোধ প্রথমে পৌঁছিবে, ধার্মিক ক্ষত্রিয়কে তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। এইরূপে বিভিন্ন রাজা ও যোদ্ধবর্গ অনুরোধের পৌর্বাপর্য অনুসারে পাণ্ডব ও কৌরবগণের পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য সমবেত হইতে লাগিলেন। পিতা এক পক্ষে, পুত্র হয়তো অপর পক্ষে যোগ দিলেন। এক ভ্রাতা এক পক্ষে, অপর ভ্রাতা হয়তো অপর পক্ষে যোগ দিলেন। তখনকার সমরনীতি বড়ই অদ্ভুত ছিল। সারাদিন যুদ্ধের পর সন্ধ্যা হইলে যখন যুদ্ধ শেষ হইত, তখন উভয় পক্ষের মধ্যে আর শত্রুভাব থাকিত না, এমন কি এক পক্ষ অপর পক্ষের শিবিরে পর্যন্ত যাতায়াত করিত। প্রাতঃকাল হইলেই কিন্তু তাহারা আবার পরস্পর যুদ্ধ করিত। মুসলমানগণের ভারত-আক্রমণের সময় পর্যন্ত হিন্দুগণ নিজেদের এই চরিত্রগত বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। আবার সেই প্রাচীনকালে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, অশ্বারোহী পদাতিককে আঘাত করিতে পারিবে না, বিষাক্ত অস্ত্রের দ্বারা কেহ কখনও যুদ্ধ করিতে পারিবে না, নিজের যে সুবিধাগুলি আছে, শত্রুরও ঠিক সেইগুলি না থাকিলে তাহাকে কখন পরাজিত করিতে পারিবে না, কোন প্রকার ছল প্রয়োগ করিতে পারিবে না। মোট কথা কোন প্রকারে শত্রুর কোন ছিদ্র থাকিলে তাহার অবৈধ সুযোগ লইয়া তাহাকে বশীভূত করিতে পারিবে না, ইত্যাদি। যদি কেহ এই সকল যুদ্ধনীতি উল্লঙ্ঘন করিতেন, তবে

তিনি ঘোর অপযশের ভাগী হইতেন, তাঁহার সজ্জন-সমাজে মুখ দেখাইবার জো থাকিত না। তখনকার ক্ষত্রিয়গণ এইরূপ শিক্ষা পাইতেন। যখন মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতের উপর বহিরাক্রমণের তরঙ্গ আসিল, তখনও হিন্দুরা তাঁহাদের আক্রমণকারীদের প্রতি সেই শিক্ষানুযায়ী ব্যবহার করিয়াছিলেন। হিন্দুরা তাঁহাদিগকে বারবার পরাজিত করিয়াছিলেন এবং প্রতিবারই পরাজয়ের পর উপহারাদি দিয়া তাঁহাদিগকে সম্মানের সহিত গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের শাস্ত্রের বিধিই এই ছিল যে, অপরের দেশ কখন বলপূর্বক অধিকার করিবে না, আর কেহ পরাস্ত হইলে তাঁহার পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে দেশে পাঠাইয়া দিতে হইবে। মুসলমানবিজেতৃগণ কিন্তু হিন্দুরাজগণের উপর অন্য প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা একবার তাঁহাদিগকে হাতে পাইলে বিনা বিচারে তাঁহাদের প্রাণনাশ করিতেন।

এই যুদ্ধপ্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। মহাভারত বলিতেছেন, যে সময়ে এই যুদ্ধব্যাপার সংঘটিত হয়, তখন কেবল যে সাধারণ ধনুর্বাণ লইয়া যুদ্ধ হইত, তাহা নহে ; তখন দৈবাস্ত্রের ব্যবহারও ছিল। এই দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইলে মন্ত্রশক্তি, চিত্তের একাগ্রতা প্রভৃতির বিশেষ প্রয়োজন হইত। এইরূপ দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া এক ব্যক্তিই দশলক্ষ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে ও ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে পারিতেন। এই মন্ত্রশক্তির প্রয়োগ করিয়া এক বাণ নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে সহস্র সহস্র বাণবৃষ্টি হইবে—এই মন্ত্রশক্তিবলে, দৈবশক্তিবলে চারিদিকে বজ্রপাত হইবে, যে-কোন জিনিস দগ্ধ করিতে পারা যাইবে, নানা অদ্ভুত ইন্দ্রজালের সৃষ্টি হইবে। রামায়ণ ও মহাভারত—উভয় মহাকাব্যের মধ্যে একটি বিশেষ বিষয় দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়, এইসব অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কামানের ব্যবহারও দেখিতে পাই। কামান খুব প্রাচীন জিনিস। চীনা ও হিন্দুরা উভয়ে উহার ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের নগরসমূহের প্রাচীরে লৌহনির্মিত শূন্যগর্ভ নলনির্মিত শত শত অদ্ভুত অস্ত্র থাকিত। লোকে বিশ্বাস করিত, চীনারা ইন্দ্রজালবিদ্যাদ্বারা শয়তানকে এক শূন্যগর্ভ লৌহনালীর ভিতর প্রবেশ করাইত, আর একটি গর্তে একটু অগ্নিসংযোগ করিলেই শয়তান ভয়ঙ্কর শব্দে উহা হইতে বাহির হইয়া অসংখ্য লোকের বিনাশ সাধন করিত।

যাহা হউক, পূর্বোক্ত প্রকারে দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া এক জনের যেমন লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিবার কথা পাঠ করা যায়, সেইরূপ তাঁহাদের যুদ্ধের জন্য নানাবিধ কৌশল-অবলম্বন, ব্যূহ-রচনা, বিভিন্ন প্রকার সৈন্যবিভাগ প্রভৃতির বিষয়ও পাঠ করা যায়। চারিপ্রকার যোদ্ধার কথা মহাভারতাদিতে বর্ণিত আছে—পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তী ও রথ। ইহার মধ্যে আধুনিক যুদ্ধে শেষ দুইটির ব্যবহার নাই। কিন্তু সে-সময়ে উহাদের বিশেষ প্রচলন ছিল। শত সহস্র হস্তী, তাহাদের আরোহীর সহিত লৌহবর্মাদিতে বিশেষভাবে রক্ষিত হইয়া সৈন্যশ্রেণীরূপে গঠিত হইত—এই হস্তিসৈন্যকে শত্রুসৈন্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তারপর অবশ্য রথের খুব প্রচলন ছিল। আপনারা সকলেই প্রাচীন রথের ছবি দেখিয়াছেন। সকল দেশেই প্রাচীনকালে এই রথের ব্যবহার ছিল।

কৌরব-পাণ্ডব উভয় পক্ষই, কৃষ্ণ যাহাতে তাঁহাদের পক্ষে আসিয়া যোগ দেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সম্মত হইলেন না। তবে তিনি অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিলেন এবং যুদ্ধকালে পাণ্ডবগণকে পরামর্শ দিতে রাজী হইলেন, আর দুর্যোধনকে নিজ অজেয় নারায়ণী সেনা প্রদান করিলেন।

এইবার কুরুক্ষেত্রের সুবৃহৎ ভূভাগে অষ্টাদশ-দিবসব্যাপী মহাযুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধনের ভ্রাতৃগণ, উভয় পক্ষেরই আত্মীয়-স্বজনগণ এবং অন্যান্য সহস্র সহস্র বীর নিহত হইলেন। এমন কি, উভয় পক্ষের মিলিত যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল, যুদ্ধাবসানে তাহার অতি অল্পই অবশিষ্ট রহিল। দুর্যোধনের মৃত্যুর পর যুদ্ধের অবসান হইল; পাণ্ডবরা জয়লাভ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারী এবং অন্যান্য নারীগণ পতিপুত্রাদির শোকে অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, অবশেষে সকলে কিছু পরিমাণে শান্ত হইলে মৃত বীরগণের যথোচিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

এই যুদ্ধের প্রধানতম ঘটনা অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ, যাহা 'ভগবদ্-গীতা' নামক অপূর্ব ও অমর কাব্যরূপে জগতে পরিচিত। ভারতে ইহাই সর্বজনপরিচিত ও সর্বজনপ্রিয় শাস্ত্র, আর ইহাতে যে উপদেশ আছে, তাহা শ্রেষ্ঠ উপদেশ। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে কৃষ্ণার্জুনের যে কথোপকথন

হয়, তাহাই 'ভগবদ্‌গীতা' নামে পরিচিত। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা ঐ গ্রন্থ পড়েন নাই, তাঁহাদিগকে আমি উহা পড়িতে পরামর্শ দিই। ঐ গ্রন্থ আপনাদের দেশের উপরও কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা যদি আপনারা জানিতেন, তবে এতদিন উহা না পড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। এমার্সন যে উচ্চ তত্ত্বের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল যদি জানিতে চান, তবে শুনুন—তাহা এই গীতা। তিনি একবার ইংলণ্ডে কার্লাইলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, কার্লাইল তাঁহাকে একখানি গীতা উপহার দেন—কংকর্ডে[১] যে উদার দার্শনিক তত্ত্বের আন্দোলন আরম্ভ হয়, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিই তাহার মূল। আমেরিকায় উদার ভাবের যত প্রকার আন্দোলন দেখিতে পাওয়া যায়, কোন না কোনরূপে সেগুলি ঐ কংকর্ড-আন্দোলনের নিকট ঋণী।

গীতার মূল বক্তা কৃষ্ণ। আপনারা যেমন ন্যাজারেথবাসী যীশুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া উপাসনা করেন, হিন্দুরা তেমনি ঈশ্বরের অনেক অবতারের পূজা করিয়া থাকেন। জগতের প্রয়োজন অনুসারে ধর্মের রক্ষা ও অধর্মের বিনাশের জন্য সময়ে সময়ে সমাগত অনেক অবতারে তাঁহারা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ভারতের প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায় এক এক অবতারের উপাসক। কৃষ্ণের উপাসক একটি সম্প্রদায়ও আছে। অন্যান্য অবতারের উপাসক অপেক্ষা বোধ হয় ভারতে কৃষ্ণোপাসকের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক। কৃষ্ণভক্তগণ বলেন, কৃষ্ণই অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন, বুদ্ধ ও অন্যান্য অবতারের কথা ভাবিয়া দেখ: তাঁহারা সন্ন্যাসী ছিলেন, সুতরাং গৃহীদের সুখে দুঃখে তাঁহাদের সহানুভূতি ছিল না; কি করিয়াই বা থাকিবে? কিন্তু কৃষ্ণের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখ: তিনি কি পুত্ররূপে, কি পিতারূপে, কি রাজারূপে সর্ব অবস্থাতেই আদর্শ চরিত্র দেখাইয়াছেন, আর তিনি যে অপূর্ব উপদেশ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সমগ্র জীবনে নিজে তাহা আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:

১ Concord—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের (U.S.A.) পূর্বাঞ্চলে একটি শহর। এখানেই এমার্সন তাঁহার জীবনের শেষ ৪৮ বৎসর অতিবাহিত করেন।

যিনি প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে থাকিয়াও মধুর শান্তি লাভ করেন, আবার গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যেও মহাকর্মশীল, তিনিই জীবনের যথার্থ রহস্য বুঝিয়াছেন।[১]

ইহা কিরূপে কার্যে পরিণত হইতে পারে, কৃষ্ণ তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন—ইহার উপায় অনাসক্তি। সব কাজ কর, কিন্তু কোন কিছুর সহিত নিজকে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত করিও না। তুমি সর্বদাই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সাক্ষিস্বরূপ আত্মা। কর্ম আমাদের দুঃখের কারণ নহে, আসক্তিই দুঃখের কারণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ অর্থের কথা ধরুন, ধনবান হওয়া খুব ভাল কথা। কৃষ্ণের উপদেশ এই—অর্থ উপার্জন কর, টাকার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর, কিন্তু উহার প্রতি আসক্ত হইও না। পতিপত্নী, পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজন, মানযশ সকলের সম্বন্ধেই এই কথা। ইহাদিগকে ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল এইটুকু লক্ষ্য রাখিবেন যে, ইহাদের প্রতি যেন আসক্ত হইয়া না পড়েন। আসক্তি বা অনুরাগের পাত্র কেবল একজন—স্বয়ং প্রভু ভগবান, আর কেহ নহে। আত্মীয়স্বজনদের জন্য কার্য করুন, তাহাদিগকে ভালবাসুন, তাহাদের ভাল করুন, যদি প্রয়োজন হয় তাহাদের জন্য শত শত জীবন উৎসর্গ করুন, কিন্তু কখনও তাহাদের প্রতি আসক্ত হইবেন না। শ্রীকৃষ্ণের নিজের জীবন উক্ত উপদেশের যথার্থ উদাহরণস্বরূপ ছিল।

স্মরণ রাখিবেন—যে গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত বর্ণিত আছে, তাহা বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন, আর তাঁহার জীবনের কতক অংশ প্রায় ন্যাজারেথবাসী যীশুর মতো। কৃষ্ণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কংস নামে একজন অত্যাচারী রাজা ছিল। আর কংস দৈববাণী-শ্রবণে অবগত হইয়াছিল যে, শীঘ্রই তাহার নিধনকর্তা জন্মগ্রহণ করিবেন। ইহা শুনিয়া সে নিজ অনুচরবর্গকে সকল পুরুষ-শিশু হত্যা করিবার আদেশ দিল। কৃষ্ণের পিতামাতাও কংসকর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন—সেই কারাগারেই কৃষ্ণের জন্ম হয়। কৃষ্ণের জন্মগ্রহণমাত্র সমুদয় কারাগার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নবজাত শিশু বলিয়া উঠিল, 'আমিই সমগ্র জীব-জগতের জ্যোতিঃস্বরূপ, জগতের কল্যাণের জন্য জন্মগ্রহণ

---

১ কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥ গীতা ৪।১৮

করিয়াছি।' আবার কৃষ্ণকে রূপকচ্ছলে ব্রজগোপাল বলা হইয়াছে, তাঁহার একটি নাম 'রাখালরাজ'। সাক্ষাৎ ভগবান নরকলেবর পরিগ্রহ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া ঋষিরা তাঁহার পূজার জন্য উপস্থিত হইলেন। উভয়ের জীবনলীলার অন্যান্য অংশে আর কোন সাদৃশ্য নাই।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ এই অত্যাচারী কংসকে পরাভূত করিলেন বটে, কিন্তু তিনি কখন স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিবার কল্পনাও করেন নাই। তিনি কর্তব্য বলিয়াই ঐ কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন; উহার ফলাফল লইয়া বা উহাতে নিজের কি স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে—এই বিষয়ে তাঁহার মনে কোন চিন্তা উঠে নাই।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অবসানে মহারথী বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম—যিনি আঠার দিনের মধ্যে দশ দিন যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুর অপেক্ষায় শরশয্যায় শয়ান ছিলেন—যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, দানধর্ম, বিবাহবিধি প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণের উপদেশ অবলম্বন করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট সাংখ্য ও যোগতত্ত্ব এবং ঋষি দেবতা ও প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা ও কিংবদন্তী বিবৃত করিলেন। মহাভারতের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ভীষ্মের এই উপদেশে পূর্ণ; ইহা হিন্দুগণের ধর্মসম্বন্ধীয় বিবিধ বিধান, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতির অক্ষয় ভাণ্ডারস্বরূপ। ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠিরের রাজপদে অভিষেকক্রিয়া সমাপ্ত হইল। কিন্তু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ভয়ঙ্কর রক্তপাতে এবং আত্মীয়স্বজন ও কুলবৃদ্ধগণের নিধনে তাঁহার হৃদয় গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইল। এক্ষণে ব্যাসের উপদেশানুসারে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন।

যুদ্ধাবসানে পঞ্চদশ বর্ষ যাবৎ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির ও তদীয় ভ্রাতৃগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া সসম্মানে নিরুদ্বেগে অতিবাহিত করিলেন। পরে সেই বৃদ্ধ ভূপতি যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যের সমুদয় ভার অর্পণ করিয়া নিজ পতিব্রতা মহিষী ও পাণ্ডবগণের মাতা কুন্তীর সহিত শেষ জীবনে তপস্যার জন্য অরণ্যে প্রস্থান করিলেন।

সিংহাসনে আরোহণের পর ছত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হইলে একদিন সংবাদ আসিল—পাণ্ডবদের পরম সুহৃৎ, পরম আত্মীয়, আচার্য, পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ এই মর্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। অর্জুন অনতিবিলম্বে

দ্বারকায় গমন ও তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পূর্বশ্রুত শোকসংবাদই সমর্থন করিলেন। শুধু কৃষ্ণ কেন, যাদবগণের প্রায় কেহই জীবিত ছিলেন না। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য ভ্রাতৃগণ শোকে মুহ্যমান হইয়া ভাবিলেন, আর কেন—আমাদেরও যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই ভাবিয়া তাঁহারা রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসাইয়া মহাপ্রস্থানের জন্য হিমালয়ে গমন করিলেন। মহাপ্রস্থান এক প্রকার সন্ন্যাসবিশেষ। প্রাচীনকালে ভারতে রাজগণও অন্যান্য সকলের ন্যায় বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাসী হইতেন। জীবনের সকল মায়া কাটাইয়া পানাহারবর্জিত অবস্থায় যে পর্যন্ত না দেহপাত হয়, সে পর্যন্ত কেবল ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে হিমালয়ের দিকে চলিতে হয়; এইরূপে চলিতে চলিতে দেহত্যাগ হইয়া থাকে।

তারপর দেবগণ ও ঋষিগণ আসিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন যে, তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে যাইতে হইবে। স্বর্গে যাইতে হইলে হিমালয়ের উচ্চতম চূড়া-সমূহ পার হইয়া যাইতে হয়। হিমালয়ের পরপারে সুমেরু পর্বত। সুমেরু পর্বতের চূড়ায় স্বর্গলোক। সেখানে দেবগণ বাস করেন। কেহ কখনও সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন নাই। দেবগণ যুধিষ্ঠিরকে এই স্বর্গে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন।

সুতরাং পঞ্চপাণ্ডব ও তাঁহাদের সহধর্মিণী দ্রৌপদী স্বর্গগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বল্কল পরিধান করিয়া যাত্রা করিলেন। পথে একটি কুকুর তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। ক্রমে উত্তরাভিমুখে চলিতে চলিতে তাঁহারা হিমালয়ে উপনীত হইলেন ও ক্লান্তপদে হিমালয়ের চূড়ার পর চূড়া লঙ্ঘন করিতে করিতে অবশেষে সম্মুখে সুবিশাল সুমেরু গিরি দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা নিস্তব্ধভাবে বরফের উপর দিয়া চলিতেছেন, এমন সময়ে দ্রৌপদী হঠাৎ অবসন্নদেহে পড়িয়া গেলেন, আর উঠিলেন না। সকলের অগ্রগামী যুধিষ্ঠিরকে ভীম বলিলেন, 'রাজন্, দেখুন, দেখুন রাজ্ঞী দ্রৌপদী ভূমিতলে পতিতা হইয়াছেন।' যুধিষ্ঠিরের চক্ষু দিয়া শোকাশ্রু ঝরিল, কিন্তু তিনি ফিরিয়া দেখিলেন না, কেবল বলিলেন, 'আমরা কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি, এখন আর পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিবার সময় নাই। চল, অগ্রসর হও।' কিয়ৎক্ষণ পরে ভীম আবার বলিয়া উঠিলেন, 'দেখুন,

দেখুন, আমাদের ভ্রাতা সহদেব পড়িল।' রাজার শোকাশ্রু ঝরিল, কিন্তু তিনি থামিলেন না। কেবল বলিলেন, 'চল, চল, অগ্রসর হও।'

সহদেবের পতনের পর এই অতিরিক্ত শীত ও হিমানীতে নকুল, অর্জুন ও ভীম একে একে পড়িলেন, কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির তখন একাকী হইলেও অবিচলিতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পশ্চাতে একবার ফিরিয়া দেখিলেন, যে কুকুরটি তাঁহাদের সঙ্গ লইয়াছিল, সে তখনও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ঐ কুকুরের সহিত হিমানীস্তূপের মধ্য দিয়া অনেক পর্বত উপত্যকা অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ উচ্চে আরোহণ করিতে লাগিলেন এবং এইরূপে অবশেষে সুমেরু পর্বতে উপনীত হইলেন। তখন স্বর্গের দুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল, দেবগণ এই ধার্মিক রাজার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এইবার ইন্দ্র দেবরথে আরোহণ করিয়া সেখানে অবতীর্ণ হইলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে রাজন্, তুমি মর্ত্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ একমাত্র তোমাকেই সশরীরে স্বর্গারোহণের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।' কিন্তু যুধিষ্ঠির ইন্দ্রকে বলিলেন, 'আমি আমার একান্ত অনুগত ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রৌপদীকে না লইয়া স্বর্গে গমন করিতে প্রস্তুত নহি।' তখন ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, 'তাঁহারা পূর্বেই স্বর্গে গিয়াছেন।'

এখন যুধিষ্ঠির তাঁহার পশ্চাতে ফিরিয়া তাঁহার অনুসরণকারী সেই কুকুরটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বৎস, এস, রথে আরোহণ কর।' ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া কহিলেন, 'রাজন্, আপনি এ কি বলিতেছেন! কুকুর রথে আরোহণ করিবে! এই অশুচি কুকুরটাকে আপনি ত্যাগ করুন। কুকুর কখনও স্বর্গে যায় না। আপনার মনের ভাব কি? আপনি কি পাগল হইয়াছেন? মনুষ্যগণের মধ্যে আপনি ধার্মিকশ্রেষ্ঠ, আপনিই কেবল সশরীরে স্বর্গগমনের অধিকারী।' তখন রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'হে ইন্দ্র, হে দেবরাজ, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সকলই সত্য; কিন্তু এই কুকুরটি হিমানীস্তূপ-লঙ্ঘনের সময় প্রভুভক্ত ভৃত্যের মতো বরাবর আমার সঙ্গে আসিয়াছে, একবারও আমার সঙ্গ ত্যাগ করে নাই। আমার ভ্রাতৃগণ একে একে দেহত্যাগ করিল, মহিষীরও প্রাণ গেল—সকলেই একে একে আমায় ত্যাগ করিল, কেবল এই কুকুরটিই আমায় ত্যাগ করে নাই। আমি এখন

উহাকে কিরূপে ত্যাগ করিতে পারি?' ইন্দ্র বলিলেন, 'কুকুরসঙ্গী মানুষের স্বর্গলোকে স্থান নাই। অতএব কুকুরটিকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে, ইহাতে আপনার কোন অধর্ম হইবে না।' যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'কুকুরটি আমার সঙ্গে যাইতে না পাইলে আমি স্বর্গে যাইতে চাহি না। যতক্ষণ দেহে জীবন থাকিবে, ততক্ষণ আমি শরণাগতকে কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি জীবন থাকিতে স্বর্গসুখ-সম্ভোগের জন্য অথবা দেবতার অনুরোধেও ধর্মপথ কখন পরিত্যাগ করিব না।' তখন ইন্দ্র বলিলেন, 'রাজন্, আপনার শরণাগত কুকুরটি স্বর্গে গমন করে, ইহাই যদি আপনার একান্ত অভিপ্রেত হয়, তবে আপনি এক কাজ করুন। আপনি মর্ত্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক, আর ওই কুকুর অশুচি—প্রাণিহত্যাকারী, জীবমাংসভোজী, হিংসাবৃত্তিপরায়ণ; কুকুরটা পাপী, আপনি পুণ্যাত্মা। আপনি পুণ্যবলে যে স্বর্গলোক অর্জন করিয়াছেন, তাহা এই কুকুরের সহিত বিনিময় করিতে পারেন।' রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আমি ইহাতে সম্মত আছি। কুকুর আমার সমুদয় পুণ্য লইয়া স্বর্গে গমন করুক।'

যুধিষ্ঠির এই বাক্য বলিবামাত্র যেন পট-পরিবর্তন হইল। যুধিষ্ঠির দেখিলেন, সেখানে কুকুর নাই, তাহার স্থানে সাক্ষাৎ ধর্মরাজ যম বর্তমান। তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রাজন্, আমি সাক্ষাৎ ধর্মরাজ, আপনার ধর্ম পরীক্ষার জন্য কুকুররূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলাম। আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। একটা সামান্য কুকুরকে নিজের পুণ্যার্জিত স্বর্গ প্রদান করিয়া স্বয়ং তাহার জন্য নরকে গমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, আপনার মতো নিঃস্বার্থ ব্যক্তি এ পর্যন্ত ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে নাই। হে মহারাজ, আপনার জন্ম দ্বারা পৃথিবী ধন্য হইয়াছে। সর্বপ্রাণীর প্রতি আপনার গভীর অনুকম্পা—এইমাত্র তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইলাম। অতএব আপনি অক্ষয় সুখকর লোকসমূহ লাভ করুন। হে রাজন্, আপনি নিজধর্মবলে ঐ সকল লোক অর্জন করিয়াছেন, আপনার দিব্য পরমপদ লাভ হইবে।'

তখন যুধিষ্ঠির স্বর্গীয় বিমানে আরোহণ করিয়া ইন্দ্র ধর্ম ও অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে স্বর্গে গমন করিলেন। সেখানে আবার প্রথমে তাঁহার আরও কিছু পরীক্ষা হইল, পরে স্বর্গস্থ মন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া

তিনি দিব্যদেহ লাভ করিলেন। অবশেষে অমর দেবদেহপ্রাপ্ত ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তখন সকল দুঃখের অবসান হইল, তাঁহারা সকলে আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন।

এইরূপে মহাভারত উচ্চভাবদ্যোতক কবিতায় 'ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়' বর্ণনা করিয়া এইখানেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

উপসংহারে বলি, আপনাদের নিকট মহাভারতের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণমাত্র দিলাম। কিন্তু মহাপ্রতিভাবান্ ও মনীষাসম্পন্ন মহর্ষি বেদব্যাস ইহাতে যে অসংখ্য মহাপুরুষের উন্নত ও মহিমময় চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহার সামান্য পরিচয়ও দিতে পারিলাম না। ধর্মভীরু অথচ দুর্বলচিত্ত বৃদ্ধ অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মনে একদিকে ধর্ম ও ন্যায়, অপরদিকে পুত্রবাৎসল্যের অন্তর্দ্বন্দ্ব, পিতামহ ভীষ্মের মহৎ চরিত্র, রাজা যুধিষ্ঠিরের মহান্ ধর্মভাব, অপর চারি পাণ্ডবের উন্নত চরিত্র, যাহাতে একদিকে মহাশৌর্যবীর্য অপর দিকে সর্বাবস্থায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি অগাধ ভক্তি ও অপূর্ব আজ্ঞাবহতার সমাবেশ; মানবীয় অনুভূতির পরাকাষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় চরিত্র, এবং তপস্বিনী রাজ্ঞী গান্ধারী, পাণ্ডবগণের স্নেহময়ী জননী কুন্তী, সদা ভক্তিপরায়ণা ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি দ্রৌপদী প্রভৃতি নারীদের চরিত্র—যাহা পুরুষগণের চরিত্রের তুলনায় কোন অংশে কম উজ্জ্বল নহে,—এই কাব্যের এই সকল এবং অন্যান্য শত শত চরিত্র এবং রামায়ণের চরিত্রসমূহ বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়া সমগ্র হিন্দুজগতের সযত্নে রক্ষিত জাতীয় সম্পত্তি, এবং তাঁহাদের ভাবধারা ও চরিত্রনীতির ভিত্তিরূপে বর্তমান রহিয়াছে। বাস্তবিক এই রামায়ণ ও মহাভারত প্রাচীন আর্যগণের জীবনচরিত ও জ্ঞানরাশির সুবৃহৎ বিশ্বকোষ। ইহাতে সভ্যতার যে আদর্শ চিত্রিত হইয়াছে, তাহা লাভ করিবার জন্য সমগ্র মানব-জাতিকে এখনও বহুকাল ধরিয়া চেষ্টা করিতে হইবে।

জড়ভরতের উপাখ্যান

(ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

প্রাচীনকালে ভরত নামে এক প্রবলপ্রতাপ সম্রাট ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন। বৈদেশিকগণ যাহাকে 'ইণ্ডিয়া' নামে অভিহিত করেন, তাহা ঐ দেশের অধিবাসিগণের নিকট 'ভারতবর্ষ' নামে পরিচিত। শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে বৃদ্ধ হইলে সকল আর্য-সন্তানকেই সে-যুগে সংসার ছাড়িয়া, নিজ পুত্রের উপর সংসারের সমস্ত ভার ঐশ্বর্য ধন সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে হইত। সেখানে তাঁহাকে তাঁহার যথার্থ স্বরূপ—আত্মার চিন্তায় কালক্ষেপ করিতে হইত; এইরূপে তিনি সংসারের বন্ধন ছেদন করিতেন। রাজাই হউন, পুরোহিতই হউন, কৃষকই হউন, ভৃত্যই হউন, পুরুষই হউন বা নারীই হউন, এই কর্তব্য হইতে কেহই অব্যাহতি পাইত না। কারণ—পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি রূপে গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় কর্তব্যগুলি সেই এক চরম অবস্থায় পৌঁছিবার সোপান মাত্র, যে অবস্থায় মানুষের জড়বন্ধন চিরদিনের জন্য ছিন্ন হইয়া যায়।

রাজা ভরত বৃদ্ধ হইলে পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া বনে গমন করিলেন। এক সময়ে যিনি লক্ষ লক্ষ প্রজার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা ছিলেন, যিনি সুবর্ণরজতখচিত মর্মরপ্রাসাদে বাস করিতেন, যাঁহার পানপাত্র নানাবিধ-রত্নমণ্ডিত ছিল, তিনি হিমারণ্যের এক স্রোতস্বিনীতীরে কুশ ও তৃণদ্বারা স্বহস্তে এক ক্ষুদ্র কুটীর নির্মাণ করিয়া বন্য ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। মানবাত্মায় যিনি অন্তর্যামিরূপে নিত্যবর্তমান, সেই পরমাত্মার অহরহঃ স্মরণ-মননই তাঁহার একমাত্র কার্য হইল।

এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল। একদিন রাজর্ষি নদীতীরে বসিয়া উপাসনা করিতেছেন, এমন সময় এক হরিণী জল পান করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইল। ঠিক সেই সময়েই কিছুদূরে একটি সিংহ প্রবল গর্জন করিয়া উঠিল। হরিণী এত ভীতা হইল যে, পিপাসা দূর না করিয়াই নদী পার হইবার জন্য এক উচ্চ লম্ফ প্রদান করিল। আসন্নপ্রসবা হরিণী এইরূপে হঠাৎ ভয় পাওয়ায় এবং

লম্ফপ্রদানের অতিরিক্ত পরিশ্রমে তৎক্ষণাৎ একটি শাবক প্রসব করিয়াই প্রাণত্যাগ করিল। হরিণশাবকটি জন্মিয়াই জলে পড়িয়া গেল; নদীর খর স্রোত তাহাকে দ্রুত একদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় রাজার দৃষ্টি সেইদিকে নিপতিত হইল। রাজা নিজ আসন হইতে উঠিয়া হরিণ-শাবকটিকে জল হইতে উদ্ধার করিলেন, পরে নিজ কুটীরে লইয়া গিয়া অগ্নিসেকাদি শুশ্রূষা দ্বারা তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিলেন। করুণহৃদয় রাজর্ষি অতঃপর হরিণশিশুটির লালনপালনের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, প্রত্যহ তাহার জন্য সুকোমল তৃণ ও ফলমূলাদি স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। সংসারত্যাগী রাজর্ষির পিতৃসুলভ যত্নে হরিণশিশুটি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ক্রমে সে একটি সুন্দরকায় হরিণ হইয়া দাঁড়াইল। যে রাজা নিজের মনের বলে পরিবার রাজ্যসম্পদ অতুল বিভব ও ঐশ্বর্যের উপর চিরজীবনের মমতা কাটাইয়াছিলেন, তিনি এখন নদী হইতে বাঁচানো মৃগশিশুর উপর আসক্ত হইয়া পড়িলেন। হরিণের উপর তাঁহার স্নেহ যতই বর্ধিত হইতে লাগিল, ততই তিনি ঈশ্বরে চিত্তসমাধান করিতে অসমর্থ হইলেন। বনে চরিতে গিয়া যদি হরিণটির ফিরিতে বিলম্ব হইত, তাহা হইলে রাজর্ষির মন তাহার জন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হইত। তিনি ভাবিতেন—আহা, বুঝি আমার প্রিয় হরিণটিকে বাঘে আক্রমণ করিয়াছে, হয়তো বা তাহার অন্য কোনপ্রকার বিপদ হইয়াছে, তাহা না হইলে এত বিলম্ব হইতেছে কেন?

এইরূপে কয়েক বর্ষ কাটিয়া গেল। অবশেষে কালচক্রের পরিবর্তনে রাজর্ষির মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তাঁহার মন মৃত্যুকালেও আত্মতত্ত্বধ্যানে নিবিষ্ট না হইয়া হরিণটির চিন্তা করিতেছিল। নিজ প্রিয়তম মৃগটির কাতর নয়নের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার জীবাত্মা দেহত্যাগ করিল। মৃত্যুকালে হরিণ-ভাবনার ফলে পরজন্মে তাঁহার হরিণ-দেহ হইল। কিন্তু কোন কর্মই একেবারে ব্যর্থ হয় না। সুতরাং রাজর্ষি ভরত গৃহস্থাশ্রমে রাজারূপে এবং বানপ্রস্থাশ্রমে ঋষিরূপে যে-সকল মহৎ ও শুভ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহারও ফল ফলিল। যদিও তিনি বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া পশু-শরীরে বাস করিতেছিলেন, তথাপি তিনি জাতিস্মর হইলেন অর্থাৎ পূর্বজন্মের সকল কথাই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত

রহিল। তিনি নিজ সঙ্গিগণকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্বসংস্কারবশে ঋষিগণের আশ্রমের নিকট বিচরণ করিতে যাইতেন; সেখানে প্রত্যহ যাগ, হোম ও উপনিষদ আলোচনা হইত।

মৃগরূপী ভরত যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া পর জন্মে কোন ধনী ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ জন্মেও তিনি জাতিস্মর হইলেন, সুতরাং পূর্ববৃত্তান্ত সর্বদা স্মৃতিপথে জাগরূক থাকায়, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার এই দৃঢ় সঙ্কল্প হইল যে, তিনি আর সংসারের ভালমন্দে জড়িত হইবেন না। শিশুর ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিনি বেশ বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট হইলেন, কিন্তু কাহারও সহিত কোন বাক্যালাপ করিতেন না; পাছে সংসারজালে জড়িত হইয়া পড়েন—এই ভয়ে তিনি জড় ও উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মন সেই অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মে সর্বদা নিমগ্ন থাকিত, প্রারব্ধ কর্ম ভোগদ্বারা ক্ষয় করিবার জন্যই তিনি জীবনযাপন করিতেন। কালক্রমে পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ পিতৃ-সম্পত্তি আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন। তাঁহারা ঐ সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতাকে জড়প্রকৃতি ও অকর্মণ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া নিজেরাই তাহা গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ভ্রাতার প্রতি এইটুকু মাত্র অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহাকে দেহধারণের উপযোগী আহারমাত্র দিতেন। ভ্রাতৃজায়াগণ সর্বদাই তাঁহার প্রতি অতি কর্কশ ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে গুরুতর শ্রমসাধ্য কার্যে নিযুক্ত করিতেন; আর যদি তিনি তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ সকল কার্য করিতে না পারিতেন, তবে তাঁহারা তাঁহার সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার কিছুমাত্র বিরক্তি বা ভয় হইত না, তিনি একটি কথাও বলিতেন না। যখন অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া যাইত, তখন তিনি গৃহ হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইতেন, ও তাঁহাদের ক্রোধের উপশম না হওয়া পর্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৃক্ষমূলে বসিয়া থাকিতেন। তাঁহাদের রাগ পড়িয়া গেলে আবার শান্তভাবে গৃহে ফিরিতেন।

একদিন জড়ভরতের ভ্রাতৃবধূগণ তাঁহাকে অতিরিক্ত তাড়না করিলে তিনি গৃহের বাহিরে গিয়া এক বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সেই দেশের রাজা শিবিকারোহণে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ একজন শিবিকা-বাহক অসুস্থ হইয়া পড়িলে রাজার অনুচরবর্গ তাহার

স্থানে শিবিকাবাহন-কার্যের জন্য আর একজন লোক অন্বেষণ করিতে লাগিল; অনুসন্ধান করিতে করিতে জড়ভরতকে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট দেখিতে পাইল। তাঁহাকে সবল যুবাপুরুষ দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'রাজার এক শিবিকাবাহকের পীড়া হইয়াছে; তুমি তাহার পরিবর্তে রাজার শিবিকা বহন করিতে রাজী আছ?' ভরত তাহাদের প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। রাজার অনুচরগণ দেখিল এ ব্যক্তি বেশ হৃষ্টপুষ্ট; অতএব তাহারা তাঁহাকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া শিবিকাবাহনে নিযুক্ত করিল। ভরতও নীরবে শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজা দেখিলেন, শিবিকা বিষমভাবে চলিতেছে। শিবিকার বহির্দেশে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি নূতন বাহককে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মূর্খ, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর্, যদি তোর স্কন্ধে বেদনাবোধ হইয়া থাকে, তবে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর্।' তখন ভরত স্কন্ধ হইতে শিবিকা নামাইয়া জীবনে এই প্রথম মৌনভঙ্গ করিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন: হে রাজন্, কাহাকে আপনি মূর্খ বলিতেছেন? কাহাকে আপনি শিবিকা নামাইতে বলিতেছেন? কে ক্লান্ত হইয়াছে, বলিতেছেন? কাহাকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন? হে রাজন্, 'তুই' শব্দের দ্বারা যদি আপনি এই মাংসপিণ্ড—দেহটাকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে দেখুন, আপনার দেহও যেমন পঞ্চভূতনির্মিত, এই দেহও তেমনি। আর দেহটা তো অচেতন, জড়; ইহার কি কোন প্রকার ক্লান্তি বা কষ্ট থাকিতে পারে? যদি 'মন' আপনার লক্ষ্য হয়, তবে আপনার মন যেরূপ, আমারও তো তাহাই—উহা তো সর্বব্যাপী। আর যদি 'তুই' শব্দে দেহমনেরও অতীত বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তো ইহা সেই আত্মা—আমার যথার্থ স্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা আপনাতে যেমন, আমাতেও তেমনি; জগতের মধ্যে ইহা সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্ব। রাজন্, আপনি কি বলিতে চাহেন, আত্মা কখনও ক্লান্ত হইতে পারেন? আপনি কি বলিতে চাহেন, আত্মা কখনও আহত হইতে পারেন? হে রাজন্, অসহায় পথসঞ্চারী কীটগুলিকে পদদলিত করিবার ইচ্ছা আমার এই দেহটার ছিল না, তাই যাহাতে তাহারা পদদলিত না হয়, সেজন্য এইভাবে সাবধান হইয়া চলাতেই শিবিকার গতি বিষম হইয়াছিল। কিন্তু আত্মা তো কখন ক্লান্তি অনুভব করে না, দুর্বলতা বোধ করে না;

কারণ আত্মা সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্। এইরূপে তিনি আত্মার স্বরূপ, পরাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়-সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় অনেক উপদেশ দিলেন।

রাজা পূর্বে বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য গর্বিত ছিলেন, তাঁহার অভিমান চূর্ণ হইল। তিনি শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া, ভরতের চরণে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'হে মহাভাগ, আপনি যে একজন মহাপুরুষ, তাহা না জানিয়াই আপনাকে শিবিকাবাহন-কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সেজন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।' ভরত তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং পূর্ববৎ নিজের ভাবে নীরবে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। যখন ভরতের দেহপাত হইল, তিনি চিরদিনের জন্য জন্মমৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন।

প্রহ্লাদ-চরিত্র

(ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

হিরণ্যকশিপু দৈত্যগণের রাজা ছিলেন। দেব ও দৈত্য উভয়েই এক পিতা হইতে উৎপন্ন হইলেও সর্বদাই পরস্পর যুদ্ধ করিতেন। সচরাচর মানব-প্রদত্ত যজ্ঞভাগে অথবা পৃথিবীর শাসন- ও পরিচালন-ব্যাপারে দৈত্যগণের অধিকার ছিল না। কিন্তু কখন কখন তাঁহারা প্রবল হইয়া দেবগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহাদের সিংহাসন অধিকার করিতেন এবং কিছুকালের জন্য পৃথিবী শাসন করিতেন। তখন দেবগণ সমগ্র জগতের প্রভু সর্বব্যাপী বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিতেন, তিনিও তাঁহাদিগকে উক্ত বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। দৈত্যগণ পরাস্ত ও বিতাড়িত হইলে দেবগণ আবার স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতেন।

পূর্বোক্ত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু এইরূপে তাঁহার জ্ঞাতি দেবগণকে জয় করিয়া স্বর্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ত্রিভুবন অর্থাৎ মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুগণের বাসস্থান মর্ত্যলোক, দেব ও দেবতুল্য ব্যক্তিগণের দ্বারা অধ্যুষিত স্বর্গলোক এবং দৈত্যগণের বাসস্থান পাতাল শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু নিজেকেই সমগ্র জগতের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি ইহাও ঘোষণা করিলেন যে, তিনি ছাড়া আর কেহ ঈশ্বর নাই, আর চারিদিকে আদেশ প্রচার করিলেন যে, কোন স্থানে কেহ যেন বিষ্ণুর উপাসনা না করে, এখন হইতে সমুদয় পূজা একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য।

হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনি শৈশবাবস্থা হইতে স্বভাবতই ভগবান বিষ্ণুর প্রতি অনুরক্ত। অতি শৈশবেই প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তির লক্ষণ দেখিয়া তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু ভাবিলেন, আমি সমগ্র জগৎ হইতে বিষ্ণুর উপাসনা যাহাতে উঠিয়া যায় তাহার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমার নিজগৃহেই যদি সেই উপাসনা প্রবেশ করে, তবে তো সর্বনাশ, অতএব প্রথম হইতেই সাবধান হওয়া কর্তব্য। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার পুত্র প্রহ্লাদকে ষণ্ড ও অমর্ক নামক দুইজন কঠোরশাসনক্ষম শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে আদেশ দিলেন যে, প্রহ্লাদ যেন বিষ্ণুর নাম

পর্যন্ত কখন শুনিতে না পায়। শিক্ষকদ্বয় সেই রাজপুত্রকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার সমবয়স্ক অন্যান্য বালকগণের সহিত রাখিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু শিশু প্রহ্লাদ তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষাগ্রহণে মনোযোগী না হইয়া সর্বদা অপর বালকগণকে বিষ্ণুর উপাসনাপ্রণালী শিখাইতে নিযুক্ত রহিলেন। শিক্ষকগণ এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া অতিশয় ভীত হইলেন। কারণ, তাঁহারা প্রবলপ্রতাপ রাজা হিরণ্যকশিপুকে অতিশয় ভয় করিতেন; অতএব তাঁহারা প্রহ্লাদকে ঐরূপ শিক্ষা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিষ্ণু-উপাসনা ও তদ্বিষয়ক উপদেশ-দান প্রহ্লাদের নিকট শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তিনি কিছুতেই উহা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা তখন নিজেদের দোষ-ক্ষালনের জন্য রাজার নিকট গিয়া এই ভয়ঙ্কর সমাচার নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার পুত্র যে কেবল নিজেই বিষ্ণুর উপাসনা করিতেছে তাহা নহে, অপর বালকগণকেও বিষ্ণুর উপাসনা শিক্ষা দিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে।

রাজা ষণ্ড ও অমর্কের নিকট পুত্র সম্বন্ধে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাকে নিজসমীপে আহ্বান করিলেন। প্রথমতঃ তিনি প্রহ্লাদকে মিষ্ট বাক্যে বুঝাইয়া বিষ্ণুর উপাসনা হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, 'দৈত্যরাজ আমিই এখন ত্রিভুবনের অধীশ্বর, অতএব আমিই একমাত্র উপাস্য', কিন্তু এই উপদেশে কোন ফল হইল না। বালক বার বার বলিতে লাগিলেন, 'সমগ্র জগতের অধীশ্বর সর্বব্যাপী বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য; আপনার রাজ্যপ্রাপ্তিও বিষ্ণুরই ইচ্ছাধীন; আর যতদিন বিষ্ণুর ইচ্ছা থাকিবে, ততদিনই আপনার রাজত্ব।' প্রহ্লাদের বাক্য শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রকে বধ করিবার জন্য নিজ অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন। আদেশ পাইয়াই দৈত্যগণ সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিল, কিন্তু প্রহ্লাদের মন বিষ্ণুতে এতদূর নিবিষ্ট ছিল যে, তিনি শস্ত্রাঘাতজনিত বেদনা কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারিলেন না।

প্রহ্লাদের পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু যখন দেখিলেন যে, শস্ত্রাঘাতেও প্রহ্লাদের কিছু হইল না, তখন তিনি ভীত হইলেন। কিন্তু আবার দৈত্য-জনোচিত অসৎ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া বালককে বিনাশ করিবার নানাবিধ

পৈশাচিক উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে তাহাকে হস্তিপদতলে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। উদ্দেশ্য—হস্তী তাহাকে পদতলে পিষিয়া বিনাশ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু যেমন লৌহপিণ্ডকে পিষিয়া ফেলা হস্তীর অসাধ্য, প্রহ্লাদের দেহও সেইরূপ হস্তিপদতলে পিষ্ট হইল না। সুতরাং প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার এই উপায় বিফল হইল।

পরে রাজা প্রহ্লাদকে এক উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূতলে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন, তাঁহার এই আদেশও যথাযথ প্রতিপালিত হইল। কিন্তু প্রহ্লাদের হৃদয়ে বিষ্ণু বাস করিতেন, সুতরাং পুষ্প যেমন ধীরে ধীরে তৃণের উপর পতিত হয়, প্রহ্লাদও তদ্রূপ অক্ষতদেহে ভূতলে পতিত হইলেন। প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার জন্য অতঃপর বিষপ্রয়োগ, অগ্নিসংযোগ, অনশনে রাখা, কূপে ফেলিয়া দেওয়া, অভিচার ও অন্যান্য নানাবিধ উপায়—একটির পর একটি অবলম্বিত হইল; কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। প্রহ্লাদের হৃদয়ে বিষ্ণু বাস করিতেন, সুতরাং কিছুই তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না।

অবশেষে রাজা আদেশ করিলেন, পাতাল হইতে নাগগণকে আহ্বান করিয়া সেই নাগপাশে প্রহ্লাদকে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রের নীচে ফেলিয়া দেওয়া হউক এবং তাহার উপর বড় বড় পাহাড় স্তূপাকার করিয়া দেওয়া হউক। এই অবস্থায় তাহাকে রাখা হউক, তাহা হইলে এখনই না হয় কিছুকাল পরে সে মরিয়া যাইবে। কিন্তু পিতার আদেশে এই অবস্থায় পতিত হইয়াও প্রহ্লাদ 'হে বিষ্ণো, হে জগৎপতে, হে সৌন্দর্যনিধে' ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার প্রিয়তম বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিষ্ণুর চিন্তা ও তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে তিনি ক্রমে অনুভব করিলেন, বিষ্ণু তাঁহার অতি নিকটে রহিয়াছেন; আরও চিন্তা করিতে করিতে অনুভব করিলেন, বিষ্ণু তাঁহার অন্তর্যামী। অবশেষে তাঁহার অনুভব হইল যে, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই সকল বস্তু এবং তিনিই সর্বত্র।

যেমন প্রহ্লাদের এইরূপ অনুভূতি হইল, অমনি তাঁহার নাগপাশ খুলিয়া গেল, তাঁহার উপর যে পর্বতরাশি চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা গুঁড়াইয়া গেল, তখন সমুদ্র স্ফীত হইয়া উঠিল ও তিনি ধীরে ধীরে তরঙ্গরাজির উপর উত্থিত হইয়া নিরাপদে সমুদ্রকূলে নীত হইলেন। তিনি যে একজন দৈত্য, তাঁহার যে একটা মর্ত্যদেহ আছে, প্রহ্লাদ তখন এ-কথা একেবারে ভুলিয়া

গিয়াছিলেন ; তিনি উপলব্ধি করিতেছিলেন যে, তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ—ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় শক্তি তাঁহা হইতেই নির্গত হইতেছে। জগতে এমন কিছু নাই—যাহা তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে, তিনিই সমগ্র জগতের—সমগ্র প্রকৃতির শাস্তাস্বরূপ। এই উপলব্ধি-বলে প্রহ্লাদ সমাধিজনিত অবিচ্ছিন্ন পরমানন্দে নিমগ্ন রহিলেন। বহুকাল পরে তাঁহার দেহজ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল, তিনি নিজেকে প্রহ্লাদ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। দেহ সম্বন্ধে আবার সচেতন হইয়াই তিনি দেখিতে লাগিলেন, ভগবান অন্তরে বাহিরে সর্বত্র রহিয়াছেন। তখন জগতের সকল বস্তুই তাঁহার বিষ্ণু বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

যখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু দেখিলেন যে, তাঁহার শত্রু ভগবান বিষ্ণুর পরমভক্ত নিজ পুত্র প্রহ্লাদের বিনাশের জন্য অবলম্বিত সকল উপায়ই বিফল হইল, তখন তিনি অত্যন্ত ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তখন দৈত্যরাজ পুনরায় পুত্রকে নিজ সন্নিধানে আনয়ন করাইলেন এবং নানাপ্রকার মিষ্টবাক্য বলিয়া তাঁহাকে আবার বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ পূর্বে পিতার নিকট যেরূপ উত্তর দিতেন, এখনও সেই একই উত্তর তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হইল। হিরণ্যকশিপু ভাবিলেন, শিক্ষা ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার শিশুজনোচিত এ-সব খেয়াল চলিয়া যাইবে। এইরূপ ভাবিয়া তিনি পুনরায় প্রহ্লাদকে ষণ্ডামর্কের হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে রাজধর্ম শিক্ষা দিতে অনুমতি করিলেন। ষণ্ডামর্কও প্রহ্লাদকে রাজধর্মসম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই উপদেশ প্রহ্লাদের ভাল লাগিত না, তিনি সুযোগ পাইলেই সহপাঠী বালকগণকে বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা দিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন।

যখন হিরণ্যকশিপুর নিকট এই সংবাদ পৌছিল যে, প্রহ্লাদ নিজ সহপাঠী দৈত্যবালকগণকেও বিষ্ণুভক্তি শিখাইতেছেন, তখন তিনি আবার ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং নিজ সমীপে ডাকাইয়া আনিয়া প্রহ্লাদকে মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইলেন এবং বিষ্ণুকে অকথ্য ভাষায় নিন্দা করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ তখনও দৃঢ়তার সহিত বলিতে লাগিলেন, 'বিষ্ণু সমগ্র জগতের অধীশ্বর, তিনি অনাদি, অনন্ত, সর্বশক্তিমান্ ও সর্বব্যাপী, এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য।' এই কথা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধে

তর্জন গর্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'রে দুষ্ট, যদি তোর বিষ্ণু সর্বব্যাপী হন, তবে তিনি এই স্তম্ভে নাই কেন?' প্রহ্লাদ বিনীতভাবে বলিলেন, 'হাঁ, অবশ্যই তিনি এই স্তম্ভে আছেন।' তখন হিরণ্যকশিপু বলিলেন, 'আচ্ছা, তাই যদি হয়, তবে আমি এই তোকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিতেছি, তোর বিষ্ণু তোকে রক্ষা করুক।' এই বলিয়া দৈত্যরাজ তরবারি-হস্তে প্রহ্লাদের দিকে বেগে অগ্রসর হইলেন এবং স্তম্ভের উপর প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেখানে বজ্রনির্ঘোষ শ্রুত হইল, নৃসিংহমূর্তি ধারণ করিয়া স্তম্ভমধ্য হইতে বিষ্ণু নির্গত হইলেন। সহসা এই ভীষণমূর্তি-দর্শনে চকিত ও ভীত হইয়া দৈত্যগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। হিরণ্যকশিপু তাঁহার সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া প্রাণপণ যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু অবশেষে ভগবান নৃসিংহ কর্তৃক পরাভূত ও নিহত হইলেন।

তখন স্বর্গ হইতে দেবগণ আসিয়া বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদও ভগবান নৃসিংহদেবের চরণে নিপতিত হইয়া পরম মনোহর স্তব করিলেন। তখন ভগবান প্রসন্ন হইয়া প্রহ্লাদকে বলিলেন, 'বৎস প্রহ্লাদ, তুমি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই আমার নিকট প্রার্থনা কর।' প্রহ্লাদ ভক্তিগদ্‌গদস্বরে বলিলেন, 'প্রভো, আমি আপনাকে দর্শন করিলাম, এক্ষণে আমার আর কি প্রার্থনীয় থাকিতে পারে? আপনি আর আমাকে ঐহিক বা পারত্রিক কোনরূপ ঐশ্বর্যের প্রলোভন দেখাইবেন না।' ভগবান পুনরায় বলিলেন, 'প্রহ্লাদ, তোমার নিষ্কাম ভক্তি দেখিয়া পরম প্রীত হইলাম। তথাপি আমার দর্শন বৃথা হয় না। অতএব আমার নিকট যে-কোন একটি বর প্রার্থনা কর।' তখন প্রহ্লাদ বলিলেন:

অজ্ঞানী ব্যক্তির ভোগ্য বিষয়ে যেরূপ তীব্র আসক্তি থাকে, তোমাকে স্মরণ করিবার সময় যেন সেইরূপ গভীর অনুরাগ আমার হৃদয় হইতে অপসৃত না হয়।[১]

তখন ভগবান বলিলেন, 'বৎস প্রহ্লাদ, যদিও আমার পরম ভক্তগণ ইহলোক বা পরলোকের কোনরূপ কাম্যবস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না, তথাপি

---

১ যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাহপসর্পতু ॥ বিষ্ণুপুরাণ, ১।২০।১৯

তুমি আমার আদেশে সর্বদা আমাতে মন রাখিয়া কল্পান্ত পর্যন্ত পৃথিবী ভোগ কর ও পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান কর। যথাসময়ে কল্পান্তে দেহপাত হইলে আমাকে লাভ করিবে।' এইরূপে প্রহ্লাদকে বর দিয়া ভগবান বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। তখন ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণ প্রহ্লাদকে দৈত্যদের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া স্ব-স্ব লোকে প্রস্থান করিলেন।

জগতের মহত্তম আচার্যগণ

(১৯০০ খ্রীঃ ৩রা ফেব্রুআরি প্যাসাডেনা সেক্সপীয়র সমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতা)

হিন্দুদের মতানুসারে এই জগৎ তরঙ্গায়িত চক্রাকারে চলিতেছে। তরঙ্গ একবার উঠিল, সর্বোচ্চ শিখরে পৌছিল, তারপর পড়িল, কিছুকালের জন্য যেন গহ্বরে পড়িয়া রহিল, আবার প্রবল তরঙ্গাকার ধারণ করিয়া উঠিবে। এইরূপে তরঙ্গের উত্থানের পর উত্থান ও পতনের পর পতন চলিতে থাকিবে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বা সমষ্টি-সম্বন্ধে যাহা সত্য, উহার প্রত্যেক অংশ বা ব্যষ্টি-সম্বন্ধেও তাহা সত্য। মনুষ্যসমাজের সকল ব্যাপার এইরূপে তরঙ্গগতিতেই চলিতে থাকে, বিভিন্ন জাতির ইতিহাসও এই সত্যেরই সাক্ষ্য দিয়া থাকে। বিভিন্ন জাতিসমূহ উঠিতেছে আবার পড়িতেছে, উত্থানের পর পতন হইতেছে ; ঐ পতনের পর আবার পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তিতে পুনরুত্থান হইয়া থাকে। এইরূপ তরঙ্গগতি সর্বদা চলিতেছে। ধর্মজগতেও এইরূপ গতি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক জাতির আধ্যাত্মিক জীবনে এইরূপ উত্থান-পতন ঘটিয়া থাকে। জাতিবিশেষের অধঃপতন হইল, বোধ হইল যেন উহার জীবনীশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু ঐ অবস্থায় ঐ জাতি ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে, ক্রমে নববলে বলীয়ান্ হইয়া আবার প্রবল বেগে জাগিয়া উঠে, তখন এক মহাতরঙ্গের আবির্ভাব হয়। সময়ে সময়ে উহা মহাবন্যার আকার ধারণ করিয়া আসে, আর সর্বদাই দেখা যায়—ঐ তরঙ্গের শীর্ষে ঈশ্বরের বার্তাবহ একজন স্বীয় জ্যোতিতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। একদিকে তাঁহারই শক্তিতে সেই তরঙ্গের—সেই জাতির অভ্যুত্থান, অপর দিকে আবার যে-সকল শক্তি হইতে ঐ তরঙ্গের উদ্ভব, তিনি তাহাদেরই ফলস্বরূপ ; উভয়েই যেন পরস্পর পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করিতেছে। সুতরাং তাঁহাকে এক হিসাবে স্রষ্টা বা জনক, অন্য হিসাবে সৃষ্ট বা জন্য বলা যাইতে পারে। তিনি সমাজের উপর তাঁহার প্রবল শক্তি প্রয়োগ করেন, আবার সমাজই তাঁহার ঐরূপ হওয়ার কারণ। ইঁহারাই জগতের চিন্তানায়ক, প্রেরিতপুরুষ, জীবনের বার্তাবহ, ঈশ্বরাবতার।

খেতড়িতে স্বামীজী, ১৮৯১

মানুষের ধারণা, জগতে ধর্ম একটিমাত্র হওয়াই সম্ভব, ধর্মাচার্য বা ঈশ্বরাবতার একজনমাত্রই হইতে পারেন, কিন্তু এ ধারণা ঠিক নহে। মহাপুরুষগণের জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রত্যেকেই যেন একটি —কেবল একটি ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট; সুরগুলির সমন্বয়েই ঐকতানের সৃষ্টি, কেবল একটি সুরে নহে। বিভিন্ন জাতির জীবন আলোচনা করিলেও দেখা যায়, কোন জাতিই কখন সমগ্র জগৎ ভোগ করিবার অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। কোন জাতিই সাহস করিয়া বলিতে পারে না যে, আমরাই কেবল সমগ্র জগতের—সমগ্র ভোগের অধিকারী হইয়া জন্মিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে বিধাতৃনির্দিষ্ট এই জাতিসমূহের ঐকতানে প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ ভূমিকা অভিনয় করিতে আসিয়াছে। প্রত্যেক জাতিকেই তাহার ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়, কর্তব্য পালন করিতে হয়। এই সমুদয়ের সমষ্টিই মহা সমন্বয়—মহা ঐকতানস্বরূপ।

জাতিসম্বন্ধে যাহা বলা হইল, এই সকল মহাপুরুষ সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। ইঁহাদের মধ্যে কেহই চিরকালের জন্য সমগ্র জগতে আধিপত্য বিস্তার করিতে আসেন নাই। এ পর্যন্ত কেহই কৃতকার্য হন নাই, ভবিষ্যতেও হইবেন না। মানবজাতির সমগ্র শিক্ষায় প্রত্যেকেরই দান একটি অংশ মাত্র। সুতরাং ইহা সত্য যে, কালে প্রত্যেক মহাপুরুষ জগতের ভাগ্যবিধাতা হইবেন।

আমাদের মধ্যে অধিকাংশই আজন্ম ব্যক্তিনির্ভর ধর্মে (personal religion) বিশ্বাসী। আমরা সূক্ষ্মতত্ত্ব ও নানা মতামত সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক আচরণ, প্রত্যেক কার্যই দেখাইয়া দেয় যে, ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রে প্রকটিত হইলেই আমরা তত্ত্ববিশেষ ধারণা করিতে সমর্থ হই। আমরা তখনই ভাববিশেষের ধারণায় সমর্থ হই, যখন উহা আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে প্রতিভাত আদর্শ পুরুষ-বিশেষের চরিত্রের মধ্য দিয়া রূপায়িত হয়। আমরা কেবল দৃষ্টান্তসহায়েই উপদেশ বুঝিতে পারি। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি আমরা সকলেই এতদূর উন্নত হইতাম যে, তত্ত্ববিশেষের ধারণা করিতে আমাদের দৃষ্টান্ত বা আদর্শ ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন হইত না, তবে অবশ্য খুব ভালই হইত, সন্দেহ নাই; কিন্তু বাস্তবিক আমরা ততদূর উন্নত নহি। সুতরাং স্বভাবতই অধিকাংশ মানব এই অসাধারণ পুরুষগণের, এই ঈশ্বরাবতারগণের—খৃষ্টান

বৌদ্ধ ও হিন্দুগণ দ্বারা পূজিত এই অবতারগণের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া আসিয়াছে। মুসলমানরা গোড়া হইতেই এইরূপ উপাসনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারা কোন প্রফেট বা ঈশ্বরদূত বা অবতারের উপাসনার বা তাঁহাকে কোন বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের একেবারে বিরোধী। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজন প্রফেট বা অবতারের পরিবর্তে তাঁহারা সহস্র সহস্র সাধু-মহাপুরুষের পূজা করিতেছেন। প্রত্যক্ষ ঘটনা অস্বীকার করিয়া তো আর কাজ করা চলে না। প্রকৃত কথা এই, আমরা ব্যক্তিবিশেষকে উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারি না, আর এরূপ উপাসনা আমাদের পক্ষে হিতকর। তোমাদের অবতার যীশুখ্রীষ্টকে যখন লোকে বলিয়াছিল, 'প্রভু, আমাদিগকে সেই পরম পিতা পরমেশ্বরকে দেখান', তিনি তখন উত্তর দিয়াছিলেন, 'যে আমাকে দেখিয়াছে, সেই পিতাকে দেখিয়াছে।' তাঁহার এই কথাটি তোমরা স্মরণ করিও। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তাঁহাকে মানব ব্যতীত অন্যভাবে কল্পনা করিতে পারে? আমরা তাঁহাকে কেবল মানবীয় ভাবের মধ্য দিয়াই দেখিতে সমর্থ। এই গৃহের সর্বত্রই তো আলোক-তরঙ্গ স্পন্দিত হইতেছে, তবে আমরা উহা দেখিতেছি না কেন? কেবল প্রদীপেই উহা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ঈশ্বর সর্বব্যাপী, নির্গুণ, নিরাকার তত্ত্ববিশেষ হইলেও আমাদের মনের বর্তমান গঠন এরূপ যে, কেবল নররূপধারী অবতারের মধ্যেই আমরা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে—দর্শন করিতে পারি। যখনই এই মহাজ্যোতিষ্কগণের আবির্ভাব হয়, তখনই মানব ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া থাকে। আমরা জগতে যেভাবে আসিয়া থাকি, তাঁহারা সেভাবে আসেন না। আমরা আসি ভিখারীর মতো, তাঁহারা আসেন সম্রাটের মতো। আমরা এই জগতে পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকের মতো আসিয়া থাকি, যেন আমরা পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি—কোনমতে পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা এখানে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ঘুরিতেছি; আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি, তাহা উপলব্ধি করিতে আমরা জানি না, বুঝিতে পারি না। আমরা আজ একরূপ কাজ করিতেছি, কাল আবার অন্যরূপ করিতেছি। আমরা যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের মতো স্রোতে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছি, বাত্যামুখে ছোট ছোট পালকের মতো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছি।

কিন্তু মানবজাতির ইতিহাস পড়িলে দেখিতে পাওয়া যায়—এই সকল বার্তাবহ আসেন, তাঁহাদের জীবনব্রত যেন আজন্ম নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, জন্ম হইতেই তাঁহারা যেন বুঝিয়াছেন ও স্থির করিয়াছেন, জীবনে কি করিতে হইবে। তাঁহাদের জীবনে কি কি করিতে হইবে, তাহা যেন তাঁহাদের সম্মুখে সুনির্দিষ্ট রহিয়াছে; আর লক্ষ্য করিয়া দেখিও, তাঁহারা সেই নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী হইতে কখনও বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন না। ইহার কারণ এই, তাঁহারা নির্দিষ্ট কোন কার্য করিবার জন্যই আসিয়া থাকেন, তাঁহারা জগৎকে কিছু দিবার জন্য—জগতের নিকট কোন এক বিশেষ বার্তা বহন করিবার জন্য আসিয়া থাকেন। তাঁহারা কখনও যুক্তি বা তর্ক করেন না। তোমরা কি কখনও এইসকল মহাপুরুষ বা শ্রেষ্ঠ আচার্যকে তাঁহাদের শিক্ষা-সম্বন্ধে কোন যুক্তিতর্ক করিতে শুনিয়াছ বা এরূপ পড়িয়াছ? তাঁহাদের মধ্যে কেহ কখন যুক্তিতর্ক করেন নাই। যাহা সত্য, তাহাই তাঁহারা সোজাসুজি বলিয়াছেন। কেন তাঁহারা তর্ক করিতে যাইবেন? তাঁহারা যে সত্য দর্শন করিতেছেন। তাঁহারা কেবল নিজেরাই দর্শন করেন না, অপরকেও দেখাইয়া থাকেন। যদি তোমরা আমায় জিজ্ঞাসা কর, ঈশ্বর আছেন কি না, আর আমি যদি উত্তরে বলি—'হাঁ', তবে তখনই তোমরা জিজ্ঞাসা করিবে, 'আপনার ঐরূপ বলিবার কি যুক্তি আছে?'—আর তোমাদিগকে উহার কিছু যুক্তি দিবার জন্য বেচারা আমাকে সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু যদি তোমরা যীশুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে, 'ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন কি?' তিনিও উত্তর দিতেন, 'হাঁ, আছেন বইকি!' তারপর 'তাঁহার অস্তিত্বের কিছু প্রমাণ আছে কি?'—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন, 'এই যে প্রভু সম্মুখেই রহিয়াছেন—তাঁহাকে দর্শন কর।' অতএব তোমরা দেখিতেছ, ঈশ্বর-সম্বন্ধে এই সকল মহাপুরুষের যে ধারণা, তাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধির ফল, উহা যুক্তি-বিচারলব্ধ নহে। তাঁহারা আর অন্ধকারে পথ হাতড়ান না, তাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শনজনিত বলে বলীয়ান্। আমি সম্মুখস্থ এই টেবিলটি দেখিতেছি, তুমি শত শত যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা কর যে টেবিলটি নাই, তুমি কখনই ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস নষ্ট করিতে পারিবে না। কারণ আমি যে উহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। আমার এই বিশ্বাস যেরূপ দৃঢ়

অচল অটল, তাঁহাদের বিশ্বাসও—তাঁহাদের আদর্শের উপর, তাঁহাদের নিজ জীবনব্রতের উপর, সর্বোপরি তাঁহাদের নিজেদের উপর বিশ্বাসও তদ্রূপ দৃঢ় ও অচল। এই মহাপুরুষগণ যেরূপ প্রবল আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন, অপর কাহাকেও সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাসী? তুমি কি পরলোক মানো? তুমি কি এই মত অথবা ঐ শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস কর?' কিন্তু মূলভিত্তিস্বরূপ সেই আত্মবিশ্বাসই যে নাই। যে নিজের উপর বিশ্বাস করিতে পারে না, সে আবার অন্য কিছুতে বিশ্বাস করিবে, লোকে ইহা আশা করে কিরূপে? আমি নিজের অস্তিত্ব-সম্বন্ধেই নিঃসংশয় নহি। এই একবার ভাবিতেছি—আমি নিত্যস্বরূপ, কিছুতে আমাকে বিনষ্ট করিতে পারে না, আবার পরক্ষণেই আমি মৃত্যুভয়ে কাঁপিতেছি। এই ভাবিতেছি—আমি অজর অমর, পরক্ষণেই হয়তো একটা ভূত দেখিয়া ভয়ে এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম যে, আমি কে, কোথায় রহিয়াছি, আমি মৃত কি জীবিত—সব ভুলিয়া গেলাম। এই ভাবিতেছি—আমি খুব ধার্মিক, আমি খুব চরিত্রবান; পরমুহূর্তেই এমন এক ধাক্কা খাইলাম যে, একেবারে চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেলাম। ইহার কারণ কি?—কারণ আর কিছুই নহে, আমি নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছি, আমার চরিত্রবলরূপ মেরুদণ্ড ভগ্ন।

কিন্তু এই সকল মহত্তম আচার্যের চরিত্র অলোচনা করিতে গেলে তাঁহাদের সকলের ভিতর এই একটি সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাইবে যে, তাঁহারা সকলেই নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস-সম্পন্ন; এরূপ বিশ্বাস অসাধারণ, সুতরাং আমরা উহা বুঝিতে পারি না। আর সেই কারণেই এই মহাপুরুষগণ নিজেদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা নানা উপায়ে ব্যাখ্যা করিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি, আর তাঁহারা নিজেদের অপরোক্ষানুভূতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য বিশ সহস্র বিভিন্ন মতবাদ কল্পনা করিয়া থাকি। আমরা নিজেদের সম্বন্ধে ঐরূপ ভাবিতে পারি না, কাজে-কাজেই আমরা যে তাঁহাদিগকে বুঝিতে পারি না, ইহা স্বাভাবিক।

আবার তাঁহাদের এরূপ শক্তি যে, যখন তাঁহাদের মুখ হইতে কোন বাণী উচ্চারিত হয়, তখন জগৎ উহা শুনিতে বাধ্য হয়। যখন তাঁহারা কিছু বলেন, প্রত্যেক শব্দটি সোজা সরল ভাবে গিয়া লোকের হৃদয়ে প্রবেশ

করে, বোমার মতো ফাটিয়া সম্মুখে যাহা কিছু থাকে, তাহারই উপর নিজ অসীম প্রভাব বিস্তার করে। যদি কথার পশ্চাতে শক্তি না থাকে, শুধু কথায় কি আছে? তুমি কোন্ ভাষায় কথা বলিতেছ, কিরূপেই বা তোমার ভাষার শব্দবিন্যাস করিতেছ, তাহাতে কি আসে যায়? তুমি ব্যাকরণশুদ্ধ বা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী ভাষা বলিতেছ কি না, তাহাতে কি আসে যায়? তোমার ভাষা আলঙ্কারিক কি না, তাহাতেই বা কি আসে যায়? প্রশ্ন এই—মানুষকে তোমার দিবার কিছু আছে কি? ইহা কেবল কথা শোনা নয়, ইহা দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার। প্রথম প্রশ্ন এই—তোমার কিছু দিবার আছে কি? যদি থাকে, তবে দাও। শব্দগুলি তো শুধু ঐ দেওয়ার কাজ করে মাত্র, ইহারা শুধু কিছু দিবার বিবিধ উপায়গুলির অন্যতম। অনেক সময় কোন প্রকার কথাবার্তা না কহিয়াই এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে ভাব সঞ্চারিত হইয়া থাকে। দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রে আছে:

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥

কি আশ্চর্য! দেখ ঐ বটবৃক্ষের মূলে বৃদ্ধ শিষ্যগণসহ যুবা গুরু বসিয়া রহিয়াছেন। মৌনই গুরুর শাস্ত্রব্যাখ্যান এবং তাহাতেই শিষ্যগণের সংশয় ছিন্ন হইয়া যাইতেছে!

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কখন কখন এমনও হয় যে, তাঁহারা আদৌ বাক্য উচ্চারণই করেন না, তথাপি তাঁহারা অপরের মনে সত্য সঞ্চারিত করেন। তাঁহারা ঈশ্বরের শক্তিপ্রাপ্ত—তাঁহারা চাপরাশ পাইয়াছেন, তাঁহারা দূত হইয়া আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা অপরকে অনায়াসে হুকুম করিয়া থাকেন; তোমাদিগকে সেই আদেশ শিরে ধারণ করিয়া প্রতিপালনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তোমাদের শাস্ত্রে যীশুখ্রীষ্ট যেরূপ জোরের সহিত অধিকারপ্রাপ্ত পুরুষের ন্যায় উপদেশ দিতেছেন, তাহা কি তোমাদের স্মরণ হইতেছে না? তিনি বলিতেছেন—'অতএব তোমরা যাও—গিয়া জগতের সকল জাতিকে শিক্ষা দাও, আমি তোমাদিগকে যে-সকল বিষয় আদেশ করিয়াছি, তাহাদিগকে সেই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে শিক্ষা দাও।' তাঁহার সকল উক্তির ভিতরই তাঁহার নিজের যে জগৎকে শিক্ষা দিবার বিশেষ কিছু আছে, তাহার উপর প্রবল বিশ্বাস দেখা যায়। জগতের লোকে

যাঁহাদিগকে প্রফেট বা অবতার বলিয়া উপাসনা করে, সেই সকল মহাপুরুষের মধ্যেই এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

এই মহত্তম আচার্যগণ এই পৃথিবীতে জীবন্ত ঈশ্বরস্বরূপ। আমরা অপর আর কাহার উপাসনা করিব? আমি মনে মনে ঈশ্বরের ধারণা করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়া দেখিলাম—কি এক মিথ্যা ক্ষুদ্র বস্তুর ধারণা করিয়া বসিয়াছি। এরূপ ঈশ্বরকে উপাসনা করিলে তো পাপই হইবে। কিন্তু চক্ষু মেলিলে দেখিতে পাই এই মহাপুরুষগণের বাস্তব জীবন ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমাদের যে-কোন ধারণা অপেক্ষা উচ্চতর। আমার মতো লোক দয়ার ধারণা আর কতদূর করিবে? কোন লোক যদি আমার নিকট হইতে কোন বস্তু চুরি করে, আমি তো অমনি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া তাহাকে জেলে দিবার জন্য প্রস্তুত হই। আমার আর ক্ষমার উচ্চতম ধারণা কতদূর হইবে? আমার নিজের যতটুকু গুণ আছে, তাহার চেয়ে অধিক গুণের ধারণা আমার হইতেই পারে না। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে নিজে দেহের বাহিরে লাফাইয়া পড়িতে পারো? তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে নিজ মনের বাহিরে লাফাইয়া যাইতে পারো? কেহই নাই। তোমরা ভগবৎ-প্রেমের ধারণা আর কি করিবে? বাস্তব জীবনে তোমরা নিজেরা যেরূপ পরস্পরকে ভালবাসিয়া থাকো, তদপেক্ষা ভালবাসার উচ্চতর ধারণা কিরূপে করিবে? নিজেরা যাহা কখন উপলব্ধি করি নাই, সেসম্বন্ধে আমরা কোন ধারণাই করিতে পারি না। সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার সকল ধারণাই প্রতিপদে বিফল হইবে। কিন্তু এই মহাপুরুষগণের জীবনরূপ প্রত্যক্ষ ব্যাপার আমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, উহা কল্পনা করিয়া আমাদের ধারণা করিতে হয় না। তাঁহাদের জীবন আলোচনা করিয়া আমরা প্রেম, দয়া, পবিত্রতার এরূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, যাহা আমরা কখন কল্পনা করিতেও পারিতাম না। অতএব আমরা এই সকল নরদেবের চরণে পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিব, ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? আর মানুষ ইহা ছাড়া আর কি করিতে পারে? আমি এমন লোক দেখিতে চাই, যে মুখে নিরাকার-তত্ত্বের কথা যতই বলুক না কেন, কার্যতঃ পূর্বোক্তভাবে সাকার-উপাসনা ব্যতীত অন্য কিছু করিতে সমর্থ। মুখে বলা আর কাজে

করার মধ্যে অনেক প্রভেদ। নিরাকার ঈশ্বর, নির্গুণতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে মুখে আলোচনা কর—বেশ কথা, কিন্তু এই সকল নরদেবই প্রকৃতপক্ষে সকল জাতির উপাস্য যথার্থ ঈশ্বর। এই সকল দেবমানবই চিরদিন জগতে পূজিত হইয়া আসিয়াছেন, আর যতদিন মানুষ মানুষ থাকিবে, ততদিন তাঁহারা পূজিত হইবেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই আমাদের বিশ্বাস হয়, যথার্থ ঈশ্বর আছেন, যথার্থ ধর্মজীবন আছে, আমাদের ঈশ্বরলাভের—ধর্মজীবন-লাভের আশা হয়। কেবল অস্পষ্ট গূঢ় তত্ত্ব লইয়া কি ফল হয়?

তোমাদের নিকট আমি যাহা বলিতে চাহিতেছি, তাহার সার মর্ম এই যে, আমার জীবনে উক্ত সকল অবতারকেই পূজা করা সম্ভবপর হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যে-সকল অবতার আসিবেন, তাঁহাদিগকেও পূজা করিবার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। সন্তান যে-কোন বেশে তাহার মাতার নিকট উপস্থিত হউক না, মাতা তাহাকে অবশ্যই চিনিতে পারেন। যদি না পারেন, আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তিনি কখনই তাহার মাতা নহেন। তোমাদের মধ্যে যাহারা মনে কর, কোন একটি বিশেষ অবতারেই যথার্থ সত্য ও ঈশ্বরের অভিব্যক্তি দেখিতেছ, অপরের মধ্যে তাহা দেখিতে পাইতেছ না, তোমাদের সম্বন্ধে স্বভাবতঃ এই সিদ্ধান্তই আমার মনে উদিত হয় যে, তোমরা কাহারও দেবত্ব ঠিক ঠিক বুঝিতে পার নাই, কেবল কতকগুলি শব্দ গলাধঃকরণ করিয়াছ মাত্র। যেমন লোকে কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত হইয়া সেই দলের যে মত, তাহাই নিজের মত বলিয়া প্রচার করে, তোমরাও তেমনি ধর্মসম্প্রদায়বিশেষে যোগদান করিয়া সেই সম্প্রদায়ের মতগুলি নিজেদের বলিয়া প্রকাশ করিতেছ। কিন্তু ইহা তো প্রকৃত ধর্ম নহে। জগতে এমন নির্বোধও অনেক আছে, যাহারা নিকটে উৎকৃষ্ট সুমিষ্ট জল থাকা সত্ত্বেও পূর্বপুরুষগণের খনিত বলিয়া লবণাক্ত কূপের জলই পান করিয়া থাকে। যাহা হউক, আমার জীবনে যতটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা হইতে এই শিখিয়াছি যে, লোকে যে-সকল শয়তানির জন্য ধর্মকে নিন্দা করে, ধর্ম সে দোষে মোটেই দোষী নয়। কোন ধর্মই কখন মানুষের উপর অত্যাচার করে নাই, কোন ধর্মই ডাইনী অপবাদ দিয়া নারীকে পুড়াইয়া মারে নাই, কোন ধর্মই কখন এই ধরনের অন্যায় কার্যের সমর্থন করে নাই। তবে মানুষকে এ-সকল কার্যে উত্তেজিত করিল কিসে? রাজনীতিই মানুষকে

এই সকল অন্যায় কার্য করিতে প্ররোচিত করিয়াছে, ধর্ম নয়। আর যদি এরূপ রাজনীতি ধর্মের নাম ধারণ করে, তবে তাহাতে কাহার দোষ?

এইরূপ যখনই কোন ব্যক্তি উঠিয়া বলে, আমার ধর্মই সত্য ধর্ম, আমার অবতারই একমাত্র সত্য অবতার, সে ব্যক্তির কথা কখনই ঠিক নহে, সে ধর্মের গোড়ার কথা জানে না। ধর্ম কেবল কথার কথা বা মতামত নহে, অথবা অপরের সিদ্ধান্তে কেবল বুদ্ধির সায় দেওয়া নহে। ধর্মের অর্থ—প্রাণে প্রাণে সত্য-উপলব্ধি; ধর্মের অর্থ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে স্পর্শ করা, প্রাণে অনুভব করা, উপলব্ধি করা যে, আমি আত্ম-স্বরূপ আর সেই অনন্ত পরমাত্মা এবং তাঁহার সকল অবতারের সহিত আমার একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। যদি তুমি বাস্তবিকই সেই পরমপিতার গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকো, তুমি অবশ্যই তাঁহার সন্তানগণকেও দেখিয়াছ, তবে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিতেছ না কেন? যদি চিনিতে না পারো, তবে নিশ্চয়ই তুমি সেই পরমপিতার গৃহে প্রবেশ কর নাই। সন্তান যে-কোন বেশে মাতার সম্মুখে আসুক, মাতা তাহাকে অবশ্য চিনিতে পারেন; সন্তানের যতই ছদ্মবেশ থাকুক, মাতার নিকট সন্তান কখন আপনাকে লুকাইয়া রাখিতে পারে না। তোমরা সকল দেশের, সকল যুগের ধর্মপ্রাণ মহান নরনারীগণকে চিনিতে শেখো এবং লক্ষ্য করিও, বাস্তবিক তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যেখানেই প্রকৃত ধর্মের বিকাশ হইয়াছে, যেখানেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ স্পর্শ ঘটিয়াছে, ঈশ্বরের দর্শন হইয়াছে, আত্মা সাক্ষাৎভাবে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছে, সেখানেই মনের ঔদার্য-ও প্রসারবশতঃ মানুষ সর্বত্র ঈশ্বরের জ্যোতিঃ দেখিতে সমর্থ হইয়াছে।

এমন সময় ছিল, যখন মুসলমানগণ এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অপরিণত ও সাম্প্রদায়িক-ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহাদের মূলমন্ত্রঃ আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়, মহম্মদই একমাত্র রসুল। যাহা কিছু তাঁহাদের উপাসনা-পদ্ধতির বহির্ভূত, সে-সমস্তই ধ্বংস করিতে হইবে এবং যে-কোন গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলি পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে। তথাপি সেই যুগেও যে-সকল মুসলমান দার্শনিক ছিলেন, তাঁহারা এরূপ ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এবং ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে, তাঁহারা সত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং চিত্তের উদারতা লাভ করিয়াছিলেন।…

আজকাল ক্রমবিকাশবাদের কথা শুনা যায়, পাশাপাশি আর একটি মতবাদ মনুষ্যসমাজে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, উহার নাম ক্রমাবনতি বা পূর্বাবস্থায় পুনরাবর্তন (Atavism)। ধর্মবিষয়েও দেখা যায়, আমরা অনেক সময় উদারতার ভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আবার প্রাচীন সঙ্কীর্ণ মতের দিকে ফিরিয়া আসি। কিন্তু প্রাচীন একঘেয়ে ভাব আশ্রয় না করিয়া আমাদের নূতন কিছু চিন্তা করিবার চেষ্টা করা উচিত, তাহাতে ভুল থাকে থাকুক। নিশ্চেষ্ট জড়ের ন্যায় থাকা অপেক্ষা ইহা ঢের ভাল। লক্ষ্যভেদের চেষ্টা তোমরা কেন করিবে না? বিফলতার মধ্য দিয়াই তো আমরা জ্ঞানের সোপানে আরোহণ করিয়া থাকি। অনন্ত সময় পড়িয়া রহিয়াছে, সুতরাং ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি? এই দেয়ালটাকে দেখ দেখি। ইহাকে কি কখন মিথ্যা কথা বলিতে শুনিয়াছ? কিন্তু উহা যে দেয়াল সেই দেয়ালই রহিয়াছে, কিছুমাত্র উন্নতি লাভ করে নাই। মানুষ মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে, আবার সেই মানুষই দেবতা হইয়া থাকে। কিছু করা চাই—হউক উহা অন্যায়, কিছু না করা অপেক্ষা তো উহা ভাল। গরুতে কখন মিথ্যা বলে না, কিন্তু চিরকাল সেই গরুই রহিয়াছে। যাহাই হউক কিছু একটা কর। মাথা খাটাইয়া কিছু ভাবিতে শেখো; ভুল হউক, ঠিক হউক—ক্ষতি নাই, কিন্তু একটা কিছু চিন্তা কর দেখি। আমার পূর্বপুরুষেরা এইভাবে চিন্তা করেন নাই বলিয়া কি আমাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে অনুভবশক্তি ও চিন্তাশক্তি সমুদয় হারাইয়া ফেলিতে হইবে? তাহা অপেক্ষা তো মরাই ভাল! আর যদি ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের একটা জীবন্ত ধারণা, একটা নিজের ভাব কিছু না থাকে, তবে আর বাঁচিয়া লাভ কি? নাস্তিকদের বরং কিছু হইবার আশা আছে, কারণ যদিও তাহারা অন্য সকল মানুষ হইতে ভিন্ন-মতাবলম্বী, তথাপি তাহারা নিজে চিন্তা করিয়া থাকে। যে-সকল ব্যক্তি নিজে কখনও চিন্তা করে না, তাহারা এখনও ধর্মরাজ্যে পদার্পণ করে নাই। তাহারা তো শুধু মেরুদণ্ডহীন জেলী-মাছের (Jellyfish) মতো কোনরূপে নামমাত্র জীবনধারণ করিতেছে। তাহারা কখনও চিন্তা করিবে না, প্রকৃতপক্ষে তাহারা ধর্মের জন্য ব্যস্ত নহে। কিন্তু যে অবিশ্বাসী নাস্তিক, সে ধর্মের জন্য ব্যস্ত, সে উহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। অতএব ভাবিতে শেখো, প্রাণপণ ঈশ্বরাভিমুখে অগ্রসর হও। বিফলতায়

কি আসে যায়? স্বরূপ চিন্তা করিতে গিয়া যদি কোন অদ্ভুত মত আশ্রয় করিতে হয়, তাহাতেই বা কি? লোকে তোমায় কিম্ভূতকিমাকার বলিবে বলিয়া যদি তোমার ভয় হয়, তবে উক্ত মতামত নিজ মনের ভিতরেই আবদ্ধ করিয়া রাখো, অপরের নিকট উহা প্রচার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহাই হউক একটা কিছু কর। ভগবানের দিকে প্রাণপণ অগ্রসর হও, অবশ্যই আলোক আসিবে। যদি কোন ব্যক্তি সারাজীবন আমার মুখে গ্রাস তুলিয়া দেয়, কালে আমি নিজের হাতের ব্যবহার ভুলিয়া যাইব। গড্ডলিকা প্রবাহের মতো একজন যেদিকে যাইতেছে, সকলেই সেইদিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে তো আধ্যাত্মিক মৃত্যু। নিশ্চেষ্টতার ফল তো মৃত্যু। ক্রিয়াশীল হও। আর যেখানে ক্রিয়াশীলতা, সেখানে বৈচিত্র্য অবশ্যই থাকিবে। বিভিন্নতা আছে বলিয়াই তো জীবন এত উপভোগ্য, বিভিন্নতাই জগতে সব কিছুর সৌন্দর্য ও কলাকৌশল; বিভিন্নতাই জগতে সমুদয় বস্তুকে সুন্দর করিয়াছে। এই বৈচিত্র্যই জীবনের মূল, জীবনের চিহ্ন; সুতরাং আমরা উহাতে ভয় পাইব কেন?

এইবার আমরা ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষগণকে (Prophet) কতকটা বুঝিবার পথে অগ্রসর হইতেছি। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, পূর্বোক্তভাবে ধর্ম আশ্রয় করিয়াও যাঁহারা নিশ্চেষ্ট জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের মতো না হইয়া যেখানেই লোকে ধর্মতত্ত্ব লইয়া চিন্তা করিয়াছেন, যেখানেই ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ প্রেমের উদয় হইয়াছে, সেখানেই আত্মা ঈশ্বরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া তদ্ভাবে ভাবিত হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে—জীবনে অন্ততঃ এক মুহূর্তের জন্যও, একবারও—সেই পরম বস্তুর আভাসমাত্র পাইয়াছে, সাক্ষাৎ অনুভূতি লাভ করিয়াছে। 'তৎক্ষণাৎ হৃদয়ের বন্ধন কাটিয়া যায়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মের ক্ষয় হয়; কারণ, তিনি তখন সেই পরমপুরুষকে দেখিয়াছেন, যিনি দূর হইতেও অতি দূরে এবং নিকট হইতেও অতি নিকটে।'[১] ইহাই ধর্ম, ইহাই ধর্মের সার। আর বাদবাকী কেবল মতমতান্তর এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অবস্থায় পৌঁছিবার বিভিন্ন উপায়মাত্র। আমরা এখন ঝুড়িটা লইয়া টানাটানি করিতেছি মাত্র, ফল সব নরদমায় পড়িয়া গিয়াছে।

১ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।৮

যদি দুই ব্যক্তি ধর্ম লইয়া বিবাদ করে, তাহাদিকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর: তোমরা কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছ, তোমরা কি অতীন্দ্রিয় বস্তু অনুভব করিয়াছ? একজন বলিতেছে, যীশুখ্রীষ্টই একমাত্র অবতার; আচ্ছা, সে কি যীশুখ্রীষ্টকে দেখিয়াছে? সে অবশ্য বলিবে, 'আমি দেখি নাই।' 'আচ্ছা বাপু, তোমার পিতা কি তাঁহাকে দেখিয়াছেন?'—'না, মহাশয়।' 'তোমার পিতামহ কি দেখিয়াছেন?'—'না, মহাশয়।' 'তুমি কি তাঁহাকে দেখিয়াছ?'—'না, মহাশয়।' 'তবে কি লইয়া বৃথা বিবাদ করিতেছ? ফলগুলি সব নরদমায় পড়িয়া গিয়াছে, এখন ঝুড়ি লইয়া টানাটানি করিতেছ!' যাঁহাদের এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে, এমন নরনারীর এইরূপে বিবাদ করিতে লজ্জাবোধ করা উচিত।

এই মহাপুরুষ ও অবতারগণ সকলেই মহান ও সকলেই সত্য। কেন? কারণ, প্রত্যেকেই এক একটি মহান ভাব প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতীয় অবতারগণের কথা ধর। তাঁহারাই প্রাচীনতম ধর্মসংস্থাপক। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের কথা ধরা যাউক। তোমরা সকলেই গীতা পড়িয়াছ, সুতরাং তোমরা দেখিবে সমগ্র গ্রন্থের মূল কথা—অনাসক্তি। সর্বদা অনাসক্ত হও। হৃদয়ের ভালবাসায় কেবল একজনের মাত্র অধিকার। কাহার অধিকার?—তাঁহারই অধিকার, যাঁহার কখনও কোন পরিণাম নাই। কে তিনি?—ঈশ্বর। ভ্রান্তিবশতঃ কোন পরিণামশীল বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি হৃদয় অর্পণ করিও না; কারণ তাহা হইতেই দুঃখের উদ্ভব। তুমি একজনকে হৃদয় দিতে পারো, কিন্তু যদি সে মরিয়া যায়, তবে তোমার দুঃখ হইবে। তুমি বন্ধুবিশেষকে ঐরূপে হৃদয় অর্পণ করিতে পারো, কিন্তু আগামী কালই সে তোমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তুমি তোমার স্বামীকে হৃদয় অর্পণ করিতে পারো, কিন্তু কাল তিনি হয়তো তোমার সহিত বিবাদ করিয়া বসিবেন। তুমি স্ত্রীকে হৃদয় সমর্পণ করিতে পারো, কিন্তু সে হয়তো কাল বাদে পরশু মরিয়া যাইবে। এইরূপেই জগৎ চলিতেছে। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন, ভগবানই একমাত্র অপরিণামী। তাঁহার ভালবাসার কখন অভাব হয় না। আমরা যেখানেই থাকি এবং যাহাই করি না কেন, তিনি সর্বদাই আমাদের প্রতি সমভাবে দয়াময়, তাঁহার হৃদয় সর্বদাই আমাদের প্রতি সমভাবে প্রেমপূর্ণ। তাঁহার কখনই কোনরূপ

পরিণাম নাই। আমরা যাহা কিছু করি না কেন, তিনি কখনই রাগ করেন না। ঈশ্বর আমাদের উপর রাগ করিবেন কিরূপে? তোমার শিশুসন্তান নানা প্রকার দুষ্টামি করিয়া থাকে, কিন্তু তুমি কি তাহার উপর রাগ কর? আমরা ভবিষ্যতে কি হইব, তাহা কি ঈশ্বর জানেন না? তিনি নিশ্চয়ই জানেন, শীঘ্র বা বিলম্বে আমরা সকলেই পূর্ণত্ব লাভ করিব। সুতরাং আমাদের শত দোষ থাকিলেও তিনি ধৈর্য ধরিয়া থাকেন, তাঁহার ধৈর্য অসীম। আমাদের তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে, আর জগতের যত প্রাণী আছে, তাহাদিগকে কেবল তাঁহার প্রকাশ বলিয়া ভালবাসিতে হইবে। ইহাই মূলমন্ত্র করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। স্ত্রীকে অবশ্যই ভালবাসিতে হইবে, কিন্তু স্ত্রী বলিয়া নহে। উপনিষৎ বলেন, স্বামীকে যে স্ত্রী ভালবাসে, তাহা স্বামী বলিয়া নহে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে সেই আত্মা আছেন বলিয়া, ভগবান আছেন বলিয়া পতি প্রিয় হইয়া থাকেন।[১]

বেদান্তদর্শন বলেন: দাম্পত্য প্রেমে যদিও পত্নী ভাবেন, তিনি স্বামীকেই ভালবাসিতেছেন, অথবা পুত্রবাৎসল্যে জননী মনে করেন, তিনি পুত্রকেই ভালবাসিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর ঐ পতির ভিতর বা পুত্রের ভিতর অবস্থান করিয়া পত্নীকে ও জননীকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনিই একমাত্র আকর্ষণের বস্তু, তিনি ব্যতীত আকর্ষণের অন্য কিছু নাই, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পত্নী ইহা জানেন না, কিন্তু অজ্ঞাতসারে তিনিও ঠিক পথে চলিয়াছেন অর্থাৎ ঈশ্বরকেই ভালবাসিতেছেন। তবে অজ্ঞাতসারে কাজ অনুষ্ঠিত হইলে, উহা হইতে দুঃখকষ্টের উদ্ভব হয়, জ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত হইলে হয় মুক্তি। আমাদের শাস্ত্র ইহাই বলিয়া থাকেন। যেখানে প্রেম—যেখানেই একবিন্দু আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানেই বুঝিতে হইবে ঈশ্বর রহিয়াছেন; কারণ ঈশ্বর রসস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। যেখানে তিনি নাই, সেখানে প্রেম থাকিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশগুলি এই ভাবের। তিনি সমগ্র ভারতে সমগ্র হিন্দুজাতির ভিতর এই ভাব প্রবেশ করাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং

---

১ 'ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।' বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ৪।৫

হিন্দুরা কাজ করিবার সময়, এমন কি জলপান করিবার সময়ও বলে, যদি কার্যের কোন শুভ ফল থাকে, তাহা ঈশ্বরে সমর্পণ করিলাম। বৌদ্ধগণ কোন সৎকর্ম করিবার সময় বলিয়া থাকে, এই সৎকর্মের ফল সমগ্র জগৎ প্রাপ্ত হউক, আর জগতের সমুদয় দুঃখকষ্ট আমাতে আসুক। হিন্দুরা বলে, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, আর ঈশ্বর সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্, সকল আত্মার অন্তরাত্মা, সুতরাং যদি আমরা সকল সৎকর্মের ফল তাঁহাকে সমর্পণ করি, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থত্যাগ, আর ঐ ফল নিশ্চয়ই সমগ্র জগৎ পাইবে।

ইহা শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার একটি দিক। তাঁহার অন্য শিক্ষা কি? সংসারের মধ্যে বাস করিয়া যিনি কর্ম করেন, অথচ সমুদয় কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তিনি কখনও বিষয়ে লিপ্ত হন না। যেমন পদ্মপত্র জলে লিপ্ত হয় না, সেই ব্যক্তিও তেমনি পাপে লিপ্ত হন না।

প্রবল কর্মশীলতা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের আর একটি দিক। গীতা বলিতেছেন, দিবারাত্র কর্ম কর, কর্ম কর, কর্ম কর। তোমরা বলিতে পারো—তবে শান্তি কোথায়? যদি সারাজীবন ছেক্‌রা গাড়ির ঘোড়ার মতো কাজ করিয়া যাইতে হয়, ঐরূপে গাড়িতে জোতা অবস্থায় মরিতে হয়, তবে আর জীবনে শান্তিলাভ হইল কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'হাঁ, তুমি শান্তিলাভ করিবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্র হইতে পলায়ন শান্তির পথ নহে।' যদি পারো সকল কর্তব্য কর্ম ছাড়িয়া পর্বতচূড়ায় বসিয়া থাকো দেখি। সেখানে গিয়াও দেখিবে, মন সুস্থির নহে, ক্রমাগত এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। জনৈক ব্যক্তি একজন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আপনি কি একান্ত নিরুপদ্রব মনোরম স্থান পাইয়াছেন? আপনি হিমালয়ে কত বৎসর ধরিয়া ভ্রমণ করিতেছেন?' সন্ন্যাসী উত্তরে বলিলেন, 'চল্লিশ বৎসর।' তখন সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন, হিমালয়ে তো অনেক সুন্দর সুন্দর স্থান রহিয়াছে, আপনি উহাদের মধ্যে একটি নির্বাচন করিয়া অনায়াসে থাকিতে পারিতেন। আপনি তাহা করিলেন না কেন?' সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, 'এই চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমার মন আমাকে উহা করিতে দেয় নাই।' আমরা সকলেই বলিয়া থাকি বটে যে, আমরা শান্তিতে থাকিব, কিন্তু মন আমাদিগকে শান্তিতে থাকিতে দিবে না।

তোমরা সকলেই সেই 'তাতার-ধরা'[১] সৈনিক পুরুষের গল্প শুনিয়াছ। জনৈক সৈনিক পুরুষ নগরের বহির্দেশে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া সেনাবাসের নিকট উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'আমি একজন তাতারকে ধরে ফেলেছি।' ভিতর হইতে একজন বলিল, 'তাকে ভিতরে নিয়ে এস।' সৈনিক বলিল, 'সে আসছে না, মশায়।' 'তবে তুমি একাই ভিতরে চলে এস।'—'সে যেতে দিচ্ছে না, মশায়।' আমাদের মনের ভিতরেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। আমরা সকলেই 'তাতার ধরিয়াছি'। আমরাও উহাকে থামাইতে পারিতেছি না, উহাও আমাদিগকে শান্ত হইতে দিতেছে না। আমরা সকলেই যে পূর্বোক্ত সৈনিক পুরুষের ন্যায় 'তাতার ধরিয়াছি'! আমরা সকলেই বলিয়া থাকি, শান্ত ভাব অবলম্বন কর, স্থির শান্ত হইয়া থাকো, ইত্যাদি। এ কথা তো প্রত্যেক শিশুই বলিতে পারে, আর মনে করে, সে ইহা কার্যে পরিণত করিতে সমর্থ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা করা বড় কঠিন। আমি এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছি। আমি সব কর্তব্য ফেলিয়া দিয়া পর্বতশিখরে পলাইয়াছিলাম, গভীর অরণ্যে ও পর্বতগুহায় বাস করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই; কারণ আমিও 'তাতার ধরিয়াছিলাম', সংসার আমার সঙ্গে সঙ্গে বরাবর চলিয়াছিল। আমার মনের মধ্যে ঐ 'তাতার' রহিয়াছে, অতএব বাহিরে কাহারও উপর দোষ চাপানো ঠিক নহে। আমরা বলিয়া থাকি, বাহিরের এই অবস্থাচক্র আমার অনুকূল, ঐ অবস্থাচক্র আমার প্রতিকূল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকল গোলযোগের মূল ঐ 'তাতার' আমার ভিতরেই রহিয়াছে। উহাকে ঠাণ্ডা করিতে পারিলে সব ঠিক হইয়া যাইবে।

এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন: 'কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিও না, মানুষের মতো উহাদের সাধনে অগ্রসর হও; উহাদের ফলাফল কি হইবে, তাহা ভাবিও না।' ভৃত্যের প্রশ্ন করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই, সৈনিক পুরুষের বিচার করিবার অধিকার নাই। কর্তব্য পালন করিয়া অগ্রসর হইতে থাকো, তোমাকে যে কাজ করিতে হইতেছে, তাহা বড় কি ছোট, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য করিও না। কেবল মনকে জিজ্ঞাসা কর, মন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতেছে কি না। যদি তুমি নিঃস্বার্থ হও, তবে

১ তুলনীয় হিন্দি প্রবাদ: 'হাম্ তো কম্‌লী ছোড় দিয়া, কম্‌লী হাম্‌কো ছোড়তা নহী', ভাসমান ব্যক্তি যাহাকে কম্বল মনে করিয়া ধরিতে গিয়াছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটি একটি ভালুক।

কিছুতেই কিছু আসিয়া যাইবে না, কিছুই তোমার উন্নতির প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। কাজে ডুবিয়া যাও, হাতের সামনে যে কর্তব্য রহিয়াছে, তাহাই করিয়া যাও। এইরূপ করিলে তুমি ক্রমে ক্রমে সত্য উপলব্ধি করিবে; 'যিনি প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে গভীর শান্তি লাভ করেন, আবার পরম নিস্তব্ধতা ও শান্তভাবের ভিতর প্রবল কর্মশীলতা দেখেন, তিনিই যোগী, তিনিই মহাপুরুষ, তিনিই পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, সিদ্ধ হইয়াছেন।'[১]

এক্ষণে তোমরা দেখিতেছ যে, শ্রীকৃষ্ণের পূর্বোক্ত উপদেশের ফলে জগতের সমুদয় কর্তব্যই পবিত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে। জগতের এমন কোন কর্তব্য নাই, যাহাকে 'ছোট কাজ' বলিয়া ঘৃণা করিবার অধিকার আমাদের আছে। সুতরাং সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজাধিরাজের রাজ্যশাসনরূপ কর্তব্যের সহিত সাধারণ ব্যক্তির কর্তব্যের কোন প্রভেদ নাই।

এক্ষণে তোমরা বুদ্ধদেবের উপদেশ মনোযোগের সহিত শোন। তিনি জগতে যে মহতী বার্তা ঘোষণা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার বাণীও আমাদের হৃদয়ের একদেশ অধিকার করিয়া থাকে। বুদ্ধ বলিতেছেন, স্বার্থপরতা এবং যাহা কিছু তোমাকে স্বার্থপর করিয়া ফেলে, তাহাই একেবারে উন্মূলিত কর। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া (স্বার্থপর) সংসারী হইও না, সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হও। সংসারী লোক মনে করে, আমি নিঃস্বার্থ হইব, কিন্তু যখনই সে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়, অমনি সে স্বার্থপর হইয়া পড়ে। মা মনে করেন, আমি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইব, কিন্তু শিশুর মুখের দিকে তাকাইলেই তাঁহার স্বার্থপরতা আসিয়া পড়ে। এই জগতের সকল বিষয় সম্বন্ধেই এইরূপ। যখনই হৃদয়ে স্বার্থপর বাসনার উদয় হয়, যখনই লোকে কোন স্বার্থপর কার্য করে, তখনই তাহার মনুষ্যত্ব—যাহা লইয়া সে মানুষ—তাহা চলিয়া যায়, সে তখন পশুতুল্য হইয়া যায়, দাসবৎ হইয়া যায়, সে নিজ প্রতিবেশিগণকে, তাহার ভ্রাতৃস্বরূপ মানবজাতিকে ভুলিয়া যায়। তখন সে আর বলে না, 'আগে তোমাদের হউক, পরে আমার হইবে', বরং বলে, 'আগে আমার হউক, তারপর বাকি সকলে নিজে নিজে দেখিয়া লইবে।'

১ কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ গীতা, ৪।১৮

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের জন্য আমাদের হৃদয়ের একদেশ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। তাঁহার উপদেশ হৃদয়ে ধারণ না করিলে আমরা কখন শান্ত ও অকপটভাবে এবং সানন্দে কোন কর্তব্য কর্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'যে কর্ম তোমাকে করিতে হইতেছে, তাহাতে যদি কোন দোষ থাকে, তবুও ভয় পাইও না; কারণ, এমন কোন কাজই নাই, যাহাতে কিছু না কিছু দোষ আছে।'[১] 'সমুদয় কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর, আর উহার ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করিও না।'

অপর দিকে আবার ভগবান বুদ্ধদেবের অমৃতময়ী বাণী আসিয়া আমাদের হৃদয়ের একদেশ অধিকার করিতেছে। সেই বাণী বলিতেছে: সময় চলিয়া যায়, এই জগৎ ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখপূর্ণ। হে মোহনিদ্রাভিভূত নরনারীগণ, তোমরা পরম মনোহর হর্ম্যতলে বসিয়া বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিত হইয়া পরম উপাদেয় চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় দ্বারা রসনার তৃপ্তিসাধন করিতেছ; এদিকে যে লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহাদের কথা কি কখন ভ্রমেও তোমাদের মানসপটে উদিত হয়? ভাবিয়া দেখ, জগতের মধ্যে মহাসত্য এই: সর্বং দুঃখমনিত্যমধ্রুবম্—দুঃখ, দুঃখ—অনিত্য জগৎ দুঃখপূর্ণ। শিশু যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে পৃথিবীতে প্রথম আসিয়াই কাঁদিয়া থাকে। শিশুর ক্রন্দন—ইহাই মহা সত্য ঘটনা। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এ জগৎ কাঁদিবারই স্থান। সুতরাং আমরা যদি ভগবান বুদ্ধদেবের বাণী হৃদয়ে স্থান দিই, আমাদের কখনও স্বার্থপর হওয়া উচিত নয়।

আবার, সেই ঈশদূত ন্যাজারেথবাসী ঈশার দিকে দৃষ্টিপাত কর। তাঁহার উপদেশ: 'প্রস্তুত হও, কারণ স্বর্গরাজ্য অতি নিকটবর্তী।' আমি শ্রীকৃষ্ণের বাণী মনে মনে গভীরভাবে আলোচনা করিয়া অনাসক্ত হইয়া কার্য করিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কখনও কখনও তাঁহার উপদেশ ভুলিয়া গিয়া সংসারে আসক্ত হইয়া পড়ি। আমি হঠাৎ ভগবান বুদ্ধদেবের বাণী হৃদয়ের ভিতর শুনিতে পাই—'সাবধান, জগতের সমুদয় পদার্থই ক্ষণস্থায়ী, এ জীবন

১ সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ গীতা, ১৮।৪৮

সততই দুঃখময়।' ঐ বাণী শুনিবামাত্র কাহার কথা শুনিব—শ্রীকৃষ্ণের কথা না শ্রীবুদ্ধের কথা?—এই বিষয়ে মন সংশয়দোলায় দুলিতে থাকে। তখনই বজ্রবেগে ভগবান ঈশার বাণী আসিয়া উপস্থিত হয়, 'প্রস্তুত হও, কারণ স্বর্গরাজ্য অতি নিকটে।' এক মুহূর্তও বিলম্ব করিও না, কল্য হইবে বলিয়া কিছু ফেলিয়া রাখিও না। সেই চরম অবস্থার জন্য সদা প্রস্তুত হইয়া থাকো, উহা তোমার নিকট এখনই উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং ভগবান ঈশার উপদেশের জন্যও আমাদের হৃদয়ে স্থান রহিয়াছে, আমরা সাদরে তাঁহার ঐ উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকি, আমরা এই ঈশদূতকে—সেই জীবন্ত ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া থাকি।

তাহার পর আমাদের দৃষ্টি সেই মহাপুরুষ মহম্মদের দিকে নিপতিত হয়, যিনি জগতে সাম্যভাবের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারো: 'মহম্মদের ধর্মে আবার ভাল কি থাকিতে পারে?' তাঁহার ধর্মে নিশ্চয়ই কিছু ভাল আছে—যদি না থাকিত, তবে উহা এতদিন বাঁচিয়া রহিয়াছে কিরূপে? যাহা ভাল, তাহাই স্থায়ী হয়, অন্য সমুদয়ের বিনাশ হইলেও উহার বিনাশ হয় না। যাহা কিছু ভাল, তাহাই সবল ও দৃঢ়, সুতরাং তাহা স্থায়ী হয়। এই পৃথিবীতেই বা অপবিত্র ব্যক্তির জীবন কতদিন? পবিত্রচিত্ত সাধুর প্রভাব কি তাহা অপেক্ষা বেশী নয়? নিশ্চয়ই; কারণ পবিত্রতাই বল, সাধুতাই বল। সুতরাং মহম্মদের ধর্মে যদি কিছুই ভাল না থাকিত, তবে উহা এতদিন বাঁচিয়া আছে কিরূপে? মুসলমান-ধর্মে যথেষ্ট ভাল জিনিস আছে। মহম্মদ সাম্যবাদের আচার্য; তিনি মানবজাতির ভ্রাতৃভাব—সকল মুসলমানের ভ্রাতৃভাবের প্রচারক, ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি, জগতের প্রত্যেক অবতার, প্রত্যেক ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ, প্রত্যেক ঈশদূতই জগতে বিশেষ বিশেষ সত্যের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। যদি তোমরা প্রথম সেই বাণী শ্রবণ কর এবং পরে আচার্যের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে সত্যের আলোকে তাঁহার সমগ্র জীবনটি ব্যাখ্যাত হইতেছে। অজ্ঞ মূর্খেরা নানাবিধ মতমতান্তর কল্পনা করিয়া থাকে, আর নিজ নিজ মানসিক উন্নতি-অনুযায়ী, নিজ নিজ

ভাবানুযায়ী ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া এই সকল মহাপুরুষে তাহা আরোপ করিয়া থাকে। তাঁহাদের উপদেশসমূহ লইয়া তাহারা নিজেদের মতানুযায়ী ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, কিন্তু প্রত্যেক মহান আচার্যের জীবনই তাঁহার বাণীর একমাত্র ভাষ্য। তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবন আলোচনা করিয়া দেখ, তিনি নিজে যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা তাঁহার উপদেশের সহিত ঠিক মিলিবে। গীতা পাঠ করিয়া দেখ, দেখিবে গীতার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সহিত গীতার বাণীর কি সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

মহম্মদ নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া গেলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণ সাম্য ও ভ্রাতৃভাব থাকা উচিত। উহার মধ্যে বিভিন্ন জাতি, মতামত, বর্ণ বা লিঙ্গ-ভেদ কিছু থাকিবে না। তুরস্কের সুলতান আফ্রিকার বাজার হইতে একজন নিগ্রোকে কিনিয়া তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তুরস্কে আনিতে পারেন; কিন্তু সে যদি মুসলমান হয়, আর যদি তাহার উপযুক্ত গুণ থাকে, তবে সে সুলতানের কন্যাকেও বিবাহ করিতে পারে। মুসলমানদের এই উদার ভাবের সহিত এদেশে (আমেরিকায়) নিগ্রো ও রেড্ ইণ্ডিয়ানদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয়, তুলনা করিয়া দেখ। আর হিন্দুরা কি করিয়া থাকে? যদি তোমাদের একজন মিশনরী হঠাৎ কোন গোঁড়া হিন্দুর খাদ্য ছুঁইয়া ফেলে, সে তৎক্ষণাৎ উহা ফেলিয়া দিবে। আমাদের এত উচ্চ দর্শনশাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও কার্যের সময়, আচরণের সময় আমরা কিরূপ দুর্বলতার পরিচয় দিয়া থাকি, তাহা লক্ষ্য করিও। কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর তুলনায় এইখানে মুসলমানদের মহত্ত্ব—জাতি বা বর্ণ বিচার না করিয়া সকলের প্রতি সাম্যভাব প্রদর্শন করা।

পূর্বে যে-সকল মহাপুরুষ ও অবতারের বিষয় কথিত হইল, তাঁহারা ছাড়া অন্য মহত্তর অবতার কি জগতে আসিবেন? অবশ্যই আসিবেন। কিন্তু তাঁহারা আসিবেন বলিয়া বসিয়া থাকিও না। আমি বরং চাই, তোমাদের প্রত্যেকেই সমুদয় প্রাচীন সংহিতার সমষ্টিস্বরূপ এই যথার্থ নব সংহিতার আচার্য হও, প্রবক্তা হও। প্রাচীনকালে বিভিন্ন আচার্যগণ যে-সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেগুলি গ্রহণ কর, নিজ নিজ অনুভূতির সহিত মিলাইয়া উহাদের সম্পূর্ণ কর এবং দিব্য প্রেরণা লাভ করিয়া অপরের

নিকট ঐ সত্য ঘোষণা কর। পূর্ববর্তী সকল আচার্যই মহান ছিলেন, প্রত্যেকেই আমাদের জন্য কিছু সত্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের পক্ষে ঈশ্বর-স্বরূপ। আমরা তাঁহাদিগকে নমস্কার করি, আমরা তাঁহাদের দাস। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদেরও নমস্কার করিব; কারণ তাঁহারা যেমন প্রফেট, ঈশ্বরতনয় বা অবতার, আমরাও তাহাই। তাঁহারা পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন, সিদ্ধ হইয়াছিলেন, আমরাও এখনই—ইহ-জীবনেই সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইব। যীশুখ্রীষ্টের সেই বাণী স্মরণ রাখিও—'স্বর্গরাজ্য অতি নিকটে।' এখনই, এই মুহূর্তেই, এস আমরা প্রত্যেকে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি—'আমি ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ হইব, আমি সেই জ্যোতিঃ-স্বরূপ ভগবানের বার্তাবহ হইব, আমি ঈশ্বরতনয়—শুধু তাহাই নহে, স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ হইব।'

কৃষ্ণ ও তাঁহার শিক্ষা

[এই বক্তৃতাটি ১৯০০ খৃঃ ১লা এপ্রিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্থান ফ্রানসিস্কো অঞ্চলে প্রদত্ত। আইডা আনসেল (Ida Ansell) নাম্নী জনৈকা শ্রোত্রী তাঁহার ব্যক্তিগত অনুধ্যানের জন্য ইহার সাঙ্কেতিক লিপি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে ১৯৫৬ খৃঃ Vedanta and the West পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তিনি ইহার সাঙ্কেতিক লিপি উদ্ধার করেন। যেখানে লিপি-কার স্বামীজীর ভাষণের কথাগুলি ঠিকমত ধরিতে পারেন নাই, সেখানে...চিহ্ন দেওয়া আছে। প্রথম বন্ধনীর ( ) মধ্যকার অংশ স্বামীজীর ভাব-পরিস্ফুটনের জন্য লিপি-কার কর্তৃক সন্নিবেশিত।]

যে কারণ-পরম্পরার ফলে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান, প্রায় সেইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল। শুধু তাহাই নয়, সে-যুগের অনুরূপ ঘটনাবলী আমরা এ-যুগেও ঘটিতে দেখি।

নির্দিষ্ট আদর্শ একটি আছে, কিন্তু ইহাও ঠিক যে, মানবজাতির একটি বৃহৎ অংশ সেই আদর্শে পৌঁছিতে পারে না, ধারণাতেও তাহা আনিতে পারে না।...যাঁহারা শক্তিমান্ তাঁহারা ঐ আদর্শ অনুযায়ী চলেন, অনেক সময়েই অসমর্থদের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি থাকে না। শক্তিমানের নিকট—দুর্বল তো শুধু কৃপারই পাত্র! শক্তিমান্‌রাই আগাইয়া যান।...অবশ্য ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি যে, দুর্বলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া এবং তাহাদের সাহায্য করাই উচ্চতম দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দার্শনিকগণ আমাদের হৃদয়বান্ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ান। এ পৃথিবীতে কয়েক বৎসরের জীবন দ্বারা এখনই সমগ্র অনন্ত জীবন নিরূপিত করিয়া ফেলিতে হইবে—এই মত যদি অনুসরণ করিতে হয়,...তবে ইহা আমাদের নিকট অত্যন্ত নৈরাশ্যজনকই হইবে।...যাহারা দুর্বল তাহাদের কথা ভাবিবার অবসর আমাদের থাকিবে না।

যদি এই জগৎ আমাদের অন্যতম অপরিহার্য শিক্ষালয় হয়, যদি অনন্ত জীবন শাশ্বত নিয়ম অনুসারেই গঠিত, রূপায়িত এবং পরিচালিত করিতে হয়, আর শাশ্বত নিয়মে সুযোগ যদি প্রত্যেকেই লাভ করে, তাহা হইলে তো আমাদের তাড়াহুড়া করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সমবেদনা জানাইবার, চারিদিকে চাহিবার এবং দুর্বলের সাহায্যে হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবার প্রচুর সময় আমাদের আছে।

বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে সংস্কৃতে আমরা দুইটি শব্দ পাই; একটি 'ধর্ম', অপরটির—'সংঘ'। ইহা খুবই বিস্ময়কর যে, শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ও বংশধরগণের অবলম্বিত ধর্মের কোন নাম নাই, (যদিও) বিদেশীরা ইহাকে হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম বলিয়া অভিহিত করেন। 'ধর্ম' এক, তবে 'সম্প্রদায়' অনেক। যে মুহূর্তে তুমি ধর্মের একটি নাম দিতে যাও, ইহাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়া অন্যান্য ধর্ম হইতে আলাদা করিয়া ফেলো, তখনই ইহা একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়, তখন আর উহা ধর্ম থাকে না। সম্প্রদায় শুধু নিজের মতটিই (প্রচার করে), ঘোষণা করিতে ছাড়ে না যে, ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য কোথাও আর সত্য নাই। পক্ষান্তরে 'ধর্ম' বিশ্বাস করে যে, জগতে একটিমাত্র ধর্মই চলিয়া আসিতেছে এবং এখনও আছে। দুইটি ধর্ম কখনও ছিল না। একই ধর্ম বিভিন্ন স্থানে উহার বিভিন্ন দিক (উপস্থাপিত করিতেছে)। মানবজাতির লক্ষ্য এবং সম্ভাবনা সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করাই আমাদের কর্তব্য। আমাদের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করিয়া ঊর্ধ্বে এবং সম্মুখে আগুয়ান মানবজাতিকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে শেখানোই শ্রীকৃষ্ণের মহতী কীর্তি। তাঁহার বিশাল হৃদয়ই সর্বপ্রথম সকল মতের মধ্যে সত্যকে দেখিতে পাইয়াছিল, তাঁহার শ্রীমুখ হইতেই প্রত্যেক মানুষের জন্য সুন্দর সুন্দর কথা প্রথম নিঃসৃত হইয়াছিল।

এই কৃষ্ণ বুদ্ধের কয়েক হাজার বৎসরের পূর্ববর্তী। এমন বহু লোক আছেন, যাঁহারা বিশ্বাস করেন না যে, কৃষ্ণ কখনও ছিলেন। কাহারও কাহারও বিশ্বাস—প্রাচীন সূর্যোপাসনা হইতেই কৃষ্ণের পূজা উদ্ভূত হইয়াছে। সম্ভবতঃ কৃষ্ণ নামে বহু ব্যক্তি ছিলেন। উপনিষদে এক কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, এক কৃষ্ণ ছিলেন রাজা, আর একজন ছিলেন সেনাপতি। সবগুলি এক কৃষ্ণে সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আমাদের কিছুই আসিয়া যায় না। ব্যাপার এই যে, যখন আধ্যাত্মিকতায় অনুপম এমন একজন আবির্ভূত হন, তখন তাঁহাকে ঘিরিয়া নানাপ্রকার পৌরাণিক কাহিনী রচিত হয়। কিন্তু বাইবেল প্রভৃতি যে-সকল ধর্মগ্রন্থ এবং উপাখ্যান এইরূপ এক ব্যক্তির উপর আরোপিত হয়, সেগুলিকে তাঁহার চরিত্রের (ছাঁচে) নূতন করিয়া ঢালা প্রয়োজন। বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্টের গল্পগুলি খ্রীষ্টের সর্বজনগ্রাহ্য জীবন (এবং) চরিত্রের আলোকেই রূপায়িত করা উচিত।

বুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতীয় সমস্ত কাহিনীতেই 'পরার্থে আত্মত্যাগ'রূপ তাঁহার সমগ্র জীবনের প্রধান সুরটি বজায় রাখা হইয়াছে।...

কৃষ্ণের মধ্যে আমরা পাই...তাঁহার বাণীর দুইটি প্রধান ভাব: প্রথম—বিভিন্ন ভাবের সমন্বয়; দ্বিতীয়—অনাসক্তি। মানুষ রাজসিংহাসনে বসিয়া, সেনাবাহিনী পরিচালনা করিয়া, জাতিসমূহের জন্য বড় বড় পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিয়াও চরম লক্ষ্য—পূর্ণতায় পৌঁছিতে পারে। ফলতঃ কৃষ্ণের মহাবাণী যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রচারিত হইয়াছিল।

প্রাচীন পুরোহিতকুলের ঢংঢাং, আড়ম্বর ও ক্রিয়াকলাপাদির অসারতা কৃষ্ণের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল, তথাপি এই সমস্তের মধ্যে তিনি কিছু ভালও দেখিয়াছিলেন।

যদি তুমি শক্তিধর হও, উত্তম। কিন্তু তাই বলিয়া যে তোমার মতো বলবান্ নয়, তাহাকে অভিশাপ দিও না।...প্রত্যেকেই বলিয়া থাকে, 'হতভাগ্য তোমরা!' কে আর বলে, 'আহা, আমি কী হতভাগ্য যে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিতেছি না!' মানুষ নিজ নিজ সামর্থ্য, সঙ্গতি ও জ্ঞান অনুযায়ী যতদূর করিবার করিতেছে, কিন্তু কী দুঃখের কথা, আমি তো তাহাদিগকে আমার পর্যায়ে টানিয়া তুলিতে পারিতেছি না!

তাই কৃষ্ণ বলিতেছেন, আচার-অনুষ্ঠান, দেবার্চনা, পুরাণকথা সবই ঠিক। ...কেন? কারণ এগুলি একই লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। ক্রিয়া-কলাপ, শাস্ত্র, প্রতীক—এ সবই এক শৃঙ্খলের এক-একটি শিকলি। শক্ত করিয়া ধর। ইহাই একমাত্র কর্তব্য। যদি তুমি অকপট হও, আর যদি দীর্ঘ শৃঙ্খলের একটি শিকলিও ধরিতে পারিয়া থাকো, তবে ছাড়িয়া দিও না, বাকী অংশটুকু তোমার কাছে আসিতে বাধ্য। (কিন্তু মানুষ) ধরিতে চায় না। তাহারা কেবল ঝগড়া-বিবাদে এবং কোন্‌টি ধরিব এই বিচারেই সময় কাটায়, ফলে কোন কিছুই ধরিয়া থাকে না।...আমরা সর্বদা সত্যকে 'খুঁজিয়াই' বেড়াই, কিন্তু উহা 'লাভ' করিতে কখনও চাই না। আমরা চাই শুধু ঘুরিয়া বেড়ানো ও (চাওয়ার) মজা। আমাদের প্রচুর শক্তি এইভাবেই ব্যয়িত হইতেছে। সেইজন্য কৃষ্ণ বলিতেছেন: মূল কেন্দ্র হইতে প্রসারিত শৃঙ্খলগুলির যে-কোন একটি ধরিয়া ফেলো। কোন একটি সোপান অপরটি হইতে বড় নয়।... যতক্ষণ আন্তরিকতা থাকে, ততক্ষণ কোন ধর্মমতকে নিন্দা করিও না। যে-

কোন একটি শিকলি জোর করিয়া ধর, তাহা হইলে ইহা তোমাকে কেন্দ্রে টানিয়া লইয়া যাইবে।...বাকী যাহা কিছু সব তোমার হৃদয়ই শিখাইয়া দিবে। ভিতরে গুরুই সকল মত, সমস্ত দর্শন শিক্ষা দিবেন।...

খ্রীষ্টের মতো কৃষ্ণও নিজেকেই ঈশ্বর বলিয়াছেন। নিজের মধ্যে তিনি দেবতাকে দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, 'একদিনের জন্যও আমার পথের বাহিরে যাইবার সাধ্য কাহারও নাই। সকলকেই আমার কাছে আসিতে হইবে। যে আমাকে যে-ভাবেই উপাসনা করুক না কেন, আমি তাহাকে সে-ভাবেই অর্থাৎ সেই ফলপ্রদানের দ্বারাই অনুগৃহীত করি এবং ঐ ভাবের মধ্য দিয়াই তাহার নিকট উপস্থিত হই।...'[১] কৃষ্ণের হৃদয় সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

কৃষ্ণ নিজের স্বাতন্ত্র্যে দাঁড়াইয়া আছেন। সেই নির্ভীক ব্যক্তিত্বে আমরা ভয় পাই। আমরা তো সব কিছুর উপর নির্ভর করি—...কয়েকটি মিষ্ট কথার উপর, অবস্থার উপর। যখন আত্মা কিছুরই উপর নির্ভর করেন না, এমন কি জীবনের উপরও নয়—তাহাই তত্ত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত। উপাসনাও এই একই লক্ষ্যে লইয়া যায়। উপাসনার উপর কৃষ্ণ খুব জোর দিয়াছেন। (ঈশ্বরের উপাসনা কর।)

আমরা জগতে নানাপ্রকার উপাসনা দেখিতে পাই। আর্ত ভগবানকে খুব ডাকে।...যাহার ধন-সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, সেও ধনলাভের আশায় খুব প্রার্থনা করে। ঈশ্বরের জন্যই যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন, তাঁহার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। (প্রশ্ন হইতে পারে): 'যদি ঈশ্বর আছেন, তবে এত দুঃখ-কষ্ট কেন?' ভক্ত বলেন, '...জগতে দুঃখ আছে; (কিন্তু) তাই বলিয়া আমি ভগবানকে ভালবাসিতে ছাড়িব না। আমার (দুঃখ) দূর করিবার জন্য আমি তাঁহার উপাসনা করি না। তাঁহাকে আমি ভালবাসি, কেন না তিনি প্রেমস্বরূপ।' অন্য (প্রকারের) উপাসনাগুলি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের; কিন্তু কৃষ্ণ কোন উপাসনারই নিন্দা করেন নাই। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা অপেক্ষা কিছু করা ভাল। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে ক্রমে উন্নত হইবে এবং তাঁহাকে নিষ্কামভাবে ভালবাসিতে পারিবে।...

---

১ গীতা, ৪।১১

এই জীবন যাপন করিয়া কিরূপে পবিত্রতা লাভ করিব? আমাদের সকলকে কি অরণ্য-গুহায় যাইতে হইবে?…না, তাহাতে লাভ কিছু নাই। মন যদি বশীভূত না হয়, তবে গুহায় বাস করিলেও কোন ফল হইবে না, কারণ এই একই মন সেখানেও নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে। আমরা গুহাতেও বিশটি শয়তান (দেখিতে পাইব), কেননা যত সব শয়তান তো মনেই। মন বশে থাকিলে আমরা যেখানেই বাস করি না কেন, উহা গুহার সমান।

আমরা যে-জগৎ দেখিতেছি, আমাদের নিজেদের মানসিক সংস্কারই তাহা সৃষ্টি করে। আমাদেরই চিন্তাধারা বস্তুনিচয়কে সুন্দর বা কুৎসিত করে। সমস্ত সংসারটাই আমাদের মনের মধ্যে। ঠিক দৃষ্টিতে সব কিছু দেখিতে শেখো। প্রথমতঃ এইটি বিশ্বাস কর যে, জগতে প্রত্যেক জিনিসেরই একটি অর্থ আছে। জগতের প্রতিটি দ্রব্যই সৎ, পবিত্র ও সুন্দর। যদি তোমার চোখে কোন কিছু মন্দ ঠেকে, তবে মনে করিও যে যথার্থভাবে তাহা বুঝিতেছ না। সব বোঝা নিজেদের উপর লও।…যখনই আমরা বলিতে প্রলুব্ধ হই যে, জগৎ অধঃপাতে যাইতেছে, তখনই আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত; তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, সংসারের সব কিছু ঠিকভাবে দেখিবার শক্তি আমরা হারাইয়াছি।

দিবারাত্র কাজ কর। 'দেখ, আমি জগতের ঈশ্বর, আমার কোন কর্তব্য নাই। প্রত্যেক কর্তব্যই বন্ধন। কিন্তু আমি কর্মের জন্যই কর্ম করি। যদি ক্ষণমাত্রও আমি কর্ম হইতে বিরত হই, (সব কিছু বিশৃঙ্খল হইবে)।'[১] অতএব কেবল কাজ করিয়া যাও, কিন্তু কর্তব্যবোধে নয়।…

এই সংসার যেন একটি খেলা। তোমরা তাঁহার (ভগবানের) খেলার সাথী। কোন দুঃখ, কোন দুর্গতির কথা না ভাবিয়া কাজ করিয়া যাও। কদর্য বস্তিতে এবং সুসজ্জিত বৈঠকখানায় ভগবানেরই লীলা দেখ। লোককে উন্নত করিবার জন্য কাজ কর! (তাহারা যে পাপী বা হীন, তাহা নয়; কৃষ্ণ এরূপ বলেন না।)

সৎকাজ এত কম হয় কেন জানো? কোন ভদ্রমহিলা একটি বস্তিতে গেলেন।…তিনি কয়েকটি টাকা দিয়া বলিলেন, 'আহা, গরীব বেচারীরা!

১ গীতা; ৩।২২-২৩

ইহা লইয়া সুখী হও।'...আবার কোনও সুন্দরী হয়তো রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে একজন দরিদ্রকে দেখিলেন এবং কয়েকটি পয়সা তাহার সম্মুখে ছুঁড়িয়া দিলেন। ভাবো দেখি, ইহা কিরূপ নিন্দনীয়! আমরা ধন্য যে, এই বিষয়ে তোমাদের বাইবেলে ভগবান আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। যীশু বলিতেছেন, 'তোমরা আমার এই ভ্রাতৃগণের মধ্যে দীনতম ব্যক্তির জন্য ইহা করিয়াছ' বলিয়া ইহা আমারই জন্য করা হইয়াছে।' তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পারো, এইরূপ চিন্তা করাও অধর্ম। প্রথমতঃ সাহায্য করার ভাবটি মন হইতে উৎপাটিত কর, তারপর উপাসনা করিতে যাও। ঈশ্বরের সন্তানসন্ততি যে তোমার প্রভুরই সন্তান। (আর সন্তান তো পিতারই ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি।) তুমি তো তাঁহার সেবক। ...জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা কর! ঈশ্বর তোমার নিকটে অন্ধ, খঞ্জ, দরিদ্র, দুর্বল বা পাপীর মূর্তিতে আসেন। তোমার জন্য উপাসনার কী চমৎকার সুযোগ! যে-মুহূর্তে চিন্তা কর যে, তুমি 'সাহায্য' করিতেছ, তখনই সমস্ত আদর্শটি নষ্ট করিয়া নিজেকে অবনত করিয়া ফেলিয়াছ। এইটি জানিয়া কাজ কর। প্রশ্ন করিবে, 'তার পর?' তোমাকে আর হৃদয়ভেদী ভয়ানক দুঃখে পড়িতে হইবে না।...তখন কর্ম আর বন্ধন হইবে না। কর্ম খেলা হইয়া যাইবে, আনন্দে পরিণত হইবে। কর্ম কর। অনাসক্ত হও। ইহাই সম্পূর্ণ কর্মরহস্য। যদি আসক্ত হও, দুঃখ আসিবে।...

জীবনে আমরা যাহাই করিতে যাই, তাহার সঙ্গে নিজেদের এক করিয়া ফেলি। এই লোকটি কটু কথা বলিল, আমার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ক্রোধের সঙ্গে আমি এক হইয়া গেলাম—তারপরই আসে দুঃখ। নিজেকে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত কর, আর কিছুর সঙ্গে নয়; কারণ আর সব কিছুই অসত্য। অনিত্য অসত্যের প্রতি আসক্তিই দুঃখ আনে। একমাত্র সৎস্বরূপই সত্য; তিনিই একমাত্র জীবন, তাঁহাতে বিষয়-বিষয়ী (object and subject)-বোধ নাই।

কিন্তু নিষ্কাম ভালবাসায় তোমাকে আঘাত পাইতে হইবে না। যাহা কিছু কর, ক্ষতি নাই। বিবাহ করিতে পারো, সন্তানের জনক হইতে পারো ...তোমার যাহা খুশি তাহা করিতে পারো—কিছুই তোমাকে দুঃখ দিবে না; 'অহং'-বুদ্ধিতে কিছু করিও না। কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য কর; কর্মের জন্যই

কর্ম কর। তাহাতে তোমার কি? তুমি নির্লিপ্তভাবে পাশে দাঁড়াইয়া থাকো।

যখন আমরা ঐরূপ অনাসক্তি লাভ করি, তখনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অদ্ভুত রহস্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। তখনই বুঝিতে পারি—একই সঙ্গে কি তীব্র কর্মচাঞ্চল্য ও চরম শান্তি! প্রতিক্ষণে কি কর্ম, আবার কি বিশ্রাম! ইহাই সংসারের রহস্য—একই সত্তায় অকর্তৃত্ব ও কর্তৃত্ব, একই আধারে অনন্ত এবং সান্ত। তখনই আমরা রহস্যটি আবিষ্কার করিব। 'যিনি তীব্র কর্মব্যস্ততার মধ্যে অপার শান্তি এবং অসীম শান্তির মধ্যে চরম কর্মচাঞ্চল্য লাভ করেন, তিনিই যোগী হইয়াছেন।'[১] কেবল তিনিই প্রকৃত কর্মী, আর কেহই নন। আমরা একটু কাজ করিয়াই ভাঙিয়া পড়ি। ইহার কারণ কি? যেহেতু আমরা কাজের সঙ্গে নিজেদের জড়াইয়া ফেলি। যদি আমরা আসক্ত না হই, তাহা হইলে কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিতে পারি।...

এইরূপ অনাসক্তিতে পৌঁছানো কত কঠিন! সেইজন্য কৃষ্ণ আমাদিগকে অপেক্ষাকৃত সহজ পথ ও উপায়গুলির নির্দেশ দিতেছেন। (পুরুষ বা নারী) প্রত্যেকের পক্ষে সহজতম রাস্তা হইতেছে ফলের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বিগ্ন না হইয়া কর্ম করা। বাসনাই বন্ধন সৃষ্টি করে। আমরা যদি কর্মের ফল চাই, তবে শুভই হউক আর অশুভই হউক, উহার ফল ভোগ করিতে হইবেই। কিন্তু যদি আমরা আমাদের নিজেদের জন্য কর্ম না করিয়া ঈশ্বরের মহিমার জন্যই করি, তাহা হইলে ফল নিজের ভাবনা নিজেই ভাবিবে। 'কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে।'[২] সৈনিক ফলের আশা না করিয়া যুদ্ধ করে। সে তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যায়। যদি পরাজয় হয়, তাহা সেনাপতির—সৈনিকের নয়। প্রীতির জন্যই আমরা কর্তব্য করিব—সেনাপতির প্রীতির জন্য, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য।...

যদি শক্তি থাকে, বেদান্তদর্শনের ভাব গ্রহণ কর এবং স্বাধীন হও। যদি তাহা না পারো তো ঈশ্বরের ভজনা কর। তাহাও যদি না পারো, কোন প্রতীকের উপাসনায় ব্রতী হও। ইহাও যদি না পারো, ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া সৎ কাজ কর। তোমার যাহা কিছু আছে, ভগবানের সেবায়

১ গীতা, ৪।১৮
২ গীতা, ২।৪৭

উৎসর্গ কর। যুদ্ধ করিতে থাকো। 'যে-কেহ ভক্তিভরে আমার উদ্দেশে পত্র পুষ্প ফল ও জল অর্পণ করে, আমি তাহা প্রীতির সহিত গ্রহণ করি।'[১] যদি তুমি কিছুই করিতে না পারো, একটি সৎ কাজও যদি তোমার দ্বারা অনুষ্ঠিত না হয়, তবে প্রভুর শরণ লও। 'ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাদিগকে যন্ত্রারূঢ়ের মতো চালাইতেছেন। তুমি সর্বান্তঃকরণে তাঁহারই শরণাগত হও…।'[২]

কৃষ্ণ (গীতায়) ভক্তির আদর্শ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে আলোচনা করিয়াছেন, এগুলি তাহারই কয়েকটি। বুদ্ধ ও যীশুর ভক্তিবিষয়ক উপদেশ আরও অন্যান্য বড় বড় গ্রন্থে আছে।…

কৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিতেছি। যীশু এবং কৃষ্ণের জীবনে প্রচুর সাদৃশ্য আছে। কোন্ চরিত্রটিকে অপরটি হইতে ধার করা হইয়াছে—এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। উভয় ক্ষেত্রেই একজন অত্যাচারী রাজা ছিল। উভয়েরই জন্ম হইয়াছিল অনেকটা এক অবস্থায়। দুইজনেরই মাতাপিতাকে বন্দী করিয়া রাখা হয়। দুইজনকেই দেবদূতেরা রক্ষা করিয়াছিলেন। উভয়ক্ষেত্রেই তাঁহাদের জন্মবৎসরে যে শিশুগুলি ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল। শৈশবাবস্থাও একই প্রকার।… আবার পরিণামে উভয়েই নিহত হন। কৃষ্ণ নিহত হন একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায়; তিনি তাঁহার হত্যাকারীকে স্বর্গে লইয়া যান। খ্রীষ্টকে হত্যা করা হয়; তিনি দস্যুর মঙ্গল কামনা করেন এবং তাহাকে স্বর্গে লইয়া যান।

নিউ টেস্টামেণ্ট এবং গীতার উপদেশগুলিতে অনেক মিল আছে। মানুষের চিন্তাধারা একই পথে অগ্রসর হয়।…কৃষ্ণের নিজের কথায় আমি তোমাদিগকে ইহার উত্তর দিতেছি: 'যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি অবতীর্ণ হই। বার বার আমি আসি। অতএব যখনই দেখিবে কোন মহাত্মা মানবজাতির উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট, জানিবে আমার আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহার পূজা করিবে।…'[৩]

---

১ গীতা, ৯।২৬

২ গীতা, ১৮।৬১

৩ গীতা, ৪।৮ ; ১০।৪১

তিনিই যদি বুদ্ধ বা যীশুরূপে অবতীর্ণ হন, তবে ধর্মে ধর্মে কেন এত মতভেদ? তাঁহাদের উপদেশ অবশ্য পালনীয়। হিন্দু ভক্ত বলিবেন: স্বয়ং ঈশ্বর কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং অন্যান্য আচার্য (লোকগুরু)-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হিন্দু দার্শনিক বলিবেন: ইঁহারা মহাপুরুষ এবং নিত্যমুক্ত। সমস্ত জগৎ কষ্ট পাইতেছে বলিয়া ইঁহারা মুক্ত হইয়াও নিজেদের মুক্তি গ্রহণ করেন না। বার বার তাঁহারা আসেন, নরশরীর ধারণ করেন এবং মানবজাতির হিতসাধন করেন, আশৈশব জানেন—তাঁহারা কে এবং কি উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন…। আমাদের মতো বন্ধনের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে দেহধারণ করিতে হয় না।…নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছাতেই তাঁহারা আসেন। বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি স্বতই তাঁহাদিগের ভিতর সঞ্চিত থাকে। আমরা ঐ শক্তির প্রতিরোধ করিতে পারি না। সেই আধ্যাত্মিকতার ঘূর্ণাবর্ত অগণিত নরনারীকে টানিয়া আনে এবং ইহার গতি চলিতেই থাকে, কেন না এই মহাপুরুষদেরই একজন না একজন পিছন হইতে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন। তাই যতদিন সমগ্র মানবজাতির মুক্তি না হয় এবং এই পৃথিবীর খেলা পরিসমাপ্ত না হয়, ততদিন ইহা চলিতে থাকে।

যাঁহাদের জীবন আমরা অনুধ্যান করিতেছি, সেই মহাপুরুষগণের নাম মহিমান্বিত হউক। তাঁহারাই তো জগতের জীবন্ত ঈশ্বর। তাঁহারাই তো আমাদের উপাস্য। ভগবান যদি মানবীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হন, কেবল তখনই আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি। তিনি তো সর্বত্র বিরাজমান, কিন্তু আমরা কি তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি? মানবদেহে সীমাবদ্ধ হইলেই আমাদের পক্ষে তাঁহাকে দেখা সম্ভব।…যদি মানুষ ও…জীবসকলকে ঈশ্বরেরই বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া মানি, তবে এই আচার্যগণই মানবজাতির নেতা এবং গুরু। অতএব, হে দেববন্দিতচরণ মহাপুরুষগণ, তোমাদিগকে প্রণাম! হে মনুষ্যজাতির পথপ্রদর্শকগণ, তোমাদিগকে প্রণাম! হে মহান্ আচার্যগণ, তোমাদের প্রণাম! হে পথিকৃৎগণ, তোমাদের উদ্দেশে আমাদের চির প্রণতি।

ভগবান বুদ্ধ

(আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েটে প্রদত্ত বক্তৃতা)

প্রত্যেক ধর্মে আমরা এক এক প্রকার সাধনার বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্মে নিষ্কাম কর্মের ভাবটাই বেশী প্রবল। আপনারা বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সম্বন্ধ-বিষয়ে ভুল বুঝিবেন না, এদেশে অনেকেই ঐরূপ করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, বৌদ্ধধর্ম সনাতনধর্মের সহিত সংযোগহীন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্ম ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, ইহা আমাদের সনাতনধর্মেরই সম্প্রদায়বিশেষ। গৌতম নামক মহাপুরুষ কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত। তাৎকালিক অবিরত দার্শনিক বিচার, জটিল অনুষ্ঠানপদ্ধতি, বিশেষতঃ জাতিভেদের উপর তিনি অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, 'আমরা এক বিশেষ কুলে জন্মিয়াছি ; যাহারা এরূপ বংশে জন্মে নাই, তাহাদের অপেক্ষা আমরা শ্রেষ্ঠ।' ভগবান বুদ্ধ জাতিভেদের এইরূপ ব্যাখ্যার বিরোধী ছিলেন। তিনি পুরোহিত-ব্যবসায়ীদের অপকৌশলেরও ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি এমন এক ধর্ম প্রচার করিলেন, যাহাতে সকাম ভাবের লেশমাত্র ছিল না, আর তিনি দর্শন ও ঈশ্বর সম্বন্ধে নানাবিধ মতবাদ আলোচনা করিতে চাহিতেন না ; ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। অনেকে অনেক সময় তাঁহাকে ঈশ্বর আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিতেন, 'ও-সব আমি কিছু জানি না।' মানবের প্রকৃত কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, 'নিজে ভাল কাজ কর এবং ভাল হও।'

একবার তাঁহার নিকট পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের তর্কের মীমাংসা করিয়া দিতে বলিলেন। একজন বলিলেন, 'ভগবন্, আমার শাস্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে এই এই কথা আছে।' অপরে বলিলেন, 'না, না, ও-কথা ভুল ; কারণ আমার শাস্ত্র ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহাকে লাভ করিবার সাধন অন্য প্রকার বলিয়াছে।' এইরূপে অপরেও ঈশ্বরের স্বরূপ ও তৎপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে নিজ নিজ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ভিন্ন-ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যেকের কথা বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিয়া প্রত্যেককে এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

'আচ্ছা, আপনাদের কাহারও শাস্ত্রে কি এ কথা বলে যে, ঈশ্বর ক্রোধী হিংসাপরায়ণ বা অপবিত্র?'

ব্রাহ্মণেরা সকলেই বলিলেন, 'না, ভগবন্, সকল শাস্ত্রেই বলে ঈশ্বর শুদ্ধ ও কল্যাণময়।' ভগবান বুদ্ধ বলিলেন, 'বন্ধুগণ, তবে আপনারা কেন প্রথমে শুদ্ধ, পবিত্র ও কল্যাণকারী হইবার চেষ্টা করুন না, যাহাতে আপনারা ঈশ্বর কি বস্তু জানিতে পারেন?'

অবশ্য আমি তাঁহার সকল মত সমর্থন করি না। আমার নিজের জন্যই আমি দার্শনিক বিচারের যথেষ্ট আবশ্যকতা বোধ করি। অনেক বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার সম্পূর্ণ মতভেদ আছে, কিন্তু মতভেদ আছে বলিয়াই যে আমি তাঁহার চরিত্রের, তাঁহার ভাবের সৌন্দর্য দেখিব না, ইহার কি কোন অর্থ আছে? জগতের আচার্যগণের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই কার্যে কোনরূপ বাহিরের অভিসন্ধি ছিল না। অন্যান্য মহাপুরুষগণ সকলেই নিজদিগকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, আর ইহাও বলিয়া গিয়াছেন, 'আমাকে যাহারা বিশ্বাস করিবে, তাহারা স্বর্গে যাইবে।' কিন্তু ভগবান বুদ্ধ শেষ নিঃশ্বাসের সহিত কি বলিয়াছিলেন? তিনি বলিয়াছিলেন, 'কেহই তোমাকে মুক্ত হইতে সাহায্য করিতে পারে না, নিজের সাহায্য নিজে কর, নিজের চেষ্টা দ্বারা নিজের মুক্তিসাধন কর।' নিজের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'বুদ্ধ-শব্দের অর্থ আকাশের ন্যায় অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন। আমি গৌতম, সেই অবস্থা লাভ করিয়াছি; তোমরাও যদি উহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর, তোমরাও উহা লাভ করিবে।' তিনি সর্ববিধ কামনা- ও অভিসন্ধি-বর্জিত ছিলেন, সুতরাং তিনি স্বর্গগমনের বা ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। তিনি রাজসিংহাসনের আশা ও সর্ববিধ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভারতের পথে পথে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা উদরপূরণ করিতেন এবং সমুদ্রের মতো বিশাল হৃদয় লইয়া নরনারী ও অন্যান্য জীবজন্তুর কল্যাণ যাহাতে হয়, তাহাই প্রচার করিতেন। জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র মহাপুরুষ, যিনি যজ্ঞে পশুহত্যা-নিবারণের উদ্দেশ্যে পশুগণের পরিবর্তে নিজ জীবন বিসর্জনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি একবার জনৈক রাজাকে বলিয়াছিলেন, 'যদি যজ্ঞে ছাগশিশু হত্যা করিলে আপনার স্বর্গগমনের সহায়তা হয়, তবে নরহত্যা করিলে তাহাতে তো আরও অধিক উপকার হইবে, অতএব যজ্ঞস্থলে

আমায় বধ করুন।' রাজা এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। অথচ এই মহাপুরুষ সর্ববিধ-অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন। তিনি কর্মযোগীর আদর্শ; আর তিনি যে উচ্চাবস্থায় আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বেশ বুঝা যায়, কর্ম দ্বারা আমরাও আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে আরোহণ করিতে পারি।

অনেকের পক্ষে একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারিলে সাধনপথ খুব সহজ হইয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধের জীবনালোচনায় স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হয়, তাহার যদি কোনরূপ দার্শনিক মতে বিশ্বাস না থাকে, সে যদি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়, অথবা কোন মন্দিরাদিতেও না যায়, এমন কি প্রকাশ্যে নাস্তিক বা জড়বাদীও হয়, তথাপি সে সেই চরমাবস্থা লাভ করিতে সমর্থ। তাঁহার মতামত বা কার্যকলাপ বিচার করিবার অধিকার আমাদের কিছুমাত্র নাই। আমি যদি বুদ্ধের অপূর্ব হৃদয়বত্তার লক্ষভাগের একভাগেরও অধিকারী হইতাম, তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতাম। হইতে পারে বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, অথবা হয়তো বিশ্বাস করিতেন না, তাহা আমার চিন্তনীয় বিষয় নয়। কিন্তু অপরে ভক্তি, যোগ বা জ্ঞানের দ্বারা যে পূর্ণ অবস্থা লাভ করে, তিনিও তাহাই লাভ করিয়াছিলেন। কেবল ইহাতে উহাতে বিশ্বাস করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না। কেবল মুখে ধর্মের কথা, ঈশ্বরের কথা আওড়াইলেই কিছু হয় না। তোতা পাখীকেও যাহা শিখাইয়া দেওয়া যায়, তাহাই সে আবৃত্তি করিতে পারে। নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে পারিলেই তাহা দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

বুদ্ধের বাণী

(১৯০০ খৃঃ ১৮ই মার্চ স্যান ফ্র্যান্সিস্কোতে প্রদত্ত ভাষণ)

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম—দার্শনিক দৃষ্টিতে নয়; কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধর্মান্দোলন সর্বাধিক প্রবল আকারে দেখা দিয়েছিল, মানবসমাজের ওপর এই আন্দোলন সবচেয়ে শক্তিশালী আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ফেটে পড়েছিল। এমন কোন সভ্যতা নেই, যার ওপর কোন না কোন ভাবে এর প্রভাব অনুভূত হয়নি।

বুদ্ধের অনুগামীরা খুব উদ্যমী ও প্রচারশীল ছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁরাই সর্বপ্রথম নিজ ধর্মের সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে সন্তুষ্ট না থেকে দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। পূর্ব-পশ্চিমে, উত্তর-দক্ষিণে তাঁরা ভ্রমণ করেছেন। তমসাচ্ছন্ন তিব্বতে তাঁরা প্রবেশ করেছেন; পারস্য, এশিয়া-মাইনরে তাঁরা গিয়েছিলেন; রুশ, পোল্যাণ্ড এবং এমন আরও অনেক পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও তাঁরা গেছেন। চীন, কোরিয়া, জাপানে তাঁরা গিয়েছিলেন; ব্রহ্ম, শ্যাম, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং আরও বিস্তৃত ভূখণ্ডে তাঁরা ধর্মপ্রচার করেছিলেন। সামরিক জয়যাত্রার ফলে মহাবীর আলেকজাণ্ডার যখন সমগ্র ভূমধ্য-অঞ্চল ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করলেন, ভারতের মনীষাও তখনই এশিয়া ও ইওরোপের বিশাল দেশগুলির মধ্যে বিস্তৃতির পথ খুঁজে পেয়েছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দেশে দেশে গিয়ে ধর্মপ্রচার করেন, আর তাঁদের শিক্ষার ফলে সূর্যোদয়ে কুয়াশার মতো কুসংস্কার এবং পুরোহিতদের অপকৌশলগুলি বিদূরিত হতে লাগলো।

এই আন্দোলনকে ঠিক ঠিক বুঝতে গেলে, বুদ্ধের আবির্ভাব-কালে ভারতে যে-অবস্থা ছিল, তা জানা দরকার—যেমন খ্রীষ্টধর্মকে বুঝতে হ'লে খ্রীষ্টের সমকালীন ইহুদী সমাজের অবস্থাটি উপলব্ধি করা আবশ্যক। খ্রীষ্ট-জন্মের ছয়শত বৎসর পূর্বে যখন ভারতীয় সভ্যতার চরম বিকাশ হয়েছিল, সেই ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে আপনাদের কিছু ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

ভারতীয় সভ্যতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অনেকবারই তার পতন ও অভ্যুদয় হয়েছে—এটাই তার বৈশিষ্ট্য। বহু জাতিরই একবার উত্থানের

পর পতন হয় চিরতরে। দু-রকম জাতি আছেঃ এক হচ্ছে ক্রমবর্ধমান, আর এক আছে যাদের উন্নতির অবসান হয়েছে। শান্তিপ্রিয় ভারত ও চীনের পতন হয়, কিন্তু আবার উত্থানও হয়; কিন্তু অন্যান্য জাতিগুলি একবার তলিয়ে গেলে আর ওঠে না—তাদের হয় মৃত্যু। শান্তিকামীরাই ধন্য, কারণ শেষ পর্যন্ত তারাই পৃথিবী ভোগ করে।

যে-যুগে বুদ্ধের জন্ম, সে-যুগে ভারতবর্ষে একজন মহান্ ধর্মনেতার—আচার্যের প্রয়োজন হয়েছিল। পুরোহিতকুল ইতিমধ্যেই খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ইহুদীদের ইতিহাস স্মরণ করলেই বেশ বোঝা যায়, তাদের দু-রকম ধর্মনেতা ছিলেন—পুরোহিত এবং ধর্মগুরু[১]; পুরোহিতরা জনসাধারণকে শুধু অন্ধকারেই ফেলে রাখত, আর তাদের মনে যত কুসংস্কারের বোঝা চাপাত। পুরোহিতদের অনুমোদিত উপাসনা-পদ্ধতিগুলি ছিল মানুষের উপর আধিপত্য কায়েম রাখবার অপকৌশল মাত্র। সমগ্র 'ওল্ড টেষ্টামেণ্টে' (Old Testament) দেখা যায় ধর্মগুরুরা পুরোহিতদের কুসংস্কারগুলির বিরোধিতা করছেন। আর এই বিরোধের পরিণতি হ'ল ধর্মগুরুদের জয় এবং পুরোহিতদের পতন।

পুরোহিতরা বিশ্বাস ক'রত—ঈশ্বর একজন আছেন বটে, কিন্তু এই ঈশ্বরকে জানতে হ'লে একমাত্র তাদের সাহায্যেই জানতে হবে। পুরোহিতদের কাছ থেকে ছাড়পত্র পেলেই মানুষ পবিত্র বেদীর কাছে যেতে পারবে! পুরোহিতদের প্রণামী দিতে হবে, পূজা করতে হবে এবং তাঁদেরই হাতে যথা-সর্বস্ব অর্পণ করতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে বারবার এই পুরোহিত-প্রাধান্যের অভ্যুত্থান হয়েছে; এই মারাত্মক ক্ষমতালিপ্সা, এই ব্যাঘ্র-সুলভ তৃষ্ণা সম্ভবতঃ মানুষের একটি আদিম বৃত্তি। পুরোহিতরাই সর্ববিষয়ে কর্তৃত্ব করবে, সহস্র রকম বিধিনিষেধ জারি করবে, সরল সত্যকে নানা জটিল আকারে ব্যাখ্যা করবে, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক অনেক কাহিনীও শোনাবে। যদি এই জন্মেই প্রতিষ্ঠা চাও অথবা মৃত্যুর পরে স্বর্গে যেতে চাও তো তাদের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যত রকম আচার-অনুষ্ঠান আছে, সব করতে হবে। এগুলি জীবনকে এতই জটিল এবং বুদ্ধিকে এতই বিভ্রান্ত করে যে, আমি সোজাসুজিভাবে কোন কথা বললেও আপনারা অতৃপ্ত হয়ে ফিরে যাবেন। ধর্মাচার্যেরা

১ Priests and Prophets

পুরোহিতদের বিরুদ্ধে এবং তাঁদের কুসংস্কার ও মতলব সম্বন্ধে বার বার সতর্ক ক'রে দিয়েছেন, কিন্তু জনসাধারণ এখনও সে-সব সতর্কবাণী শুনতে শেখেনি—এখনও তাদের অনেক কিছু শিক্ষা করতে হবে।

মানুষকে শিক্ষাগ্রহণ করতেই হবে। আজকাল গণতন্ত্র এবং সাম্যের কথা সকলেই বলে থাকে, কিন্তু একজন যে আর একজনের সমান, এ-কথা সে জানবে কি ক'রে? এজন্য তার থাকা চাই—সবল মস্তিষ্ক এবং নিরর্থক ভাব-মুক্ত পরিষ্কার মন; সমস্ত অসার সংস্কাররাশিকে ভেদ ক'রে অন্তরের গভীরে যে শুদ্ধ সত্য আছে, তাতেই তার মনকে ভরিয়ে দিতে হবে। তখনই সে জানবে যে, পূর্ণতা ও সমগ্র শক্তি তার মধ্যে আগে থেকেই রয়েছে—অপর কেউ এগুলি তাকে দিতে পারে না। যখনই সে এইটি বোধ করে, সেই মুহূর্তেই সে মুক্ত হয়ে যায়, সে সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে তখন অনুভব করে, প্রত্যেকেই তারই মতো পূর্ণ এবং অন্য ভাইয়ের উপর কোন রকম দৈহিক মানসিক বা নৈতিক ক্ষমতা জাহির করবার কিছুই আর তার থাকে না। তার চেয়ে ছোট কেউ থাকতে পারে—এই ভাবটি সে একেবারে ত্যাগ করে। তখনই সে সাম্যের কথা বলতে পারে, তার পূর্বে নয়।

যাক, যা বলছিলাম, ইহুদীদের মধ্যে পুরোহিত আর ধর্মগুরুদের বিরোধ অবিরাম চলছিল, এবং সব রকম শক্তি ও বিদ্যাকে পুরোহিতরা একচেটিয়া অধিকারে রাখতে সচেষ্ট ছিল, যতদিন না তারা নিজেরাই সেই শক্তি ও বিদ্যা হারিয়ে ফেলেছিল। যে শৃঙ্খল তারা সাধারণ মানুষের পায়ে পরাতে আরম্ভ করেছিল, তা তাদের নিজেদেরই পায়ে পরতে হয়েছিল। প্রভুরাই শেষ পর্যন্ত দাস হয়ে দাঁড়ায়। এই বিরোধের পরিণতিই হ'ল ন্যাজারেথবাসী যীশুর বিজয়—এই জয়লাভই হচ্ছে খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস। খ্রীষ্ট অবশেষে রাশীকৃত শয়তানি সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করতে পেরেছিলেন। এই মহাপুরুষ পৌরোহিত্য-রূপ দানবীয় স্বার্থপরতাকে নিধন করেন এবং তার কবল থেকে সত্যরত্ন উদ্ধার ক'রে বিশ্বের সকলকেই তা দিয়েছিলেন, যাতে যে-কেউ সেই সত্য লাভ করতে চায়, স্বাধীনভাবেই সে তা পেতে পারে। এজন্য কোন পুরোহিতের মর্জির অপেক্ষায় তাকে থাকতে হবে না।

ইহুদীরা কোনকালেই তেমন দার্শনিক জাতি নয়; ভারতীয়দের মতো সূক্ষ্ম বুদ্ধি তাদের ছিল না বা ভারতীয় মননশীলতাও তারা লাভ করেনি।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমান্ এবং আত্মিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রবর্তক তো তাঁরাই, আর সত্যিই তাঁরা বিস্ময়কর সব কাজও করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণদের সেই উদার মনোভাবটি লুপ্ত হয়ে গেল। তাঁরা নিজেদের ক্ষমতা ও অধিকার নিয়ে ঔদ্ধত্য দেখাতে শুরু করলেন। কোন ব্রাহ্মণ যদি কাউকে খুনও করতেন, তবুও তাঁর কোন শাস্তি হ'ত না। ব্রাহ্মণ তাঁর জন্মগত অধিকারবলেই বিশ্বের অধীশ্বর। এমন কি অতি দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণকেও সম্মান দেখাতে হবে।

কিন্তু পুরোহিতরা যখন বেশ জাঁকিয়ে উঠেছেন, তখন সন্ন্যাসী নামে তত্ত্বজ্ঞ ধর্মাচার্যেরাও ছিলেন। প্রত্যেক হিন্দু, তা তিনি যে বর্ণেরই হোন না কেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের জন্য সব কর্ম পরিত্যাগ ক'রে মৃত্যুরও সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এ সংসার যাঁদের কোনমতেই ভাল লাগে না, তাঁরা গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হন। পুরোহিতদের উদ্ভাবিত এরূপ দু-হাজার আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে সন্ন্যাসীরা মোটেই মাথা ঘামান না; যথা: কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ কর—দশ অক্ষর, দ্বাদশ অক্ষর ইত্যাদি ইত্যাদি; এগুলি বাজে জিনিস।

প্রাচীন ভারতের তত্ত্বদর্শী ঋষিরা পুরোহিতদের নির্দেশকে অস্বীকার ক'রে শুদ্ধ সত্য প্রচার করেছিলেন। পুরোহিতদের শক্তিকে তাঁরা বিনষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং কিছু করেওছিলেন। কিন্তু দুই পুরুষ যেতে না যেতেই তাঁদের শিষ্যেরা ঐ পুরোহিতদেরই কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুটিল পথের অনুবর্তন করতে লাগলেন—ক্রমে তাঁরাও পুরোহিত হয়ে দাঁড়ালেন ও বললেন, 'আমাদের সাহায্যেই সত্যকে জানতে পারবে!' এইভাবে সত্য বস্তু আবার কঠিন স্ফটিকাকার ধারণ ক'রল; সেই শক্ত আবরণ ভেঙে সত্যকে মুক্ত করবার জন্য ঋষিগণ বার বার এসেছেন। হ্যাঁ, সাধারণ মানুষ ও সত্যদ্রষ্টা ঋষি—দুই-ই সর্বদা থাকবে, নতুবা মনুষ্যজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

তোমরা অবাক হচ্ছ যে, পুরোহিতদের এত সব জটিল নিয়ম-কানুন কেন? তোমরা সোজাসুজি সত্যের কাছে আসতে পারো না কেন? তোমরা কি সত্যকে প্রচার করতে লজ্জিত হচ্ছ, নতুবা এত সব দুর্বোধ্য আচার-বিচারের আড়ালে সত্যকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা কেন? জগতের সম্মুখে

সত্যকে স্বীকার করতে পারছ না ব'লে তোমরা কি ঈশ্বরের কাছে লজ্জিত নও? এই কি তোমাদের ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা? পুরোহিতরাই সত্য-প্রচারের যোগ্য পুরুষ! সাধারণ মানুষ সত্যের যোগ্য নয়? সত্যকে সহজবোধ্য করতে হবে, কিছুটা তরল করতে হবে।

যীশুর শৈলোপদেশ (Sermon on the Mount) এবং গীতাই ধরা যাক—অতি সহজ সরল সে-সব কথা। একজন রাস্তার লোকও তা বুঝতে পারে। কী চমৎকার! সত্য অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সরলভাবেই এখানে প্রকাশিত। কিন্তু না, ঐ পুরোহিতরা এত সহজেই সত্যকে ধরে ফেলাটা পছন্দ করবে না। তারা দু-হাজার স্বর্গ আর দু-হাজার নরকের কথা শোনাবেই। লোকে যদি তাদের বিধান মেনে চলে, তবে স্বর্গে গতি হবে; আর তাদের অনুশাসন না মানলে লোকে নরকে যাবে।

কিন্তু সত্যকে মানুষ ঠিকই জানবে। কেউ কেউ ভয় পান যে, যদি পূর্ণ-সত্য সাধারণকে ব'লে ফেলা হয়, তবে তাদের অনিষ্টই হবে। এঁরা বলেন—নির্বিশেষ সত্য লোককে জানানো উচিত নয়। কিন্তু সত্যের সঙ্গে আপসের ভাবে চলেও জগতের এমন কিছু একটা মঙ্গল হয়নি। এ পর্যন্ত যা হয়েছে, তার চেয়ে খারাপ আর কী হবে? সত্যকেই ব্যক্ত কর। যদি তা যথার্থ হয়, তবে অবশ্যই তাতে মঙ্গল হবে। লোকে যদি তাতে প্রতিবাদ করে বা অন্য কোন প্রস্তাব নিয়ে আসে, তা হ'লে শয়তানির পক্ষই সমর্থন করা হবে।

বুদ্ধের আমলে ভারতবর্ষ এই-সব ভাবে ভরে গিয়েছিল। নিরীহ জনসাধারণকে তখন সর্বপ্রকার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখা হয়েছিল। বেদের একটিমাত্র শব্দও কোন বেচারার কানে প্রবেশ করলে তাকে দারুণ শাস্তি ভোগ করতে হ'ত। প্রাচীন হিন্দুদের দ্বারা দৃষ্ট বা অনুভূত সত্যরাশি বেদকে পুরোহিতরা গুপ্ত সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল!

অবশেষে একজন আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁর ছিল বুদ্ধি, শক্তি ও হৃদয়—উন্মুক্ত আকাশের মতো অনন্ত হৃদয়। তিনি দেখলেন জনসাধারণ কেমন ক'রে পুরোহিতদের দ্বারা চালিত হচ্ছে, আর পুরোহিতরাও কিভাবে শক্তিমত্ত হয়ে উঠেছে। এর একটা বিহিত করতেও তিনি উদ্যোগী হলেন। কারও ওপর কোন আধিপত্য বিস্তার করতে তিনি চাননি। মানুষের মানসিক বা আধ্যাত্মিক সব রকম বন্ধনকে চূর্ণ করতে উদ্যত

হয়েছিলেন তিনি। তাঁর হৃদয়ও ছিল বিশাল। প্রশস্ত হৃদয়—আমাদের মধ্যে আরও অনেকেরই আছে এবং সকলকে সহায়তা করতে আমরাও চাই। কিন্তু আমাদের সকলেরই বুদ্ধিমত্তা নেই ; কি উপায়ে কিভাবে সাহায্য করা যায়, তা জানা নেই। মানবাত্মার মুক্তির পথ উদ্ভাবন করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি এই মানুষটির ছিল। লোকের কেন এত দুঃখ—তা তিনি জেনেছিলেন, আর এই দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সর্বগুণান্বিত মানুষ ছিলেন তিনি, সব কিছুর সমাধান করেছিলেন তিনি। তিনি নির্বিচারে সকলকেই উপদেশ দিয়ে বোধিলব্ধ শান্তি উপলব্ধি করতে তাদের সাহায্য করেছিলেন। ইনিই মহামানব বুদ্ধ।

তোমরা আর্নলড্-এর 'এশিয়ার আলো' (The Light of Asia)[১] কাব্যে পড়েছ : বুদ্ধ একজন রাজপুত্র ছিলেন এবং জগতের দুঃখ তাঁকে কত গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল ; ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে লালিত হলেও নিজের ব্যক্তিগত সুখ ও নিরাপত্তা তাঁকে মোটেই শান্তি দিতে পারেনি ; পত্নী এবং নবজাত শিশু-সন্তানকে রেখে কীভাবে তিনি সংসার ত্যাগ করেন ; সত্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সাধু-মহাত্মাদের দ্বারে দ্বারে তিনি কতই ঘুরেছিলেন এবং অবশেষে কেমন ক'রে বোধিলাভ করলেন। তাঁর বিশাল ধর্মান্দোলন, শিষ্যমণ্ডলী এবং ধর্মসঙ্ঘের কথাও আপনারা জানেন। এ-সবই জানা কথা।

ভারতে পুরোহিত ও ধর্মাচার্যদের মধ্যে যে বিরোধ চলছিল, বুদ্ধ তার মূর্তিমান বিজয় রূপে দেখা দিলেন। ভারতবর্ষীয় পুরোহিতদের সম্পর্কে একটি কথা কিন্তু বলে রাখা দরকার—তাঁরা কোনদিনই ধর্মের ব্যাপারে অসহিষ্ণু ছিলেন না ; ধর্মদ্রোহিতাও তাঁরা করেননি কখনও। যে-কেউ তাঁদের বিরুদ্ধে অবাধে প্রচার করতে পারত। তাঁদের ধর্মবুদ্ধি এ-রকম ছিল যে, কোন ধর্মমতের জন্য তাঁরা কোনকালে কাউকে নির্যাতিত করেননি। কিন্তু পুরোহিতকুলের অদ্ভুত দুর্বলতা তাঁদের পেয়ে বসেছিল ; তাঁরাও ক্ষমতালোভী হলেন, নানা আইন-কানুন বিধি-বিধান তৈরি ক'রে ধর্মকে অনাবশ্যকভাবে জটিল ক'রে তুলছিলেন, আর এইভাবেই তাঁদের ধর্মের যারা অনুগামী, তাদের শক্তিকে খর্ব ক'রে দিয়েছিলেন।

---

১ *Light of Asia*—Edwin Arnold

ধর্মের এইসব বাড়াবাড়ির মূলোচ্ছেদ করলেন বুদ্ধ। অতিশয় স্পষ্ট সত্যকে তিনি প্রচার করেছিলেন। নির্বিচারে সকলের মধ্যে তিনি বেদের সারমর্ম প্রচার করেছিলেন; বৃহত্তর জগৎকেও তিনি এই শিক্ষা দেন, কারণ তাঁর সমগ্র উপদেশাবলীর মধ্যে মানব-মৈত্রী অন্যতম। মানুষ সকলেই সমান, বিশেষ অধিকার কারও নেই। বুদ্ধ ছিলেন সাম্যের আচার্য। প্রত্যেক নর-নারীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনে সমান অধিকার—এই ছিল তাঁর শিক্ষা। পুরোহিত ও অপরাপর বর্ণের মধ্যে ভেদ তিনি দূর করেন। নিকৃষ্টতম ব্যক্তিও উচ্চতম আধ্যাত্মিক রাজ্যের যোগ্য হ'তে পেরেছিল; নির্বাণের উদার পথ তিনি সকলের জন্যই উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের মতো দেশেও তাঁর বাণী সত্যই খুব বলিষ্ঠ। যতপ্রকার ধর্মই প্রচার করা হোক, কোন ভারতীয়ই তাতে ব্যথিত হয় না। কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ হজম করতে ভারতকে একটু বেগ পেতে হয়েছিল। আপনাদের কাছে তা আরও কত কঠিন লাগবে!

তাঁর বাণী ছিল এই: আমাদের জীবনে এত দুঃখ কেন? কারণ আমরা অত্যন্ত স্বার্থপর। আমরা শুধু নিজেদেরই জন্য সব কিছু বাসনা করি—তাই তো এত দুঃখ। এ থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কী? আত্মবিসর্জন। 'অহং' ব'লে কিছু নেই—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই ক্রিয়াশীল জগৎ মাত্র আছে। জীবন-মৃত্যুর গতাগতির মূলে 'আত্মা' ব'লে কিছু নেই। আছে শুধু চিন্তা-প্রবাহ, একটির পর আর একটি সঙ্কল্প। সঙ্কল্পের একটি ফুট উঠল, আবার বিলীন হয়ে গেল সেই মুহূর্তেই—এইমাত্র। এই চিন্তা বা সঙ্কল্পের কর্তা কেউ নেই—কোন জ্ঞাতাও নেই। দেহ অনুক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে—মন এবং বুদ্ধিও পরিবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং 'অহং' নিছক ভ্রান্তি। যত স্বার্থপরতা, তা এই 'অহং'—মিথ্যা 'অহং'কে নিয়েই। যদি জানি যে 'আমি' ব'লে কিছু নেই, তা হলেই আমরা নিজেরা শান্তিতে থাকব এবং অপরকেও সুখী করতে পারব।

এই ছিল বুদ্ধের শিক্ষা। তিনি শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি; জগতের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'পশুবলি যদি কল্যাণের হয়, তবে তো মনুষ্যবলি অধিকতর কল্যাণের'—এবং নিজেকেই তিনি যূপকাষ্ঠে বলি দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন,

'পশুবলি হচ্ছে অন্যতম কুসংস্কার। ঈশ্বর আর আত্মা—এ দুটিও কুসংস্কার। ঈশ্বর হচ্ছেন পুরোহিতদের উদ্ভাবিত এক কুসংস্কার মাত্র। পুরোহিতদের কথা মতো যদি সত্যই কোন একজন ঈশ্বর থাকেন, তবে জগতে এত দুঃখ কেন? তিনি তো দেখছি আমারই মতন কার্য-কারণের অধীন। যদি তিনি কার্য-কারণের অতীত, তা হ'লে সৃষ্টি করেন কিসের জন্য? এ-রকম ঈশ্বর মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। স্বর্গে বসে একজন শাসক তাঁর আপন মর্জি অনুযায়ী দুনিয়াকে শাসন করছেন, এবং আমাদের এখানে ফেলে রেখে দিয়েছেন শুধু জ্বলে-পুড়ে মরবার জন্য—আমাদের দিকে করুণায় ফিরে তাকাবার মতো এক মুহূর্ত অবসরও তাঁর নেই! সমগ্র জীবনটাই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের; কিন্তু তাও যথেষ্ট শাস্তি নয়—মৃত্যুর পরেও আবার নানা স্থানে ঘুরতে হবে এবং আরও অন্যান্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। তথাপি এই বিশ্বস্রষ্টাকে খুশী করবার জন্য আমরা কতই না যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়া-কাণ্ড ক'রে চলেছি!'

বুদ্ধ বলেছেন: এ-সব আচার-অনুষ্ঠান—সবই ভুল। জগতে আদর্শ মাত্র একটিই। সব মোহকে বিনষ্ট কর; যা সত্য তাই শুধু থাকবে। মেঘ সরে গেলেই সূর্যালোক ফুটে উঠবে। 'অহং'-এর বিনাশ কিভাবে হবে? সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হও; একটি সামান্য পিপীলিকার জন্যও প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকো। কোন কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে কর্ম করবে না, কোন ভগবানকে খুশী করবার জন্যও নয় বা কোন পুরস্কারের লোভেও নয়—কারণ শুধু 'অহং'কে বিনাশ ক'রে তুমি নিজের নির্বাণ চাইছ! পূজা-উপাসনা এ-সব নিতান্ত অর্থহীন। তোমরা সবাই বলো 'ভগবানকে ধন্যবাদ'—কিন্তু কোথায় তিনি? কেউই জানো না, অথচ 'ভগবান, ভগবান' ক'রে সবাই মেতে উঠেছ।

হিন্দুরা তাদের ঈশ্বর ছাড়া আর সব-কিছুই ত্যাগ করতে পারে। ঈশ্বরকে অস্বীকার করার মানে ভক্তির মূল উৎপাটন করা। ভক্তি ও ঈশ্বরকে হিন্দুরা আঁকড়ে থাকবেই। তারা কখনই এ-দুটি পরিত্যাগ করতে পারে না। আর বুদ্ধের শিক্ষায় দেখ—ঈশ্বর ব'লে কেউ নেই, আত্মা কিছু নয়, শুধু কর্ম। কিসের জন্য? 'অহং'-এর জন্য নয়, কেন না তাও এক ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি দূর হলেই আমরা আমাদের নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত

হবো। জগতে এমন লোক সত্যই মুষ্টিমেয়, যারা এতখানি উঁচুতে উঠতে পারে এবং নিছক কর্মের জন্যই কর্ম করে।

তথাপি এই বুদ্ধের ধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। এর একমাত্র কারণ বিস্ময়কর ভালবাসা, যা মানব-ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি মহৎ হৃদয়কে বিগলিত করেছিল—শুধু মানুষের সেবায় নয়, সর্ব প্রাণীর সেবায় যা নিবেদিত হয়েছিল, যে ভালবাসা সাধারণের দুঃখমোচন ভিন্ন অপর কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখে না।

মানুষ ভগবানকে ভালবাসছিল, কিন্তু মনুষ্য-ভ্রাতাদের কথা ভুলেই গিয়েছিল। ঈশ্বরের জন্য মানুষ নিজের জীবন পর্যন্ত বলি দিতে পারে, আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের নামে সে নরহত্যাও করতে পারে। এই ছিল জগতের অবস্থা। ভগবানের মহিমার জন্য তারা পুত্র বিসর্জন দিত, দেশ লুণ্ঠন ক'রত, সহস্র সহস্র জীবহত্যা ক'রত, এই ধরিত্রীকে রক্তস্রোতে প্লাবিত ক'রত ভগবানেরই জয় দিয়ে। এই সর্বপ্রথম তারা ঈশ্বরের অপর মূর্তি মানুষের দিকে ফিরে তাকালো। মানুষকেই ভালবাসতে হবে। সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য গভীর প্রেমের প্রথম প্রবাহ—সত্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের এই প্রথম তরঙ্গ, যা ভারতবর্ষ থেকে উত্থিত হয়ে ক্রমশঃ উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমের নানা দেশকে প্লাবিত করেছে।

সত্য যেন সত্যেরই মতো ভাস্বর থাকে, এটিই ছিল এই আচার্যের ইচ্ছা। কোন রকম নতি বা আপসের বালাই নেই; কোন পুরোহিত, কোন ক্ষমতাপন্ন লোক, কোন রাজার তোষামোদ করবারও আবশ্যক নেই। কোন কুসংস্কারমূলক আচারের কাছে—তা যত প্রাচীনই হোক না কেন, কারও মাথা নোয়াবার প্রয়োজন নেই; সুদূর অতীতকাল থেকে চলে আসছে বলেই কোন অনুষ্ঠান বা পুঁথিকে মেনে নিলে চলবে না। সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ এবং ধর্মীয় তন্ত্র-মন্ত্র তিনি অস্বীকার করেছেন। এমন কি যে সংস্কৃত ভাষায় বরাবর ভারতবর্ষে ধর্ম শিক্ষা চলে আসছিল, তাও তিনি বর্জন করেছিলেন, যাতে তাঁর অনুগামীরা ঐ ভাষার সঙ্গে সংযুক্ত সংস্কারগুলি কোনরূপে গ্রহণ করতে না পারে।

যে-তত্ত্বটি এতক্ষণ আমরা আলোচনা করছিলাম, তাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা যায়—হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। আমরা বলি, বুদ্ধের এই আত্মত্যাগের

শিক্ষাকে আমাদের দৃষ্টিতে বিচার করলে আরও ভাল ক'রে বুঝতে পারা যাবে। উপনিষদে আত্মা ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে গভীর তত্ত্বের কথা আছে। আত্মা আর পরব্রহ্ম অভিন্ন। যা-কিছু সবই আত্মা—একমাত্র আত্মাই সৎ-বস্তু। মায়াতে আমরা আত্মাকে বহু দেখি। আত্মা কিন্তু এক, বহু নয়। সেই এক আত্মাই নানারূপে প্রতিভাত হয়। মানুষ মানুষের ভাই, কারণ সব মানুষই এক। বেদ বলেন : মানুষ শুধু আমার ভাই নয়, সে আমার স্বরূপ। বিশ্বের কোন অংশকে আঘাত ক'রে আমি নিজেকেই আঘাত করি। আমিই বিশ্বজগৎ। আমি যে ভাবি, আমি অমুক—ইহাই মায়া। প্রকৃত স্বরূপের দিকে যতই অগ্রসর হবে, এই মায়াও তত দূরে যাবে। বিভিন্নত্ব ও ভেদবুদ্ধি যতই লোপ পাবে, ততই বোধ করবে যে সবই এক পরমাত্মা। ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তিনি একজন কেউ আকাশে বসে নেই। তিনি শুদ্ধ আত্মা। কোথায় তাঁর অধিষ্ঠান? তোমার অন্তরের অন্তস্তলেই তিনি রয়েছেন; তিনিই হচ্ছেন অন্তরাত্মা। তোমার নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক ক'রে কিভাবে তাঁকে ধারণা করবে? যখন তুমি তাঁকে তোমা থেকে স্বতন্ত্র ব'লে ভাবছ, তখন তাঁকে জানতে পার না; 'তুমিই তিনি'—এটিই ভারতীয় ঋষিদের বাণী।

তুমি অমুককে দেখছ—এবং জগতের সবই তোমা থেকে পৃথক, এ-রকম ভাব নিছক স্বার্থপরতা। তুমি মনে কর, তুমি আর আমি ভিন্ন। আমার কথা তুমি একটুও ভাবো না। তুমি ঘরে গিয়ে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লে। আমি মরে গেলেও তোমার ভোজন পান ও আনন্দ ঠিকই থাকে। কিন্তু সংসারের বাকী লোক যখন কষ্ট পায়, তখন তুমি সুখ ভোগ করতে পার না। আমরা সকলেই এক। বৈষম্যের ভ্রমই যত দুঃখের মূল। আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই—কিছুই নেই।

বুদ্ধের শিক্ষা হ'ল—ঈশ্বর ব'লে কিছু নেই, মানুষই সব। ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রচলিত যাবতীয় মনোভাবকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, এই মনোভাব মানুষকে দুর্বল এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে! সব-কিছুর জন্য যদি ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা করবে, তা হ'লে কে আর কর্ম করতে বেরোচ্ছে, বলো? যারা কর্ম করে, ঈশ্বর তাদেরই কাছে আসেন। যারা নিজেদের সাহায্য করে, ভগবান তাদেরই সাহায্য করেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে অন্য

ধারণা আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে শিথিল ও পেশীগুলোকে দুর্বল ক'রে দেয়, আর আমাদের পরনির্ভরশীল ক'রে তোলে। যেখানে স্বাধীনতা, সেইখানেই শান্তি; যখনই পরাধীনতা, তখনই দুঃখ। মানুষের নিজের মধ্যে অনন্ত শক্তি, এবং সে তা বোধ করতে পারে—সে উপলব্ধি করতে পারে যে, সে-ও অনন্ত আত্মা। নিশ্চয়ই তা সম্ভব, কিন্তু তোমরা তো বিশ্বাস কর না। তোমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রছ, আবার সর্বদা নিজেদের বারুদও তাজা রাখছ।

বুদ্ধের শিক্ষা ঠিক বিপরীত। মানুষকে আর কাঁদতে দিও না। পূজা-প্রার্থনার কোন দরকার নেই। ভগবান তো আর দোকান খুলে বসেননি? প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে তুমি ভগবানেরই উপাসনা ক'রছ। আমি যে কথা বলছি, এও এক উপাসনা; আর তোমরা যে শুনছ, সেও এক রকম পূজা। তোমাদের কি এমন কোন মানসিক বা শারীরিক ক্রিয়া আছে, যার দ্বারা তোমরা সেই অনন্ত শক্তিমান ঈশ্বরের ভজনা ক'রছ না? সব ক্রিয়াই তাঁর নিরন্তর উপাসনা। যদি ভেবে থাকো, কতকগুলি শব্দই হচ্ছে পূজা, তা হ'লে সে পূজা নিতান্তই বাহ্য। এমন পূজা-প্রার্থনা মোটেই ভাল নয়, তাতে কখন কোন প্রকৃত ফল পাওয়া যায় না।

প্রার্থনা মানে কি কোন যাদুমন্ত্র, কোন রকম পরিশ্রম না ক'রে শুধু তা উচ্চারণ করলেই তুমি আশ্চর্য ফল লাভ করবে? কখনই না। সকলকেই পরিশ্রম করতে হবে; অনন্ত শক্তির গভীরে সকলকেই ডুব দিতে হবে। ধনী-দরিদ্র সবারই ভিতরে সেই একই অনন্ত শক্তি। একজন কঠোর শ্রম করবে, আর একজন কয়েকটি কথা বার বার ব'লে ফল লাভ করবে—এ মোটেই সত্য নয়। এ বিশ্বজগৎও একটি নিরন্তর প্রার্থনা। যদি এই অর্থে প্রার্থনাকে বুঝতে চেষ্টা করো, তবেই তোমাদের সঙ্গে আমি একমত। কথার প্রয়োজন নেই; নীরব পূজা বরং ভাল।

এই মতবাদের যথার্থ মর্ম কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বোঝে না। ভারতবর্ষে আত্মা সম্বন্ধে কোন-রকম আপসের অর্থ পুরোহিত-মণ্ডলীর হাতে সব ক্ষমতা তুলে দেওয়া, এবং আচার্যদের সমস্ত শিক্ষা ভুলে যাওয়া। বুদ্ধ এ-কথা জানতেন; তাই তিনি পুরোহিত-অনুশাসিত সর্বপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করেছিলেন এবং মানুষকে তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলেন। জনসাধারণের অভ্যস্ত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে তাঁর দাঁড়াবার প্রয়োজন হয়ে

পড়েছিল; অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন তাঁকে আনতে হয়েছিল। ফলে এই যাগ-যজ্ঞমূলক ধর্ম ভারত থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে যায়, কোনকালেই তার পুনরভ্যুদয় হ'ল না।

বৌদ্ধধর্ম আপাতদৃষ্টিতে ভারতবর্ষ থেকে নির্বাসিত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হয়নি। বুদ্ধের শিক্ষার মধ্যে একটি বিপদের বীজ ছিল—বৌদ্ধধর্ম ছিল সংস্কারমূলক। ধর্ম-বিপ্লব আনবার জন্য তাঁকে অনেক নাস্তিবাচক শিক্ষাও দিতে হয়েছিল। কিন্তু কোন ধর্ম যদি নাস্তি-ভাবের দিকেই বেশী জোর দেয়, তার সম্ভাব্য বিলুপ্তির আশঙ্কাও থাকবে সেখানেই। শুধুমাত্র সংশোধনের দ্বারাই কোন সংস্কারমূলক সম্প্রদায় টিকে থাকতে পারে না;—সংগঠনী উপাদানই হচ্ছে যথার্থ প্রেরণা—যা তার মূল প্রেরণা। সংস্কারের কাজগুলি সম্পন্ন হবার পরই অস্তি-ভাবমূলক কাজের দিকে জোর দেওয়া উচিত; বাড়ী তৈরী হয়ে গেলেই ভারা খুলে ফেলতে হয়।

ভারতবর্ষে এমন হয়েছিল যে, কালক্রমে বুদ্ধের অনুগামীরা তাঁর নাস্তি-ভাবমূলক উপদেশগুলির প্রতি বেশীমাত্রায় আকৃষ্ট হয়, ফলে তাদের ধর্মের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল। নাস্তি-ভাবের প্রকোপে সত্যের অস্তি-ভাব-মূলক দিকটা চাপা পড়ে যায় এবং এই কারণেই বুদ্ধের নামে যে সব বিনাশমূলক মনোভাব আবির্ভূত হয়েছিল, ভারতবর্ষ সেগুলি প্রত্যাখ্যান করে। ভারতের জাতীয় ভাবধারার নিয়তিই এই।

ঈশ্বর ব'লে কেউ নেই এবং আত্মাও নেই—বৌদ্ধধর্মের এইসব নাস্তি-ভাব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমি বলি—একমাত্র ঈশ্বরই আছেন; এটা সন্দেহাতীত দৃঢ় উক্তি। তিনিই একমাত্র সদ্‌বস্তু। বুদ্ধ যেমন বলেন, আত্মা ব'লে কিছু নেই, আমিও বলি, 'মানুষ তুমি বিশ্বের সহিত ওতপ্রোত হয়ে আছ; তুমিই সব।' কত বাস্তব! সংস্কারের উপাদান মরে গেছে, কিন্তু সংগঠনী বীজ চিরকালের জন্য সজীব আছে। বুদ্ধ নিম্নজাতীয় প্রাণীদের প্রতিও করুণা শিখিয়ে গেছেন, তার পর থেকে ভারতে এমন কোন সম্প্রদায়ই নেই, যারা সর্বজীবে, এমন কি পশুপক্ষীদের প্রতিও করুণা করতে শেখায়নি। এই দয়া, ক্ষমা, করুণাই হ'ল বুদ্ধের শিক্ষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বুদ্ধ-জীবনের একটা বিশেষ আবেদন আছে। আমি সারা জীবন বুদ্ধের অত্যন্ত অনুরাগী, তবে তাঁর মতবাদের নই। অন্য সব চরিত্রের চেয়ে এঁর

চরিত্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অধিক। আহা, সেই সাহসিকতা, সেই নির্ভীকতা, সেই গভীর প্রেম! মানুষের কল্যাণের জন্যই তাঁর জন্ম! সবাই নিজের জন্য ঈশ্বরকে খুঁজছে, কত লোকই সত্যানুসন্ধান করছে; তিনি কিন্তু নিজের জন্য সত্যলাভের চেষ্টা করেননি। তিনি সত্যের সন্ধান করেছেন মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে। কেমন ক'রে মানুষকে সাহায্য করবেন, এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। সারা জীবন তিনি কখনও নিজের ভাবনা ভাবেননি। এত বড় মহৎ জীবনের ধারণা আমাদের মতো অজ্ঞ স্বার্থান্ধ সঙ্কীর্ণচিত্ত মানুষ কি ক'রে করতে পারে?

তারপর তাঁর আশ্চর্য বুদ্ধির কথাও ভেবে দেখ। কোন রকম ভাবাবেগ নেই। সেই বিশাল মস্তিষ্কে কুসংস্কারের লেশও ছিল না। প্রাচীন পুঁথিতে লেখা আছে, পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গেছে, অথবা বন্ধুরা বিশ্বাস করতে বলছে—এই সব কারণেই বিশ্বাস ক'রো না; তুমি নিজেই বিচার ক'রে দেখ, নিজেই সত্যানুসন্ধান কর; নিজেই অনুভব কর। তারপর যদি তুমি তা অন্যের বা বহুর পক্ষে কল্যাণপ্রদ মনে কর, তখন তা মানুষের মধ্যে বিতরণ কর। কোমলমস্তিষ্ক ক্ষীণমতি দুর্বলচিত্ত কাপুরুষেরা কখনও সত্যকে জানতে পারে না। আকাশের মতো উদার ও মুক্ত হওয়া চাই। চিত্ত হবে নির্মল, স্বচ্ছ, তবেই তাতে সত্য প্রতিভাত হবে। কী কুসংস্কার-রাশিতে পরিপূর্ণ আমরা সবাই! তোমাদের দেশেও, যেখানে তোমরা নিজেদের খুবই শিক্ষিত বলে ভাবো, কী সঙ্কীর্ণতা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তোমরা! ভেবে দেখ, তোমাদের এত সভ্যতার গর্ব সত্ত্বেও আমি নিতান্ত হিন্দু বলেই কোন এক অনুষ্ঠানে আমাকে বসতে আসন দেওয়া হয়নি।

খ্রীষ্টের জন্মের ছ-শ বছর আগে, বুদ্ধ যখন জীবিত ছিলেন, ভারতবাসীরা অবশ্যই আশ্চর্যরকম শিক্ষিত ছিল; নিশ্চয়ই তারা অত্যন্ত উদার ছিল। বিশাল জনতা বুদ্ধের অনুগামী হয়েছিল, নৃপতিরা সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন, রানীরা সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। জনসাধারণ সহজেই তাঁর উপদেশগুলি সমাদর ক'রে গ্রহণ করতে পেরেছিল, কারণ তাঁর শিক্ষা এত বিপ্লবাত্মক ছিল, এবং যুগ যুগ ধরে প্রচারিত পুরোহিতদের শিক্ষার চেয়ে বিভিন্ন ছিল! অবশ্য তাদের মনও ছিল উন্মুক্ত ও প্রশস্ত, যা সচরাচর দেখা যায় না।

এইবার তাঁর পরিনির্বাণের কথা চিন্তা কর। তাঁর জীবন যেমন মহৎ, মৃত্যুও ছিল তেমনি মহৎ। তোমাদের আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মতোই কোন জাতের একটি লোকের দেওয়া খাদ্য তিনি গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুরা এই জাতের লোকদের স্পর্শ করে না, কারণ তারা নির্বিচারে সব-কিছুই খায়। তিনি শিষ্যদের বলেছিলেন, 'তোমরা এ-খাদ্য খেও না, কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। লোকটির কাছে গিয়ে বলো, আমার জীবনে এক মহৎ কর্তব্য সে পালন করেছে—সে আমাকে দেহ-মুক্ত ক'রে দিয়েছে।' এক বৃদ্ধ বুদ্ধকে দর্শন করবার আশায় কয়েক ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে এসে কাছে বসেছিল। বুদ্ধ তাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। জনৈক শিষ্যকে কাঁদতে দেখে, তিনি তিরস্কার ক'রে বললেন, 'এ কী? আমার এত উপদেশের এই ফল? কোন মিথ্যা বন্ধনে তোমরা জড়িও না, আমার ওপর কিছুমাত্র নির্ভর ক'রো না, এই নশ্বর শরীরটার জন্য বৃথা গৌরবের প্রয়োজন নেই। বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নন, তিনি উপলব্ধি-স্বরূপ। নিজেরাই নিজেদের নির্বাণ লাভ কর।'

এমন কি অন্তিমকালেও তিনি নিজের জন্য কোন প্রতিষ্ঠা দাবী করেননি। এই কারণেই আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট হচ্ছেন উপলব্ধির এক একটি অবস্থার নামমাত্র। লোকশিক্ষকদের মধ্যে বুদ্ধই আমাদের আত্ম-বিশ্বাসী হ'তে সবচেয়ে বেশী ক'রে শিক্ষা দিয়েছেন, শুধু মিথ্যা 'অহং'-এর বন্ধন থেকে আমাদের মুক্ত করেননি, অদৃশ্য ঈশ্বর বা দেবতাদের উপর নির্ভরতা থেকেও মুক্ত করেছেন। মুক্তির সেই অবস্থা—যাকে তিনি নির্বাণ বলতেন, তা লাভ করবার জন্য প্রত্যেককেই আহ্বান করেছিলেন। একদিন সে-অবস্থায় সকলেই উপনীত হবে; এবং সেই নির্বাণে উপনীত হওয়াই হচ্ছে মনুষ্য-জীবনের চরম সার্থকতা।

ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

(১৯০০ খৃঃ ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত লস্ এঞ্জেলেসে প্রদত্ত বক্তৃতা)

সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিল এবং একটি শূন্য গহ্বর সৃষ্ট হইল। আবার আর এক তরঙ্গ উঠিল—হয়তো উহা পূর্বাপেক্ষা বৃহত্তর; উহারও পতন হইল, আবার একটি উঠিল। এইরূপে তরঙ্গের পর তরঙ্গ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সংসারের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেও আমরা এইরূপ উত্থান-পতন দেখিয়া থাকি, আর সাধারণতঃ উত্থানের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, পতনের দিকে নয়। কিন্তু সংসারে এই উভয়েরই সার্থকতা আছে, কোনটিরই মূল্য কম নহে। বিশ্বজগতের ইহাই প্রকৃতি। কি চিন্তাজগতে, কি পারিবারিক জগতে, কি সমাজে, কি আধ্যাত্মিক ব্যাপারে—সর্বত্র এই ক্রমিক গতি, সর্বত্রই উত্থান-পতন চলিয়াছে। এই কারণে ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে প্রধান ব্যাপারগুলি—উদার আদর্শসমূহ—সময়ে সময়ে সমাজের মধ্যে প্রবল তরঙ্গাকার ধারণ করিয়া উত্থিত হয় ও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তার পর অতীত অবস্থার ভাবগুলিকে পরিপাক করিবার জন্য, উহাদিগকে রোমন্থন করিবার জন্য কিছুকালের মতো ইহা অদৃশ্য হয়, যেন ঐ ভাবগুলিকে সমগ্র সমাজে খাপ খাওয়াইবার জন্য, উহাদিগকে সমাজের ভিতর ধরিয়া রাখিবার জন্য, পুনরায় উঠিবার—পূর্বাপেক্ষা প্রবলতর বেগে উঠিবার বল সঞ্চয়ের জন্য কিছুকাল ইহা কোথায় ডুবিয়া যায়।

বিভিন্ন জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে এইরূপ উত্থান-পতনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যে মহাত্মার—যে ঈশদূতের জীবনচরিত আমরা আজ অপরাহ্ণে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনিও স্বজাতির ইতিহাসের এমন এক সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যাহাকে আমরা নিশ্চয়ই মহাপতনের যুগ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি। তাঁহার উপদেশ ও কার্যকলাপের যে বিক্ষিপ্ত সামান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা হইতে আমরা স্থানে স্থানে অল্পমাত্র আভাস পাই। বিক্ষিপ্ত সামান্য বিবরণ বলিলাম, কারণ তাঁহার সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, তাঁহার সমুদয় উক্তি ও কার্যকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিলে তাহা সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত

করিয়া ফেলিত। আর তাঁহার তিনবর্ষব্যাপী ধর্মপ্রচারের মধ্যে যেন কত যুগের ঘটনা, কত যুগের ব্যাপার একত্র সংঘটিত হইয়াছে, সেগুলিকে উদ্ঘাটিত করিতে এই উনিশ শত বৎসর লাগিয়াছে। কে জানে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইতে আরও কতদিন লাগিবে? আপনার আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষ অতি ক্ষুদ্র শক্তির আধার। কয়েক মুহূর্ত, কয়েক ঘণ্টা, বড় জোর কয়েক বর্ষ আমাদের সমুদয় শক্তি-বিকাশের পক্ষে—উহার সম্পূর্ণ প্রসারের পক্ষে যথেষ্ট। তারপর আর কিছু শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য মহাশক্তিধর এই পুরুষের কথা একবার ভাবিয়া দেখুন। শত শত শতাব্দী, শত শত যুগ চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি জগতে যে শক্তি সঞ্চার করিয়া গেলেন, এখনও তাহার প্রসার-কার্যের বিরাম নাই, এখনও তাহা নিঃশেষিত হয় নাই। যতই যুগের পর যুগপ্রবাহ চলিয়াছে, ততই তাহাও নব বলে বলীয়ান হইতেছে।

যীশুখ্রীষ্টের জীবনে আপনারা যাহা দেখিতে পান, তাহা তাঁহার পূর্ববর্তী সমুদয় প্রাচীন ভাবের সমষ্টিস্বরূপ। ধরিতে গেলে একভাবে সকল ব্যক্তির জীবন—সকল ব্যক্তির চরিত্রই অতীত ভাবসমূহের ফলস্বরূপ। সমগ্র জাতীয় জীবনের এই অতীত ভাবসমূহ—বংশানুক্রমিক সঞ্চারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ, শিক্ষা এবং নিজের পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার হইতে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতর আসিয়া থাকে। সুতরাং একভাবে প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরই সমগ্র পৃথিবীর, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় অতীত সম্পত্তি রহিয়াছে বলিতে হইবে। বর্তমানে আমরা সেই অনন্ত অতীতে কৃত কার্যের ফল ব্যতীত আর কি? অনন্ত ঘটনাপ্রবাহে অনিবার্যরূপে পুরোভাগে অগ্রসর ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে অসমর্থ ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গনিচয় ব্যতীত আমরা আর কি? প্রভেদ এই—আপনি আমি অতি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ। কিন্তু জাগতিক ঘটনা-প্রবাহরূপ মহাসমুদ্রে কতকগুলি প্রবল তরঙ্গ থাকিবেই। আপনাতে আমাতে জাতীয় জীবনের অতীত ভাব অতি অল্পমাত্রই পরিস্ফুট হইয়াছে; কিন্তু এমন অনেক শক্তিমান পুরুষ আছেন, যাঁহারা প্রায় সমগ্র অতীতের সাকার বিগ্রহস্বরূপ এবং ভবিষ্যতের দিকেও তাঁহাদের হস্ত প্রসারিত। সমগ্র মানবজাতি যে অনন্ত উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, ইঁহারা যেন সেই পথের নির্দেশক স্তম্ভস্বরূপ। বাস্তবিক ইঁহারা এত বড় যে, ইঁহাদের ছায়া

যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ঢাকিয়া ফেলে, আর ইঁহারা অনাদি অনন্তকাল অবিনশ্বর থাকেন। এই মহাপুরুষ যে বলিয়াছেন, 'ঈশ্বর-তনয়ের ভিতর দিয়া ব্যতীত কেহ কখন ঈশ্বরকে দর্শন করে নাই'—এ কথা অতি সত্য। ঈশ্বর-তনয়ের মধ্য দিয়া না দেখিলে ঈশ্বরকে আমরা আর কোথায় দেখিব? ইহা খুব সত্য যে, আপনাতে আমাতে—আমাদের মধ্যে অতি দীন হীন ব্যক্তিতে পর্যন্ত ঈশ্বর বিদ্যমান, ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব আমাদের সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। কিন্তু যেমন আলোকের পরমাণুসকল সর্বব্যাপী, সর্বত্র স্পন্দনশীল হইলেও ইহাদিগকে আমাদের দৃষ্টিগোচর করিতে হইলে প্রদীপ জ্বালিবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ জগতের বিরাট আলোকস্বরূপ এই সকল প্রত্যাদিষ্ট পুরুষে, এই সকল দেবমানবে, ঈশ্বরের মূর্তিমান বিগ্রহ-স্বরূপ—এই সকল অবতারে প্রতিবিম্বিত না হইলে সমগ্র জগতের সর্বব্যাপী ঈশ্বর আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারেন না।

আমরা সকলেই বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না, আমরা তাঁহার ভাব ধারণা করিতে পারি না। কিন্তু জ্ঞানালোকের এই মহান বার্তাবহগণের কোন একজনের চরিত্রের সহিত আপনার ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় উচ্চতম ধারণার তুলনা করুন। দেখিবেন, আপনার কল্পিত ঈশ্বর এই আদর্শ হইতে নিম্নে পড়িয়া থাকে এবং অবতারের—ঈশ্বরাদিষ্ট পুরুষের চরিত্র আপনার ধারণা হইতে বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত। আদর্শের প্রতিমূর্তিস্বরূপ এইসকল মহাপুরুষ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের মহৎ জীবনের যে দৃষ্টান্ত আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন, আপনারা তাহা অপেক্ষা ঈশ্বরের উচ্চতর ধারণা করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। তাহাই যদি সত্য হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, এইসকল মহাপুরুষকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করা কি অন্যায়? এই দেবমানবগণের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদিগকে এ পৃথিবীতে একমাত্র দেবতারূপে উপাসনা করা কি পাপ? যদি তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের সর্ববিধ ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ধারণা বা কল্পনা হইতে উচ্চতর হন, তবে তাঁহাদিগকে উপাসনা করিতে দোষ কি? ইহাতে যে শুধু দোষ নাই তাহা নহে, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপাসনা কেবল এইভাবেই সম্ভব।

আপনারা যতই চেষ্টা করুন, পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারাই চেষ্টা করুন, বা স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর বিষয়ে মন দিয়াই চেষ্টা করুন, যতদিন আপনারা

মানবজগতে মানবদেহে অবস্থিত, ততদিন আপনাদের উপলব্ধ সমগ্র জগৎই মানবভাবাপন্ন, আপনাদের ধর্মও মানবভাবে ভাবিত, আপনাদের ঈশ্বরও মানবভাবাপন্ন হইবেন। অবশ্যই এরূপ হইবে। কে এমন আছে, যে সাক্ষাৎ উপলব্ধ বস্তুকে গ্রহণ না করিবে, এবং যাহা কেবল কল্পনাগ্রাহ্য ভাববিশেষ, যাহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারা যায় না এবং স্থূল অবলম্বনের সহায়তা ব্যতীত যাহার নিকট অগ্রসর হওয়াই দুরূহ, তাহাকে ত্যাগ না করিবে? সেইজন্য এই ঈশ্বরাবতারগণ সকল যুগে সকল দেশেই পূজিত হইয়াছেন।

আমরা এখন য়াহুদীদিগের অবতার খ্রীষ্টের জীবনচরিতের একটু আধটু আলোচনা করিব। একটি তরঙ্গের উত্থানের পর ও দ্বিতীয় তরঙ্গের উত্থানের পূর্বে তরঙ্গের যে পতনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, খ্রীষ্টের জন্মকালে য়াহুদীগণ সেই অবস্থায় ছিল। ইহাকে রক্ষণশীলতার অবস্থা বলিতে পারা যায়। এ অবস্থায় মানুষের মন যেন সম্মুখে চলিতে চলিতে কিছুকালের জন্য ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং এতদিন ধরিয়া যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা রক্ষা করিতেই যত্নবান্ হয়। এ অবস্থায় জীবনের সার্বভৌম ও মহান সমস্যাসমূহের দিকে নিবিষ্ট না হইয়া মন খুঁটিনাটির দিকেই অধিক আকৃষ্ট হয়। এ অবস্থায় তরণী যেন অগ্রসর না হইয়া নিশ্চল থাকে, ইহাতে নিজস্ব চেষ্টা অপেক্ষা অদৃষ্টের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সহ্য করিবার ভাবই অধিক বিদ্যমান। এটি লক্ষ্য করিবেন, আমি এই অবস্থার নিন্দা করিতেছি না, ইহার সমালোচনা করিবার কিছুমাত্র অধিকার আমাদের নাই। কারণ, যদি এই পতন না হইত, তবে ন্যাজারেথবাসী যীশুতে যে পরবর্তী উত্থান মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা সম্ভব হইত না। ফারিসি ও সাদিউসিগণ[১] হয়তো কপট ছিলেন; হয়তো তাঁহারা এমন সব কাজ করিতেন, যাহা তাঁহাদের করা উচিত ছিল না; হইতে পারে তাঁহারা ঘোর ধর্মধ্বজী ও ভণ্ড ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যেরূপই থাকুন না কেন, ঈশদূত যীশুর আবির্ভাবরূপ

১ Pharisee—যীশুখ্রীষ্টের সমসাময়িক এক ইহুদী ধর্মসম্প্রদায়, ইঁহারা ধর্মের যথার্থ তত্ত্ব অপেক্ষা বাহ্য বিধি ও অনুষ্ঠানাদির পালনেই অধিক আগ্রহ দেখাইতেন। Sadducee—ঐ সময়ের আর এক ইহুদী সম্প্রদায়; ইঁহারা অভিজাতবংশীয় এবং সন্দেহবাদী ছিলেন।

কার্য বা ফলের বীজ বা কারণ তাঁহারাই। যে শক্তিবেগ একদিকে ফারিসি ও সাদিউসিদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাই অপরদিকে মহামনীষী ন্যাজারেথবাসী যীশুরূপে আবির্ভূত হয়।

অনেক সময় আমরা বাহ্য ক্রিয়াকলাপাদির উপর—ধর্মের অত খুঁটিনাটির উপর অনুরাগকে হাসিয়া উড়াইয়া দিই বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যেই ধর্মজীবনের শক্তি নিহিত। অনেক সময় আমরা অত্যধিক অগ্রসর হইতে গিয়া ধর্ম-জীবনের শক্তি হারাইয়া ফেলি। দেখাও যায়, সাধারণতঃ উদার পুরুষগণ অপেক্ষা গোঁড়াদের মনের তেজ বেশী। সুতরাং গোঁড়াদের ভিতরও একটা মহৎ গুণ আছে, তাহাদের ভিতর যেন প্রবল শক্তিরাশি সংগৃহীত ও সঞ্চিত থাকে। ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে যেমন, সমগ্র জাতি সম্বন্ধেও সেইরূপ। জাতির ভিতরেও ঐরূপ শক্তি সংগৃহীত ও সঞ্চিত থাকে। চতুর্দিকে বাহ্যশত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত, রোমক-শাসনে তাড়িত হইয়া এক কেন্দ্রে সন্নিবদ্ধ, চিন্তা-জগতে গ্রীক প্রবণতা দ্বারা এবং পারস্য ভারত ও আলেকজান্দ্রিয়া হইতে আগত ভাবতরঙ্গরাজি দ্বারা এক নির্দিষ্ট গণ্ডিতে কেন্দ্রীভূত হইয়া চতুর্দিকে দৈহিক মানসিক নৈতিক সর্ববিধ শক্তিসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত এই য়াহুদীজাতি এক সহজাত রক্ষণশীল প্রবল শক্তিরূপে দণ্ডায়মান ছিল; ইহাদের বংশধরগণ আজও সে শক্তি হারায় নাই। আর উক্ত জাতি তাহার সমগ্র শক্তি জেরুজালেম ও য়াহুদীধর্মের উপর কেন্দ্রীভূত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আর যেমন—সকল শক্তিই একবার সঞ্চিত হইলে অধিকক্ষণ এক স্থানে থাকিতে পারে না, চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়া নিজেকে নিঃশেষিত করে, য়াহুদীদের সম্বন্ধেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহাকে দীর্ঘকাল সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। সুদূর ভবিষ্যতে প্রসারিত হইবে বলিয়া ইহাকে দীর্ঘকাল এক স্থানে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না।

য়াহুদী জাতির ভিতরে এই কেন্দ্রীভূত শক্তি পরবর্তী যুগে খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত মিলিত হইয়া একটি স্রোতস্বতী সৃষ্টি করিল। এইরূপে ক্রমশঃ বহু ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর সম্মিলনে এক উদ্বেল তরঙ্গসঙ্কুল নদী উৎপন্ন হইল। তাহার শীর্ষদেশে ন্যাজারেথবাসী যীশু সমাসীন। এইরূপে প্রত্যেক মহাপুরুষই তাঁহার সমসাময়িক অবস্থার ও

তাঁহার নিজ জাতির অতীতের ফলস্বরূপ ; তিনি আবার স্বয়ং ভবিষ্যতের স্রষ্টা। অতীত কারণসমষ্টির ফলস্বরূপ কার্যাবলী আবার ভাবী কার্যের কারণস্বরূপ হয়। আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষ সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। তাঁহার নিজ জাতির মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম, ঐ জাতি যে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য যুগ যুগ ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, তাহাই তাঁহার মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। আর তিনি স্বয়ং ভবিষ্যতের জন্য মহাশক্তির আধারস্বরূপ ; শুধু তাঁহার নিজ জাতির জন্য নহে, জগতের অন্যান্য অসংখ্য জাতির জন্যও তাঁহার জীবন মহাশক্তি সঞ্চার করিয়াছে।

আর একটি বিষয় আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ ন্যাজারেথবাসী মহাপুরুষের বর্ণনা আমি প্রাচ্য দৃষ্টিকোণ হইতেই করিব। আপনারা অনেক সময় ভুলিয়া যান যে, তিনি একজন প্রাচ্যদেশীয় ছিলেন। আপনারা তাঁহাকে নীল নয়ন ও পীত কেশ দ্বারা চিত্রিত করিতে যতই চেষ্টা করুন না কেন, তিনি একজন খাঁটি প্রাচ্যদেশীয় ছিলেন। বাইবেল গ্রন্থে যে-সকল উপমা ও রূপকের প্রয়োগ আছে, তাহাতে যে-সকল দৃশ্য ও স্থানের বর্ণনা আছে, তাহার কবিত্ব, তাহাতে অঙ্কিত চিত্রসমূহের ভাবভঙ্গি ও সন্নিবেশ এবং তাহাতে বর্ণিত প্রতীক ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি—এ-সকল প্রাচ্যভাবেরই সাক্ষ্য দিতেছে। তাহাতে উজ্জ্বল আকাশ, প্রখর সূর্য, তৃষ্ণার্ত নরনারী ও জীবকুলের বর্ণনা, মেষপাল কৃষককুল ও কৃষিকার্যের বর্ণনা, পন্‌চাক্কি ঘটীযন্ত্র তৎসংলগ্ন জলাধার ও ঘরট্টের (পিষিবার জাঁতা) বর্ণনা প্রভৃতি—এ সকলই এখনও এশিয়াতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এশিয়ার বাণী চিরদিনই ধর্মের বাণী, আর ইওরোপের বাণী রাজনীতির। নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মহত্ত্ব দেখাইয়াছে। ইওরোপের বাণী আবার প্রাচীন গ্রীসের প্রতিধ্বনিমাত্র। নিজ সমাজই গ্রীকদের সর্বস্ব ছিল। তদতিরিক্ত অন্যান্য সকল সমাজই তাহাদের চক্ষে বর্বর, তাহাদের মতে গ্রীক ব্যতীত আর কাহারও জগতে বাস করিবার অধিকার নাই, গ্রীকরা যাহা করে তাহাই ঠিক ; জগতে আর যাহা কিছু আছে, তাহার কোনটিই ঠিক নহে, সুতরাং সেগুলি জগতে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। গ্রীক মনের সহানুভূতি একান্তই মানবিক, অতএব অত্যন্ত স্বাভাবিক ও কলাকৌশলময়।

গ্রীক মন সম্পূর্ণরূপে ইহলোক লইয়াই ব্যাপৃত; এই জগতের বাহিরে কোন বিষয় সে স্বপ্নেও ভাবিতে চায় না। এমন কি, তাহার কবিতা পর্যন্ত এই ব্যাবহারিক জগৎকে লইয়া। তাহার দেবদেবীগণের কার্যকলাপ আলোচনা করিলে বোধ হয় যেন তাঁহারা মানুষ, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে মানব-প্রকৃতিবিশিষ্ট; সাধারণ মানুষ যেমন সুখে দুঃখে হৃদয়ের নানা আবেগে উত্তেজিত হইয়া পড়ে, তাঁহারাও প্রায় সেইরূপ। গ্রীক সৌন্দর্য ভালবাসে বটে, কিন্তু এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন যে, তাহা বাহ্যপ্রকৃতির সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছুই নহে, যথা—শৈলমালা, হিমানী ও কুসুমরাজির সৌন্দর্য, বাহ্য অবয়ব ও আকৃতির সৌন্দর্য, নরনারীর মুখের, বিশেষতঃ আকৃতির সৌন্দর্যেই গ্রীক মন আকৃষ্ট হইত। আর এই গ্রীকগণ পরবর্তী যুগের ইওরোপের শিক্ষাগুরু বলিয়া ইওরোপ গ্রীসের বাণীরই প্রতিধ্বনি করিতেছে।

এশিয়ায় আবার অন্যপ্রকৃতির লোকের বাস। উক্ত প্রকাণ্ড মহাদেশের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন, কোথাও শৈলমালার চূড়াগুলি অভ্রভেদী হইয়া নীল গগনচন্দ্রাতপকে যেন প্রায় স্পর্শ করিতেছে; কোথাও ক্রোশের পর ক্রোশ ব্যাপ্ত বিশাল মরুভূমি—যেখানে একবিন্দু জলও পাইবার সম্ভাবনা নাই, একটি তৃণও যেখানে উৎপন্ন হয় না; কোথাও নিবিড় অরণ্য ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া চলিয়াছে, যেন শেষ হইবার নাম নাই! আবার কোথাও বা বিপুলকায়া স্রোতস্বতী প্রবলবেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবমানা। চতুর্দিকে প্রকৃতির এইসকল মহিমময় দৃশ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাচ্যদেশবাসীর সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যের প্রতি অনুরাগ সম্পূর্ণ এক বিপরীত দিকে বিকাশ প্রাপ্ত হইল। উহা বহির্দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া অন্তর্দৃষ্টি-পরায়ণ হইল। সেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-সম্ভোগের অদম্য তৃষ্ণা, প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভের তীব্র পিপাসা বিদ্যমান, সেখানেও উন্নতির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা বর্তমান; গ্রীকেরা যেমন অপর জাতিগুলিকে বর্বর বলিয়া ঘৃণা করিত, সেখানেও সেই ভেদবুদ্ধি, সেই ঘৃণার ভাব বিদ্যমান। কিন্তু সেখানে জাতীয় ভাবের পরিধি অধিকতর বিস্তৃত। এশিয়ায় আজও জন্ম, বর্ণ বা ভাষা লইয়া জাতি গঠিত হয় না; সেখানে একধর্মাবলম্বী হইলেই এক জাতি হয়। সকল খ্রীষ্টান মিলিয়া এক জাতি, সকল মুসলমান মিলিয়া এক জাতি, সকল বৌদ্ধ মিলিয়া এক জাতি, সকল হিন্দু মিলিয়া এক জাতি। একজন বৌদ্ধ চীনদেশবাসী, অপর একজন

পারস্যদেশবাসীই হউক না কেন, যেহেতু উভয়ে একধর্মাবলম্বী, সেইজন্য তাহারা পরস্পরকে ভাই বলিয়া মনে করিয়া থাকে। সেখানে ধর্মই মানবজাতির পরস্পরের বন্ধন, মিলনভূমি। আর ঐ পূর্বোক্ত কারণেই প্রাচ্যদেশীয়গণ কল্পনাপ্রবণ, তাহারা জন্ম হইতেই বাস্তব জগৎ ছাড়িয়া স্বপ্নজগতে থাকিতেই ভালবাসে। জল-প্রপাতের কলধ্বনি, বিহগকুলের কাকলী, সূর্য চন্দ্র তারা—এমন কি সমগ্র জগতের সৌন্দর্য যে পরম মনোরম ও উপভোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাচ্য মনের পক্ষে ইহাই পর্যাপ্ত নহে, সে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ভাবে ভাবুক হইতে চায়। প্রাচ্যবাসী বর্তমানের—ইহজগতের গণ্ডি ভেদ করিয়া তাহার অতীত প্রদেশে যাইতে চায়। বর্তমান—প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ তাহার পক্ষে যেন কিছুই নহে। প্রাচ্যদেশ যুগযুগান্ত ধরিয়া যেন সমগ্র মানবজাতির শৈশবের শিশু-শয্যা; সেখানে ভাগ্যচক্রের সর্ববিধ পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়; সেখানে এক রাজ্যের পর অন্য রাজ্যের, এক সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়া অন্য সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছে, মানবীয় ঐশ্বর্য বৈভব গৌরব শক্তি—সবই এখানে গড়াগড়ি যাইতেছে; বিদ্যা ঐশ্বর্য বৈভব ও সাম্রাজ্যের সমাধিভূমি—ইহাই যেন প্রাচ্যের পরিচয়। সুতরাং প্রাচ্যদেশীয়গণ যে এই জগতের সকল পদার্থকেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন এবং স্বভাবতই এমন কোন বস্তু দর্শন করিতে চান, যাহা অপরিণামী অবিনাশী এবং এই দুঃখ- ও মৃত্যুপূর্ণ জগতের মধ্যে নিত্য আনন্দময় ও অমর,—ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। প্রাচ্যদেশীয় মহাপুরুষগণ এই আদর্শের বিষয় ঘোষণা করিতে কখনও ক্লান্তিবোধ করেন না। আর আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, জগতের অবতার ও মহাপুরুষগণ সকলেই প্রাচ্যদেশীয়, কেহই অন্য কোন দেশের লোক নহেন।

আমরা আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষের প্রথম মূলমন্ত্রই শুনিতে পাই: এ জীবন কিছুই নহে, ইহা হইতে উচ্চতর আরও কিছু আছে। আর ঐ অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব জীবনে পরিণত করিয়া তিনি যে যথার্থ প্রাচ্যদেশের সন্তান, তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তোমরা পাশ্চাত্যেরা নিজেদের কার্যক্ষেত্রে অর্থাৎ সামরিক ব্যাপারে, রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগ-পরিচালনায় এবং সেইরূপ অন্যান্য কর্মে দক্ষ। হয়তো প্রাচ্যদেশীয়গণ ও-সকল বিষয়ে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহারা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে সফল, তাঁহারা ধর্মকে নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন—কার্যে পরিণত

করিয়াছেন। যদি কেহ কোন দার্শনিক মত প্রচার করেন, তবে দেখিবেন, কাল শত শত লোক আসিয়া প্রাণপণে নিজেদের জীবনে তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবে। যদি কোন ব্যক্তি প্রচার করেন যে, এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিলেই মুক্তি হইবে, তিনি তখনই এমন পাঁচশত লোক পাইবেন, যাহারা এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে প্রস্তুত। আপনারা ইহাকে হাস্যাস্পদ বলিতে পারেন, কিন্তু জানিবেন—ইহার পশ্চাতে তাহাদের দার্শনিক তত্ত্ব বিদ্যমান; তাহারা যে ধর্মকে কেবল বিচারের বস্তু না ভাবিয়া জীবনে উপলব্ধি করিবার—কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করে, ইহাতে তাহার আভাস ও পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে মুক্তির যে-সকল বিবিধ উপায় নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, সেগুলি বুদ্ধিবৃত্তির ব্যায়ামমাত্র, তাহাদিগকে কোনকালে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা পর্যন্ত করা হয় না। পাশ্চাত্য দেশে যে প্রচারক উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিতে পারেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মোপদেষ্টারূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

অতএব আমরা দেখিতেছি, প্রথমতঃ এই ন্যাজারেথবাসী যীশু যথার্থই প্রাচ্য ভাবে ভাবিত ছিলেন। এই নশ্বর জগৎ ও ইহার ঐশ্বর্যে তাঁহার আদৌ আস্থা ছিল না। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য জগতে যেরূপ শাস্ত্রীয় বাক্য বিকৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা দেখা যায়, তাহার কোন প্রয়োজন নাই। এত প্রবলভাবে মোচড়ানো হয় যে, আর টানিয়া বাড়ানো চলে না; শাস্ত্র-বাক্যগুলি তো আর রবার নহে যে, যত ইচ্ছা টানিয়া বাড়ানো যাইবে, আর তাহারও একটা সীমা আছে। ধর্মকে বর্তমান যুগের ইন্দ্রিয়-সর্বস্বতার সহায়ক করিয়া লওয়া কখনই উচিত নহে। এটি ভাল করিয়া বুঝিবেন যে, আমাদিগকে সরল ও অকপট হইতে হইবে। যদি আমাদের আদর্শ অনুসরণ করিবার শক্তি না থাকে, তবে আমরা যেন আমাদের দুর্বলতা স্বীকার করিয়া লই, কিন্তু আদর্শকে যেন খাটো না করি, কেহ যেন আদর্শটিকেই একেবারে ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিবার চেষ্টা না করেন। পাশ্চাত্যজাতিগণ খ্রীষ্ট-জীবনের যে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দিয়া থাকেন, সেগুলি শুনিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া যায়। তিনি যে কি ছিলেন, আর কি ছিলেন না, কিছুই বোঝা যায় না। কেহ তাঁহাকে একজন মহা রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কেহ বা তাঁহাকে একজন সেনাপতি, কেহ তাঁহাকে স্বদেশহিতৈষী য়াহুদী, কেহ বা

তাঁহাকে অন্যরূপ একটা কিছু প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বাইবেল-গ্রন্থে কি এমন কোন কথা লেখা আছে, যাহাতে ঐরূপ অনুমানগুলির কোন প্রমাণ আছে? একজন মহান ধর্মাচার্যের জীবনই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য। যীশু তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন শুনুন: 'শৃগালেরও একটা গর্ত থাকে, আকাশচারী পাখিদেরও বাসা আছে, কিন্তু মানবপুত্রের (যীশুর) মাথা গুঁজিবার এতটুকু স্থান নাই।' যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, ইহাই মুক্তির একমাত্র পথ। তিনি মুক্তির আর কোন পথ প্রদর্শন করেন নাই। আমরা যেন দন্তে তৃণ লইয়া দীনভাবে স্বীকার করি যে, আমাদের এইরূপ ত্যাগ-বৈরাগ্যের শক্তি নাই, আমাদের এখনও 'আমি ও আমার' প্রতি ঘোর আসক্তি বর্তমান। আমরা ধন ঐশ্বর্য বিষয়—এই সব চাই। আমাদিগকে ধিক্, আমরা যেন আমাদের দুর্বলতা স্বীকার করি, কিন্তু যীশুকে অন্যরূপে বর্ণনা করিয়া মানবজাতির এই মহান্ আচার্যকে লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন না করি। তাঁহার কোন পারিবারিক বন্ধন ছিল না। আপনারা কি মনে করেন, এই ব্যক্তির ভিতর কোন দেহ ভাব ছিল? আপনারা কি মনে করেন, জ্ঞানজ্যোতির পরম আধার এই অতিমানব স্বয়ং ঈশ্বর জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন পশুগণের সমধর্মী হইবার জন্য? তথাপি লোকে তাঁহার উপদেশ বলিয়া যা খুশী প্রচার করিয়া থাকে। তাঁহার স্ত্রী-পুরুষ—এই ভেদজ্ঞান ছিল না, তিনি নিজেকে আত্মা বলিয়াই জানিতেন। তিনি জানিতেন, তিনি শুদ্ধ আত্মা, কেবল মানবজাতির কল্যাণের জন্য দেহকে পরিচালন করিতেছেন—দেহের সঙ্গে তাঁহার শুধু ঐটুকু সম্পর্ক ছিল। আত্মাতে কোনরূপ লিঙ্গভেদ নাই। পাশব ভাবের সহিত বিদেহ আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই, দেহের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। অবশ্য এইরূপ ত্যাগের ভাব হইতে আমরা এখনও বহু দূরে থাকিতে পারি, থাকিলামই বা, কিন্তু আদর্শটিকে আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমরা যেন স্পষ্ট স্বীকার করি যে, ত্যাগই আমাদের আদর্শ, কিন্তু আমরা ঐ আদর্শের নিকট পৌঁছিতে এখনও অক্ষম।

তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মাস্বরূপ—এই তত্ত্বের উপলব্ধি ব্যতীত তাঁহার জীবনে আর কোন কার্য ছিল না, আর কোন চিন্তা ছিল না। তিনি বাস্তবিকই বিদেহ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মাস্বরূপ ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার

অদ্ভুত দিব্যদৃষ্টিসহায়ে ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক নর-নারী, সে য়াহুদীই হউক বা অন্য জাতিই হউক, ধনি-দরিদ্র, সাধু-অসাধু—সকলেই তাঁহার মতো সেই এক অবিনাশী আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং তাঁহার সমগ্র জীবনে এই একমাত্র কার্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি সমগ্র মানবজাতিকে তাহাদের নিজ নিজ যথার্থ শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, 'তোমরা এই দীন হীন কুসংস্কারময় স্বপ্ন ছাড়িয়া দাও। মনে করিও না যে, অপরে তোমাদিগকে দাসবৎ পদদলিত এবং উৎপীড়িত করিতেছে, কারণ তোমাদের মধ্যে এমন এক বস্তু রহিয়াছে, যাহার উপর কোন অত্যাচার করা চলে না, যাহাকে পদদলিত করা যায় না, যাহাকে কোনমতে বিনাশ করিতে বা কোনরূপ কষ্ট দিতে পারা যায় না।' আপনারা সকলেই ঈশ্বর-তনয়, সকলেই অমর আত্মাস্বরূপ। তিনি এই মহাবাণী জগতে ঘোষণা করিয়াছেন: জানিও, স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরেই অবস্থিত। আমি ও আমার পিতা অভেদ। ন্যাজারেথবাসী যীশু এইসব কথাই বলিয়াছেন। তিনি এই সংসারের কথা বা ইহ জীবনের বিষয় কখনও কিছু বলেন নাই। এই জগতের ব্যাপারে তাঁহার কোন সম্বন্ধই ছিল না, শুধু মানবজাতি যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থা হইতে তাহাকে তিনি সম্মুখে খানিকটা আগাইয়া দিবেন, আর ক্রমাগত ইহাকে চালাইতে থাকিবেন, যতদিন না সমগ্র জগৎ সেই পরম জ্যোতির্ময় পরমেশ্বরের নিকট পৌঁছিতেছে, যতদিন না প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিতেছে, যতদিন না দুঃখকষ্ট ও মৃত্যু জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত হইতেছে।

তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে যে-সকল পরস্পরবিরোধী আখ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা পাঠ করিয়াছি। খ্রীষ্টের জীবনচরিতের সমালোচক পণ্ডিতবর্গ ও তাঁহাদের গ্রন্থাবলী এবং 'উচ্চতর সমালোচনা'[১] নামক সাহিত্যরাশির সহিতও আমরা পরিচিত। আর নানাগ্রন্থ-আলোচনা দ্বারা পণ্ডিতেরা যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও আমরা জানি। বাইবেলের

১ ইতিহাস ও সাহিত্যের দিক দিয়া বাইবেলের বিভিন্নাংশের রচনা, রচনাকাল ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিচারমূলক সাহিত্যরাশি Higher or Historical Criticism নামে অভিহিত। ইহা বাইবেলের শ্লোকাবলী ও শব্দরাশি-সম্বন্ধীয় বিচার ও ব্যাখ্যা হইতে পৃথক্ ও উচ্চতর।

নিউ টেস্টামেণ্ট-অংশ কতটা সত্য, অথবা উহাতে বর্ণিত যীশুখ্রীষ্টের জীবনচরিত কতটা ঐতিহাসিক সত্যের সহিত মিলে—এ-সকল বিষয় বিচার করিবার জন্য আজ আমরা এখানে উপস্থিত হই নাই। যীশুখ্রীষ্টের জন্মিবার পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে নিউ টেস্টামেণ্ট লিখিত হইয়াছিল কি না, অথবা যীশুখ্রীষ্টের জীবনচরিতের কতটা অংশ সত্য, এ-সকল প্রশ্নেও কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু ঐ জীবনের পশ্চাতে এমন কিছু আছে, যাহা অবশ্য সত্য—এমন কিছু আছে, যাহা আমাদের অনুকরণের যোগ্য। মিথ্যা বলিতে হইলে সত্যেরই নকল করিতে হয় এবং ঐ সত্যটির বাস্তবিক সত্তা আছে। যাহা কোনকালে ছিল না, তাহার নকল করা চলে না। যাহা কেহ কোনকালে কখনও উপলব্ধি করে নাই, তাহা কখনই অনুকরণ করা যায় না। সুতরাং ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, বাইবেলের বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ কল্পনারও অবশ্যই কিছু ভিত্তি ছিল, নিশ্চয়ই সেই সময়ে জগতে এক মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল—আধ্যাত্মিক শক্তির এক অপূর্ব বিকাশ হইয়াছিল এবং সেই মহা আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধেই আজ আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। ঐ মহাশক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন আমাদের কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই, তখন আমাদের পণ্ডিতকুলের সমালোচনায় ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। যদি প্রাচ্যদেশীয়দের মতো আমাকে এই ন্যাজারেথবাসী যীশুর উপাসনা করিতে হয়, তবে একটিমাত্র ভাবেই আমি তাঁহার উপাসনা করিতে পারি, অর্থাৎ আমায় তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াই উপাসনা করিতে হইবে, অন্য কোনরূপে উপাসনা করিবার উপায় নাই। আপনারা কি বলিতে চান, আমাদের ঐরূপে তাঁহাকে উপাসনা করিবার অধিকার নাই? যদি আমরা তাঁহাকে আমাদের সমান স্তরে টানিয়া আনিয়া একজন মহাপুরুষমাত্র বলিয়া একটু সম্মান দেখাই, তবে আর আমাদের তাঁহাকে উপাসনা করিবার প্রয়োজন কি? আমাদের শাস্ত্র বলেন, 'যাঁহাদের ভিতর দিয়া ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, যাঁহারা স্বয়ং সেই জ্যোতিঃস্বরূপ, সেই জ্যোতির তনয়গণ উপাসিত হইলে যেন আমাদের সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হন এবং আমরাও তাঁহাদের সহিত এক হইয়া যাই।'

কারণ, আপনারা এটি লক্ষ্য করিবেন যে, মানব ত্রিবিধভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া থাকে। প্রথম অবস্থায় অশিক্ষিত মানবের অপরিণত বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, ঈশ্বর বহুদূরে—উর্ধ্বে স্বর্গনামক স্থানবিশেষে পাপপুণ্যের মহা-বিচারকরূপে সিংহাসনে সমাসীন। লোকে তাঁহাকে 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্'-রূপে দর্শন করে। ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় এরূপ ধারণাও ভাল, ইহাতে মন্দ কিছুই নাই। আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, মানব মিথ্যা বা ভ্রম হইতে সত্যে অগ্রসর হয় না, সত্য হইতে সত্যে আরোহণ করিয়া থাকে। যদি আপনারা ইচ্ছা করেন তো বলিতে পারেন, মানুষ নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে আরোহণ করিয়া থাকে; কিন্তু ভ্রম বা মিথ্যা হইতে সত্যে গমন করে, এ-কথা কখনই বলিতে পারেন না। মনে করুন, আপনি এখান হইতে সূর্যাভিমুখে সরলরেখায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন; এখান হইতে সূর্যকে অতি ক্ষুদ্র দেখায়। মনে করুন, আপনি এখান হইতে দশ লক্ষ মাইল অগ্রসর হইলেন, সেখানে গিয়া সূর্যকে এখানকার অপেক্ষা বৃহৎ দেখিবেন। যতই অগ্রসর হইবেন, ততই বৃহত্তররূপে দেখিতে থাকিবেন। মনে করুন, এইরূপ বিভিন্ন স্থান হইতে সূর্যের বিশ সহস্র আলোকচিত্র গ্রহণ করা গেল, ইহাদের প্রত্যেকটি যে অপরটি হইতে পৃথক্ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু উহাদের সকলগুলিই যে সেই এক সূর্যেরই আলোকচিত্র. ইহা কি আপনি অস্বীকার করিতে পারেন? এইরূপ উচ্চতর বা নিম্নতর সর্ববিধ ধর্ম-প্রণালীই সেই অনন্ত জ্যোতির্ময় ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার বিভিন্ন সোপান মাত্র। কোন কোন ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা নিম্নতর, কোন কোন ধর্মে উচ্চতর, এইমাত্র প্রভেদ। এই কারণেই সমগ্র জগতে গভীর চিন্তায় অসমর্থ জন-সাধারণের ধর্মে ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দেশে স্বর্গনামক স্থানবিশেষে অবস্থানকারী জগৎ-শাসক, পুণ্যবানের পুরস্কারদাতা ও পাপীর দণ্ডদাতা এবং এরূপ অন্যান্য গুণসম্পন্ন ঈশ্বরের ধারণা থাকিবেই এবং বরাবরই রহিয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায়। মানব অধ্যাত্মরাজ্যে যতই অগ্রসর হয়, ততই সে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে, যে-ঈশ্বরকে সে এতদিন স্বর্গনামক স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ মনে করিতেছিল, তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বব্যাপী, সর্বত্র বিদ্যমান; তিনি দূরে অবস্থিত নহেন, তাহার হৃদয়-মধ্যেই রহিয়াছেন। তিনি স্পষ্টতই সকল আত্মার অন্তরাত্মা। আমার আত্মা যেমন আমার দেহকে পরিচালনা করিতেছে,

তেমনি ঈশ্বর আমার আত্মারও পরিচালক ও নিয়ন্তা; আত্মার মধ্যে অন্তরাত্মা। আবার কতকগুলি ব্যক্তি এতদূর শুদ্ধচিত্ত ও আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হইলেন যে, তাঁহারা পূর্বোক্ত ধারণা অতিক্রম করিয়া অবশেষে ঈশ্বরকে লাভ করিলেন। বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্টে আছে, 'যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র, তাঁহারা ধন্য, কারণ তাঁহারাই ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন।' অবশেষে তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহারা ও পিতা-ঈশ্বর অভিন্ন।

আপনারা দেখিবেন, বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্ট-অংশে এই মহান্ ধর্মাচার্য যীশু উক্ত ত্রিবিধ সোপানের উপযোগী শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সাধারণ প্রার্থনা (Common Prayer) শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করুন: 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম জয়যুক্ত হউক' ইত্যাদি। ইহা সরল ভাবের প্রার্থনা, শিশুর প্রার্থনা। লক্ষ্য করিবেন যে, ইহা 'সাধারণ প্রার্থনা'; কারণ, ইহা অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য বিহিত। অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ব্যক্তিদের জন্য—যাঁহারা পূর্বোক্ত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য—তিনি উন্নততর সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন: 'আমি আমার পিতাতে, তোমরা আমাতে এবং আমি তোমাদিগের মধ্যে বর্তমান।' স্মরণ হইতেছে তো? আর যখন য়াহুদীরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—আপনি কে? তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, 'আমি ও আমার পিতা এক।' য়াহুদীরা মনে করিয়াছিল, তিনি ঈশ্বরের সহিত নিজেকে অভিন্ন ঘোষণা করিয়া ঈশ্বরের অমর্যাদা করিতেছেন। কিন্তু তিনি এই বাক্য কি উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, তাহাও আমাদের প্রাচীন ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষগণ বলিয়া গিয়াছেন, 'তোমরা সকলেই দেবতা বা ঈশ্বর—তোমরা সকলেই সেই পরাৎপর পুরুষের সন্তান।' অতএব দেখুন, বাইবেলেও ধর্মের এই ত্রিবিধ সোপান স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে; আর আপনারা ইহাও দেখিবেন যে, আপনাদের পক্ষে প্রথম সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে শেষ সোপানে পৌঁছানোই অপেক্ষাকৃত সহজ।

এই ঈশ্বরের দূত বার্তাবহ যীশু সত্যলাভের পথ দেখাইতে আসিয়াছিলেন। তিনি দেখাইতে আসিয়াছিলেন যে, নানারূপ অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা সেই যথার্থ তত্ত্ব—আত্মতত্ত্ব লাভ হয় না, নানাবিধ কূট জটিল দার্শনিক বিচারের দ্বারা আত্মতত্ত্ব লাভ হয় না। আপনার যদি

কিছুমাত্র বিদ্যা না থাকে, সে বরং আরও ভাল; আপনি সারা জীবনে যদি একখানি পুস্তকও না পড়িয়া থাকেন, সে আরও ভাল কথা। এগুলি আপনার মুক্তির জন্য একেবারেই আবশ্যক নয়; মুক্তিলাভের জন্য ঐশ্বর্য বৈভব উচ্চপদ বা প্রভুত্বের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই—এমন কি, পাণ্ডিত্যেরও কিছু প্রয়োজন নাই; কেবল একটি জিনিসের প্রয়োজন পবিত্রতা—চিত্তশুদ্ধি। 'পবিত্রাত্মা বা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ ধন্য', কারণ আত্মা স্বয়ং শুদ্ধস্বভাব। তাহা অন্যরূপ অর্থাৎ অশুদ্ধ কিরূপে হইতে পারে? আত্মা ঈশ্বরপ্রসূত, ঈশ্বর হইতে তাহার আবির্ভাব। বাইবেলের ভাষায় আত্মা 'ঈশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ'; কোরানের ভাষায় তাহা 'ঈশ্বরেরও আত্মাস্বরূপ'। আপনারা কি বলিতে চান—এই ঈশ্বরাত্মা কখনও অপবিত্র হইতে পারেন? কিন্তু হায়, আমাদেরই শুভাশুভ কর্মের দ্বারা তাহা যেন শত শত শতাব্দীর ধূলি ও মলিনতায় আবৃত হইয়াছে। নানাবিধ অন্যায় কর্ম, অশুভ কর্ম সেই আত্মাকে শত শত শতাব্দীর অজ্ঞানরূপ ধূলি ও মলিনতায় সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। কেবল ঐ ধূলি ও মলিনতা দূর করা আবশ্যক, তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ আত্মা নিজের প্রভায় উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইবে। 'শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরকে দর্শন করিবে।' 'স্বর্গরাজ্য তোমাদের অন্তরে।' ন্যাজারেথবাসী যীশু আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'যখন স্বর্গরাজ্য এখানেই—তোমাদের ভিতরেই রহিয়াছে, তখন আবার উহার অন্বেষণের জন্য কোথায় যাইতেছ? আত্মার উপরিভাগে যে মলিনতা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেলো, স্বর্গরাজ্য এখানেই বর্তমান, দেখিতে পাইবে। ইহা পূর্ব হইতেই তোমার সম্পত্তি। যাহা তোমার নহে, তাহা তুমি কি করিয়া পাইবে? ইহা তো তোমার জন্মপ্রাপ্ত অধিকার। তোমরা অমৃতের অধিকারী, সেই নিত্য সনাতন পিতার তনয়।'

ইহাই সেই সুসমাচার-বাহী যীশুখ্রীষ্টের মহতী শিক্ষা। তাঁহার অপর শিক্ষা—ত্যাগ; ত্যাগই সকল ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। আত্মাকে কি করিয়া বিশুদ্ধ করিবে? ত্যাগের দ্বারা। জনৈক ধনী যুবক যীশুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'প্রভো', অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?' যীশু তাঁহাকে বলিলেন, 'তোমার এখনও একটি জিনিসের অভাব

আছে। যাও, বাড়ী যাও; তোমার যাহা কিছু আছে সব বিক্রয় কর, ঐ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্রগণকে বিতরণ কর, তাহা হইলে স্বর্গে তুমি অক্ষয় সম্পদ্ সঞ্চয় করিবে। তারপর নিজের দুঃখভার (Cross) বহন করিয়া আমার অনুসরণ কর।' ধনী যুবকটি যীশুর এই উপদেশে দুঃখিত হইল এবং বিষণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল, কারণ তাহার অগাধ সম্পত্তি ছিল। আমরা সকলেই অল্পবিস্তর ঐ ধনী যুবকের মতো। দিবারাত্র আমাদের কর্ণে সেই মহাবাণী ধ্বনিত হইতেছে। আমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার মধ্যে, সাংসারিক বিষয়-ভোগের মধ্যে আমরা মনে করি, আমরা জীবনের উচ্চতর লক্ষ্য সব ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু ইহার মধ্যেই হঠাৎ এক মুহূর্তের বিরাম আসিল, সেই মহাবাণী আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল: 'তোমার যাহা কিছু আছে, সব ত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ কর।' 'যে-কোন ব্যক্তি নিজের জীবনরক্ষার দিকে মনোযোগ দিবে, সে তাহা হারাইবে; আর যে আমার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিবে, সে তাহা পাইবে।' কারণ, যে-কোন ব্যক্তি তাঁহার জন্য এই জীবন উৎসর্গ করিবে, সে অমৃতত্ব লাভ করিবে। আমাদের সর্ববিধ দুর্বলতার মধ্যে, সর্ববিধ কার্যকলাপের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য কখন কখন যেন একটু বিরাম আসিয়া উপস্থিত হয়, আর সেই মহাবাণী আমাদের কর্ণে ঘোষণা করিতে থাকে: 'তোমার যাহা কিছু আছে, সব ত্যাগ করিয়া দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ কর এবং আমাকে অনুসরণ কর।' তিনি ঐ এক আদর্শ প্রচার করিতেছেন, জগতের সকল শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যগণও ঐ এক আদর্শ প্রচার করিয়াছেন—তাহা এই ত্যাগ। এই ত্যাগের তাৎপর্য কি? সু-নীতির একটি মাত্র আদর্শ—নিঃস্বার্থপরতা। অহংশূন্য হও। পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতা বা অহংশূন্যতাই আমাদের একমাত্র আদর্শ। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত এই যে, ডান গালে চড় মারিলে বাম গাল ফিরাইয়া দিতে হইবে। যদি কেহ তোমার জামা কাড়িয়া লয়, তাহাকে তোমার বহিরাবরণটিও খুলিয়া দিতে হইবে।

আদর্শকে ছোট না করিয়া যতদূর পারা যায় উত্তমরূপে কার্য করিয়া যাইতে হইবে। আর সেই আদর্শ অবস্থা এই: যে-অবস্থায় মানুষের 'অহং'-ভাব কিছুই থাকে না, যখন কোন বস্তুতে তাহার কোন অধিকারবোধ থাকে না, যখন 'আমি, আমার' বলিবার কিছু থাকে না, সে যখন সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিসর্জন করে, সে নিজেকে যেন মারিয়া ফেলে—এরূপ ব্যক্তির ভিতর স্বয়ং

ঈশ্বর বিরাজমান। কারণ, তাহার ভিতর হইতে 'অহং'-বোধ একেবারে চলিয়া গিয়াছে, নষ্ট হইয়াছে, একেবারে নির্মূল হইয়া গিয়াছে। আমরা এখনও সেই আদর্শে পৌছিতে পারিতেছি না, তথাপি আমাদিগকে ঐ আদর্শের উপাসনা করিতে হইবে এবং ধীরে ধীরে ঐ আদর্শে পৌছিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, যদিও আমাদিগকে ইতস্ততঃ পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হয়। কল্যই হউক, আর সহস্র বর্ষ পরেই হউক, ঐ আদর্শ অবস্থায় পৌছিতেই হইবে। কারণ, ইহা শুধু আমাদের লক্ষ্য নহে, ইহা উপায়ও বটে। নিঃস্বার্থপরতা—সম্পূর্ণভাবে অহংশূন্যতাই সাক্ষাৎ মুক্তিস্বরূপ; কারণ 'অহং'ভাব-ত্যাগ হইলে ভিতরের মানুষ-ভাব মরিয়া যায়, একমাত্র ঈশ্বরই অবশিষ্ট থাকেন।

আর এক কথা। দেখিতে পাওয়া যায়, মানবজাতির সকল ধর্মাচার্যই সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য। মনে করুন, ন্যাজারেথবাসী যীশু উপদেশ দিতেছেন, কোন ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, 'আপনি যাহা উপদেশ করিতেছেন, তাহা অতি সুন্দর; আমি বিশ্বাস করি, ইহাই পূর্ণতালাভের উপায়, আর আমি ইহা অনুসরণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি আপনাকে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র বলিয়া উপাসনা করিতে পারিব না।' ন্যাজারেথবাসী যীশু এ-কথায় কি উত্তর দিবেন? তিনি নিশ্চয়ই উত্তর দিবেন, 'বেশ ভাই, তুমি আদর্শ অনুসরণ কর এবং নিজের ভাবে ইহার দিকে অগ্রসর হও। তুমি ঐ উপদেশের জন্য আমাকে প্রশংসা কর আর নাই কর, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না। আমি তো দোকানদার নই, ধর্ম লইয়া ব্যবসা করিতেছি না। আমি কেবল সত্য শিক্ষা দিয়া থাকি, আর সত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। সত্যকে একচেটিয়া করিবার অধিকার কাহারও নাই। সত্য স্বয়ং ঈশ্বর। আগাইয়া চল।' কিন্তু তাঁহার অনুগামীরা আজকাল কি বলেন? তাঁহারা বলেন, 'তোমরা তাঁহার উপদেশ অনুসরণ কর বা নাই কর, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, উপদেষ্টাকে যথাযথ সম্মান দিতেছ কি? যদি উপদেষ্টার —আচার্যের সম্মান কর, তবেই তোমার উদ্ধার হইবে; নতুবা তোমার মুক্তি নাই।' এইরূপে এই আচার্যবরের সমুদয় উপদেশই বিকৃত হইয়াছে। এখন কেবল উপদেষ্টার ব্যক্তিত্ব লইয়া বিবাদ। তাহারা জানে না যে, এইরূপে উপদেশ অনুসরণ না করিয়া উপদেষ্টার নাম লইয়া টানাটানি করাতে ব্যক্তিকে

সম্মান না করিয়া একভাবে তাঁহাকে অপমানিতই করিতেছে। ঐরূপে তাঁহার উপদেশ ভুলিয়া শুধু তাঁহাকে সম্মান করিতে গেলে তিনি নিজেই লজ্জায় সঙ্কুচিত হইতেন। জগতের কোন ব্যক্তি তাঁহাকে মনে রাখিল বা না রাখিল, তাহাতে তাঁহার কি আসিয়া যায়? জগতের নিকট তাঁহার একটি বার্তা ছিল, এবং তিনি তাহা প্রচার করিয়াছেন। বিশ সহস্র জীবন পাইলেও তিনি জগতের দরিদ্রতম ব্যক্তির জন্য তাহা উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। যদি লক্ষ লক্ষ ঘৃণিত সামারিয়াবাসীর জন্য লক্ষ লক্ষ বার তাঁহাকে ক্লেশ সহ্য করিতে হইত, এবং তাঁহার জীবনবলিই যদি প্রত্যেকের মুক্তির একমাত্র উপায় হইত, তবে তিনি অনায়াসে তাঁহার জীবনবলি দিতে প্রস্তুত হইতেন। এ সমস্ত কাজই তিনি করিতেন, ইহাতে এক ব্যক্তির নিকটও তাঁহার নিজ নাম জানাইবার ইচ্ছা তাঁহার হইত না। স্বয়ং ভগবান যেভাবে কার্য করেন, তিনিও তেমনি ধীরস্থিরভাবে, নীরবে অজ্ঞাতভাবে কার্য করিয়া যাইতেন। তাঁহার অনুগামীরা এক্ষণে কি বলেন? তাঁহারা বলেন, 'তোমরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও নির্দোষ হইতে পারো, কিন্তু তোমরা যদি আমাদের আচার্যকে—আমাদের মহাপুরুষকে যথোপযুক্ত সম্মান না দাও, তবে তাহাতে কোন ফল হইবে না।' কেন? এই কুসংস্কার—এই ভ্রমের উৎপত্তি কোথা হইতে? এই ভ্রমের একমাত্র কারণ এই যে, যীশুখ্রীষ্টের অনুগামিগণ মনে করেন, ভগবান কেবল একবার মাত্র দেহে আবির্ভূত হইতে পারেন।

ঈশ্বর তোমাদের নিকট মানবরূপেই আবির্ভূত হন। সমগ্র প্রকৃতিতে যাহা একবার ঘটিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই অতীতে বহুবার ঘটিয়াছিল এবং ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই ঘটিবে। প্রকৃতিতে এমন কিছু নাই, যাহা নিয়মাধীন নহে; আর নিয়মাধীন হওয়ার অর্থ এই যে, যাহা একবার ঘটিয়াছে, তাহা চিরদিনই ঘটিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিতে থাকিবে।

ভারতেও এই অবতারবাদ রহিয়াছে। ভারতে মহান্ অবতারগণের অন্যতম শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার 'ভগবদ্গীতা'রূপ অপূর্ব বাণী আপনারা অনেকে পাঠ করিয়া থাকিবেন; তিনি বলিতেছেন:

যদিও আমি জন্মরহিত, অক্ষয় এবং প্রাণিজগতের ঈশ্বর, তথাপি নিজ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া নিজ মায়ায় জন্মগ্রহণ করি। হে অর্জুন, যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করিয়া

থাকি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।[১]

যখনই জগতের অবনতি হয়, তখনই ভগবান ইহার উন্নতির জন্য আসিয়া থাকেন। এইরূপে তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। গীতায় আর একস্থানে তিনি এই ভাবের কথা বলিয়াছেন: যখনই দেখিবে কোন মহাশক্তিসম্পন্ন পবিত্রস্বভাব মহাত্মা মানবজাতির উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, জানিও তিনি আমারই তেজসম্ভূত, আমি তাঁহার মধ্য দিয়া কার্য করিতেছি।[২]

অতএব আসুন, আমরা শুধু ন্যাজারেথবাসী যীশুর ভিতর ভগবানকে দর্শন না করিয়া তাঁহার পূর্বে যে-সকল মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পরে যাঁহারা আসিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের সকলের ভিতরই ঈশ্বরকে দর্শন করি। আমাদের উপাসনা যেন সীমাবদ্ধ না হয়। সকলেই সেই এক অনন্ত ঈশ্বরেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তিমাত্র। তাঁহারা সকলেই পবিত্রাত্মা ও স্বার্থগন্ধহীন। তাঁহারা সকলেই এই দুর্বল মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং জীবন দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই আমাদের সকলের, এমন কি ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের সমস্ত পাপ নিজেরা গ্রহণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন।

এক হিসাবে আপনারা সকলেই অবতার—সকলেই নিজ নিজ স্কন্ধে জগতের ভার বহন করিতেছেন। আপনারা কি কখনও এমন নরনারী দেখিয়াছেন, যাহাকে শান্তভাবে সহিষ্ণুতার সহিত নিজ জীবনভার বহন করিতে না হয়? বড় বড় অবতারগণ অবশ্য আমাদের তুলনায় অনেক বড় ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের স্কন্ধে প্রকাণ্ড জগতের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তুলনায় আমরা অতি ক্ষুদ্র, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরাও সেই একই কর্ম করিতেছি—আমাদের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে, আমাদের ক্ষুদ্র গৃহে আমরা আমাদের সুখদুঃখরাজি বহন করিয়া চলিয়াছি। এমন মন্দপ্রকৃতি, এমন অপদার্থ কেহ নাই, যাহাকে নিজ নিজ ভার কিছু না কিছু বহন করিতে

১ গীতা—৪।৬-৮

২ গীতা—১০।৪১

হয়। আমাদের ভুল-ভ্রান্তি যতই থাকুক, আমাদের মন্দ চিন্তা ও মন্দ কর্মের পরিমাণ যতই হউক, আমাদের চরিত্রের কোন না কোন স্থানে এমন এক উজ্জ্বল অংশ আছে, কোন না কোন স্থানে এমন এক স্বর্ণসূত্র আছে, যাহা দ্বারা আমরা সর্বদা সেই ভগবানের সহিত সংযুক্ত। কারণ নিশ্চয়ই জানিবেন, যে মুহূর্তে ভগবানের সহিত আমাদের এই সংযোগ নষ্ট হইবে, সেই মুহূর্তেই আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আর যেহেতু কাহারও কখনও সম্পূর্ণ বিনাশ হইতে পারে না, সেহেতু, আমরা যতই হীন ও অবনত হই না কেন, আমাদের অন্তরের অন্তস্তলের কোন না কোন নিভৃত প্রদেশে এমন একটি ক্ষুদ্র জ্যোতির্ময় বৃত্ত রহিয়াছে, যাহার সহিত ভগবানের নিত্যযোগ।

বিভিন্নদেশীয় বিভিন্নজাতীয় ও বিভিন্নমতাবলম্বী যে-সকল অবতারের জীবন ও শিক্ষা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে প্রণাম; বিভিন্নজাতীয় যে-সকল দেবতুল্য নরনারী মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম; জীবন্ত-ঈশ্বরস্বরূপ যাঁহারা আমাদের বংশধরগণের কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কার্য করিতে ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম।

ঈশ্বরের দেহধারণ বা অবতার

(The Divine Incarnation or Avatara :
খ্রীষ্ট-বিষয়ক বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপির অনুবাদ)

যীশুখ্রীষ্ট ভগবান ছিলেন—মানবদেহে অবতীর্ণ সগুণ ঈশ্বর। বহু রূপে বহু বার ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং তোমরা শুধু তাঁর সেই রূপগুলিরই উপাসনা করতে পারো। পরব্রহ্ম উপাসনার বস্তু নন। ঈশ্বরের নির্গুণ ভাবকে উপাসনা করা অর্থহীন। নরদেহে অবতীর্ণ যীশুখ্রীষ্টকেই আমাদের ঈশ্বর ব'লে পূজা করতে হবে। ঈশ্বরের এরূপ বিকাশের চেয়ে উচ্চতর কোন কিছুর পূজা কেউ করতে পারে না। খ্রীষ্ট থেকে পৃথক কোন ভগবানের উপাসনা যত শীঘ্র ত্যাগ করবে, ততই তোমাদের কল্যাণ। তোমাদের কল্পনানির্মিত যিহোবার কথা ধর, আবার সুন্দর মহান খ্রীষ্টের কথাও ভেবে দেখ। যখনই খ্রীষ্টের উর্ধ্বে কোন ভগবান সৃষ্টি কর, তখনই সব পণ্ড কর। দেবতাই কেবল দেবতার উপাসনা করতে পারে, মানুষের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়, এবং ঈশ্বরের প্রচলিত প্রকাশের উর্ধ্বে তাঁকে উপাসনা করার যে-কোন প্রয়াস মানুষের পক্ষে বিপজ্জনকই হবে। যদি মুক্তি চাও তো খ্রীষ্টের সমীপবর্তী হও; তোমাদের কল্পিত যে-কোন ঈশ্বরের চেয়ে তিনি অনেক উর্ধ্বে। যদি মনে কর—খ্রীষ্ট একজন মানুষ ছিলেন, তবে তাঁর উপাসনা ক'রো না। কিন্তু যখনই ধারণা করতে পারবে—তিনি ঈশ্বর, তখনই তাঁর উপাসনা ক'রো। যারা বলে—তিনি মানুষ ছিলেন, আবার তাঁকে পূজাও করে, তারা নিতান্ত অশাস্ত্রীয় অধর্মের কাজই করে। এখানে মধ্যপন্থা ব'লে কিছু নেই, সমগ্র শক্তিকেই গ্রহণ করতে হবে। 'যে পুত্রকে দেখেছে, সে পিতাকেই দর্শন করেছে', আর পুত্রকে না দেখে কেউ পিতার দর্শন পাবে না। শুধু বড় বড় কথা, অসার দার্শনিক বিচার আর স্বপ্ন ও কল্পনা! যদি আধ্যাত্মিক জীবনে কিছু উপলব্ধি করতে চাও, তবে খ্রীষ্টে প্রকাশিত ঈশ্বরকে নিবিড়ভাবে ধরে থাকো।

দার্শনিক দিক দিয়ে খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ ব'লে কোন মানুষ ছিলেন না, তাঁদের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকেই দেখেছিলাম। কোরানে মহম্মদ বার বার

বলেছেন, খ্রীষ্ট কখনও ক্রুশবিদ্ধ হননি—ও একটা রূপকমাত্র; খ্রীষ্টকে কেউ ক্রুশবিদ্ধ করতে পারে না।

যুক্তিমূলক ধর্মের সর্বনিম্ন স্তর দ্বৈতভাব, আর একের মধ্যে তিনের অবস্থিতিই উচ্চতম। জগৎ ও জীব ঈশ্বরের দ্বারাই অনুস্যূত; ঈশ্বর, জগৎ এবং জীব—এই 'একের মধ্যে তিন'-কেই আমরা দেখছি। আবার সঙ্গে সঙ্গে আভাস পাচ্ছি যে, এক থেকেই এই তিনটি হয়েছে। এই দেহটি যেমন জীবাত্মার আবরণ, তেমনি এই জীবাত্মা যেন পরমাত্মার আবরণ বা দেহ। 'আমি' যেমন বিশ্বপ্রকৃতির চেতন আত্মা, তেমনি ঈশ্বর আমার আত্মারও আত্মা—পরমাত্মা। তুমিই হচ্ছ সেই কেন্দ্র—যার মাধ্যমে তুমি বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখছ, আবার তার মধ্যেই তুমি রয়েছ। জগৎ জীব আর ঈশ্বর, এই নিয়েই একটি সত্তা—নিখিল বিশ্ব। সুতরাং এগুলি মিলে একটি একক, তথাপি একই-কালে এগুলি আবার পৃথকও বটে।

আবার আর এক প্রকারের 'ত্রিত্ব' (তিনে এক) আছে, অনেকটা খ্রীষ্টানদের 'ট্রিনিটি'-র মতো। ঈশ্বরই পরব্রহ্ম, এই নির্বিশেষ সত্তায় আমরা তাঁকে অনুভব করতে পারি না; শুধু 'নেতি নেতি' বলতে পারি মাত্র। তবুও ঈশ্বরীয় সত্তার সান্নিধ্যসূচক কয়েকটি গুণ কিন্তু আমরা ধারণা করতে পারি। প্রথমতঃ সৎ বা অস্তিত্ব, দ্বিতীয়তঃ চিৎ বা জ্ঞান, তৃতীয়তঃ আনন্দ—অনেকটা যেন তোমাদের পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার অনুরূপ। পিতা হচ্ছেন সৎ-স্বরূপ, যা থেকে সব কিছুর সৃষ্টি; পুত্র হচ্ছেন চিৎ-স্বরূপ, খ্রীষ্টের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ। খ্রীষ্টের পূর্বেও ঈশ্বর সর্বত্র ছিলেন, সকল প্রাণীর মধ্যে ছিলেন; কিন্তু খ্রীষ্টের আবির্ভাবেই আমরা তাঁর সম্বন্ধে সচেতন হ'তে পেরেছি, ইনিই ঈশ্বর। তৃতীয় হচ্ছে আনন্দ, পবিত্র আত্মার আবেশ। পূর্বোক্ত জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ আনন্দের অধিকারী হয়। যে-মুহূর্তে তুমি খ্রীষ্টকে তোমার হৃদয়ে বসাবে, তখন থেকেই তোমার পরমানন্দ; আর তাতেই হবে তিনের একত্ব-সাধন।

মহম্মদ

(স্যান ফ্র্যান্সিস্কো বে-অঞ্চলে ১৯০০ খৃঃ ২৫শে মার্চ প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপির অনুবাদ)

কৃষ্ণের প্রাচীন বাণী—বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও মহম্মদ—এই তিন মহাপুরুষের বাণীর সমন্বয়। এই তিন জনের প্রত্যেকেই এক একটি মত প্রবর্তন করিয়া তাহা চূড়ান্তভাবে প্রচার করিয়াছেন। কৃষ্ণ এই মহাপুরুষগণের পূর্ববর্তী। তবু আমরা বলিতে পারি, কৃষ্ণ পুরাতন ভাবসমূহ গ্রহণ করিয়া সেগুলির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, যদিও তাঁহার বাণীই প্রাচীনতম। বৌদ্ধধর্মের প্রগতি-তরঙ্গে তাঁহার বাণী সাময়িকভাবে নিমজ্জিত হইয়াছিল। আজ কৃষ্ণের বাণীই ভারতের বিশিষ্ট বাণী। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, আজ সায়াহ্নে আরবের মহাপুরুষ মহম্মদের বিশেষ কর্মধারা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।···

মহম্মদ যৌবনে ধর্মবিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন বলিয়া মনে হয় না; অর্থোপার্জনেই তাঁহার ঝোঁক ছিল। তিনি সৎস্বভাব ও অতিশয় প্রিয়দর্শন যুবক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এক ধনী বিধবা এই যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। পৃথিবীর বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর যখন মহম্মদ আধিপত্য লাভ করেন, তখন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাঁহার একাধিক পত্নী ছিলেন। পত্নীদিগের মধ্যে কে তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়, জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি প্রথমা পত্নীর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, 'তিনিই আমাকে প্রথম বিশ্বাস করেন। মেয়েদের মন বিশ্বাসপ্রবণ।··· স্বাধীনতা লাভ কর, সব কিছু লাভ কর, কিন্তু নারীচরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি যেন হারাইও না!'···

পাপাচরণ, পৌত্তলিকতা, উপাসনার নামে ভণ্ডামি, কুসংস্কার, নরবলি প্রভৃতি দেখিয়া মহম্মদের হৃদয় ব্যথিত হইল। খ্রীষ্টানদের দ্বারা ইহুদীরা অবনমিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টানেরা মহম্মদের স্বদেশীয়গণ অপেক্ষা আরও অধঃপতিত হইয়াছিল।

আমরা সর্বদাই তাড়াহুড়া করি। কিন্তু মহৎ কাজ করিতে গেলে বিরাট প্রস্তুতির প্রয়োজন।···দিবারাত্র প্রার্থনার পর মহম্মদ স্বপ্নে অনেক কিছু দর্শন করিতে থাকেন। জিব্রাইল (Gabriel) স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া মহম্মদকে

বলেন যে, তিনি সত্যের বার্তাবহ। দেবদূত তাঁহাকে আরও বলেন—যীশু, মুশা ও অন্যান্য প্রেরিত পুরুষগণের বাণী লুপ্ত হইয়া যাইবে। তিনি মহম্মদকে ধর্মপ্রচারের আদেশ করেন। খ্রীষ্টানেরা যীশুর নামে রাজনীতি এবং পারসীকরা দ্বৈতভাব প্রচার করিতেছিলেন দেখিয়া মহম্মদ বলিলেন, 'আমাদের ঈশ্বর এক। যাহা কিছু আছে, সব কিছুরই প্রভু তিনি। ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য কাহারও তুলনা হয় না।'

ঈশ্বর ঈশ্বরই ; এখানে কোন দার্শনিকতা বা নীতিশাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব নাই। 'আমাদের আল্লা এক অদ্বিতীয়, এবং মহম্মদই তাঁহার রসুল'—মক্কার রাস্তায় রাস্তায় মহম্মদ ইহা প্রচার করিতে লাগিলেন।…মক্কার লোকেরা তাঁহাকে নির্যাতন করিতে থাকে, তখন তিনি মদিনা শহরে পলাইয়া গেলেন। তিনি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং সমগ্র আরবজাতি ঐক্যবদ্ধ হইল। আল্লার নামে মহম্মদের ধর্ম জগৎ প্লাবিত করিল। কী প্রচণ্ড বিজয়ী শক্তি!…

আপনাদের ভাবসমূহ খুব কঠোর, আর আপনারা খুবই কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বশবর্তী! এই বার্তাবহগণ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের নিকট হইতে আসেন, নতুবা তাঁহারা কিভাবে এত মহান্ হইতে পারিয়াছিলেন? আপনারা প্রতিটি ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন। আমাদের প্রত্যেকেরই দোষ-ত্রুটি আছে। কাহার না আছে? ইহুদীদের অনেক দোষ আমি দেখাইয়া দিতে পারি। দুর্জনেরা সর্বদাই দোষ-ত্রুটি খোঁজে।…মাছি ক্ষত অন্বেষণ করে, আর মধু-মক্ষিকা শুধু ফুলের মধুর জন্য আসে। মক্ষিকা-বৃত্তি অনুসরণ করিবেন না, মধুমক্ষিকার পথ ধরুন।…

পরবর্তী জীবনে মহম্মদ অনেক পত্নী গ্রহণ করেন। মহাপুরুষেরা প্রত্যেকে দুই শত পত্নী গ্রহণ করিতে পারেন। আপনাদের মতো 'দৈত্য'কে এক পত্নী গ্রহণ করিতেও আমি অনুমতি দিব না। মহাপুরুষদের চরিত্র রহস্যাবৃত। তাঁহাদের কার্যধারা দুর্জ্ঞেয়। তাঁহাদিগকে বিচার করিতে যাওয়া আমাদের অনুচিত। খ্রীষ্ট বিচার করিতে পারেন মহম্মদকে। আপনি আমি কে?—শিশুমাত্র। এইসকল মহাপুরুষকে আমরা কি বুঝিব?

মহম্মদের ধর্ম আবির্ভূত হয় জনসাধারণের জন্য বার্তারূপে।…তাঁহার প্রথম বাণী ছিল—'সাম্য'।…একমাত্র ধর্ম আছে—তাহা প্রেম। জাতি বর্ণ

বা অন্য কিছুর প্রশ্ন নাই। এই সাম্যভাবে যোগ দাও! সেই কার্যে পরিণত সাম্যই জয়যুক্ত হইল।...সেই মহতী বাণী ছিল খুব সহজ সরল: স্বর্গ ও মর্ত্যের স্রষ্টা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও। শূন্য হইতে তিনি সব কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না।...

মসজিদগুলি প্রোটেস্টাণ্ট গির্জার মতো;... সঙ্গীত, চিত্র ও প্রতিকৃতি এখানে নিষিদ্ধ। এককোণে একটি বেদী; তাহার উপর কোরান রক্ষিত হয়। সব লোক সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। কোন পুরোহিত, যাজক বা বিশপ নাই।... যে নমাজ পড়ে, সেও শ্রোতৃমণ্ডলীর একপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিবে। এই ব্যবস্থার কতকাংশ সুন্দর। ...

এই প্রাচীন মহাপুরুষেরা সকলেই ছিলেন ঈশ্বরের দূত। আমি নতজানু হইয়া তাঁহাদের পূজা করি, তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করি। কিন্তু তাঁহারা মৃত!...আর আমরা জীবিত। আমাদের আগাইয়া যাইতে হইবে! ...যীশু অথবা মহম্মদের অনুকরণ করাই ধর্ম নহে। অনুকরণ ভাল হইলেও তাহা কখনও খাঁটি নহে। যীশুর অনুকরণকারী হইবেন না, কিন্তু যীশু হউন। আপনারা যীশু বুদ্ধ অথবা অন্য কোন মহাপুরুষের মতোই মহান্। আমরা যদি তাঁহাদের মতো না হই, তবে চেষ্টা করিয়া আমাদিগকে সেরূপ হইতে হইবে। আমি ঠিক ঠিক যীশুর মতো নাও হইতে পারি। ইহুদী হইয়া জন্মগ্রহণ করার প্রয়োজনও আমার নাই।...

নিজ নিজ প্রকৃতির নিকট খাঁটি হওয়াই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন। যদি আপনার নিজের অস্তিত্ব না থাকে, তবে ঈশ্বর অথবা অন্য কাহারও অস্তিত্বই বা কিরূপে থাকিবে? যেখানেই থাকুন, এই মনই অসীম অনন্ত ঈশ্বরকে পর্যন্ত অনুভব করে। ঈশ্বরকে আমি অনুভব করি, তাই তিনি আছেন। আমি যদি ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে না পারি, তবে আমার কাছে তাঁহার অস্তিত্ব নাই। ইহাই মানব-প্রগতির বিরাট জয়যাত্রা।

এই মহাপুরুষগণ পথনির্দেশক চিহ্ন। ইহাই তাঁহাদের একমাত্র পরিচয়। তাঁহারা বলেন, 'ভ্রাতৃগণ, আগাইয়া যাও'। আর আমরা তাঁহাদিগকে আঁকড়াইয়া থাকি; নড়িতে চাহি না। আমরা চিন্তা করিতে চাহি না; আমরা চাই অন্যে আমাদের জন্য চিন্তা করুক। ঈশদূতগণ তাঁহাদের ব্রত উদ্‌যাপন করেন। পূর্ণোদ্যমে কর্মপথে চলিবার জন্য তাঁহারা আমাদিগকে উপদেশ দেন।

শত বৎসর পরে তাঁহাদের বাণী আমরা আঁকড়াইয়া ধরি এবং নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাই।

ধর্ম, বিশ্বাস ও মতবাদ সম্বন্ধে কথা বলা সহজ, কিন্তু চরিত্রগঠন ও ইন্দ্রিয়-সংযম খুব কঠিন। এ বিষয়ে আমরা পরাভূত হই, কপট হইয়া পড়ি।…

ধর্ম কোন মতবাদ নহে, কতকগুলি নিয়মও নহে। ধর্ম একটি প্রক্রিয়া। মতবাদ ও নিয়মগুলি অনুশীলনের জন্যই আবশ্যক। সেই অনুশীলনের দ্বারা আমরা শক্তি সঞ্চয় করি এবং অবশেষে বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হই। মতবাদ ব্যায়ামবিশেষ—ইহা ছাড়া তাহার অন্য কোন উপকারিতা নাই।… অনুশীলনের দ্বারা আত্মা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। যখন আপনি বলিতে পারেন, 'আমি বিশ্বাস করি'—তখনই সেই অনুশীলনের পরিসমাপ্তি।…

'যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি মনুষ্য-দেহ ধারণ করি। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।'[১]

জ্ঞানালোকের মহান্ বার্তাবহগণের ইহাই পরিচয়। তাঁহারা আমাদের মহান্ আচার্য, আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; কিন্তু আমাদিগকে নিজ নিজ পথে চলিতে হইবে।

১ গীতা, ৪।৭-৮

পওহারী বাবা

(মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত ইংরেজী 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকার জন্য লিখিত—১৮৯৯)

১

ভগবান বুদ্ধ ধর্মের অন্যান্য প্রায় সকল ভাবকে সেই সময়ের জন্য বাদ দিয়া 'তাপিত জগৎকে সাহায্য করাই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম'—এই ভাবটিরই প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু স্বার্থপূর্ণ আমিত্বে আসক্তি যে সম্পূর্ণ ভ্রমমাত্র, ইহা উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহাকেও অনেক বৎসর ধরিয়া আত্মানুসন্ধানে কাটাইতে হইয়াছিল। আমাদের উচ্চতম কল্পনাশক্তিও বুদ্ধদেব অপেক্ষা নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত কর্মীর ধারণা করিতে অক্ষম ; তথাপি সমুদয় বিষয়ের রহস্য বুঝিতে তাঁহা অপেক্ষা আর কাহাকে কঠোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল ? এ-কথা সকল সময়েই সত্য যে, কার্য যে পরিমাণে মহৎ, তাহার পশ্চাতে সেই পরিমাণে উপলব্ধির শক্তি নিহিত। পূর্ব হইতেই প্রস্তুত একটি সুচিন্তিত কার্য-প্রণালীর প্রত্যেক খুঁটিনাটিকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য অধিক একাগ্র চিন্তাশক্তির প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু প্রবল শক্তি গভীর মনঃসংযোগেরই পরিণাম মাত্র। সামান্য প্রচেষ্টার জন্য হয়তো মতবাদমাত্র পর্যাপ্ত হইতে পারে ; কিন্তু যে ক্ষুদ্র বেগের দ্বারা ক্ষুদ্র লহরীর উৎপত্তি হয়, প্রবল উর্মির জনক তীব্র বেগ হইতে তাহা নিশ্চয় খুবই পৃথক। তাহা হইলেও ঐ ক্ষুদ্র লহরীটি প্রবল উর্মি-উৎপাদনকারী শক্তির এক ক্ষুদ্র অংশেরই বিকাশমাত্র।

মন নিম্নতর কর্মভূমিতে প্রবল কর্মতরঙ্গ তুলিতে সক্ষম হইবার পূর্বে তাহাকে তথ্যসমূহের—নগ্ন সত্যসমূহের নিকট পৌঁছিতে হইবে, সেগুলি যতই কঠোর ও ভীষণ হউক ; সত্যকে—খাঁটি সত্যকে (যদিও উহার তীব্র স্পন্দনে হৃদয়ের প্রত্যেকটি তন্ত্রী ছিন্ন হইতে পারে) লাভ করিতে হইবে এবং নিঃস্বার্থ ও অকপট প্রেরণা (যদিও উহা লাভ করিতে একটির পর আর একটি করিয়া প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটিয়া ফেলিতে হয়) অর্জন করিতে হইবে। সূক্ষ্ম বস্তু কালচক্রে প্রবাহিত হইতে হইতে ব্যক্তভাব ধারণা করিবার জন্য উহার চতুর্দিকে স্থূলবস্তুসমূহ একত্র করিতে থাকে ; অদৃশ্য—দৃশ্যের আকার ধারণ

করে; সম্ভব—বাস্তবে, কারণ—কার্যে এবং চিন্তা—প্রত্যক্ষ কর্মে পরিণত হয়।

সহস্র সহস্র ঘটনা যে কারণকে এখন কার্যে রূপায়িত হইতে দিতেছে না, তাহা শীঘ্র বা বিলম্বে কার্যরূপে প্রকাশিত হইবে; বর্তমানে যতই নিস্তেজ হউক না কেন, জড়জগতে শক্তিশালী চিন্তার গৌরবের দিন আসিবে। আর যে-আদর্শ ইন্দ্রিয়সুখ-প্রদানের সামর্থ্য দ্বারাই সকল বস্তুর গুণাগুণ বিচার করে, তাহা যথার্থ আদর্শ নহে।

যে প্রাণী যত নিম্নস্তরের, সে ইন্দ্রিয়ে তত অধিক সুখ অনুভব করে, সে তত অধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে বাস করে। ইন্দ্রিয়-সুখের পরিবর্তে উচ্চতর স্তরের দৃশ্য দেখাইয়া ও সেখানকার সুখ আস্বাদ করাইয়া পশু-ভাবাপন্ন মানুষকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইবার শক্তিকেই যথার্থ সভ্যতা বলিয়া বুঝা উচিত।

মানুষ সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী ইহা জানে। সকল অবস্থায় সে নিজে ইহা স্পষ্টরূপে না-ও বুঝিতে পারে। ভাবময় জীবন সম্বন্ধে তাহার হয়তো ভিন্ন মত থাকিতে পারে, কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও তাহার প্রাণের এই স্বাভাবিক ভাব লুপ্ত হয় না, উহা সর্বদাই আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে—তাই সে বাজিকর, চিকিৎসক, ঐন্দ্রজালিক, পুরোহিত অথবা বিজ্ঞানের অধ্যাপককে সম্মান না করিয়া থাকিতে পারে না। মানুষ যে-পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের রাজ্য ছাড়াইয়া উচ্চ ভূমিতে বাস করিবার শক্তি লাভ করে, তাহার ফুসফুস যে-পরিমাণ বিশুদ্ধ ভাব গ্রহণ করিতে পারে এবং যতটা সময় সে এই উচ্চাবস্থায় থাকিতে পারে, তাহা দ্বারাই তাহার উন্নতির পরিমাপ হয়।

সংসারে ইহা দেখা যায় এবং স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উন্নত মানবগণ জীবনধারণের জন্য যতটুকু আবশ্যক, ততটুকু ব্যতীত তথাকথিত আরামের জন্য সময় ব্যয় করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক; আর যতই তাঁহারা উন্নত হইতে থাকেন, ততই নিতান্ত আবশ্যক কাজগুলিতেও তাঁহাদের উৎসাহ কমিয়া যায়।

ভাব ও আদর্শ অনুসারে মানুষের বিলাসের ধারণা পর্যন্ত পরিবর্তিত হইতে থাকে। মানুষ চেষ্টা করে, সে যে-চিন্তাজগতে বিচরণ করিতেছে, তাহার বিলাসের বস্তুগুলিও যেন যথাসম্ভব তদনুযায়ী হয়—আর ইহাই কলা বা কৌশল।

'যেমন এক অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট হইয়া নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে, অথচ যতটুকু ব্যক্ত হইয়াছে, তদপেক্ষাও ইহা অনেক বেশী'[১]—ঠিক কথা, অনন্তগুণে অধিক। এক কণা—সেই অনন্ত জ্ঞানের এক কণা-মাত্র আমাদের সুখবিধানের জন্য জড়-জগতে অবতরণ করিতে পারে, ইহার অবশিষ্ট ভাগকে জড়ের ভিতর টানিয়া আনিয়া এইভাবে স্থূল কঠিন হস্তে নাড়াচাড়া করা যাইতে পারে না। সেই পরম সূক্ষ্ম পদার্থ সর্বদাই আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে পলাইয়া যাইতেছে এবং ইহাকে আমাদের স্তরে আনিবার চেষ্টা দেখিয়া উপহাস করিতেছে। এ ক্ষেত্রে মহম্মদকেই পর্বতের নিকট যাইতে হইবে—'না' বলিবার উপায় নাই। মানুষ যদি সেই উচ্চ-স্তরের সৌন্দর্য-রাশি ভোগ করিতে চায়, যদি সে ইহার বিমল আলোকে অবগাহন করিতে চায়, যদি সে দেখিতে চায় যে, তাহার নিজের জীবন সেই জগৎকারণের সহিত এক ছন্দে স্পন্দিত হইতেছে, তবে তাহাকে সেই স্তরে উঠিতে হইবে।

জ্ঞানই বিস্ময়-রাজ্যের দ্বার খুলিয়া দেয়, জ্ঞানই পশুকে দেবতা করে ; যে জ্ঞান আমাদিগকে সেই বস্তুর নিকট লইয়া যায়, যাঁহাকে জানিলে আর সকলই জানা হয়[২], যাহা সকল জ্ঞানের কেন্দ্রস্বরূপ, যাহার স্পন্দনে সকল বিজ্ঞান জীবন্ত হইয়া উঠে—সেই ধর্মবিজ্ঞান নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ, কারণ উহাই কেবল মানুষকে সম্পূর্ণ ধ্যানময় জীবনযাপনে সমর্থ করে। ধন্য সেই দেশ, যে দেশ ইহাকে 'পরাবিদ্যা' নামে অভিহিত করিয়াছে!

কর্মজীবনে তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতে প্রায় দেখা যায় না, তথাপি আদর্শটি এখনও নষ্ট হয় নাই। একদিকে আমাদের কর্তব্য এই যে, আমরা আমাদের আদর্শের দিকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপেই অগ্রসর হই বা অতি ধীরে ধীরে অননুভবনীয় গতিতে অগ্রসর হই, আমরা যেন কখনও ইহা ভুলিয়া না যাই। আবার অপর দিকে দেখা যায়, যদিও আমরা আমাদের চোখে হাত দিয়া সত্যের জ্যোতিকে ঢাকিয়া রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করি, তথাপি সে আদর্শ সর্বদাই আমাদের সম্মুখে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

---

১ কঠোপনিষদ্, ২।২।৯

২ মুণ্ডকোপনিষদ্, ১।১।৩

আদর্শই কর্মজীবনের প্রাণ। আমরা দার্শনিক বিচারই করি বা প্রাত্যহিক জীবনের কঠোর কর্তব্য সম্পন্ন করি, আদর্শই আমাদের সমগ্র জীবনকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। আদর্শের রশ্মি সরল বা বক্র নানা রেখায় প্রতিবিম্বিত ও পরাবর্তিত (refracted) হইয়া আমাদের জীবন-গৃহের প্রতিটি গবাক্ষপথে আসিতেছে, আর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইহার আলোকে আমাদিগকে প্রত্যেক কার্যই করিতে হয়, প্রত্যেক বস্তুকেই ইহা দ্বারা পরিবর্তিত সুন্দর বা বিকৃতরূপে দেখা যায়। আমরা বর্তমানে যাহা হইয়াছি, আদর্শই আমাদিগকে তাহা করিয়াছে ; আর ভবিষ্যতে যাহা হইব, আদর্শই আমাদিগকে তাহা করিবে। আদর্শের শক্তি আমাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে ; আমাদের সুখে দুঃখে, বড় বা ছোট কাজে, আমাদের ধর্মাধর্মে ইহার শক্তির পরিচয় অনুভূত হইয়া থাকে।

যদি কর্মজীবনের উপর আদর্শের এইরূপ প্রভাব হয়, কর্মজীবনও আদর্শ-গঠনে কম শক্তিমান্ নহে। আদর্শের সত্য কর্মজীবনেই প্রমাণিত। আদর্শের পরিণতি কর্মজীবনের প্রত্যক্ষ অনুভবে। আদর্শ থাকিলেই প্রমাণিত হয় যে, কোন না কোন স্থানে, কোন না কোনরূপে ইহা কর্মজীবনেও পরিণত হইয়াছে। আদর্শ বৃহত্তর হইতে পারে, কিন্তু ইহা কর্মজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের বিস্তৃত ভাবমাত্র। আদর্শ অনেক স্থলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মের সমষ্টি ও সাধারণ ভাবমাত্র।

কর্মজীবনেই আদর্শের শক্তিপ্রকাশ। কর্মজীবনের মধ্য দিয়াই ইহা আমাদের উপর কার্য করিতে পারে। কর্মজীবনের মাধ্যমে আদর্শ আমাদের জীবনে গ্রহণোপযোগী আকারে পরিবর্তিত হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তরে অবতরণ করে। কর্মজীবনকে সোপান করিয়াই আমরা আদর্শে আরোহণ করি। উহারই উপর আমাদের আশা-ভরসা নির্ভর করে ; উহাই আমাদিগকে কার্যে উৎসাহ দেয়।

যাহাদের বাক্যবিন্যাস আদর্শকে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে পারে অথবা যাহারা সূক্ষ্মতম তত্ত্বসমূহ উদ্ভাবন করিতে পারে, এরূপ লক্ষ লক্ষ লোক অপেক্ষা আদর্শকে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছে—এরূপ একজন মানুষ অধিক শক্তিশালী।

ধর্মের সহিত সংযুক্ত না হইলে, এবং অল্প বিস্তর সফলতার সহিত

কর্মজীবনে ধর্ম পরিণত করিতে যত্নবান একদল অনুবর্তী না পাইলে মানবজাতির নিকট দর্শনশাস্ত্রসমূহ নিরর্থক প্রতীয়মান হয়, বড় জোর উহা কেবল মানসিক ব্যায়াম-মাত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যে-সকল মতবাদ একটা কিছু প্রত্যক্ষ বস্তু পাইবার আশা জাগ্রত করে না, কতক লোক সেই সকল মতবাদ গ্রহণ করিয়াও কিছুটা কার্যে পরিণত করিতে পারে, এগুলিরও স্থায়িত্বের জন্য বহুলোক প্রয়োজন, কারণ তাহার অভাবে অনেক নিশ্চিত মতবাদও লোপ পাইয়াছে।

আমাদের মধ্যে অনেকেই ভাবময় জীবনের সহিত কর্মের সামঞ্জস্য রাখিতে পারে না। কোন কোন মহাত্মা পারেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয়, গভীরভাবে চিন্তা করিলে কার্যশক্তি হারাইয়া ফেলে, আবার বেশী কাজ করিলে গভীর চিন্তাশক্তি হারাইয়া থাকে। এই কারণেই অনেক মহামনস্বী যে-সকল উচ্চ উচ্চ আদর্শ জীবনে উপলব্ধি করেন, সেই-গুলিকে জগতে কার্যে পরিণত করিবার ভার তাঁহাদিগকে কালের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যাইতে হয়। যতদিন না অপেক্ষাকৃত ক্রিয়াশীল মস্তিষ্ক আসিয়া আদর্শগুলিকে কার্যে পরিণত করিয়া প্রচার করিতেছে, ততদিন তাঁহাদের চিন্তারাশিকে অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এ-কথা লিখিবার সময়েই আমরা দিব্যচক্ষে সেই পার্থসারথিকে দেখিতেছি, তিনি যেন উভয় বিরোধী সৈন্যদলের মধ্যে রথে দাঁড়াইয়া বামহস্তে দৃপ্ত অশ্বগণকে সংযত করিতেছেন—বর্মপরিহিত যোদ্ধবেশে প্রখর দৃষ্টি দ্বারা সমবেত সৈন্যদলকে দর্শন করিতেছেন এবং স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা উভয় পক্ষের সৈন্যসজ্জার প্রত্যেক খুঁটিনাটিও বিচার করিয়া দেখিতেছেন; আবার অপর দিকে আমরা যেন শুনিতেছি ভীত অর্জুনকে চমকিত করিয়া তাঁহার মুখ হইতে কর্মের অত্যদ্ভুত রহস্য বাহির হইতেছে:

যিনি কর্মের মধ্যে অকর্ম অর্থাৎ বিশ্রাম বা শান্তি এবং অকর্মে অর্থাৎ বিশ্রামের ভিতর কর্ম দেখেন, মনুষ্যগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, তিনিই সকল কর্ম করিয়া থাকেন।[১]

ইহাই পূর্ণ আদর্শ। কিন্তু খুব কম লোকেই এই আদর্শে পৌঁছিয়া থাকে।

---

১ কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥ গীতা—৪।১৮

সুতরাং যেমনটি আছে, আমাদিগকে তেমনটিই লইতে হইবে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিতে প্রকাশিত বিভিন্ন চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্র গ্রথিত করিয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

ধার্মিক লোকদের ভিতর আমরা তীব্র চিন্তাশীল (জ্ঞানযোগী), লোক-হিতের জন্য প্রবল কর্মানুষ্ঠানকারী (কর্মযোগী), সাহসের সহিত আত্ম-সাক্ষাৎকারে অগ্রসর (রাজযোগী) এবং শান্ত ও বিনয়ী (ভক্তিযোগী)—এই চারিপ্রকারের সাধক দেখিতে পাই।

২

বর্তমান প্রবন্ধে যাঁহার চরিত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে, তিনি একজন অদ্ভুত বিনয়ী ও গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন।

পওহারী বাবা (শেষ জীবনে ইনি এই নামে অভিহিত হইতেন) বারাণসী জেলার গুজী নামক স্থানের নিকটবর্তী এক গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি বাল্যকালেই গাজিপুরে তাঁহার পিতৃব্যের নিকট থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিবার জন্য আসিলেন।

বর্তমানকালে হিন্দু সাধুরা—সন্ন্যাসী, যোগী, বৈরাগী ও পন্থী—প্রধানতঃ এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সন্ন্যাসীরা শঙ্করাচার্যের মতাবলম্বী অদ্বৈতবাদী। যোগীরা যদিও অদ্বৈতবাদী, তথাপি তাঁহারা বিভিন্নপ্রকার যোগপ্রণালীর সাধন করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্রশ্রেণীরূপে পরিগণিত করা হয়। বৈরাগীরা রামানুজ ও অন্যান্য দ্বৈতবাদী আচার্যগণের অনুবর্তী। মুসলমান-রাজত্বের সময় যে-সকল ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে পন্থী বলে; ইহাদের মধ্যে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয় প্রকার মতাবলম্বীই দেখিতে পাওয়া যায়। পওহারী বাবার পিতৃব্য রামানুজ বা শ্রী-সম্প্রদায়ভুক্ত একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন—অর্থাৎ তিনি আজীবন অবিবাহিত থাকিবেন, এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গাজিপুরের দুই মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে তাঁহার একখণ্ড জমি ছিল, সেইখানেই তিনি বাস করিতেন। তাঁহার অনেকগুলি ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল বলিয়া তিনি পওহারী বাবাকে নিজ বাটীতে রাখিয়াছিলেন, আর তাঁহাকেই তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি ও সামাজিক পদমর্যাদার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন।

পওহারী বাবার এই সময়কার জীবনের ঘটনা বিশেষ কিছু জানা যায় না। যে-সকল বিশেষত্বের জন্য ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি এরূপ সুপরিচিত হইয়াছিলেন, সেগুলির কোন লক্ষণ তখন তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়াও বোধ হয় না। লোকের এইটুকুই স্মরণ আছে যে—তিনি ব্যাকরণ, ন্যায় এবং নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থসমূহ অতিশয় মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন; এদিকে খুব চট্‌পটে ও আমুদে ছিলেন। সময়ে সময়ে এই আমোদের মাত্রা এত বাড়িয়া উঠিত যে, তাঁহার রঙ্গপ্রিয়তার ফলে সহপাঠী ছাত্রগণকে বিলক্ষণ ভুগিতে হইত।

এইরূপে প্রাচীন ধরনের ভারতীয় ছাত্রজীবনের দৈনন্দিন কার্যের ভিতর দিয়া ভাবী মহাত্মার বাল্যজীবন কাটিতে লাগিল; তাঁহার অধ্যয়নে অসাধারণ অনুরাগ ও ভাষাশিক্ষায় অপূর্ব দক্ষতা ব্যতীত সেই সরল সদানন্দ ক্রীড়াশীল ছাত্রজীবনে এমন কিছু দেখা যায় নাই, যাহা তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সেই প্রবল গাম্ভীর্যের পূর্বাভাস দেয়—যাহার চূড়ান্ত পরিণতি হইয়াছিল এক অদ্ভুত ও ভয়ানক আত্মাহুতিতে।

এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে এই অধ্যয়নশীল যুবক—সম্ভবতঃ এই প্রথম—জীবনের গভীর মর্ম প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন; এতদিন তাঁহার যে দৃষ্টি পুস্তকে নিবদ্ধ ছিল, এখন সেখান হইতে উঠাইয়া তাহা দ্বারা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজ মনোজগৎ পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া ধর্মে যথার্থ সত্য কিছু আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইল। এই সময় তাঁহার পিতৃব্যের দেহত্যাগ হইল। যাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি জীবন ধারণ করিতেন, যাঁহার উপর এই যুবক-হৃদয়ের সমুদয় ভালবাসা নিবদ্ধ ছিল, তিনি চলিয়া গেলেন; তখন সেই উদ্দাম যুবক হৃদয়ের অন্তস্তলে শোকাহত হইয়া ঐ শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্য এমন বস্তুর অন্বেষণে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন, যাহা অপরিবর্তনীয়।

ভারতে সকল বিষয়ের জন্যই আমাদের একজন গুরু প্রয়োজন হয়। আমরা হিন্দুরা বিশ্বাস করি, পুস্তকে তত্ত্ববিশেষের ভাসা-ভাসা বর্ণনামাত্র থাকে। সকল শিল্পের, সকল বিদ্যার, সর্বোপরি ধর্মের জীবন্তরহস্যসমূহ গুরু হইতে শিষ্যে সঞ্চারিত হওয়া চাই।

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তিগণ অন্তর্জীবনের রহস্য

নির্বিঘ্নে মনন করিবার জন্য সর্বদাই লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া অতি নিভৃত স্থানে গিয়া বাস করিয়াছেন; আর এখনও এমন একটি বন, পর্বত বা পবিত্রস্থান নাই, কিংবদন্তী যাহাকে কোন না কোন মহাত্মার বাসস্থান বলিয়া মহিমান্বিত করে নাই।

তাহার পর এই উক্তিটিও সর্বজন-প্রসিদ্ধ যে,

'রমতা সাধু, বহতা পানি।
যহ কভি না মৈল লখানি॥'

অর্থাৎ যে জল প্রবাহিত হয় তাহা যেমন বিশুদ্ধ থাকে, তেমনি যে সাধু ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, তিনিও তেমনি পবিত্র থাকেন।

ভারতে যাঁহারা ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া ধর্মজীবন গ্রহণ করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিচরণ করিয়া বিভিন্ন তীর্থ ও দেবমন্দির দর্শন করিয়াই অধিকাংশ জীবন কাটাইয়া থাকেন—কোন জিনিস যেমন সর্বদা নাড়াচাড়া করিলে তাহাতে মরিচা ধরে না, তাঁহারা বলেন, এইরূপ ভ্রমণ করিলে তাঁহাদের মধ্যেও সেইরূপ মলিনতা প্রবেশ করিবে না। ইহাতে আর এক উপকার হয় এই যে, তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ধর্ম বহন করিয়া লইয়া যান। যাঁহারা সংসারত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই ভারতের চারি কোণে অবস্থিত চারিটি[১] প্রধান তীর্থ দর্শন করা একরূপ অবশ্য-কর্তব্য বলিয়াই বিবেচিত হয়।

এইসব চিন্তাই বোধ হয় আমাদের যুবক-ব্রহ্মচারীকে প্রভাবিত করিয়াছিল, তবে আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, জ্ঞানতৃষ্ণাই তাঁহার ভ্রমণের সর্বপ্রধান কারণ। আমরা তাঁহার ভ্রমণ সম্বন্ধে খুব অল্পই জানি, তবে তাঁহার সম্প্রদায়ের অধিকাংশ গ্রন্থ যে ভাষায় লিখিত সেই দ্রাবিড় ভাষাসমূহে তাঁহার জ্ঞান দেখিয়া এবং শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের প্রাচীন বাঙলা ভাষার সহিত তাঁহার ব্যাপক পরিচয় দেখিয়া আমরা অনুমান করি, দাক্ষিণাত্যে ও বাঙলাদেশে তাঁহার স্থিতি বড় অল্প দিন হয় নাই।

কিন্তু একটি স্থানে গমনের সম্বন্ধে তাঁহার যৌবনকালের বন্ধুগণ বিশেষ জোর দিয়া বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, কাথিয়াওয়াড়ে গিরনার পর্বতের শীর্ষদেশে তিনি যোগসাধনার রহস্যে প্রথম দীক্ষিত হন।

---

১ চার ধাম: উত্তরে বদরী-নাথ, পূর্বে পুরী, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও পশ্চিমে দ্বারকা।

এই পর্বত বৌদ্ধদের চক্ষে অতি পবিত্র ছিল। এই পর্বতের পাদদেশে সেই সুবৃহৎ শিলা বিদ্যমান, যাহার উপর সম্রাটকুলের মধ্যে ধার্মিকচূড়ামণি ধর্মাশোকের সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত অনুশাসন খোদিত আছে। উহার নিম্নদেশে শত শত শতাব্দীর বিস্মৃতির অন্ধকারে অরণ্যাবৃত বিরাট স্তূপরাজি লীন হইয়া ছিল—ঐগুলিকে অনেকদিন ধরিয়াই গিরনার পর্বতশ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলমালা বলিয়াই লোকে মনে করিত। বৌদ্ধধর্ম এক্ষণে যে সম্প্রদায়ের সংশোধিত সংস্করণ বলিয়া বিবেচিত হয়—সেই ধর্মসম্প্রদায় এখনও উহাকে বড় কম পবিত্র মনে করেন না; আর আশ্চর্যের বিষয়, ঐ ধর্মের জগজ্জয়ী উত্তরাধিকারী আধুনিক হিন্দুধর্মে মিশিয়া যাইবার পূর্ব পর্যন্ত ঐ ধর্ম সাহসপূর্বক স্থাপত্যক্ষেত্রে জয়লাভ করিবার চেষ্টা করে নাই।

৩

মহাযোগী অবধূতগুরু দত্তাত্রেয়ের পবিত্র নিবাসভূমি বলিয়া গিরনার হিন্দুদের মধ্যে বিখ্যাত; আর কিংবদন্তী আছে যে, এই পর্বতচূড়ায় ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ এখনও বড় বড় সিদ্ধযোগীর সাক্ষাৎ পাইয়া থাকেন।

তারপর আমরা দেখিতে পাই, এই যুবক ব্রহ্মচারী বারাণসীর নিকটে গঙ্গাতীরে জনৈক যোগসাধক সন্ন্যাসীর শিষ্যরূপে বাস করিতেছে। এই সন্ন্যাসী নদীর উচ্চ তটভূমির উপর খনিত একটি গর্তে বাস করিতেন। আমাদের প্রবন্ধের বিষয়ীভূত মহাত্মাও পরবর্তী জীবনে গাজিপুরের নিকট নদীর উচ্চতটভূমিতে একটি গভীর গহ্বর নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন; ইহা তিনি যে গুরুর নিকটেই শিখিয়াছিলেন, বেশ বুঝিতে পারা যায়।

যোগীরা যোগাভ্যাসের সুবিধার জন্য সর্বদাই গুহায় অথবা যেখানকার আবহাওয়ার কোনরূপ পরিবর্তন নাই এবং যেখানে কোন শব্দ মনকে বিচলিত করিতে পারে না, এমন স্থানে বাস করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

আমরা আরও জানিতে পারি যে, তিনি প্রায় এই সময়ে বারাণসীতে জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিতেছিলেন।

অনেক বর্ষ ভ্রমণ, অধ্যয়ন ও সাধনার পর এই ব্রহ্মচারী যুবক, যেস্থানে বাল্যকালে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পিতৃব্য যদি তখন জীবিত থাকিতেন, তবে তিনি সম্ভবতঃ এই বালকের

মুখমণ্ডলে সেই জ্যোতিঃ দেখিতে পাইতেন, যাহা প্রাচীনকালে জনৈক শ্রেষ্ঠ ঋষি তাঁহার শিষ্যের মুখে দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—সৌম্য ব্রহ্মজ্যোতিতে আজ তোমার মুখ উদ্ভাসিত দেখিতেছি[১]। কিন্তু এক্ষেত্রে বাল্যকালের সঙ্গীরাই তাঁহার গৃহপ্রত্যাবর্তনে স্বাগত অভ্যর্থনা করিলেন, তাঁহাদের অনেকেই সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন—সংসার চিরদিনের জন্য তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল, যে সংসারে চিন্তার অবসর নাই, কিন্তু কর্ম অনন্ত।

তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের সহপাঠী বন্ধু ও খেলার সাথীর (যাঁহার ভাব বুঝিতে তাঁহারা অভ্যস্ত ছিলেন) সমুদয় আচার-আচরণে এক পরিবর্তন—রহস্যময় পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন। ঐ পরিবর্তন দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে ভয় ও বিস্ময়ের উদ্রেক হইল। কিন্তু উহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে তাঁহার মতো হইবার ইচ্ছা, অথবা তাঁহার ন্যায় তত্ত্বান্বেষণ-স্পৃহা জাগরিত হইল না। তাঁহারা দেখিলেন, এ এক অদ্ভুত মানব—এই যন্ত্রণা- ও জড়বাদপূর্ণ সংসার একেবারে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এই পর্যন্ত। তাঁহারা স্বভাবতই তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেন, আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন না।

ইতিমধ্যে এই মহাত্মার বিশেষত্বসমূহ দিন দিন অধিকতর পরিস্ফুট হইতে লাগিল। বারাণসীর নিকটে তাঁহার গুরু যেমন করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ ভূমিতে একটি গর্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করত অনেকক্ষণ সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি আহার সম্বন্ধে অতি ভয়ানক কঠোর সংযম আরম্ভ করিলেন। সারাদিন তিনি নিজের ছোট আশ্রমটিতে কাজ করিতেন, তাঁহার পরম প্রেমাস্পদ প্রভু রামচন্দ্রের পূজা করিতেন, উত্তম খাদ্য রন্ধন করিয়া (কথিত আছে, তিনি রন্ধনবিদ্যায় অসাধারণ পটু ছিলেন) ঠাকুরকে ভোগ দিতেন, তারপর সেই প্রসাদ বন্ধুবান্ধবগণ ও দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন, এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহাদের সেবা করিতেন। তাহারা সকলে যখন শয়ন করিত, তখন এই যুবক গোপনে সন্তরণ করিয়া গঙ্গার অপর তীরে যাইতেন। সেখানে সারা রাত সাধনভজনে কাটাইয়া উষার পূর্বেই ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুবর্গকে জাগাইতেন

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌, ৪।২।৯।২

এবং আবার নিত্যকর্ম আরম্ভ করিতেন, আমরা ভারতে এরূপ কাজকে 'অপরের সেবা বা পূজা' বলিয়া থাকি।

ইতিমধ্যে তাঁহার নিজের খাওয়াও কমিয়া আসিতে লাগিল; অবশেষে আমরা শুনিয়াছি, উহা প্রত্যহ এক মুঠা তেতো নিমপাতা বা কয়েকটা লঙ্কা মাত্রে দাঁড়াইল। তারপর গঙ্গাতীরস্থ জঙ্গলে প্রত্যহ রাত্রে সাধনার জন্য গমন ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল—তিনি নিজহাতে নির্মিত গুহাতে আরও বেশী সময় বাস করিতে লাগিলেন। আমরা শুনিয়াছি, সেই গুহায় তিনি দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতেন, তারপর বাহির হইতেন। এই দীর্ঘকাল তিনি কি খাইয়া থাকিতেন, তাহা কেহই জানিত না; এই জন্য লোকে তাঁহাকে 'পওহারী' অর্থাৎ বায়ুভক্ষণকারী বাবা বলিতে আরম্ভ করিল।

তিনি তাঁহার জীবনে আর কখনও এই স্থান ত্যাগ করেন নাই। একবার তিনি এত অধিক দিন ধরিয়া ঐ গুহার মধ্যে ছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে মৃত বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কিন্তু অনেক দিন পরে বাবা আবার বাহির হইয়া বহুসংখ্যক সাধুকে এক ভাণ্ডারা দিলেন।

যখন ধ্যানমগ্ন না থাকিতেন, তখন তিনি তাঁহার গুহার মুখের উপরিভাগে অবস্থিত একটি গৃহে বাস করিতেন, আর এই সময়ে যাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, তাহাদের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিতেন। তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। গাজিপুরের অহিফেন-বিভাগের রায় গগনচন্দ্র বাহাদুর—যিনি স্বাভাবিক মহত্ত্ব ও ধর্মপ্রাণতার জন্য সকলেরই প্রিয় ছিলেন—আমাদিগকে এই মহাত্মার সহিত আলাপ করাইয়া দেন।

ভারতের আরও অনেক মহাত্মার জীবনের ন্যায়, এই জীবনেও বাহ্য কর্মমুখরতা বিশেষ কিছু ছিল না। 'বাক্যের দ্বারা নয়, জীবনের দ্বারা শিক্ষা দিতে হইবে; আর যাহারা সত্য ধারণ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে, তাহাদেরই জীবনে সত্য প্রতিফলিত হয়'—এই মহাপুরুষের জীবন ঐ ভারতীয় আদর্শেরই অন্যতম উদাহরণ। এই ধরনের ব্যক্তিগণ যাহা জানেন, তাহা প্রচার করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, কারণ তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা এই যে, বাক্যের দ্বারা নয়, ভিতরের সাধনার দ্বারাই সত্যলাভ হয়। ধর্ম তাঁহাদের নিকট সামাজিক

কর্তব্যের প্ররোচক শক্তিবিশেষ নয়, ধর্ম সত্যের ঐকান্তিক অনুসন্ধান এবং এই জীবনে সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি।

কালের একটি মুহূর্ত অপেক্ষা অপর একটি মুহূর্তের অধিকতর শক্তি আছে, এ-কথা তাঁহারা অস্বীকার করেন। অতএব অনন্তকালের প্রতিটি মুহূর্তই অন্যান্য মুহূর্তের সহিত সমান বলিয়া তাঁহারা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা না করিয়া এখানেই এবং এখনই ধর্মের সত্যসমূহ সাক্ষাৎ দর্শন করিবার উপর জোর দিয়া থাকেন।

বর্তমান লেখক এক সময়ে এই মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, জগতের কল্যাণের জন্য কেন তিনি গুহা হইতে বাহিরে আসিবেন না। প্রথমতঃ তিনি তাঁহার স্বাভাবিক বিনয় ও রসিকতার সহিত নিম্নলিখিত দৃঢ় উত্তর প্রদান করেন :

'কোন দুষ্ট লোক কোন অন্যায় কার্য করিতেছিল, এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং শাস্তি-স্বরূপ তাহার নাক কাটিয়া দেয়। নিজের নাককাটা রূপ জগৎকে কেমন করিয়া দেখাইবে, ইহা ভাবিয়া সে অতিশয় লজ্জিত হইল ও নিজের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া এক জঙ্গলে পলাইয়া গেল। সেখানে সে একটি ব্যাঘ্রচর্ম বিছাইয়া বসিয়া থাকিত, আর এদিক-ওদিকে কেহ আসিতেছে—মনে হইলে অমনি গভীর ধ্যানের ভান করিত। তাহার এইরূপ ব্যবহারে সরিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, দলে দলে লোক এই অদ্ভুত সাধুকে দেখিতে এবং পূজা করিতে আসিতে লাগিল। তখন সে দেখিল, এইরূপ অরণ্যবাসে আবার তাহার সহজে জীবিকানির্বাহের উপায় হইল। এইভাবে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে সেই স্থানের অধিবাসীরা এই মৌনব্রতধারী ধ্যানপরায়ণ সাধুর নিকট হইতে কিছু উপদেশ শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইল, বিশেষতঃ জনৈক যুবক তাহার নিকট দীক্ষিত হইবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইল। শেষে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল যে, আর বিলম্ব করিলে সাধুর প্রতিষ্ঠা একেবারে লোপ হয়। তখন সে একদিন মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া ঐ উৎসাহী যুবককে বলিল, 'আগামী কাল একখানি ধারাল ক্ষুর লইয়া এখানে আসিও।' যুবকটি তাহার জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা অতি শীঘ্রই পূর্ণ হইবে, এই আশায় পরম আনন্দিত হইয়া পরদিন অতি প্রত্যূষে ক্ষুর লইয়া উপস্থিত হইল। নাককাটা সাধু

তাহাকে বনের এক অতি নিভৃত স্থানে লইয়া গেল, তার পর ক্ষুরখানি হাতে লইয়া উহা খুলিল এবং এক আঘাতে তাহার নাক কাটিয়া দিয়া গম্ভীর বচনে বলিল, 'হে যুবক, আমি এইরূপে এই আশ্রমে দীক্ষিত হইয়াছি। সেই দীক্ষাই আমি তোমাকে দিলাম। এখন তুমিও তৎপর হইয়া সুবিধা পাইলেই অপরকে এই দীক্ষা দিতে থাকো।' যুবকটি লজ্জায় তাহার এই অদ্ভুত দীক্ষার রহস্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিল না এবং সাধ্যানুসারে তাহার গুরুর আদেশ পালন করিতে লাগিল। এইরূপে এক নাককাটা সাধু-সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়া সমগ্র দেশ ছাইয়া ফেলিল। তুমি কি আমাকেও এইরূপ আর একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতারূপে দেখিতে চাও?'

ইহার অনেক পরে, যখন তিনি অপেক্ষাকৃত গম্ভীরভাবে ছিলেন, ঐ বিষয়ে আর একবার প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, 'তুমি কি মনে কর, স্থূলদেহ দ্বারাই কেবল অপরের উপকার সম্ভব? একটি মন শরীরের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া অপরের মনকে সাহায্য করিতে পারে, ইহা কি সম্ভব বলিয়া মনে কর না?'

অপর এক সময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি এত বড় একজন যোগী, তথাপি তিনি প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য উপদিষ্ট শ্রীরঘুনাথজীর মূর্তিপূজা, হোমাদি কর্ম করেন কেন? তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন, 'সকলেই যে নিজের কল্যাণের জন্য কর্ম করে, এ কথা তুমি ধরিয়া লইতেছ কেন? একজনও কি অপরের জন্য কর্ম করিতে পারে না?'

অতঃপর সকলেই সেই চোরের কথা শুনিয়াছেন; সে তাঁহার আশ্রমে চুরি করিতে আসিয়াছিল, সাধুকে দেখিয়াই সে ভীত হইয়া চোরাই জিনিসের পোঁটলা ফেলিয়া পলাইল। সাধু সেই পোঁটলা লইয়া চোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক দূর দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন; শেষে তাহার পদপ্রান্তে সেই পোঁটলাটি ফেলিয়া দিয়া করজোড়ে সজলনয়নে নিজকৃত বাধার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন ও অতি কাতরভাবে সেইগুলি লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'এগুলি আমার নহে, তোমার।'

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে আরও শুনিয়াছি, একবার তাঁহাকে গোখুরা সাপে দংশন করে এবং যদিও কয়েক ঘণ্টার জন্য সকলে তাঁহাকে মৃত বলিয়াই

স্থির করিয়াছিল, কিছুকাল পরে তিনি সুস্থ হইয়া উঠেন, তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, 'ঐ গোখুরা সাপটি আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে দূতরূপে আসিয়াছিল (পাহন দেওতা আয়া)।'

আমরা এই কাহিনী অনায়াসেই বিশ্বাস করিতে পারি। কারণ, আমরা জানি তাঁহার স্বভাব কী প্রগাঢ় নম্রতা, বিনয় ও প্রেমে ভূষিত ছিল। সর্বপ্রকার পীড়া তাঁহার নিকট সেই 'প্রেমাস্পদের নিকট হইতে দূতস্বরূপ' (পাহন দেওতা)-ছিল ; আর যদি তিনি ঐ সকল পীড়ায় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেন, তথাপি অপর লোকে পর্যন্ত ঐ পীড়াগুলিকে অন্য নামে অভিহিত করিবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এই অনাড়ম্বর প্রেম ও কোমলতা চতুর্দিকের লোকের মধ্যে বিস্তৃত হইতে লাগিল ; যাঁহারা চারিদিকের পল্লীগুলিতে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই অদ্ভুত ব্যক্তির নীরব শক্তিবিস্তারের সাক্ষ্য দিতে পারেন।

শেষের দিকে তিনি আর লোকজনের সঙ্গে দেখা করিতেন না। যখন মাটির নীচের গুহা হইতে উঠিয়া আসিতেন, তখন লোকজনের সঙ্গে কথা কহিতেন বটে, কিন্তু মধ্যে দ্বার রুদ্ধ থাকিত। তিনি যে গুহা হইতে উঠিয়াছেন, তাহা হোমের ধূম দেখিয়া অথবা পূজার আয়োজনের শব্দে বুঝা যাইত।

তাঁহার এই একটি বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি যখন যে কার্য করিতেন, তাহা যতই তুচ্ছ হউক—তখন তাহাতেই সম্পূর্ণ মগ্ন হইয়া যাইতেন। শ্রীরামচন্দ্রজীর পূজায় তিনি যেরূপ যত্ন ও মনোযোগ দিতেন, একটি তাম্রকুণ্ড মাজিতেও ঠিক তাহাই করিতেন। তিনি যে আমাদিগকে কর্মরহস্য সম্বন্ধে একবার বলিয়াছিলেন, 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি' অর্থাৎ সিদ্ধির উপায়কেও এমনভাবে আদর-যত্ন করিতে হইবে, যেন উহাই সিদ্ধি-স্বরূপ—তিনি নিজেই এই আদর্শের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ছিলেন।

তাঁহার বিনয়ও কোনরূপ কষ্ট যন্ত্রণা বা আত্মগ্লানিপূর্ণ ছিল না। একবার তিনি আমাদিগের নিকট অতি সুন্দরভাবে নিম্নলিখিত ভাবটি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন: হে রাজা, ভগবান অকিঞ্চনের ধন ; হাঁ, যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে, এমন কি, নিজের আত্মাকে পর্যন্ত 'আমার' বলিয়া অধিকার করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছে, তিনি তাহারই।—এই ভাব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াই স্বভাবতঃ তাঁহার এই বিনয় আসিয়াছিল।

তিনি সাক্ষাৎভাবে উপদেশ দিতে পারিতেন না; কারণ, তাহা হইলে নিজেকেই আচার্যের পদ গ্রহণ করিতে হয়, নিজেকে অপর অপেক্ষা উচ্চতর আসনে বসাইতে হয়। কিন্তু একবার তাঁহার হৃদয়-প্রস্রবণ খুলিয়া গেলে তাহা হইতে অনন্ত জ্ঞানবারি উৎসারিত হইত, তথাপি উত্তরগুলি সর্বদা সাক্ষাৎভাবে না হইয়া পরোক্ষভাবে হইত।

তিনি দীর্ঘাকৃতি, মাংসল ও একচক্ষু ছিলেন এবং প্রকৃত বয়স অপেক্ষা তাঁহাকে অল্পবয়স্ক দেখাইত। তাঁহার কণ্ঠস্বরের মতো মধুর স্বর আর কাহারও শুনি নাই। জীবনের শেষ দশ বৎসর বা ততোধিক কাল তিনি লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে অবস্থান করিতেন। তাঁহার গৃহদ্বারের পশ্চাতে গোটাকতক আলু ও একটু মাখন রাখিয়া দেওয়া হইত; যখন তিনি সমাধিতে না থাকিতেন, তখন রাত্রে ঐগুলি গ্রহণ করিতেন। গুহার মধ্যে থাকিলে তাহাও তাঁহার প্রয়োজন হইত না। এইরূপে যোগশাস্ত্রের সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ এবং পবিত্রতা, বিনয় ও প্রেমের জীবন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ এই নীরব জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ধূম দেখিলেই তিনি সমাধি হইতে উঠিয়াছেন বলিয়া বুঝা যাইত। একদিন ধূমে পোড়া মাংসের গন্ধ পাওয়া যাইতে লাগিল। চতুর্দিকের লোকে কিছু স্থির করিতে পারিল না। শেষে গন্ধ অসহ্য হইয়া উঠিল এবং ধূম পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া তাহারা গৃহের দ্বার ভাঙিয়া ফেলিল এবং দেখিল, সেই মহাযোগী নিজেকে হোমাগ্নিতে শেষ আহুতি দিয়াছেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহার দেহ ভস্মে পরিণত হইল।

আমাদিগকে এখানে কালিদাসের সেই বাক্য স্মরণ করিতে হইবে:

মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মহাত্মাগণের কার্যের নিন্দা করিয়া থাকে; কারণ সেই কার্যগুলি অসাধারণ এবং তাহাদের কারণও লোকে ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না।[১]

তথাপি তাঁহার সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল বলিয়া তাঁহার এই কার্যের কারণ সম্বন্ধে একটি আনুমানিক সিদ্ধান্ত করিতে সাহসী হইতেছি।

---

১ অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকম্।
নিন্দন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্॥—কুমারসম্ভব

আমাদের মনে হয়, মহাত্মা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত ; তখন তিনি মৃত্যুর পরেও যাহাতে কাহাকেও কষ্ট দিতে না হয়, সেজন্য সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মনে আর্যোচিত এই শেষ আহুতি দিয়াছিলেন।

বর্তমান লেখক এই পরলোকগত মহাত্মার নিকট গভীরভাবে ঋণী ; সেজন্য তাঁহার প্রেমাস্পদ ও তৎসেবিত শ্রেষ্ঠ আচার্যদিগের অন্যতম মহাত্মার উদ্দেশে—এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তি অযোগ্য হইলেও উৎসর্গীকৃত হইল।

মদীয় আচার্যদেব *

[১৮৯৬, ২৪শে ফেব্রুআরি নিউ ইয়র্কে নবপ্রতিষ্ঠিত বেদান্ত সোসাইটির উদ্যোগে স্বামীজী বিখ্যাত My Master বক্তৃতাটি দেন; ঐ বৎসরের শেষদিকে লণ্ডন ত্যাগের পূর্বে উইম্বলডনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা দেন। বর্তমান অনুবাদ উভয় বক্তৃতা হইতে সংকলিত]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন: যখনই ধর্মের প্রভাব কমিয়া যায় ও অধর্মের প্রভাব বাড়িতে থাকে, তখনই আমি মানবজাতিকে সাহায্য করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করি।[১]

আমাদের এই জগতে ক্রমাগত পরিবর্তন ও নূতন নূতন পরিস্থিতির জন্য যখনই নূতন সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়, তখনই এক শক্তি-তরঙ্গ আসিয়া থাকে। আর মানব আধ্যাত্মিক ও জড় উভয় স্তরে ক্রিয়াশীল বলিয়া উভয়ত্র এই সমন্বয়-তরঙ্গের আবির্ভাব হয়। আধুনিক কালে ইউরোপই প্রধানতঃ জড়রাজ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে, আর সমগ্র জগতের ইতিহাসে এশিয়াই আধ্যাত্মিক রাজ্যে সমন্বয়-সাধনের ভিত্তিস্বরূপ। অধুনা আবার আধ্যাত্মিক স্তরে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে। বর্তমানে জড়বাদী ভাবসমূহই অত্যুচ্চ গৌরব ও শক্তির অধিকারী; আজ মানুষ ক্রমাগত জড়ের উপর নির্ভর করিতে করিতে নিজের দিব্য স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া অর্থোপার্জনের যন্ত্রবিশেষে পরিণত হইতে বসিয়াছে—এখন আর একবার সমন্বয়ের প্রয়োজন। সমন্বয়ের সেই শক্তি আসিয়াছে, সেই বাণী উচ্চারিত হইয়াছে—যাহা ক্রমবর্ধমান জড়বাদের মেঘ অপসারিত করিয়া দিবে। সেই শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, অনতি-বিলম্বেই তাহা মানবজাতিকে তাহার প্রকৃত স্বরূপের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে, আর এশিয়া হইতেই এই শক্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিবে।

আমাদের এই জগৎ শ্রমবিভাগের নিয়মে পরিকল্পিত। একজন মানুষই সব কিছুর অধিকারী হইবে—এ কথা বলা অর্থহীন। কোন একটি জাতিই যে সকল বিষয়ের অধিকারী হইবে—এরূপ ভাবা আরও ভুল। তথাপি আমরা কি ছেলেমানুষ! অজ্ঞতাবশতঃ শিশু ভাবিয়া থাকে যে, সমগ্র জগতে তাহার

---

১ যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ গীতা

লণ্ডনে স্বামীজী, ১৮৯৬

পুতুলের মতো কাম্য আর কিছুই নাই। যে-জাতি জড়শক্তিতে বড়, সে ভাবে জড়বস্তুই একমাত্র কাম্য, উন্নতি বা সভ্যতা বলিতে জড়শক্তির অধিকারই বুঝায়; আর যদি এমন কোন জাতি থাকে, যাহাদের ঐ শক্তি নাই বা যাহারা ঐ শক্তি চাহে না, তাহারা নগণ্য—তাহারা বাঁচিয়া থাকার অযোগ্য, তাহাদের সমগ্র অস্তিত্বই নিরর্থক। অন্যদিকে আর এক জাতি ভাবিতে পারে, কেবল জড়বাদী সভ্যতা সম্পূর্ণ নিরর্থক। প্রাচ্যদেশ হইতে উত্থিত বাণী একদা সমগ্র জগৎকে বলিয়াছিল: যদি কোন ব্যক্তি বিশ্বের সব কিছু অধিকার করে অথচ তাহার আধ্যাত্মিকতা না থাকে, তবে তাহাতে কি সার্থকতা? ইহাই প্রাচ্য ভাব, অপরটি পাশ্চাত্য।

এই উভয় ভাবেরই মহত্ত্ব আছে, উভয় ভাবেরই গৌরব আছে। বর্তমান সমন্বয়ে এই উভয় আদর্শের সামঞ্জস্য, উভয় আদর্শের মিলন হইবে। পাশ্চাত্য জাতির নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যেমন সত্য, প্রাচ্য জাতির নিকট আধ্যাত্মিক জগৎ তেমনি সত্য। প্রাচ্য জাতি যাহা কিছু চায় বা আশা করে, যাহা থাকিলে জীবনটাকে সত্য বলিয়া বোধ হয়, আধ্যাত্মিক স্তরেই সে তাহা পাইয়া থাকে। পাশ্চাত্য জাতির চক্ষে সে স্বপ্নমুগ্ধ; প্রাচ্য জাতির নিকট পাশ্চাত্যও সেইরূপ স্বপ্নমুগ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়—পাঁচ মিনিটও যাহা স্থায়ী নহে, এমন পুতুল লইয়া সে খেলা করিতেছে! আর যে মুষ্টিমেয় জড়বস্তুকে শীঘ্র বা বিলম্বে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তাহাকেই বয়স্ক নরনারীগণ এত বড় মনে করে—ইহা চিন্তা করিয়া প্রাচ্য হাসিতেছে। একে অন্যকে স্বপ্নবিলাসী বলিয়া থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শ মানবজাতির উন্নতির পক্ষে যেমন আবশ্যক, প্রাচ্য আদর্শও সেইরূপ; আর আমার বোধ হয়, পাশ্চাত্য আদর্শ অপেক্ষা উহা অধিক প্রয়োজনীয়। যন্ত্র কখন মানবকে সুখী করে নাই, কখন করিবেও না। যে আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চায় যে, যন্ত্র আমাদিগকে সুখী করিবে, সে জোর করিয়া বলে যন্ত্রেই সুখ আছে; কিন্তু সুখ চিরকাল মনেই বর্তমান। যে মনের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, সে-ই কেবল সুখী হইতে পারে, অপরে নহে। আর এই যন্ত্রের শক্তিই বা কি? যে ব্যক্তি তারের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করিতে পারে, তাহাকে খুব মহৎ ও বুদ্ধিমান্ বলিব কেন? প্রকৃতি কি প্রতি মুহূর্তে ইহা অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করিতেছে না? তবে প্রকৃতির

পদতলে নত হইয়া তাহারই উপাসনা কর না কেন? যদি সমগ্র জগতের উপর তোমার শক্তি বিস্তৃত হয়, যদি তুমি জগতের প্রত্যেকটি পরমাণুকে বশীভূত করিতে পারো, তাহা হইলেই বা কি আসিয়া যায়? যতদিন মানুষ তাহার নিজের ভিতর সুখী হইবার শক্তি অর্জন না করে, এবং নিজেকে জয় করিতে সমর্থ না হয়, ততদিন সে সুখী হইতে পারিবে না। ইহা সত্য যে, মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি 'প্রকৃতি' শব্দে কেবল জড় বা বাহ্য প্রকৃতিই বুঝিয়া থাকে। ইহা সত্য যে, নদী-শৈল-সাগর-সমন্বিতা নানা শক্তি- ও ভাবমণ্ডিতা বাহ্য প্রকৃতি অতি মহৎ। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও মহত্তর মানবের অন্তঃপ্রকৃতি—সূর্য-চন্দ্র-তারকা, পৃথিবী তথা সমগ্র জড়জগৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনের ঊর্ধ্বে এই অন্তঃপ্রকৃতি আমাদের গবেষণার অন্যতম ক্ষেত্র। পাশ্চাত্য জাতি যেমন বহির্জগতের গবেষণায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, প্রাচ্য জাতি তেমনি এই অন্তর্জগতের গবেষণায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। অতএব ইহাই সঙ্গত যে, যখন আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়, তখন প্রাচ্য হইতেই হইয়া থাকে। এরূপ হওয়াই সঙ্গত। আবার যখন প্রাচ্য জাতি যন্ত্রনির্মাণ শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাকে যে পাশ্চাত্য জাতির পদতলে বসিয়া উহা শিখিতে হইবে, ইহাও সঙ্গত। পাশ্চাত্য জাতির যখন আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও ব্রহ্মাণ্ডরহস্য শিখিবার প্রয়োজন হইবে, তখন তাহাকেও প্রাচ্যের পদতলে বসিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

আমি তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির জীবনকথা বলিতে যাইতেছি, যিনি ভারতে এইরূপ এক তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবন-চরিত বলিবার পূর্বে তোমাদের নিকট ভারতের ভিতরের রহস্য, ভারত বলিতে কি বুঝায়, তাহা বলিব। যাহাদের চক্ষু জড়বস্তুর কৃত্রিম সৌন্দর্যে বিভ্রান্ত হইয়াছে, যাহারা সারা জীবনটাকে পান-ভোজন ও সম্ভোগের বেদীমূলে উৎসর্গ করিয়াছে, কাঞ্চন ও ভূখণ্ডকেই যাহারা যথাসর্বস্ব বলিয়া স্থির করিয়াছে, ইন্দ্রিয়সুখকেই যাহারা সুখের সীমা বলিয়া বুঝিয়াছে, অর্থকেই যাহারা আরাধ্য দেবতা করিয়াছে, যাহাদের চরম লক্ষ্য ইহলোকে কয়েক মুহূর্তের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও তারপর মৃত্যু, যাহাদের মন সম্মুখে ঝাঁপ দিতে

অক্ষম, যাহারা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের মধ্যে বাস করিয়া তদপেক্ষা উচ্চতর কোন কিছুর চিন্তা কখন করে না, এইরূপ ব্যক্তিরা ভারতে গিয়া কি দেখে?—দেখে চারিদিকে কেবল দারিদ্র্য আবর্জনা কুসংস্কার অজ্ঞতা বীভৎসভাবে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। ইহার কারণ কি? কারণ—তাহারা সভ্যতা বলিতে পোশাক, পরিচ্ছদ, শিক্ষা ও সামাজিক শিষ্টাচার মাত্র বুঝে। পাশ্চাত্য জাতি তাহাদের বাহ্য অবস্থার উন্নতি করিতে সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিয়াছে; ভারত কিন্তু অন্য পথে গিয়াছে। সমগ্র জগতের মধ্যে কেবল সেখানেই এমন এক জাতির বাস, যে জাতি কখন নিজদেশের সীমা ছাড়াইয়া অপর জাতিকে জয় করিতে গিয়াছে—সমগ্র ইতিহাসে কোথাও ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না, যে জাতি কখন অপরের দ্রব্যে লোভ করে নাই, যাহাদের একমাত্র দোষ এই যে, তাহাদের মস্তিষ্ক এবং দেশের ভূমি অতিশয় উর্বর, আর তাহারা গুরুতর পরিশ্রমে ধনসঞ্চয় করিয়া যেন অপরাপর জাতিকে ডাকিয়া নিজদের সর্বস্বান্ত করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছে। তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়াছে, অপর জাতি তাহাদিগকে বর্বর বলিয়াছে—ইহাতে তাহাদের দুঃখ নাই, ইহাতে তাহারা সন্তুষ্ট। পরিবর্তে তাহারা এই জগতের নিকট সেই পরমপুরুষের দর্শন-বার্তা প্রচার করিতে চায়, জগতের নিকট মানবপ্রকৃতির গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চায়, যে আবরণে মানবের প্রকৃত স্বরূপ আবৃত, তাহা ছিন্ন করিতে চায়; কারণ তাহারা জানে—এ সবই স্বপ্ন, তাহারা জানে—এই জড়ের পশ্চাতে মানবের প্রকৃত দিব্যভাব বিরাজমান, যাহা কোন পাপে মলিন হয় না, কাম যাহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে না, অগ্নি যাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল সিক্ত করিতে পারে না, তাপ শুষ্ক করিতে পারে না, মৃত্যু বিনষ্ট করিতে পারে না। পাশ্চাত্য জাতির চক্ষে জড়বস্তু যতখানি সত্য, ভারতবাসীর নিকট মানবের যথার্থ স্বরূপও ততখানি সত্য।

তোমাদের যেমন কামানের মুখে লাফাইয়া পড়িবার সাহস আছে, তোমাদের যেমন স্বদেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিবার সাহস আছে, ঈশ্বরের নামে তাহাদেরও তেমনি সাহস আছে। এই ভারতেই মানুষ যখন জগৎকে মনের কল্পনা বা স্বপ্নমাত্র বলিয়া ঘোষণা করে, তখন সে যাহা বিশ্বাস করে এবং চিন্তা করে, তাহা যে সত্য, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ, বিষয়-সম্পত্তি

সকলই সে ত্যাগ করিয়া থাকে। মানব-জীবনটা দু-দিনের নয়, প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবন অনাদি অনন্ত—এ কথা যখনই কেহ বুঝিতে পারে, তখন এই ভারতেই মানুষ নদীতীরে বসিয়া অনায়াসে শরীরটা পরিত্যাগ করিতে পারে, যেমন তোমরা সামান্য তৃণখণ্ড অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারো। ইহাই তাহাদের বীরত্ব—তাহারা মৃত্যুকে পরমাত্মীয় বলিয়া আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হয়, কারণ তাহারা নিশ্চয় জানে যে, তাহাদের মৃত্যু নাই। এইখানেই তাহাদের শক্তি নিহিত—এই শক্তিবলেই শত শত বর্ষব্যাপী বৈদেশিক আক্রমণ ও অত্যাচারে তাহারা অক্ষত রহিয়াছে; এই জাতি এখনও জীবিত এবং এই জাতির ভিতর ভীষণতম দুঃখ-বিপদের দিনেও ধর্ম-বীরের অভাব হয় নাই। পাশ্চাত্যে যেমন বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এশিয়াতেও তেমনি বড় বড় ধর্মবীর জন্মিয়াছেন। বর্তমান (ঊনবিংশ) শতাব্দীর প্রারম্ভে, যখন ভারতে পাশ্চাত্য ভাব প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে, যখন পাশ্চাত্য দিগ্বিজয়িগণ তরবারি হস্তে ঋষির বংশধরগণের নিকট প্রমাণ করিতে আসে যে, তাহারা বর্বর ও স্বপ্নবিলাসী, তাহাদের ধর্ম শুধু পৌরাণিক গল্প, ঈশ্বর আত্মা ও অন্য যাহা কিছু পাইবার জন্য তাহারা এতদিন চেষ্টা করিতেছিল, তাহা শুধু অর্থশূন্য শব্দসমষ্টি; আর হাজার হাজার বৎসর যাবৎ এই জাতি ক্রমাগত যে ত্যাগ-বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া আসিতেছে, সেগুলি বৃথা; তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকগণকে এই প্রশ্ন চঞ্চল করিয়া তুলিল: তবে কি এতদিন পর্যন্ত এই জাতির জীবন যে-আদর্শে গঠিত হইয়াছে, তাহার সার্থকতা একেবারেই নাই? তবে কি আবার এই জাতিকে পাশ্চাত্য ধারায় নূতনভাবে জীবন গঠন করিতে হইবে? তবে কি প্রাচীন পুঁথি-পত্র সব ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে, দর্শনশাস্ত্রগুলি পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে, ধর্মাচার্যগণকে তাড়াইয়া দিতে হইবে, মন্দিরগুলি ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে?

তরবারি ও বন্দুকের সাহায্যে নিজ নিজ ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করিতে সমর্থ বিজেতা পাশ্চাত্য জাতিগুলি কি বলে নাই, তোমাদের পুরাতন যাহা কিছু আছে, সবই কুসংস্কার—সবই পৌত্তলিকতা? পাশ্চাত্য ভাবে পরিচালিত নূতন বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাপ্রাপ্ত বালকগণ অতি বাল্যকাল হইতেই এই সকল ভাবে অভ্যস্ত হইল, সুতরাং তাহাদের ভিতর যে সন্দেহের আবির্ভাব হইবে, ইহা

কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া প্রকৃতভাবে সত্যানুসন্ধানে তাহারা ব্রতী হইল না; তাহার পরিবর্তে পাশ্চাত্য যাহা বলে, তাহাই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইল—পাশ্চাত্য ভাবই সত্যের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়াইল! পুরোহিতকুলের উচ্ছেদসাধন করিতে হইবে, বেদরাশি পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে, কারণ পাশ্চাত্য এ কথা বলিতেছে! এইরূপ সন্দেহ ও অস্থিরতার ভাব হইতেই ভারতে তথাকথিত সংস্কারের তরঙ্গ উঠিল।

যদি তুমি ঠিক ঠিক সংস্কারক হইতে চাও, তবে তোমার তিনটি জিনিস থাকা চাই—প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা। তোমার ভ্রাতাদের জন্য যথার্থই কি তোমার প্রাণ কাঁদিয়াছে? পৃথিবীতে এত দুঃখ-কষ্ট, এত অজ্ঞান, এত কুসংস্কার রহিয়াছে—ইহা কি তুমি যথার্থই প্রাণে প্রাণে অনুভব কর? সকল মানুষকে ভাই বলিয়া কি তুমি যথার্থই অনুভব কর? তোমার সমগ্র সত্তাই কি এই ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে? এই ভাব কি তোমার রক্তের স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে, তোমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে? এই ভাব কি তোমার প্রত্যেক স্নায়ুর ভিতর ঝঙ্কার তুলিতেছে? তুমি কি এই সহানুভূতির ভাবে পূর্ণ হইয়াছ? যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, তুমি প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। তারপর ভাবিতে হইবে: প্রতিকারের কোন পন্থা খুঁজিয়া পাইয়াছ কি না? তোমরা যে চীৎকার করিয়া সকলকে সবই ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলিতে বলিতেছ, তোমরা নিজেরা কি কোন পথ পাইয়াছ? হইতে পারে প্রাচীন ভাবগুলি কুসংস্কারপূর্ণ, কিন্তু ঐ-সকল কুসংস্কারের সঙ্গে অমূল্য সত্য মিশ্রিত রহিয়াছে, নানাবিধ খাদের সহিত স্বর্ণখণ্ডও রহিয়াছে। এমন কোন উপায় আবিষ্কার করিয়াছ কি, যাহাতে খাদ বাদ দিয়া খাঁটি সোনাটুকু মাত্র লওয়া যাইতে পারে? যদি তাহাও করিয়া থাকো, তবে বুঝিতে হইবে, তুমি দ্বিতীয় সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। আরও একটি জিনিসের প্রয়োজন—প্রাণপণ অধ্যবসায়। তুমি যে কল্যাণ করিতে যাইতেছ, বলো দেখি, তোমার আসল অভিসন্ধিটা কি? নিশ্চিতরূপে কি বলিতে পারো যে, তোমার এই কল্যাণেচ্ছার পশ্চাতে অর্থ মান যশ বা প্রভুত্বের বাসনা নাই? তুমি কি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারো, যদি সমগ্র জগৎ তোমাকে পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে, তথাপি তোমার আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া কাজ করিয়া যাইতে পারিবে? তুমি কি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারো, তুমি যাহা চাও

তাহা জানো, আর তোমার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হইলেও তোমার কর্তব্য—সেই কর্তব্যই সাধন করিয়া যাইতে পারিবে? তুমি কি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারো, যতদিন জীবন থাকিবে, যতদিন হৃদয়ের গতি সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ না হইবে, ততদিন অধ্যবসায়ের সহিত উদ্দেশ্যসাধনে লাগিয়া থাকিবে? এই ত্রিবিধ গুণ যদি তোমার থাকে, তবেই তুমি প্রকৃত সংস্কারক, তবেই তুমি যথার্থ আচার্য ও গুরু, তবেই তুমি আমাদের নমস্য। যদি তোমার এই গুণগুলি না থাকে, তবে তুমি আমাদের শ্রদ্ধার যোগ্য নও। কিন্তু মানুষ বড়ই দুর্বল, বড়ই সঙ্কীর্ণদৃষ্টি। অপেক্ষা করিয়া থাকিবার ধৈর্য তাহার নাই, প্রকৃত দর্শনের শক্তি তাহার নাই—সে এখনই ফল দেখিতে চায়। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, সে নিজেই ফল ভোগ করিতে চায়, প্রকৃতপক্ষে অপরের জন্য তাহার বড় ভাবনা নাই। সে কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করিতে চাহে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন: কর্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে কখনও নয়।

ফল কামনা কর কেন? আমাদের কেবল কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে। ফল যাহা হইবার হইতে দাও। কিন্তু মানুষের সহিষ্ণুতা নাই—এইরূপ অসহিষ্ণুতার জন্য শীঘ্র শীঘ্র ফলভোগের আকাঙ্ক্ষায় সে যে-কোন একটা মতলব লইয়া তাহাতেই লাগিয়া যায়। জগতের অধিকাংশ ভাবী সংস্কারককেই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতে এই সংস্কারের ভাব আসিল। কিছুকালের জন্য বোধ হইল, যে জড়বাদ ও 'অহং'-সর্বস্বতার তরঙ্গ ভারতের উপকূলে প্রবলবেগে আঘাত করিতেছে, তাহা আমাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হৃদয়ের প্রভূত সরলতা, ঈশ্বরলাভের জন্য হৃদয়ের তীব্র ব্যাকুলতা প্রভৃতি সবই ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। মুহূর্তের জন্য বোধ হইল, যেন সমগ্র জাতির অদৃষ্টে বিধাতা একেবারে ধ্বংস লিখিয়াছেন। কিন্তু এই জাতি এরূপ সহস্র বিপ্লব-তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিয়া আসিয়াছে। সেগুলির তুলনায় এ তরঙ্গের বেগ তো অতি সামান্য। শত শত বর্ষ ধরিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া এই দেশকে বন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছে, সম্মুখে যাহা পাইয়াছে তাহাই ভাঙিয়া-চুরিয়া দিয়াছে; তরবারি ঝলসিত হইয়াছে, 'আল্লার জয়'-রবে ভারত-গগন বিদীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু পরে যখন বিপ্লবের বন্যা থামিল, দেখা গেল জাতীয় আদর্শ অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে।

ভারতীয় জাতি নষ্ট হইবার নহে। মৃত্যুকে উপহাস করিয়া ভারতবাসী নিজ মহিমায় বিরাজিত রহিয়াছে, এবং যতদিন ভারতের জাতীয় ভিত্তিস্বরূপ ধর্মভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, যতদিন ভারতের লোক ধর্মকে ছাড়িয়া বিষয়সুখে উন্মত্ত না হইবে, যতদিন ভারতবাসীরা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ না করিবে, ততদিন তাহারা এইরূপই থাকিবে। হয়তো তাহারা চিরকাল ভিক্ষুক ও দরিদ্র থাকিবে, ধূলি ও মলিনতার মধ্যে হয়তো তাহাদিগকে চিরদিন থাকিতে হইবে, কিন্তু তাহারা যেন তাহাদের ঈশ্বরকে পরিত্যাগ না করে; তাহারা যে ঋষির বংশধর, এ-কথা যেন তাহারা ভুলিয়া না যায়। যেমন পাশ্চাত্য দেশে একটি মুটে-মজুর পর্যন্ত মধ্যযুগের কোন দস্যু-'ব্যারনে'র বংশধররূপে আপনাকে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে, ভারতে তেমনি সিংহাসনারূঢ় সম্রাট পর্যন্ত অরণ্যবাসী বল্কলপরিহিত আরণ্যফলমূলভোজী ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ অকিঞ্চন ঋষিগণের বংশধররূপে নিজেকে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করেন। আমরা এইরূপ ঋষিগণেরই বংশধর বলিয়া পরিচিত হইতে চাই; আর যতদিন পুণ্যচরিত্রের উপর এইরূপ গভীর শ্রদ্ধা থাকিবে, ততদিন ভারতের বিনাশ নাই।

ভারতের চারিদিকে যখন এইরূপ নানাবিধ সংস্কারের চেষ্টা চলিতেছিল, সেই সময়ে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুআরি, বঙ্গদেশের কোন সুদূর পল্লীগ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে একটি শিশুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতামাতা অতি নিষ্ঠাবান্ প্রাচীনপন্থী লোক ছিলেন। এরূপ ব্রাহ্মণের জীবন নিত্য ত্যাগ ও তপস্যায় পূর্ণ। জীবিকানির্বাহের জন্য তাঁহার পক্ষে অল্প কয়েকটি পথই উন্মুক্ত, তাহার উপর আবার নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের পক্ষে যে-কোন বিষয়কর্ম নিষিদ্ধ। আবার যথেচ্ছভাবে কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিবারও জো নাই। কল্পনা করিয়া দেখ—এরূপ জীবন কি কঠোর! ব্রাহ্মণদের কথা ও তাহাদের পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ের কথা তোমরা অনেক শুনিয়াছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের মধ্যে কয়জন ভাবিয়া দেখিয়াছ—এই অদ্ভুত মানুষগুলি কিভাবে তাহাদের প্রতিবেশিগণের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিল? দেশের সকল জাতির মধ্যে তাহারা দরিদ্রতম, ত্যাগই তাহাদের শক্তির রহস্য। তাহারা কখন ধনের আকাঙ্ক্ষা করে নাই। জগতের মধ্যে তাহারাই সর্বাপেক্ষা দরিদ্র পুরোহিত, সেইজন্যই

তাহারা সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্। তাহারা নিজেরা এরূপ দরিদ্র বটে, তথাপি দেখিবে—যদি গ্রামে কোন দরিদ্র ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, ব্রাহ্মণপত্নী তাহাকে গ্রাম হইতে কখন অভুক্ত চলিয়া যাইতে দিবে না। ইহাই ভারতীয় মাতার সর্বপ্রথম কর্তব্য; যেহেতু তিনি মাতা, সেইজন্য তাঁহার কর্তব্য সকলকে খাওয়াইয়া সর্বশেষে নিজে খাওয়া। প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে হইবে—সকলে খাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তবেই তিনি খাইতে পাইবেন; সেই-জন্যই ভারতে জননীকে সাক্ষাৎ ভগবতী বলা হয়। আমরা যাঁহার জীবনী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার মাতা এইরূপ আদর্শ হিন্দু জননী ছিলেন। ভারতে যে জাতি যত উচ্চ, তাহার বিধিনিষেধও তত বেশী। খুব নীচ জাতিরা যাহা খুশী খাইতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা উচ্চতর জাতিসমূহে আহারে বিধিনিষেধ দেখা যায়; আর উচ্চতম জাতি, ভারতের বংশানুক্রমিক পুরোহিত জাতি, ব্রাহ্মণের জীবনে—পূর্বেই বলিয়াছি—খুব বেশী আচারনিষ্ঠা। পাশ্চাত্য দেশের আচার-ব্যবহারের তুলনায় এই ব্রাহ্মণদের জীবন বিরামহীন তপস্যায় পূর্ণ, কিন্তু তাহাদের খুব স্থৈর্য আছে। তাহারা কোন একটা ভাব পাইলে তাহার চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়ে না, আর বংশানুক্রমে সে-ভাব পোষণ করিয়া কার্যে পরিণত করে। একবার তাহাদিগকে কোন একটা ভাব দাও, সহজে তাহা অপসারিত করিতে পারিবে না; তবে তাহাদিগকে কোন নূতন ভাব দেওয়া বড় কঠিন।

নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরা এই কারণে অতিশয় স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের চিন্তা ও ভাবের রাজ্যে বাস করে। কিরূপে জীবনযাপন করিতে হইবে, তাহা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত আছে; তাহারা সেই-সকল বিধি-নিষেধের সামান্য খুঁটিনাটি পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া থাকে। তাহারা বরং উপবাস করিয়া থাকিবে, তথাপি তাহাদের স্বজাতির ক্ষুদ্র গণ্ডির বহির্ভূত কোন ব্যক্তির হাতে খাইবে না। এইরূপ স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় হইলেও তাহাদের ঐকান্তিকতা ও অসাধারণ নিষ্ঠা আছে। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদের ভিতর অনেক সময় এইরূপ প্রবল বিশ্বাস ও ধর্মভাব দেখা যায়, কারণ সত্যের প্রতি গভীর বিশ্বাস হইতেই তাহাদের নিষ্ঠা আসিয়াছে। তাহারা এরূপ অধ্যবসায়ের সহিত লাগিয়া থাকে যে, আমরা সকলে হয়তো তাহা ঠিক বলিয়া মনে না-ও করিতে পারি, কিন্তু তাহাদের মতে

তাহা সত্য। আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে, মানুষ সর্বদা দানশীল হইবে —এমন কি চরমভাবেও। যদি কোন ব্যক্তি অপরকে সাহায্য করিতে—সেই ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিতে গিয়া নিজে অনশনে প্রাণত্যাগ করে, শাস্ত্র বলেন, ইহা অন্যায় নহে, বরং ইহা মানুষের কর্তব্য। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিজের মৃত্যুর ভয় না রাখিয়া সম্পূর্ণভাবে দানব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। যাঁহারা ভারতীয় সাহিত্যের সহিত পরিচিত, তাঁহারা এইরূপ চূড়ান্ত দানশীলতার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি প্রাচীন সুন্দর উপাখ্যানের কথা স্মরণ করিতে পারেন। মহাভারতে লিখিত আছে, এক অতিথিকে ভোজন করাইতে গিয়া কিরূপে একটি সমগ্র পরিবার অনশনে প্রাণ দিয়াছিল। ইহা অতিরঞ্জিত নহে, কারণ এখনও এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায়। মদীয় আচার্যদেবের পিতামাতার চরিত্র এই আদর্শে গঠিত ছিল। তাঁহারা খুব দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু অনেক সময় কোন দরিদ্র অতিথিকে খাওয়াইতে গিয়া মাতা সারাদিন উপবাস করিয়া থাকিতেন।

এইরূপ পিতামাতার কোলে এই শিশু জন্মগ্রহণ করেন—আর জন্ম হইতেই তাঁহার মধ্যে একটু বিশেষত্ব, একটু অসাধারণত্ব ছিল। জন্মাবধিই তাঁহার পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ হইত—কি কারণে তিনি জগতে আসিয়াছেন, তাহা জানিতেন, আর সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সমুদয় শক্তি নিয়োগ করেন। অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি পাঠশালায় প্রেরিত হন।

ব্রাহ্মণসন্তানকে পাঠশালায় যাইতেই হয়। লেখাপড়ার কাজ ছাড়া ব্রাহ্মণের অন্য কাজে অধিকার নাই। এখনও দেশের অনেক স্থানে প্রচলিত, বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদের সহিত সম্পর্কিত ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি আধুনিক প্রণালী হইতে খুবই ভিন্ন রকমের। সেই শিক্ষাপ্রণালীতে ছাত্রদের বেতন দিতে হইত না। প্রাচীন ধারণা ছিল—জ্ঞান এত পবিত্র বস্তু যে, ইহা বিক্রয় করা উচিত নয়। কোন মূল্য না লইয়া অবাধে জ্ঞানবিতরণ করিতে হইবে। আচার্যেরা ছাত্রগণকে বিনা বেতনে নিজেদের নিকট রাখিতেন; আর শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ছাত্রগণকে খাওয়া-পরাও দিতেন। এই সকল আচার্যের ব্যয়নির্বাহের জন্য ধনী পরিবারের লোকেরা বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যে তাঁহাদিগকে দান করিতেন। বিশেষ বিশেষ দানের অধিকারী বলিয়া তাঁহারা বিবেচিত হইতেন এবং আচার্যদিগকেও ছাত্রদের প্রতিপালন করিতে হইত। যে

বালকের কথা আমি বলিতেছি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একজন পণ্ডিত ছিলেন। বালক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট পাঠ আরম্ভ করিলেন। অল্পদিন পরে বালকের দৃঢ় ধারণা হইল যে, সকল লৌকিক বিদ্যার উদ্দেশ্য শুধু পার্থিব উন্নতি। সুতরাং লেখাপড়া ছাড়িয়া তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণে সম্পূর্ণভাবে জীবন উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর সংসারে প্রবল দারিদ্র্য দেখা দিল; বালককে নিজের আহারের সংস্থানের চেষ্টা করিতে হইল। তিনি কলিকাতার নিকটে এক স্থানে একটি মন্দিরে পুরোহিত নিযুক্ত হইলেন। মন্দিরে পৌরোহিত্য-কর্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে বড় নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। তোমরা যে অর্থে 'চার্চ' শব্দ ব্যবহার কর, আমাদের মন্দির সেরূপ নহে। মন্দিরগুলি সাধারণ-উপাসনার স্থান নহে, কারণ ভারতে সমবেত উপাসনা বলিয়া কিছু নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধনী ব্যক্তিরা পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন।

বিষয়-সম্পত্তি যাঁহার বেশী আছে, তিনি এইরূপ মন্দির করিয়া দেন। মন্দিরে তিনি ঈশ্বরের কোন প্রতীক বা ঈশ্বরাবতারের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভগবানের নামে পূজার জন্য তাহা উৎসর্গ করেন। রোমান ক্যাথলিক চার্চে যেরূপ অর্চনা (Mass) হইয়া থাকে, এই সকল মন্দিরে কতকটা সেইভাবে পূজা হয়—শাস্ত্র হইতে মন্ত্র-শ্লোকাদি পাঠ করা হয়, প্রতিমার সম্মুখে আলো ঘুরানো হয়; মোট কথা, আমরা একজন মহৎ ব্যক্তিকে যেভাবে সম্মান করি, প্রতিমার প্রতি ঠিক সেইরকম আচরণ করা হয়। মন্দিরে এই অনুষ্ঠানগুলিই হয়। যে ব্যক্তি কখন মন্দিরে যায় না, তাহার অপেক্ষা যে মন্দিরে যায়, মন্দিরে যাওয়ার দরুন সে মহত্তর বলিয়া বিবেচিত হয় না। বরং যে কখন মন্দিরে যায় না, সেই অধিকতর ধার্মিক বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ ভারতে ধর্ম প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব, আর লোকে নিজগৃহে নির্জনেই আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাসনাদি নির্বাহ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে মন্দিরে পৌরোহিত্য নিন্দনীয় কার্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, অর্থবিনিময়ে বিদ্যাদানই যখন নিন্দার্হ বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন ধর্ম সম্বন্ধে যে ইহা আরও অধিক প্রযোজ্য, বলাই বাহুল্য। মন্দিরের পুরোহিত যখন বেতন লইয়া কার্য করে, তখন বলিতে হইবে, সে এই ধর্মগত বিষয় লইয়া

ব্যবসায় করিতেছে। অতএব যখন দারিদ্র্যের তাড়নায় বাধ্য হইয়া এই বালককে জীবিকার একমাত্র উপায়রূপে মন্দিরে পুরোহিতের কর্ম অবলম্বন করিতে হইল, তখন তাহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করিয়া দেখ।

বাঙলা দেশে অনেক কবি জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের রচিত সঙ্গীতসমূহ সাধারণ লোকের মধ্যে খুব প্রচলিত। কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় এবং পল্লীগ্রামগুলিতে সেইসকল গান গীত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্মসঙ্গীত এবং সেইগুলির সারমর্ম এই যে, ধর্মকে সাক্ষাৎ অনুভব করিতে হইবে। এই ভাবটি সম্ভবতঃ ভারতীয় ধর্মসমূহের বিশেষত্ব। ভারতে ধর্ম সম্বন্ধে এমন কোন গ্রন্থ নাই, যাহাতে এই ভাবটি নাই। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে, তাঁহাকে দেখিতে হইবে, তাঁহার সহিত কথা কহিতে হইবে—ইহাই ধর্ম। অনেক সাধুপুরুষের ঈশ্বরদর্শন-কাহিনী ভারতে সর্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ বিশ্বাস তাঁহাদের ধর্মের ভিত্তি। ভারতের আবহাওয়া সাধুসন্তদের ঈশ্বরদর্শনের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির জন্য ঐ গ্রন্থগুলি লিখিত হয় নাই, কোনরূপ যুক্তি দ্বারা ইহাদিগকে বুঝিবার উপায় নাই, কারণ তাঁহারা নিজেরা যাহা দেখিয়াছেন তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন; যাঁহারা নিজদিগকে ঐরূপ উচ্চভাবাপন্ন করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল ঐসকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারা বলেন, ইহজীবনেই এরূপ প্রত্যক্ষানুভূতি সম্ভব, আর সকলেরই ইহা হইতে পারে। মানবের এই শক্তি বিকশিত হইলেই ধর্মের আরম্ভ। ইহাই সকল ধর্মের সার কথা।

এইজন্যই দেখিতে পাই, একজনের খুব ভাল বক্তৃতা দিবার শক্তি আছে, তাঁহার যুক্তিসমূহ অকাট্য, এবং তিনি খুব উচ্চ উচ্চ ভাব প্রচার করিতেছেন, তথাপি তাঁহার কথা কেহ শুনে না; আর একজন অতি সামান্য ব্যক্তি, নিজের মাতৃভাষাই হয়তো ভাল করিয়া জানেন না, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় দেশের অর্ধেক লোক তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতেছে। ভারতে এরূপ হয়, যখন লোকে কোনরূপে জানিতে পারে কাহারও এইরূপ প্রত্যক্ষানুভূতি হইয়াছে, ধর্ম তাঁহার পক্ষে আর অনুমানের বিষয় নয়—ধর্ম, আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বর প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া তিনি আর অন্ধ-

কারে হাতড়াইতেছেন না, তখন চারিদিক হইতে লোক তাঁহাকে দেখিতে আসে এবং ক্রমে তাঁহাকে পূজা করিতে আরম্ভ করে।[১]

পূর্বকথিত মন্দিরে আনন্দময়ী জগন্মাতার একটি মূর্তি ছিল। এই বালককে প্রত্যহ প্রাতে ও সায়াহ্নে তাঁহার পূজা করিতে হইত। পূজা করিতে করিতে এই ভাব আসিয়া তাঁহার মন অধিকার করিল: এই মূর্তির ভিতর সত্যই কিছু আছে কি? সত্যই কি জগতে আনন্দময়ী মা বলিয়া কেহ আছেন? তিনি কি সত্য সত্যই চৈতন্যময়ী এবং এই বিশ্বের নিয়ন্ত্রী? অথবা এ সব কি স্বপ্নবৎ মিথ্যা? ধর্মের মধ্যে কিছু সত্য আছে কি?

তিনি শুনিয়াছিলেন, অতীতকালে অনেক বড় বড় সাধু মহাপুরুষ এইরূপে ভগবান লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং অবশেষে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফলও হইয়াছে। তিনি শুনিয়াছিলেন, ভারতের সকল ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য—এই জগন্মাতার সাক্ষাৎ উপলব্ধি। তাঁহার সমুদয় মন-প্রাণ যেন সেই এক ভাবে তন্ময় হইয়া গেল। কিরূপে তিনি জগন্মাতাকে লাভ করিবেন, এই এক চিন্তাই তাঁহার মনে প্রবল হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহার এই ভাব বাড়িতে লাগিল। শেষে তিনি 'কিরূপে মায়ের দর্শন পাইব'—ইহা ছাড়া আর কিছু বলিতে বা শুনিতে পারিতেন না।

সকল হিন্দু বালকের মনেই এই সংশয় আসিয়া থাকে। এই সংশয়ই আমাদের দেশের বিশেষত্ব: আমরা যাহা করিতেছি, তাহা কি সত্য? কেবল মতবাদে আমাদের তৃপ্তি হইবে না। অথচ ঈশ্বর সম্বন্ধে যত মতবাদ এ পর্যন্ত প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলি সবই ভারতে আছে। শাস্ত্র বা মতবাদ আমাদিগকে তৃপ্ত করিতে পারে না। আমাদের দেশের সহস্র সহস্র ব্যক্তির মনে এইরূপ প্রত্যক্ষানুভূতির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকে: এ-কথা কি সত্য যে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন? যদি থাকেন, তবে আমি কি তাঁহার দর্শন পাইতে পারি? আমি কি সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ?—পাশ্চাত্য জাতি এগুলিকে কেবল কল্পনা মনে করিতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহাই বিশেষ কাজের কথা। এই ভাব আশ্রয় করিয়া লোকে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। এই ভাবের জন্য প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র হিন্দু গৃহত্যাগ করে এবং

১ 'উদ্বোধন' হইতে প্রকাশিত 'My Master' বক্তৃতায় এই অনুচ্ছেদটি পাদটীকায় আছে।

কঠোর তপস্যা করার ফলে অনেকে মরিয়া যায়। পাশ্চাত্য জাতির মনে ইহা খুবই কাল্পনিক বলিয়া বোধ হইবে; তাহারা যে কেন এইরূপ মত প্রকাশ করে, তাহারও কারণ আমি অনায়াসে বুঝিতে পারি। তবু পাশ্চাত্য দেশে অনেকদিন বসবাস করা সত্ত্বেও আমি এই প্রাচ্য ভাবকেই জীবনে সর্বাপেক্ষা সত্য—বাস্তব বলিয়া মনে করি।

জীবনটা তো মুহূর্তের•জন্য—তা তুমি রাস্তার মুটেই হও, আর লক্ষ লক্ষ লোকের শাসক সম্রাটই হও। জীবন তো ক্ষণভঙ্গুর—তা তোমার স্বাস্থ্য খুব ভালই হউক, অথবা খুব মন্দই হউক। হিন্দু বলেন, এ জীবন-সমস্যার একমাত্র সমাধান—ঈশ্বরলাভ। ধর্মলাভই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। যদি ঈশ্বর ও ধর্ম সত্য হয়, তবেই জীবন-রহস্যের ব্যাখ্যা হয়, জীবনভার দুর্বহ হয় না, জীবনটা উপভোগ্য হয়। তাহা না হইলে জীবন একটা বৃথা ভারমাত্র। ইহাই আমাদের ধারণা; শত শত যুক্তি দ্বারা ধর্ম ও ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায় না। যুক্তিবলে ধর্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্ভব বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু ঐখানেই শেষ। সত্যকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইবে, আর ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে গেলে অনুভূতি আবশ্যক। ঈশ্বর আছেন, এইটি নিশ্চয় করিয়া বুঝিতে হইলে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে হইবে। সাক্ষাৎ উপলব্ধি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আমাদের নিকট ধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে না।

বালকের হৃদয়ে যখন এই ধারণা প্রবেশ করিল, তখন তাঁহার সারাদিন কেবল ঐ এক ভাবনা—কিসে প্রত্যক্ষ দর্শন হইবে। দিনের পর দিন তিনি কাঁদিয়া বলিতেন—'মা, সত্যই কি তুমি আছ, না এ-সব কল্পনা মাত্র? কবিগণ ও ভ্রান্ত ব্যক্তিগণই কি এই আনন্দময়ী জননীর কল্পনা করিয়াছেন অথবা সত্যই কিছু আছে?' আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, আমরা যে অর্থে শিক্ষা শব্দ ব্যবহার করি, সেরূপ শিক্ষা তাঁহার কিছুই ছিল না; ইহাতে বরং ভালই হইয়াছিল। অপরের ভাব—অপরের চিন্তার অনুগামী হইয়া তাঁহার মনের স্বাভাবিকতা, মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায় নাই। তাঁহার মনের এই প্রধান চিন্তাটি দিন দিন বাড়িতে লাগিল, শেষে এমন হইল যে, তিনি আর কিছু ভাবিতে পারিতেন না। নিয়মিতরূপে পূজা করা, সব খুঁটিনাটি নিয়ম পালন করা—এখন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। সময়ে সময়ে তিনি

দেবতাকে ভোগ দিতে ভুলিয়া যাইতেন, কখন কখন আরতি করিতে ভুলিতেন, আবার কখন সব ভুলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা আরতি করিতেন। লোকমুখে ও শাস্ত্রমুখে তিনি শুনিয়াছিলেন, যাহারা ব্যাকুলভাবে ভগবানকে চায়, তাহারাই তাঁহাকে পাইয়া থাকে। এক্ষণে ভগবানকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার সেই প্রবল আগ্রহ দেখা দিল। অবশেষে তাঁহার পক্ষে মন্দিরের নিয়মিত পূজা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি পূজা পরিত্যাগ করিয়া মন্দিরের পার্শ্ববর্তী পঞ্চবটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনের এই ভাব সম্বন্ধে তিনি আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন, 'কখন সূর্য উদিত হইল, কখন বা অস্ত গেল, তাহা আমি জানিতে পারিতাম না।' তিনি নিজের দেহভাব একেবারে ভুলিয়া গেলেন, আহার করিবার কথাও তাঁহার স্মরণ থাকিত না। এই সময়ে তাঁহার এক আত্মীয় তাঁহাকে খুব যত্নপূর্বক সেবাশুশ্রূষা করিতেন, তিনি তাঁহার মুখে জোর করিয়া খাবার দিতেন। অজ্ঞাতসারে ঐ খাদ্য কতকটা উদরস্থ হইত। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিতেন, 'মা, মা, তুই কি সত্যি আছিস্, তবে আমায় কেন অজ্ঞানে ফেলে রেখেছিস্? সত্য কি, আমাকে তা জানতে দিচ্ছিস্ না কেন? আমি তোকে সাক্ষাৎ দেখতে পাচ্ছি না কেন? লোকের কথা, শাস্ত্রের কথা, ষড়্‌দর্শন—এ-সব পড়ে-শুনে কি হবে, মা? এ সবই মিছে। সত্য—যথার্থ সত্য আমি সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করতে চাই। সত্য অনুভব করতে—স্পর্শ করতেই আমি চাই।'

এইভাবে সেই বালকের দিনরাত্রি কাটিত। দিবাবসানে সন্ধ্যায় যখন মন্দিরে আরতির শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি শুনিতে পাইতেন, তাঁহার মন তখন অতিশয় ব্যাকুল হইত; তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, 'মা, আরও এক দিন বৃথা চলে গেল, তবু তোমার দেখা পেলাম না! এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের আর একটা দিন চলে গেল, আমি সত্যকে জানতে পারলাম না!' হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণায় তিনি কখন কখন মাটিতে মুখ ঘর্ষণ করিয়া কাঁদিতেন।

মনুষ্যহৃদয়ে এইরূপ তীব্র ব্যাকুলতা আসিয়া থাকে। শেষ অবস্থায় তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'বৎস, মনে কর, একটা ঘরে এক থলি মোহর রহিয়াছে, আর তার পাশের ঘরে একটা চোর রহিয়াছে, তুমি কি মনে কর সেই চোরের নিদ্রা হইবে? সে নিদ্রা যাইতে পারে না। তাহার মনে

ক্রমাগত এই চিন্তার উদয় হইবে যে, কি করিয়া সে ঐ ঘরে ঢুকিয়া মোহরের থলিটি লইবে? তাই যদি হয়, তবে তুমি কি মনে কর, যাহার এই ধারণা দৃঢ় হইয়াছে যে, এইসকল আপাত-প্রতীয়মান বস্তুর পশ্চাতে সত্য রহিয়াছে, ঈশ্বর বলিয়া একজন আছেন, একজন অবিনশ্বর অনন্ত-আনন্দস্বরূপ আছেন, যে আনন্দের সহিত তুলনা করিলে ইন্দ্রিয়-সুখ ছেলেখেলা বলিয়া বোধ হয়, সে কি তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়া স্থির থাকিতে পারে? এক মুহূর্তের জন্যও কি সে এই চেষ্টা পরিত্যাগ করিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। সে উহা লাভের জন্য উন্মত্ত হইবে।' এই বালকের হৃদয়ে এই উন্মত্ততা প্রবেশ করিল। সে-সময়ে তাঁহার কোন গুরু ছিলেন না, এমন কেহ ছিল না—যে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর কোন সন্ধান দেয়, বরং সকলেই মনে করিত, তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। সাধারণে তো এইরূপ বলিবেই। যদি কেহ সংসারের অসার বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করে, লোকে তাহাকে উন্মত্ত বলে; কিন্তু এইরূপ ব্যক্তিই সংসারে যথার্থ শ্রেষ্ঠ। এইরূপ উন্মত্ততা হইতেই জগৎ-আলোড়নকারী শক্তির উদ্ভব হইয়াছে, আর ভবিষ্যতেও এইরূপ উন্মত্ততা হইতেই শক্তি উদ্ভূত হইয়া জগৎকে আলোড়িত করিবে।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস সত্যলাভের অবিশ্রান্ত চেষ্টা চলিল। তখন তাঁহার নানাবিধ অলৌকিক ও অদ্ভুত দর্শন হইতে লাগিল, নিজ স্বরূপের রহস্য তাঁহার নিকট ক্রমশঃ উদ্‌ঘাটিত হইতে লাগিল, যেন আবরণের পর আবরণ অপসারিত হইতে লাগিল। জগন্মাতা নিজেই গুরু হইয়া বালককে আকাঙ্ক্ষিত সত্যলাভের সাধনায় দীক্ষিত করিলেন। এই সময়ে সেই স্থানে এক পরমা সুন্দরী অনুপম বিদুষী আসিলেন। পরবর্তী সময়ে এই মহাত্মা বলিতেন যে, বিদুষী বলিলে তাঁহাকে ছোট করা হয়—তিনি ছিলেন মূর্তিমতী বিদ্যা, যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী মূর্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। এই মহিলার বিষয় আলোচনা করিলেও তোমরা ভারতীয়দের বিশেষত্ব কোথায় বুঝিতে পারিবে। সাধারণতঃ হিন্দুনারীগণ যেরূপ অজ্ঞানান্ধকারে বাস করেন—পাশ্চাত্যদেশে যাহাকে স্বাধীনতার অভাব বলে—তাহার মধ্যেও এইরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন নারীর জন্ম সম্ভব হইয়াছিল। তিনি একজন সন্ন্যাসিনী ছিলেন—কারণ ভারতে নারীগণও বিবাহ না করিয়া, সংসারত্যাগ

করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় জীবন সমর্পণ করেন। এই মন্দিরে আসিয়াই তিনি যেমন শুনিলেন যে, একটি বালক দিনরাত ঈশ্বরের নামে অশ্রু বিসর্জন করিতেছে আর লোকে তাঁহাকে পাগল বলে, অমনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। এই মহিলার নিকটেই বালক প্রথম সাহায্য পাইলেন। মহিলা তৎক্ষণাৎ বালকের হৃদয়ের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'বৎস, তোমার মতো উন্মত্ততা যাহার আসিয়াছে, সে ধন্য। সমগ্র বিশ্বই পাগল—কেহ ধনের জন্য, কেহ সুখের জন্য, কেহ নামের জন্য, কেহ বা অন্য কিছুর জন্য। সেই ধন্য, যে ঈশ্বরের জন্য পাগল। এইরূপ মানুষ বড়ই দুর্লভ।' এই মহিলা বালকটির নিকট অনেক বৎসর থাকিয়া তাঁহাকে ভারতের বিভিন্ন ধর্মপ্রণালীর সাধন শিখাইতে লাগিলেন, নানা প্রকার যোগসাধনায় দীক্ষিত করিলেন এবং এই বেগবতী ধর্ম-স্রোতস্বতীর গতিকে যেন পরিচালিত ও প্রণালীবদ্ধ করিলেন।

কিছুদিন পরে সেখানে একজন পরম পণ্ডিত ও দর্শনশাস্ত্রবিৎ সন্ন্যাসী আসিলেন। তিনি ছিলেন অদ্ভুত আদর্শবাদী এবং বিশ্বাস করিতেন, প্রকৃতপক্ষে জগতের কোন অস্তিত্ব নাই; ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি গৃহে বাস করিতেন না, রৌদ্র ঝঞ্ঝা বর্ষায় বাহিরে থাকিতেন। তিনি এই সাধককে বেদান্ত-শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু শীঘ্রই দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন যে, গুরু অপেক্ষা শিষ্য অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। তিনি কয়েক মাস তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়া চলিয়া গেলেন। পূর্বোক্ত সাধিকা মহিলা ইতিপূর্বেই দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। যখনই বালকের হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইল, অমনি তিনি চলিয়া গেলেন। আজ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে অথবা তিনি এখনও জীবিত আছেন, তাহা কেহই জানে না। তিনি আর ফিরেন নাই।

মন্দিরে পূজারী থাকাকালে আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষের অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া লোকে স্থির করিয়াছিল, তাঁহার একটু মাথার গোল হইয়াছে। আত্মীয়েরা তাঁহাকে দেশে লইয়া গিয়া একটি অল্পবয়স্কা বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ দিল—মনে করিল, ইহাতেই তাঁহার মনের গতি ফিরিয়া যাইবে, মাথার গোল আর থাকিবে না। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়া ভগবানকে লইয়া আরও মাতিয়া গেলেন। অবশ্য তাঁহার যেরূপ

বিবাহ হইল, উহাকে ঠিক বিবাহ নাম দেওয়া যায় না। যখন স্ত্রী একটু বড় হয়, তখনই প্রকৃত বিবাহ হইয়া থাকে, আর এই বিবাহের পর স্বামী শ্বশুরালয়ে গিয়া স্ত্রীকে নিজগৃহে লইয়া আসে—ইহাই সামাজিক প্রথা। এ ক্ষেত্রে কিন্তু স্বামী একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী আছেন। সুদূর পল্লীতে পিত্রালয়ে বালিকাটি শুনিলেন যে, তাঁহার স্বামী ধর্মে মত্ত হইয়া গিয়াছেন, এমন কি—অনেকে তাঁহাকে পাগল বলিয়াই মনে করিতেছে। তিনি স্থির করিলেন, এ কথার সত্যতা জানিতে হইবে—তাই তিনি পল্লী হইতে বাহির হইয়া তাঁহার স্বামী যেখানে আছেন, পদব্রজে সেখানে গেলেন। অবশেষে যখন তিনি স্বামীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন না। যদিও ভারতে নরনারী যে-কেহ ধর্মজীবন অবলম্বন করে, তাহারই আর কাহারও সহিত কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না, তথাপি ইনি স্ত্রীকে ত্যাগ না করিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন, 'আমি জানিয়াছি, সকল নারীই আমার জননী ; তবু এখন তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।'

এই বিশুদ্ধস্বভাবা মহীয়সী মহিলা স্বামীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি বলিলেন, 'জোর করিয়া আপনাকে সংসারী করিবার ইচ্ছা আমার নাই, আমি কেবল নিকটে থাকিয়া আপনার সেবা করিতে চাই, আপনার নিকট সাধনভজন শিখিতে চাই।' তিনি স্বামীর একজন প্রধান অনুগতা শিষ্যা হইলেন—তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তি-পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে স্ত্রীর অনুমতি পাইয়া তাঁহার শেষ বাধা অপসারিত হইল এবং তিনি স্বাধীনভাবে নিজ মনোনীত পথে জীবনযাপন করিতে সমর্থ হইলেন।

যাহা হউক, এইরূপে তিনি সাংসারিক বন্ধনমুক্ত হইলেন এবং সাধনাতেও অনেক অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে প্রথমেই তাঁহার হৃদয়ে এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইল—কিভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে অভিমান-বিবর্জিত হইবেন, 'আমি ব্রাহ্মণ, ও শূদ্র' বলিয়া নিজের যে জাত্যভিমান আছে, কিরূপে তাহা সমূলে উৎপাটিত করিবেন, কিভাবে তিনি অতি হীনতম জাতির সঙ্গে পর্যন্ত নিজের সমত্ব বোধ করিবেন। আমাদের দেশে যে জাতিভেদ-প্রথা আছে, তাহাতে বিভিন্ন মানবের মধ্যে পদমর্যাদার ভেদ স্থির ও চিরনির্দিষ্ট

হইয়া থাকে। জন্মবশেই প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষ সামাজিক মর্যাদা লাভ করে, আর যতদিন না সে কোন গুরুতর অন্যায় কর্ম করে, ততদিন সেই মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হয় না। জাতিসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্বোচ্চ এবং মেথর বা চণ্ডাল সর্বনিম্ন। সুতরাং যাহাতে নিজেকে কাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান না থাকে, এই কারণে এই ব্রাহ্মণসন্তান মেথরের কাজ করিয়া তাহার সহিত নিজের অভেদ-বুদ্ধি আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মেথরের কাজ রাস্তা সাফ করা, ময়লা সাফ করা—কেহই তাহাকে স্পর্শ করে না। এইভাবে মেথরের প্রতিও যাহাতে তাঁহার ঘৃণাবুদ্ধি না থাকে, এই উদ্দেশ্যে তিনি গভীর রাত্রে উঠিয়া তাহাদের ঝাড়ু ও অন্যান্য যন্ত্র লইয়া মন্দিরের নর্দমা, পায়খানা প্রভৃতি নিজহস্তে পরিষ্কার করিতেন এবং পরে নিজ দীর্ঘকেশ দ্বারা সেই স্থান মুছিয়া দিতেন। শুধু যে এইরূপেই তিনি দীনতা স্বীকার করিতেন, তাহা নহে; মন্দিরে প্রত্যহ অনেক ভিক্ষুককে প্রসাদ দেওয়া হইত—তাহাদের মধ্যে আবার অনেক মুসলমান, পতিত ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তিও থাকিত। তিনি সেইসব কাঙালীদের খাওয়া হইলে তাহাদের পাতা উঠাইতেন, তাহাদের ভুক্তাবশিষ্ট জড় করিতেন, তাহা হইতে স্বয়ং কিছু গ্রহণ করিয়া অবশেষে যেখানে এইরূপ সকল শ্রেণীর ও অবস্থার লোক বসিয়া খাইয়াছে, সেই স্থান পরিষ্কার করিতেন। আপনারা এই শেষোক্ত ব্যাপারটিতে যে কি অসাধারণত্ব আছে, ইহা দ্বারা বিশেষ কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তাহা বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু ভারতে আমাদের নিকট ইহা বড়ই অদ্ভুত ও নিঃস্বার্থ কাজ বলিয়া বোধ হয়। এই উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করার কাজ নীচ অস্পৃশ্য জাতিরাই করিয়া থাকে। তাহারা কোন শহরে প্রবেশ করিলে নিজের জাতির পরিচয় দিয়া লোককে সাবধান করিয়া দেয়—যাহাতে তাহারা তাহাদের স্পর্শদোষ হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে লিখিত আছে, যদি ব্রাহ্মণ হঠাৎ এইরূপ নীচজাতির মুখ দেখিয়া ফেলে, তবে তাহাকে সারাদিন উপবাসী থাকিয়া একসহস্র গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। এই সকল শাস্ত্রীয় নিষেধবাক্য সত্ত্বেও এই ব্রাহ্মণোত্তম যে-স্থানে বসিয়া নীচজাতিরা আহার করে, সে-স্থান পরিষ্কার করিতেন, তাহাদের ভুক্তাবশেষ ভগবৎপ্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ করিতেন। শুধু কি তাই, রাত্রে গোপনে উঠিয়া ময়লা পরিষ্কার করিয়া অস্পৃশ্যদের সহিত আপনার সমত্ব বোধ করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এই ভাব ছিল:

আমি যে যথার্থই সমগ্র মানবজাতির সেবক হইয়াছি, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আমাকে তোমার বাড়ির ঝাড়ুদার হইতে হইবে!

তারপর তাঁহার অন্তরে এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিল যে, বিভিন্ন ধর্ম-প্রণালীতে কি সত্য আছে, তাহা জানিবেন। এ পর্যন্ত তিনি নিজের ধর্ম ব্যতীত আর কিছু জানিতেন না। এখন তাঁহার বাসনা হইল, অন্যান্য ধর্ম কিরূপ, তাহা জানিবেন। আর তিনি যাহা কিছু করিতেন, তাহাই সর্বান্তঃকরণে অনুষ্ঠান করিতেন। সুতরাং তিনি অন্যান্য ধর্মের গুরু সন্ধান করিতে লাগিলেন। গুরু বলিতে ভারতে আমরা কি বুঝি, এটি সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। গুরু বলিতে শুধু গ্রন্থকীট বুঝায় না; তিনিই গুরু, যিনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি সত্যকে সাক্ষাৎ জানিয়াছেন—অপর কাহারও নিকট শুনিয়া নহে। একজন মুসলমান সাধুকে পাইয়া তাঁহার প্রদর্শিত সাধনপ্রণালী অনুসারে তিনি সাধন করিতে লাগিলেন। তিনি মুসলমানদিগের মতো পোশাক পরিতে লাগিলেন, মুসলমানদিগের শাস্ত্রানুযায়ী সমুদয় অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, সেই সময়ের জন্য তিনি ইসলাম-ভাবাপন্ন হইয়া গেলেন। আর তিনি দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন যে, এই সকল সাধনপ্রণালীর অনুষ্ঠানও তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব-উপনীত অবস্থাতেই পৌছাইয়া দেয়। তিনি যীশুখ্রীষ্টের সত্যধর্মের অনুসরণ করিয়াও একই ফল লাভ করিলেন। তিনি যে-কোন ধর্মসম্প্রদায়ের সাধককে পাইতেন, তাঁহারই নিকট শিক্ষা করিয়া তাঁহার সাধন-প্রণালী সাধন করিয়াছিলেন; আর তিনি যখন যে প্রণালীতে সাধন করিতেন, সর্বান্তঃকরণে তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরুগণ তাঁহাকে যেমন যেমন করিতে বলিতেন, তিনি যথাযথ অনুষ্ঠান করিতেন, আর সকল ক্ষেত্রেই তিনি একই প্রকার ফল লাভ করিতেন। এইভাবে নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, প্রত্যেক ধর্মেরই উদ্দেশ্য এক, সকলেই সেই একই বস্তু শিক্ষা দিতেছে—প্রভেদ প্রধানতঃ সাধনপ্রণালীতে, আরও অধিক প্রভেদ ভাষায়। মূলতঃ সকল সম্প্রদায় ও সকল ধর্মেরই উদ্দেশ্য এক।

তারপর তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল, সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে একেবারে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদজ্ঞান-বর্জিত হওয়া প্রয়োজন; কারণ আত্মার কোন লিঙ্গ নাই; আত্মা পুরুষও নহেন, স্ত্রীও নহেন। লিঙ্গভেদ কেবল দেহেই বিদ্যমান,

আর যিনি সেই আত্মাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার এই ভেদবুদ্ধি থাকিলে চলিবে না। তিনি পুরুষদেহধারী, অতএব এক্ষণে তিনি সর্ব-বিষয়ে স্ত্রীভাব আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তিনি নিজেকে নারী বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকের ন্যায় বেশ ধারণ করিলেন, স্ত্রীলোকের ন্যায় কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন, পুরুষের কাজ সব ছাড়িয়া দিলেন, নিজ পরিবারস্থ নারীদের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন—এইরূপে অনেক বর্ষ ধরিয়া সাধন করিতে করিতে তাঁহার মন পরিবর্তিত হইয়া গেল, তাঁহার স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ-জ্ঞান একেবারে দূর হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কামের বীজ পর্যন্ত দগ্ধ হইয়া গেল—তাঁহার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গেল।

আমরা পাশ্চাত্য দেশে নারীপূজার কথা শুনিয়া থাকি, কিন্তু সাধারণতঃ এই পূজা নারীর সৌন্দর্য ও যৌবনের পূজা। ইনি কিন্তু নারীপূজা বলিতে বুঝিতেন—মা আনন্দময়ীর পূজা। সকল নারীই সেই আনন্দময়ী মা ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। আমি নিজে দেখিয়াছি, সমাজ যাহাদিগকে স্পর্শ করে না, এরূপ স্ত্রীলোকদের সম্মুখে তিনি করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের পদতলে পতিত হইয়া অর্ধ-বাহ্যশূন্য অবস্থায় বলিতেছেন, 'মা, একরূপে তুমি রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, আর একরূপে তুমি এই জগৎ হইয়াছ। আমি তোমাকে বারবার প্রণাম করি।' ভাবিয়া দেখ, সেই ব্যক্তির জীবন কিরূপ ধন্য, যাঁহার অন্তর হইতে সর্ববিধ পশুভাব চলিয়া গিয়াছে, যিনি প্রত্যেক নারীকে ভক্তিভাবে দর্শন করেন, যাঁহার নিকট সকল নারীর মুখ অন্য রূপ ধারণ করিয়াছে, কেবল সেই আনন্দময়ী জগন্মাতার মুখ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। ইহাই আমাদের প্রয়োজন। তোমরা কি বলিতে চাও, নারীর মধ্যে যে দেবত্ব রহিয়াছে, তাহাকে প্রতারণা করা যায়? তাহা কখনও হয় নাই, হইতেও পারে না। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে উহা সর্বদাই আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। উহা অব্যর্থভাবেই সমুদয় প্রবঞ্চনা ও কপটতা ধরিয়া ফেলে, উহা অভ্রান্তভাবে সত্যের তেজ, আধ্যাত্মিকতার আলোক ও পবিত্রতার শক্তি উপলব্ধি করিয়া থাকে। যদি প্রকৃত ধর্মলাভ করিতে হয়, তবে এইরূপ পবিত্রতাই সর্বতোভাবে আবশ্যক।

এই ব্যক্তি এইরূপ কঠোর নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা লাভ করিলেন। আমাদের জীবনে যে-সকল প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবের সহিত সংঘর্ষ রহিয়াছে, তাঁহার পক্ষে আর তাহা রহিল না। তিনি অতি কষ্টে আধ্যাত্মিক রত্নসমূহ সঞ্চয় করিয়া মানবজাতিকে দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন তাঁহার ঈশ্বর নির্দিষ্ট কার্য আরম্ভ হইল। তাঁহার প্রচারকার্য ও উপদেশদান আশ্চর্য ধরনের। আমাদের দেশে আচার্যের খুব সম্মান, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করা হয়। গুরুকে যেরূপ সম্মান দেওয়া হয়, পিতামাতাকেও আমরা সেরূপ সম্মান করি না। পিতামাতা হইতে আমরা দেহ পাইয়াছি, কিন্তু গুরু আমাদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন; আমরা তাঁহার সন্তান, তাঁহার মানসপুত্র। কোন অসাধারণ আচার্যের অভ্যুদয় হইলে সকল হিন্দুই তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আসে, দলে দলে লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু লোকে এই আচার্যবরকে সম্মান করিল কি না, এ বিষয়ে তাঁহার কোন খেয়ালই ছিল না, তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য, তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না। তিনি জানিতেন—মা-ই সব করিতেছেন, তিনি কিছুই নহেন। তিনি সর্বদাই বলিতেন, 'যদি আমার মুখ দিয়া কোন ভাল কথা বাহির হয়, তাহা আমার মায়ের কথা, আমার তাহাতে কোন গৌরব নাই।' তিনি তাঁহার নিজ প্রচারকার্য সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এ ধারণা ত্যাগ করেন নাই।

আমরা দেখিয়াছি, সংস্কারক ও সমালোচকদের কার্যপ্রণালী কিরূপ। তাঁহারা কেবল অপরের দোষ দেখান, সব ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলিয়া নিজেদের কল্পিত নূতন ভাবে নূতন করিয়া গড়িতে যান। আমরা সকলেই নিজ নিজ মনোমত এক-একটা কল্পনা লইয়া বসিয়া আছি। দুঃখের বিষয়, কেহই তাহা কার্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত নহে, কারণ সকলেই আমাদের মতো উপদেশ দিতে প্রস্তুত। তাঁহার কিন্তু সেই ভাব ছিল না, তিনি কাহাকেও ডাকিতে যাইতেন না। তাঁহার এই মূলমন্ত্র ছিল—প্রথমে চরিত্র গঠন কর, প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাব অর্জন কর, ফল আপনি আসিবে। তাঁহার প্রিয় দৃষ্টান্ত ছিল: যখন পদ্ম ফোটে, তখন ভ্রমর নিজে নিজেই মধু খুঁজিতে আসে। এইরূপে যখন তোমার হৃৎপদ্ম ফুটিবে, তখন শত শত লোক তোমার নিকট শিক্ষা লইতে আসিবে।—এইটি জীবনের এক মহা শিক্ষা।

মদীয় আচার্যদেব আমাকে শত শতবার এই শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি আমি প্রায়ই ইহা ভুলিয়া যাই। খুব কম লোকেই চিন্তার অদ্ভুত শক্তি বুঝিতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি গুহায় বসিয়া উহার প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া একটিমাত্র প্রকৃত মহৎ চিন্তাও করিয়া প্রাণত্যাগ করে, সেই চিন্তা সেই গুহার প্রাচীর ভেদ করিয়া সমগ্র আকাশে বিচরণ করিবে, পরিশেষে সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ে ঐ ভাব সংক্রামিত হইবে। চিন্তার এইরূপ অদ্ভুত শক্তি! অতএব তোমার ভাব অপরকে দিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। প্রথমে দিবার মতো কিছু সঞ্চয় কর। তিনিই প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন, যাঁহার দিবার কিছু আছে; কারণ শিক্ষাপ্রদান বলিতে কেবল কথা বলা বুঝায় না, উহা কেবল মতামত বুঝানো নহে; শিক্ষাপ্রদান বলিতে বুঝায় ভাব-সঞ্চার। যেমন আমি তোমাকে একটি ফুল দিতে পারি, তদপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে ধর্মও দেওয়া যাইতে পারে। ইহা কবিত্বের ভাষায় বলিতেছি না, অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভারতে এই ভাব অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিদ্যমান, আর পাশ্চাত্য দেশে যে 'প্রেরিতগণের গুরুশিষ্যপরম্পরা' (Apostolic succession) মত প্রচলিত আছে, তাহাতেই ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অতএব প্রথমে চরিত্র গঠন কর—এইটিই তোমার প্রথম কর্তব্য। আগে সত্য কি—তাহা নিজে জানো, পরে অনেকে তোমার নিকট শিখিবে, তাহারা তোমার নিকট আসিবে। আমার গুরুদেবের মনোভাব এইরূপই ছিল, তিনি কাহারও সমালোচনা করিতেন না।

বৎসরের পর বৎসর দিবারাত্র আমি এই ব্যক্তির সহিত বাস করিয়াছি, কিন্তু কখন শুনি নাই, তাঁহার জিহ্বা কোন সম্প্রদায়ের নিন্দাসূচক বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই তিনি সমভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিয়াছিলেন। মানুষ—হয় জ্ঞানপ্রবণ, না হয় ভক্তিপ্রবণ, না হয় যোগপ্রবণ, না হয় কর্মপ্রবণ হইয়া থাকে। বিভিন্ন ধর্মসমূহে এই বিভিন্ন ভাবসমূহের কোন-না-কোনটির প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। তথাপি একই ব্যক্তিতে এই চারিটি ভাবের বিকাশই সম্ভব এবং ভবিষ্যৎ মানব ইহা করিতে সমর্থ হইবে, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। তিনি কাহারও দোষ দেখিতেন না, সকলের মধ্যেই ভাল দেখিতেন। আমার বেশ মনে আছে, একদিন এক ব্যক্তি ভারতীয় কোন সম্প্রদায়ের নিন্দা করিতেছেন, এই

সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠান নীতিবিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত। তিনি কিন্তু তাহাদেরও নিন্দা করিতে প্রস্তুত নহেন—স্থিরভাবে কেবল মাত্র বলিলেন, 'কেউ বা সদর দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢোকে, কেউ বা আবার পাইখানার দোর দিয়ে ঢুকতে পারে। এদের মধ্যেও ভাল লোক থাকতে পারে। আমাদের কাকেও নিন্দা করা উচিত নয়।' তাঁহার দৃষ্টি সংস্কারশূন্য ও নির্মল হইয়া গিয়াছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাব, তাহাদের ভিতরের কথাটা তিনি সহজেই ধরিতে পারিতেন। তিনি নিজ অন্তরের মধ্যে এই সকল বিভিন্ন ভাব একত্র করিয়া সামঞ্জস্য করিতে পারিতেন।

সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই অপূর্ব মানুষটিকে দেখিতে এবং সরল গ্রাম্যভাষায় তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসিতে লাগিল। তাঁহার প্রত্যেকটি কথায় একটা শক্তি মাখানো থাকিত, প্রত্যেক কথাই হৃদয়ের তমোরাশি দূর করিয়া দিত। কথায় কিছু নাই, ভাষাতেও কিছু নাই; যে ব্যক্তি সেই কথা বলিতেছেন, তাঁহার সত্তা—তিনি যাহা বলেন তাহাতে জড়াইয়া থাকে, তাই কথার জোর হয়। আমরা সকলেই সময়ে সময়ে ইহা অনুভব করি। আমরা খুব বড় বড় বক্তৃতা শুনিয়া থাকি, অনেক সুযুক্তিপূর্ণ প্রসঙ্গ শুনিয়া থাকি, তারপর বাড়ী গিয়া সব ভুলিয়া যাই। আবার অন্য সময়ে হয়তো অতি সরল ভাষায় দুই-চারিটি কথা শুনিলাম—সেগুলি আমাদের প্রাণে এমন লাগিল যে, সারা জীবনের জন্য সেই কথাগুলি আমাদের হৃদয়ে গাঁথিয়া গেল, আমাদের অঙ্গীভূত হইয়া গেল, স্থায়ী ফল প্রসব করিল। যে ব্যক্তি নিজের কথাগুলিতে নিজ সত্তা, নিজ জীবন প্রদান করিতে পারেন, তাঁহারই কথায় ফল হয়, কিন্তু তাঁহার মহাশক্তিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। সর্বপ্রকার শিক্ষার অর্থই আদান-প্রদান—আচার্য দিবেন, শিষ্য গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আচার্যের কিছু দিবার বস্তু থাকা চাই, শিষ্যেরও গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই।

এই ব্যক্তি ভারতের রাজধানী[১]—আমাদের দেশে শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র, যেখান হইতে প্রতি বৎসর শত শত সন্দেহবাদী ও জড়বাদীর সৃষ্টি হইতেছিল, সেই কলিকাতার নিকট বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু অনেক

---

১ তখন কলিকাতা ভারতের রাজধানী ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, অনেক সন্দেহবাদী, অনেক নাস্তিক তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার কথা শুনিতেন।

আমি বাল্যকাল হইতেই সত্যের সন্ধান করিতাম, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সভায় যাইতাম। যখন দেখিতাম, কোন ধর্মপ্রচারক বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইয়া অতি মনোহর উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার বক্তৃতার শেষে তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, 'এই যে-সব কথা বলিলেন, তাহা কি আপনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারা জানিয়াছেন, অথবা উহা কেবল আপনার বিশ্বাসমাত্র? ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিতরূপে কি কিছু জানিয়াছেন?' তাঁহারা উত্তরে বলিতেন, 'এ-সকল আমার মত ও বিশ্বাস।' অনেককে আমি এই প্রশ্ন করিতাম, 'আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?' কিন্তু তাঁহাদের উত্তর শুনিয়া ও তাঁহাদের ভাব দেখিয়া আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে, তাঁহারা ধর্মের নামে লোক ঠকাইতেছেন মাত্র। এখানে ভগবান শঙ্করাচার্যের একটি কথা আমার মনে পড়িতেছে: বিভিন্ন প্রকার বাক্যযোজনার রীতি, শাস্ত্রব্যাখ্যার কৌশল পণ্ডিতদিগের ভোগের জন্য; উহা দ্বারা কখনও মুক্তি হইতে পারে না।[১]

এইরূপে আমি ক্রমশঃ নাস্তিক হইয়া পড়িতেছিলাম, এমন সময়ে এই আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ্ক আমার ভাগ্যগগনে উদিত হইলেন। আমি এই ব্যক্তির কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলাম। তাঁহাকে একজন সাধারণ লোকের মতো বোধ হইল, কিছু অসাধারণত্ব দেখিলাম না। অতি সরল ভাষায় তিনি কথা কহিতেছিলেন, আমি ভাবিলাম, এ ব্যক্তি কি একজন বড় ধর্মাচার্য হইতে পারেন? আমি সারা জীবন অপরকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকেও সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন?' তিনি উত্তর দিলেন—'হাঁ।' 'মহাশয়, আপনি কি তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারেন?' 'হাঁ।' 'কি প্রমাণ?' 'আমি তোমাকে যেমন আমার সম্মুখে দেখিতেছি, তাঁহাকেও ঠিক সেইরূপ দেখি, বরং আরও স্পষ্টতর, আরও উজ্জ্বলতররূপে দেখি।' আমি একেবারে মুগ্ধ হইলাম। এই প্রথম আমি এমন একজনকে দেখিলাম, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন, 'আমি ঈশ্বর দেখিয়াছি, ধর্ম সত্য, উহা

---

১ বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥ —বিবেকচূড়ামণি

অনুভব করা যাইতে পারে—আমরা এই জগৎ যেমন প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা ঈশ্বরকে অনন্তগুণ স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে।' ইহা একটা তামাসার কথা নয়, বা মানুষের তৈরী কোন গল্প নয়, ইহা বাস্তবিক সত্য। আমি দিনের পর দিন এই ব্যক্তির নিকট যাইতে লাগিলাম। অবশ্য সকল কথা আমি এখন বলিতে পারি না, তবে এইটুকু বলিতে পারি—ধর্ম যে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমি বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিলাম। একবার স্পর্শে, একবার দৃষ্টিতে একটা সমগ্র জীবন পরিবর্তিত হইতে পারে। আমি এইরূপ ব্যাপার বারবার হইতে দেখিয়াছি।

বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ ও প্রাচীনকালের বিভিন্ন মহাপুরুষের বিষয় পাঠ করিয়াছিলাম: তাঁহারা উঠিয়া বলিলেন—সুস্থ হও, আর সে ব্যক্তি সুস্থ হইয়া গেল। দেখিলাম, ইহা সত্য; আর যখন আমি এই ব্যক্তিকে দেখিলাম, আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়া গেল। ধর্ম দান করা সম্ভব, আর মদীয় আচার্যদেব বলিতেন, 'জগতের অন্যান্য জিনিস যেমন দেওয়া-নেওয়া যায়, ধর্ম তদপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া-নেওয়া যাইতে পারে।' অতএব আগে ধার্মিক হও, দিবার মতো কিছু অর্জন কর, তার পর জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহা বিতরণ কর। ধর্ম বাক্যাড়ম্বর নহে, মতবাদবিশেষ নহে, অথবা সাম্প্রদায়িকতা নহে। সম্প্রদায়ে বা সমিতির মধ্যে ধর্ম আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ধর্ম আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ লইয়া। ধর্ম কিরূপে সমিতিতে পরিণত হইবে? কোন ধর্ম কি কখন সমিতি দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে? ঐরূপ করিলে ধর্ম ব্যবসাদারিতে পরিণত হয়, আর যেখানে এইরূপ ব্যবসাদারি ঢোকে, সেখানেই ধর্ম লোপ পায়। এশিয়াই সকল ধর্মের প্রাচীন জন্মভূমি। এমন একটি ধর্মের নাম কর, যাহা সংগঠিত দলের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। এরূপ একটিরও নাম তুমি করিতে পারিবে না। ইওরোপই এই উপায়ে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিল, আর সেইজন্যই ইওরোপ এশিয়ার মতো সমগ্র জগৎকে আধ্যাত্মিক ভাবে কখনই প্রভাবিত করিতে পারে নাই। কতকগুলি ভোটের সংখ্যাধিক্য হইলেই কি মানুষ অধিক ধার্মিক হইবে, অথবা উহার সংখ্যাল্পতায় কম ধার্মিক হইবে? মন্দির বা চার্চ-নির্মাণ অথবা সমবেত উপাসনায় ধর্ম হয় না; কোন গ্রন্থে, বচনে, অনুষ্ঠানে বা সমিতিতেও ধর্ম পাওয়া যায় না; ধর্মের আসল কথা—

অপরোক্ষানুভূতি। আর আমরা সকলেই দেখিতেছি—যতক্ষণ না সত্যকে জানা যায়, ততক্ষণ কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। আমরা যতই তর্ক করি না কেন, যতই উপদেশ শুনি না কেন, কেবল একটি জিনিসেই আমাদের তৃপ্তি হইতে পারে—সেটি আমাদের নিজেদের প্রত্যক্ষানুভূতি; আর এই প্রত্যক্ষানুভূতি সকলের পক্ষেই সম্ভব, কেবল উহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে ধর্মকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিবার প্রথম সোপান——ত্যাগ। যতদূর সাধ্য ত্যাগ করিতে হইবে। অন্ধকার ও আলোক, বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ—দুই কখন একসঙ্গে অবস্থান করিতে পারে না। 'তোমরা ঈশ্বর ও ধনদেবতার সেবা একসঙ্গে করিতে পার না।' [১]

আমার গুরুদেবের নিকট আমি আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়—একটি অদ্ভুত সত্য শিক্ষা করিয়াছি; ইহাই আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় যে, জগতের ধর্মসমূহ পরস্পর-বিরোধী নহে। এগুলি এক সনাতন ধর্মেরই বিভিন্ন ভাবমাত্র। এক সনাতন ধর্ম চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছে, চিরকালই থাকিবে, আর এই ধর্মই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। অতএব আমাদের সকল ধর্মকে সম্মান করিতে হইবে, আর যতদূর সম্ভব সবগুলিকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কেবল যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশ অনুসারে ধর্ম বিভিন্ন হয়, তাহা নহে; ব্যক্তি হিসাবেও উহা বিভিন্ন ভাব ধারণ করে। কোন ব্যক্তির ভিতর ধর্ম তীব্র কর্ম-রূপে প্রকাশিত, কাহারও ভিতর গভীর ভক্তি-রূপে, কাহারও ভিতর যোগ-রূপে, কাহারও ভিতর বা জ্ঞান-রূপে প্রকাশিত। তুমি যে পথে যাইতেছ, তাহা ঠিক নহে—এ কথা বলা ভুল। এইটি করিতে হইবে, এই মূল রহস্যটি শিখিতে হইবেঃ সত্য একও বটে, বহুও বটে। বিভিন্ন দিক দিয়া দেখিলে একই সত্যকে আমরা বিভিন্নভাবে দেখিতে পারি। তাহা হইলেই কাহারও প্রতি বিরোধ পোষণ না করিয়া সকলের প্রতি আমরা অনন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন হইব। যতদিন পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ জন্মগ্রহণ করিতেছে, ততদিন এক আধ্যাত্মিক সত্যই বিভিন্ন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইবে; এইটি বুঝিলে অবশ্যই আমরা পরস্পরের বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি

---

১ বাইবেল

সহানুভূতি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব। যেমন প্রকৃতি বলিতে 'বহুত্বে একত্ব' বুঝায়, ব্যাবহারিক জগতে অনন্ত ভেদ থাকা সত্ত্বেও যেমন সেই সমুদয় ভেদের পশ্চাতে অনন্ত অপরিণামী নিরপেক্ষ একত্ব রহিয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আর ব্যষ্টি—ক্ষুদ্রাকারে সমষ্টির পুনরাবৃত্তি মাত্র। এই সমুদয় ভেদ সত্ত্বেও ইহাদেরই মধ্যে অনন্ত একত্ব বিরাজমান—ইহাই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। অন্যান্য ভাব অপেক্ষা এই ভাবটি আজকাল বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া আমার বোধ হয়। আমি এমন এক দেশের মানুষ, যেখানে ধর্মসম্প্রদায়ের অন্ত নাই; সেখানে দুর্ভাগ্যবশতই হউক বা সৌভাগ্য-বশতই হউক, যে-কোন ব্যক্তি ধর্ম লইয়া একটু নাড়াচাড়া করে, সেই একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে চায়; আমি এমন দেশে জন্মিয়াছি বলিয়া অতি বাল্যকাল হইতেই জগতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলির সহিত পরিচিত। এমন কি, 'মর্মনেরা' (Mormons)[১] পর্যন্ত ভারতে ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়াছিল। আসুক সকলে; সেই তো ধর্মপ্রচারের স্থান। অন্যান্য দেশ অপেক্ষা সেখানেই ধর্মভাব অধিক বদ্ধমূল হয়। তোমরা আসিয়া হিন্দুদিগকে যদি রাজনীতি শিখাইতে চাও, তাহারা বুঝিবে না, কিন্তু যদি তুমি আসিয়া ধর্মপ্রচার কর, —উহা যতই কিম্ভূতকিমাকার ধরনের হউক না কেন, অল্পকালের মধ্যেই সহস্র সহস্র লোক তোমার অনুসরণ করিবে; আর জীবৎকালেই সাক্ষাৎ ভগবানরূপে পূজিত হইবার তোমার যথেষ্ট সম্ভাবনা। ইহাতে আমি আনন্দই বোধ করি, কারণ ভারতে আমরা এই একটি বস্তুই চাহিয়া থাকি। হিন্দুদের মধ্যে নানাবিধ সম্প্রদায় আছে, তাহাদের সংখ্যাও অনেক, আবার কতকগুলি আপাততঃ এত বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় যে, তাহাদের মিলিবার যেন কোন ভিত্তিই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তথাপি সকলেই বলিবে, তাহারা এক ধর্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

'যেমন বিভিন্ন নদী বিভিন্ন পর্বতে উৎপন্ন হইয়া, ঋজু কুটিল নানা পথে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সমুদ্রে আসিয়া মিলিয়া যায়, তেমনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাব বিভিন্ন হইলেও সকলেই অবশেষে তোমার নিকট আসিয়া

১ ১৮৩০ খৃঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জোসেফ স্মিথ নামক জনৈক ব্যক্তি এই সম্প্রদায় স্থাপন করেন। ইঁহারা বাইবেলে একটি নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন, অলৌকিক ক্রিয়া করিতে পারেন বলিয়া দাবী করেন এবং পাশ্চাত্য সমাজের রীতিবিরুদ্ধ বহুবিবাহপ্রথার পক্ষপাতী।

উপস্থিত হয়।'[১] ইহা শুধু একটা মতবাদ নহে, ইহা কার্যতঃ স্বীকার করিতে হইবে; তবে আমরা সচরাচর যেমন দেখিতে পাই, কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়া বলেন, 'অপর ধর্মে কিছু সত্য আছে; হাঁ, হাঁ, এতে কতকগুলি বড় ভাল জিনিস আছে বটে'—সেভাবে নহে। আবার কাহারও কাহারও এই অদ্ভুত উদার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—'অন্যান্য ধর্ম ঐতিহাসিক যুগের পূর্ববর্তী সময়ের ক্রমবিকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্নস্বরূপ, কিন্তু আমাদের ধর্মে উহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে!' একজন বলিতেছে, 'আমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ, কেন না ইহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন'; আবার অপর একজন তাহার ধর্ম সর্বাপেক্ষা আধুনিক বলিয়া সেই একই দাবী করিতেছে। আমাদের বুঝিতে হইবে ও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ধর্মেরই মানুষকে মুক্ত করিবার সমান শক্তি আছে। মন্দিরে বা চার্চে ধর্মসকলের প্রভেদ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহা কুসংস্কার মাত্র। সেই একই ঈশ্বর সকলের ডাকে সাড়া দেন; অতি ক্ষুদ্র জীবাত্মারও রক্ষা এবং উদ্ধারের জন্য তুমি, আমি বা অপর দায়ী নয়, সেই এক সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই সকলের জন্য দায়ী। আমি বুঝিতে পারি না, লোকে কিরূপে একদিকে নিজদিগকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী বলিয়া ঘোষণা করে, আবার ইহাও ভাবে যে, ঈশ্বর একটি ক্ষুদ্র জনসমাজের ভিতর সমুদয় সত্য দিয়াছেন, আর তাহারাই অবশিষ্ট মানব-সমাজের রক্ষক। কোন ব্যক্তির বিশ্বাস নষ্ট করিবার চেষ্টা করিও না। যদি পারো তবে তাহাকে কিছু ভাল জিনিস দাও। যদি পারো তবে মানুষ যেখানে আছে, সেখান হইতে তাহাকে একটু উপরে তুলিয়া দাও। ইহাই কর, কিন্তু মানুষের যাহা আছে, তাহা নষ্ট করিও না। কেবল তিনিই যথার্থ আচার্যনামের যোগ্য, যিনি আপনাকে এক মুহূর্তে যেন সহস্র সহস্র বিভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত করিতে পারেন; কেবল তিনিই যথার্থ আচার্য, যিনি অল্পায়াসেই শিষ্যের অবস্থায় আপনাকে লইয়া যাইতে পারেন—যিনি নিজের শক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া তাহার চক্ষু দিয়া দেখিতে পান, তাহার কান দিয়া শুনিতে পান, তাহার মন দিয়া বুঝিতে পারেন। এইরূপ আচার্যই যথার্থ

---

১ রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গমাস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥ —শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্

শিক্ষা দিতে পারেন, অপর কেহ নহে। যাঁহারা কেবল অপরের ভাব নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কখনই কোন উপকার করিতে পারেন না।

মদীয় আচার্যদেবের নিকট থাকিয়া আমি বুঝিয়াছি, মানুষ এই দেহেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করিতে পারে, তাঁহার মুখ হইতে কাহারও প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হয় নাই, এমন কি তিনি কাহারও সমালোচনা পর্যন্ত করিতেন না। তাঁহার দৃষ্টি জগতে কোন কিছুকে মন্দ বলিয়া দেখিবার শক্তি হারাইয়াছিল—তাঁহার মন কোনরূপ কুচিন্তা করিবার সামর্থ্য হারাইয়াছিল। তিনি ভাল ছাড়া আর কিছু দেখিতেন না। সেই মহাপবিত্রতা, মহাত্যাগই ধর্মলাভের একমাত্র নিগূঢ় উপায়। বেদ বলেনঃ 'ধন বা পুত্রোৎপাদনের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়।' যীশু বলিয়াছেন, 'তোমার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর ও আমার অনুসরণ কর।'

সব বড় বড় আচার্য ও মহাপুরুষগণও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং জীবনে উহা পরিণত করিয়াছেন। এই ত্যাগ ব্যতীত আধ্যাত্মিকতা লাভের সম্ভাবনা কোথায়? যেখানেই হউক না কেন, সকল ধর্মভাবের পশ্চাতেই ত্যাগ রহিয়াছে; আর ত্যাগের ভাব যত কমিয়া যায়, ইন্দ্রিয়পরতা ততই ধর্মের ভিতর ঢুকিতে থাকে, এবং ধর্মভাবও সেই পরিমাণে কমিয়া যায়। এই মহাপুরুষ ত্যাগের সাকার বিগ্রহ ছিলেন। আমাদের দেশে যাঁহারা সন্ন্যাসী হন, তাঁহাদিগকে সমুদয় ধন-ঐশ্বর্য মান-সম্ভ্রম ত্যাগ করিতে হয়; আর আমার গুরুদেব এই আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি কাঞ্চন স্পর্শ করিতেন না; তাঁহার কাঞ্চনত্যাগ-স্পৃহা তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর পর্যন্ত এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, নিদ্রিতাবস্থাতেও তাঁহার দেহে কোন ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করাইলে তাঁহার মাংসপেশীসমূহ সঙ্কুচিত হইয়া যাইত এবং তাঁহার সমুদয় দেহই যেন ঐ ধাতুদ্রব্যকে স্পর্শ করিতে অস্বীকার করিত। এমন অনেকে ছিল, যাহাদের নিকট হইতে তিনি কিছু গ্রহণ করিলে তাহারা কৃতার্থ বোধ করিত, যাহারা আনন্দের সহিত তাঁহাকে সহস্র সহস্র টাকা দিতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু যদিও তাঁহার উদার হৃদয় সকলকে আলিঙ্গন করিতে সদা প্রস্তুত ছিল, তথাপি তিনি এইসব লোকের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেন। সম্পূর্ণভাবে কাম-কাঞ্চন জয়ের এক

জীবন্ত উদাহরণ ছিলেন তিনি; এই দুই ভাব তাঁহার ভিতর বিন্দুমাত্র ছিল না, আর বর্তমান শতাব্দীর জন্য এইরূপ মানুষের অতিশয় প্রয়োজন। বর্তমান-কালে লোকে যাহাকে নিজেদের 'প্রয়োজনীয় দ্রব্য' বলে, যাহা ব্যতীত এক-মাসও বাঁচিতে পারিবে না মনে করে—আর এই প্রয়োজন তাহারা অতিরিক্ত-রূপে বাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে—এমন সময়ে এই ত্যাগের প্রয়োজন। বর্তমানে এমন একজন লোকের প্রয়োজন, যিনি জগতের অবিশ্বাসীদের নিকট প্রমাণ করিতে পারেন যে, এখনও এমন মানুষ আছেন, যিনি সংসারের সমুদয় ধন-রত্ন ও মান-যশের জন্য বিন্দুমাত্র লালায়িত নহেন। বাস্তবিক এখনও এরূপ অনেক লোক আছেন।

তাঁহার জীবনে আদৌ বিশ্রাম ছিল না। তাঁহার জীবনের প্রথমাংশ ধর্ম-উপার্জনে ও শেষাংশ উহার বিতরণে ব্যয়িত হইয়াছিল। দলে দলে লোক তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসিত, আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০ ঘণ্টা তিনি তাহাদের সহিত কথা কহিতেন। এরূপ ঘটনা যে দু-এক দিন ঘটিয়াছিল তাহা নহে, মাসের পর মাস এইরূপ হইতে লাগিল; অবশেষে এই কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙিয়া গেল। মানবজাতির প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেম ছিল। যাহারা তাঁহার কৃপালাভের জন্য আসিত, এইরূপ সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে অতি সামান্য ব্যক্তিও তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইত না। ক্রমে তাঁহার গলায় একটা ঘা হইল, তথাপি অনেক বুঝাইয়াও তাঁহার কথা বলা বন্ধ করা গেল না। আমরা তাঁহার নিকট সর্বদা থাকিতাম; যাহাতে তাঁহার কষ্ট না হয়, এজন্য লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু যখনই তিনি শুনিতেন, লোকে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে তাঁহার কাছে আসিতে দিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং তাহারা আসিলে তাহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন। যদি কেহ বলিত, 'এই সব লোকজনের সঙ্গে কথা কহিলে আপনার কষ্ট হইবে না?', তিনি হাসিয়া এইমাত্র উত্তর দিতেন, 'কি! দেহের কষ্ট! আমার কত দেহ হইল, কত দেহ গেল। যদি এ দেহটা পরের সেবায় যায়, তবে তো ইহা ধন্য হইল। যদি একজন লোকেরও যথার্থ উপকার হয়, সেজন্য আমি হাজার হাজার দেহ দিতে প্রস্তুত আছি।' একবার এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, 'মহাশয়, আপনি তো

একজন মস্ত যোগী—আপনি আপনার দেহের উপর একটু মন রাখিয়া ব্যারামটা সারাইয়া ফেলুন না।' প্রথমে তিনি ইহার কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে যখন ঐ ব্যক্তি আবার সেই কথা তুলিল, তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন, 'তোমাকে আমি একজন জ্ঞানী মনে করিতাম, কিন্তু দেখিতেছি—তুমি অপরাপর সংসারী লোকদের মতোই কথা বলিতেছ। এই মন ভগবানের পাদপদ্মে অর্পিত হইয়াছে—তুমি কি বল, ইহাকে ফিরাইয়া লইয়া আত্মার খাঁচাস্বরূপ দেহে দিব?'

এইরূপে তিনি সকলকে উপদেশ দিতে লাগিলেন,—আর চারিদিকে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেল যে, তাঁহার দেহাবসান সন্নিকট, তাই পূর্বাপেক্ষা আরও অধিক লোক দলে দলে আসিতে লাগিল। তোমরা কল্পনা করিতে পার না, ভারতের বড় বড় ধর্মাচার্যগণের নিকট লোক আসিয়া কিরূপে চারিদিকে ভিড় করে এবং জীবদ্দশাতেই তাঁহাদিগকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি কেবল তাঁহাদের বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করিবার জন্যই অপেক্ষা করে। এইরূপ ধর্মানুরাগ হইতেই মানুষের প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা আসিয়া থাকে। মানুষ যাহা চায় ও আদর করে, তাহাই পাইয়া থাকে—জাতি সম্বন্ধেও ঐ কথা। যদি ভারতে গিয়া রাজনৈতিক বক্তৃতা দাও, তাহা যত চমৎকারই হউক না কেন, তুমি শ্রোতা পাইবে না; কিন্তু ধর্মশিক্ষা দাও দেখি—তবে শুধু বাক্য দ্বারা হইবে না, নিজে ধর্মজীবন যাপন করিতে হইবে, তাহা হইলে শত শত ব্যক্তি তোমার নিকট—কেবল তোমাকে দেখিবার জন্য, তোমার পদধূলি লইবার জন্য আসিবে।

যখন লোকে শুনিল যে, এই মহাপুরুষ সম্ভবতঃ শীঘ্রই তাহাদের মধ্য হইতে সরিয়া যাইবেন, তখন তাহারা পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় আসিতে লাগিল। আমাদের গুরুদেব নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাকে বারণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিতাম না। অনেক লোক দূর-দূরান্তর হইতে আসিত, আর তিনি তাহাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া শান্তি পাইতেন না। তিনি বলিতেন, 'যতক্ষণ আমার কথা কহিবার শক্তি রহিয়াছে, ততক্ষণ উপদেশ দিব।' আর তিনি যাহা বলিতেন, তাহাই করিতেন। একদিন তিনি আমাদিগকে ইঙ্গিতে জানাইলেন, সেইদিন দেহত্যাগ করিবেন এবং বেদের পবিত্রতম মন্ত্র 'ওঁ' উচ্চারণ

করিতে করিতে মহাসমাধিস্থ হইলেন। এইরূপে সেই মহাপুরুষ আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন আমরা তাঁহার দেহে অগ্নিসংযোগ করিলাম।

তাঁহার ভাব ও উপদেশাবলী প্রচার করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি তখন অতি অল্পই ছিল। গৃহী ভক্তগণ ব্যতীত তাঁহার কতকগুলি যুবক শিষ্য ছিল, তাহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছিল এবং তাঁহার কার্য চালাইয়া যাইতে প্রস্তুত ছিল। তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু তাহারা তাহাদের সম্মুখে যে মহান্ জীবনাদর্শ দেখিয়াছিল, তাহার শক্তিতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বছরের পর বছর এই দিব্য জীবনের সংস্পর্শে আসাতে প্রবল উৎসাহাগ্নি তাহাদের ভিতরও সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাহারা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। এই যুবকগণ সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের নিয়মাবলী প্রতিপালন করিতে লাগিল, আর যদিও তাহাদের মধ্যে অনেকেই সদ্বংশজাত, তথাপি তাহারা যে শহরে জন্মিয়াছিল, তাহারই রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম তাহাদিগকে প্রবল বাধা সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া রহিল, আর দিনের পর দিন ভারতের সর্বত্র এই মহাপুরুষের উপদেশ প্রচার করিতে লাগিল—অবশেষে সমগ্র দেশ তাঁহার প্রচারিত ভাবসমূহে পূর্ণ হইয়া গেল। বঙ্গদেশের সুদূর পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া এই নিরক্ষর বালক কেবল দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও আত্মশক্তিবলে সত্য উপলব্ধি করিয়া অপরকে তাহা দান করিয়া গেলেন—আর সে সত্যকে জীবন্ত রাখিবার জন্য কেবল কয়েকজন যুবককে রাখিয়া গেলেন।

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম ভারতের সর্বত্র কোটি কোটি লোকের নিকট পরিচিত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার শক্তি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছে; যদি আমি জগতের কোথাও সত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে একটি কথাও বলিয়া থাকি, তাহা আমার গুরুদেবের—আর ভুলভ্রান্তিগুলি আমার।

এইরূপ ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল—এই যুগে এইরূপ ত্যাগ আবশ্যক। আধুনিক নরনারীগণ, তোমাদের মধ্যে যদি এরূপ পবিত্র অনাঘ্রাত পুষ্পের মতো কেহ থাকে, উহা ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করা উচিত। যদি তোমাদের মধ্যে এমন কেহ থাকে, যাহাদের সংসারে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা নাই, যাহাদের বয়স বেশী হয় নাই, তাহারা সংসার ত্যাগ কর। ধর্মলাভের ইহাই রহস্য

—ত্যাগ কর। প্রত্যেক নারীকে জননী বলিয়া চিন্তা কর, আর কাঞ্চন পরিত্যাগ কর। ভয় কি? যেখানেই থাকো না কেন, প্রভু তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। প্রভু নিজ সন্তানগণের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। সাহস করিয়া ত্যাগ কর দেখি। এইরূপ ত্যাগের প্রয়োজন। তোমরা কি দেখিতেছ না, পাশ্চাত্য দেশে জড়বাদের কি প্রবল স্রোত বহিতেছে? কতদিন আর চোখে কাপড় বাঁধিয়া থাকিবে? তোমরা কি দেখিতেছ না, কি ভীষণভাবে কাম ও অপবিত্রতা সমাজের অস্থিমজ্জা শোষণ করিয়া লইতেছে? কেবল বাক্যের দ্বারা অথবা সংস্কার-আন্দোলনের দ্বারা নয়—ত্যাগের দ্বারাই ক্ষয় ও বিনাশের মধ্যে ধর্মভাব লইয়া অটল অচল সুমেরুবৎ দাঁড়াইয়া থাকিলে তবেই তোমরা এই সকল অধর্মের ভাব রোধ করিতে পারিবে। বাক্যব্যয় করিও না, তোমার দেহের প্রত্যেক লোমকূপ হইতে পবিত্রতার শক্তি, ব্রহ্মচর্যের শক্তি, ত্যাগের শক্তি বাহির হউক। যাহারা দিবারাত্রি কাঞ্চনের জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগকে ঐ শক্তি গিয়া আঘাত করুক; তাহারা কাঞ্চনের জন্য এই তীব্র আগ্রহের মধ্যে কাঞ্চনত্যাগী তোমাকে দেখিবামাত্র আশ্চর্য হউক। আর কামও ত্যাগ কর। কাম-কাঞ্চনত্যাগী হও, নিজেকে যেন বলিস্বরূপ প্রদান কর—তুমি ছাড়া আর কে ইহা সাধন করিবে? যাহারা জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ, সমাজ যাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে—তাহারা নহে, কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ ও নবীনতম, সেই বলবান্ সুন্দর যুবাপুরুষেরাই ইহার অধিকারী, তাহাদিগকেই ভগবানের বেদীতে জীবন সমর্পণ করিতে হইবে; আর এই স্বার্থত্যাগের দ্বারা জগৎকে উদ্ধার কর। জীবনের আশা বিসর্জন দিয়া সমগ্র মানবজাতির সেবক হও—সমগ্র মানবজাতির নিকট ধর্মপ্রচার কর। ইহাকেই তো ত্যাগ বলে, শুধু বাক্যদ্বারা ইহা হয় না। উঠিয়া দাঁড়াও, এবং কাজে লাগিয়া যাও। তোমাদিগকে দেখিবামাত্র সংসারী লোকের মনে—কাঞ্চনাসক্ত ব্যক্তির মনে ভয়ের সঞ্চার হইবে। কথায় কখন কোন কাজ হয় না—কতই তো প্রচার হইয়াছে, কোন ফল হয় নাই। প্রতি মুহূর্তেই অর্থপিপাসায় রাশি রাশি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হয় না, কারণ উহাদের পশ্চাতে কেবল ফাঁকি—ঐ-সকল গ্রন্থের ভিতর কোন শক্তি নাই। এস, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর। যদি কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করিতে পারো, তোমায়

বাক্যব্যয় করিতে হইবে না, তোমার হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে, তোমার ভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইবে। যে ব্যক্তি তোমার নিকট আসিবে, তাহাকেই তোমার ধর্মভাব স্পর্শ করিবে।

বর্তমান জগতের সমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘোষণা এই: মতামত, সম্প্রদায়, গির্জা বা মন্দিরের অপেক্ষা রাখিও না। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে যে সার-বস্তু অর্থাৎ ধর্ম রহিয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় উহারা তুচ্ছ; আর যতই এই ভাব মানুষের মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, ততই তাহার ভিতর জগতের কল্যাণ করিবার শক্তি আসিয়া থাকে। প্রথমে এই ধর্মধন উপার্জন কর, কাহারও উপর দোষারোপ করিও না, কারণ সকল মত—সকল পথই ভাল। তোমাদের জীবন দিয়া দেখাও যে, 'ধর্ম' অর্থে কেবল শব্দ বা নাম বা সম্প্রদায় বুঝায় না, উহার অর্থ আধ্যাত্মিক অনুভূতি। যাহারা অনুভব করিয়াছে, তাহারাই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে। যাহারা নিজেরা ধর্মলাভ করিয়াছে, কেবল তাহারাই অপরের ভিতর ধর্মভাব সঞ্চার করিতে পারে, তাহারাই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আচার্য হইতে পারে—তাহারাই কেবল জগতে জ্ঞানের শক্তি সঞ্চার করিতে পারে।

তাহা হইলে তোমরা এরূপ হও! কোন দেশে এইরূপ ব্যক্তির যতই অভ্যুদয় হইবে, সেই দেশ ততই উন্নত হইবে। আর যে দেশে এরূপ লোক একেবারে নাই, সে দেশের পতন অনিবার্য, কিছুতেই উহার উদ্ধারের আশা নাই। অতএব মানবজাতির নিকট মদীয় আচার্যদেবের উপদেশ এই: 'প্রথমে নিজে ধার্মিক হও এবং সত্য উপলব্ধি কর।' আর তিনি সকল দেশের দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ যুবকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'তোমাদের ত্যাগের সময় আসিয়াছে!' তিনি চান, তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃস্বরূপ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ কর। তিনি চান, তোমরা মুখে কেবল 'ভাইকে ভালবাসি' না বলিয়া, তোমাদের কথা যে সত্য, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কাজে লাগিয়া যাও। যুবকগণের নিকট এখন এই আহ্বান আসিয়াছে, 'কাজ কর, ঝাঁপিয়ে পড়ো, ত্যাগী হয়ে জগৎকে উদ্ধার কর।'

ত্যাগ ও প্রত্যক্ষানুভূতির সময় আসিয়াছে। জগতের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে, তাহা দেখিতে পাইবে; বুঝিবে—বিবাদের কোন

প্রয়োজন নাই এবং তখনই সমগ্র মানবজাতির সেবা করিতে পারিবে। মদীয় আচার্যদেবের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল—সকল ধর্মের মূলে যে ঐক্য রহিয়াছে, তাহা ঘোষণা করা। অন্যান্য আচার্যেরা বিশেষ বিশেষ ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, সেইগুলি তাঁহাদের নিজ নিজ নামে পরিচিত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর এই মহান্ আচার্য নিজের জন্য কিছুই দাবী করেন নাই। তিনি কোন ধর্মের উপর কোনরূপ আক্রমণ করেন নাই, কারণ তিনি সত্যসত্যই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ঐ ধর্মগুলি এক সনাতন ধর্মেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার মত

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে স্থূল অর্থেই অবতার ব'লে মনে করতেন, যদিও এর ঠিক কি অর্থ, তা আমি বুঝি না। আমি বলতাম, বৈদান্তিক অর্থে তিনি হচ্ছেন ব্রহ্ম। দেহত্যাগের ঠিক কয়েকদিন আগে তাঁর খুবই শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল; আমি যখন মনে মনে ভাবছি—দেখি, এই কষ্টের মধ্যেও তিনি নিজেকে অবতার বলতে পারেন কি না—তখনই তিনি আমাকে বললেন, 'যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই এ দেহে রামকৃষ্ণ; তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।' তিনি আমাকে খুবই ভালবাসতেন—এজন্য অনেকে আমাকে ঈর্ষা ক'রত। যে-কোন লোককেই দেখামাত্র তিনি তার চরিত্র বুঝে নিতেন, এবং এ বিষয়ে তাঁর সে মতের আর পরিবর্তন হ'ত না। আমরা কোন মানুষকে বিচার করি যুক্তি দিয়ে, সেজন্য আমাদের বিচারে থাকে ভুল-ত্রুটি; তাঁর ছিল ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি। কোন কোন ব্যক্তিকে তাঁর অন্তরঙ্গ বা 'ভেতরের লোক' বলতেন—তাদের তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে গোপন তত্ত্ব ও যোগশাস্ত্রের রহস্য শেখাতেন। বাইরের লোক বা বহিরঙ্গদের কাছে বলতেন নানা উপদেশমূলক গল্প; এগুলিই লোকে 'শ্রীরামকৃষ্ণের কথা' ব'লে জানে। ঐ অন্তরঙ্গ তরুণদের তিনি তাঁর কাজের উপযোগী ক'রে গড়ে তুলতেন, অনেকে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও তাতে তিনি কান দিতেন না। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গদের মধ্যে শেষোক্তদের কাজকর্ম দেখে প্রথমোক্তদের তুলনায় তাদের প্রতিই আমার অনেক বেশি ভাল ধারণা হয়েছিল; তবে অন্তরঙ্গদের প্রতি আমার ছিল অন্ধ অনুরাগ। লোকে বলে—আমাকে ভালবাসলে আমার কুকুরটিকেও ভালবেসো। আমি ঐ ব্রাহ্মণ-পূজারীকে অন্তর দিয়ে ভালবাসি। সুতরাং তিনি যা ভালবাসেন, যাঁকে তিনি মান্য করেন—আমিও তাই ভালবাসি, তাঁকে আমিও মান্য করি। আমার সম্পর্কে তাঁর ভয় ছিল, পাছে আমাকে স্বাধীনতা দিলে আমি আবার এক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি ক'রে বসি।

তিনি কোন একজনকে বললেন, 'এ জীবনে তোমার ধর্ম লাভ হবে না।' সকলের ভূত-ভবিষ্যৎ তিনি যেন দেখতে পেতেন। বাইরে থেকে যে

মনে হ'ত—তিনি কারও কারও উপরে পক্ষপাতিত্ব করছেন, এই ছিল তার কারণ। চিকিৎসকেরা যেমন বিভিন্ন রোগীর চিকিৎসা বিভিন্নভাবে করেন, বৈজ্ঞানিক মনোভাব-সম্পন্ন তিনিও তেমনি বিভিন্ন লোকের জন্য বিভিন্ন রকম সাধনা নির্দেশ করতেন। তাঁর ঘরে অন্তরঙ্গদের ছাড়া আর কাউকেই শুতে দেওয়া হ'ত না। যারা তাঁর দর্শন পায়নি, তাদের মুক্তি হবে না, আর যারা তিনবার তাঁর দর্শন পেয়েছে, তাদেরই মুক্তি হবে—এ কথা সত্য নয়।

উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণে অক্ষম জনসাধারণের নিকট তিনি 'নারদীয় ভক্তি' প্রচার করতেন।

সাধারণতঃ তিনি দ্বৈতবাদই শিক্ষা দিতেন, অদ্বৈতবাদ শিক্ষা না দেওয়াই ছিল তাঁর নিয়ম। তবে তিনি আমাকে অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিয়েছিলেন—এর আগে আমি ছিলাম দ্বৈতবাদী।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ জাতির আদর্শ

কোন জাতিকে এগিয়ে যেতে হ'লে তার উচ্চ আদর্শ থাকা চাই। সেই আদর্শ হবে 'পরব্রহ্ম'। কিন্তু তোমরা সকলেই কোন বিমূর্ত আদর্শের (abstract ideal) দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'তে পারবে না বলেই তোমাদের একটি ব্যক্তির আদর্শ অবশ্যই প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তোমরা সেই আদর্শ পেয়েছ। অন্য কোন ব্যক্তি এ যুগে যে আমাদের আদর্শ হ'তে পারেন না, তার কারণ তাঁদের কাল শেষ হয়ে গিয়েছে। বেদান্তের ভাব যাতে এ যুগে প্রত্যেকেই গ্রহণ করতে পারে, তারই জন্য এমন মানুষের আজ আমাদের প্রয়োজন, বর্তমান যুগের মানুষের প্রতি যাঁর সহানুভূতি আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এই অভাব পূর্ণ হয়েছে। আজ প্রত্যেকের সামনেই এই আদর্শ তুলে ধরো। সাধু বা অবতার, যেভাবেই তাঁকে গ্রহণ কর না কেন—তাতে কিছু যায় আসে না।

তিনি একবার বলেছিলেন যে তিনি আমাদের মধ্যে আবার আসবেন। আমার মনে হয়, তার পর তিনি বিদেহ-মুক্তির অবস্থায় ফিরে যাবেন। কাজ করতে হ'লে প্রত্যেকেরই একজন ইষ্টদেবতা থাকা প্রয়োজন—খ্রীষ্টানেরা যাকে বলে 'গার্ডিয়ান এঞ্জেল'—এ ঠিক তাই। আমি মাঝে মাঝে যেন কল্পনা করি, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ইষ্টদেবতা আছেন। আর তাঁদের প্রত্যেকেই যেন আধিপত্য লাভের জন্য চেষ্টা করছেন। এ ধরনের ইষ্টদেবতার—কোন জাতির কল্যাণ করার ক্ষমতা থাকে না।

গীতা-প্রসঙ্গ

গীতা—১

(১৯০০ খৃঃ ২৬শে মে স্যান ফ্র্যান্সিস্কোতে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপি)

গীতা বুঝিতে হইলে ইহার ঐতিহাসিক পটভূমি বোঝা প্রয়োজন। গীতা উপনিষদের ভাষ্য। উপনিষদ ভারতের প্রধান ধর্মগ্রন্থ—খ্রীষ্টান জগতে নিউ-টেস্টামেণ্টের মতো ভারতে ইহার স্থান। উপনিষদের সংখ্যা একশতেরও অধিক; কোনটি ছোট এবং কোনটি বড় হইলেও প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র গ্রন্থ। উপনিষদ কোন ঋষি বা আচার্যের জীবন-কাহিনী নয়, ইহার বিষয়বস্তু আত্মতত্ত্ব। উপনিষদের সূত্রসমূহ রাজাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিদ্বৎসভায় আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 'উপনিষদ' শব্দের একটি অর্থ—(আচার্যের নিকট) উপবেশন। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা উপনিষদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, ইহাদিগকে কেন সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক বিবরণ বলা হয়। দীর্ঘ আলোচনা সমাপ্ত হইবার পর সাধারণতঃ স্মরণ করিয়া এগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। পূর্বাপর সম্বন্ধ বা পটভূমি নাই বলিলেই হয়। জ্ঞানগর্ভ বিষয়গুলি শুধু উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রাচীন সংস্কৃতভাষার উৎপত্তি খ্রীষ্টের ৫০০০ বৎসর পূর্বে। উপনিষদগুলি ইহারও অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর আগেকার—ঠিক কখন ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। উপনিষদের ভাবগুলিই গীতায় গৃহীত হইয়াছে—কোন কোন ক্ষেত্রে হুবহু শব্দ পর্যন্ত। সেগুলি এমনিভাবে গ্রথিত যে, সমগ্র উপনিষদের বিষয়বস্তুটি যেন সুসম্বদ্ধ, সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ এত বিরাট যে, যদি ইহার শ্লোকগুলি একত্র করা হয়, তবে এই বক্তৃতা-গৃহটিতে স্থান-সঙ্কুলান হইবে না। ইহা ছাড়া কিছু নষ্টও হইয়া গিয়াছে। বেদ বহু শাখায় বিভক্ত; এক-একটি ঋষি-সম্প্রদায় ছিলেন এক-একটি শাখার ধারক ও বাহক। ঋষিগণ স্মৃতিশক্তির সাহায্যে শাখাগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষে এখনও অনেকে আছেন, যাঁহারা উচ্চারণের কিছুমাত্র ভুল না করিয়া বেদের অধ্যায়ের পর অধ্যায় আবৃত্তি করিতে পারেন। বেদের বৃহত্তর অংশ এখন আর পাওয়া যায় না,

কিন্তু যে-অংশ পাওয়া যায়, তাহা লইয়াই একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার হইতে পারে। বেদের প্রাচীনতম অংশে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি পাওয়া যায়। বৈদিক রচনাবলীর পারম্পর্য-নির্ণয়ের জন্য আধুনিক গবেষকদের একটি ঝোঁক দেখা যায়—কিন্তু এ বিষয়ে গোঁড়া ও প্রাচীনপন্থীদের ধারণা অন্যরূপ, যেমন বাইবেল সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা আধুনিক গবেষকদের মত হইতে ভিন্ন। বেদকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়: একটি দার্শনিক অংশ—উপনিষদ, অন্যটি কর্মকাণ্ড।

কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে এখন একটি মোটামুটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। অনুষ্ঠান-বিধি ও স্তবস্তুতি লইয়াই কর্মকাণ্ড; বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে বিভিন্ন স্তব। কর্মকাণ্ডের মধ্যে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত বিধিসমূহ পাওয়া যায়—উহাদের কতকগুলি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। বহু হোতা ও পুরোহিতের আবশ্যক। যাগযজ্ঞের বিশদ অনুষ্ঠানের জন্য হোতা, ঋত্বিক প্রভৃতির কার্য একটি বিশেষ বিজ্ঞানে পরিণত হয়। ক্রমশঃ এই সব স্তব ও যাগযজ্ঞকে কেন্দ্র করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে একটা শ্রদ্ধার ভাব গড়িয়া উঠে। দেবতাগণ তখন অন্তর্হিত হন এবং যাগযজ্ঞই তাঁহাদের স্থান অধিকার করে। ভারতে ইহা একটি অদ্ভুত ক্রমপরিণতি। গোঁড়া হিন্দু (মীমাংসক) দেবতায় বিশ্বাসী নন; যাঁহারা গোঁড়া নন, তাঁহারা দেবতায় বিশ্বাসী। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, বেদে উল্লিখিত দেবতাগণের তাৎপর্য কি, তাহা হইলে তিনি ইহার সদুত্তর দিতে পারিবেন না। পুরোহিতরা মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। গোঁড়া হিন্দুদিগকে ইহার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, শব্দের এমন একটি শক্তি আছে, যাহা দ্বারা বিশেষ ফল উৎপন্ন হয়, এই পর্যন্ত। প্রাকৃতিক ও অতি-প্রাকৃতিক সমস্ত শক্তিই উহার মধ্যে আছে। অতএব বেদ হইল শব্দরাশি, যাহার উচ্চারণ নির্ভুল হইলে আশ্চর্য ফল উৎপন্ন হইতে পারে। একটি শব্দেরও উচ্চারণ ভুল হইলে চলিবে না। প্রত্যেকটি শব্দ বিধিমত উচ্চারিত হওয়া প্রয়োজন। এইরূপে অন্যান্য ধর্মে যাহাকে প্রার্থনা বলা হয়, তাহা অন্তর্হিত হইল এবং বেদই দেবতারূপে পরিণত হইল। কাজেই দেখা যাইতেছে, এ মতে বেদে শব্দ-রাশির উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এইগুলি হইল শাশ্বত

শব্দরাশি, যাহা হইতে সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। শব্দ ছাড়া কোন চিন্তার অভিব্যক্তি হয় না। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা চিন্তারই অভিব্যক্তি এবং চিন্তা ব্যক্ত হয় কেবলমাত্র শব্দের সাহায্যে। যে শব্দরাশি দ্বারা অব্যক্ত চিন্তা ব্যক্ত হয়, তাহাই বেদ। অতএব বলা যায়, প্রত্যেকটি বস্তুর বাহিরের যে অস্তিত্ব, তাহা নির্ভর করে বেদের উপর, কারণ শব্দ ছাড়া চিন্তার অভিব্যক্তি সম্ভব নয়। যদি 'অশ্ব' শব্দটি না থাকিত, তবে কেহই অশ্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারিত না। অতএব চিন্তা, শব্দ ও বস্তুর মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা চাই। প্রকৃতপক্ষে এই শব্দগুলি কি? এগুলি বেদ। হিন্দুরা এই ভাষাকে মোটেই সংস্কৃত বলেন না; ইহা বৈদিক বা দেবভাষা। অন্যান্য ভাষার মতো সংস্কৃতও একটি বিকৃত রূপ। বৈদিক ভাষা হইতে প্রাচীনতর আর কোন ভাষা নাই। আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন—বেদসমূহের রচয়িতা কে? এগুলি কাহারও দ্বারা লিখিত হয় নাই। শব্দরাশিই বেদ। একটি শব্দই বেদ, যদি আমি ঠিকভাবে তাহা উচ্চারণ করিতে পারি। ঠিকভাবে উচ্চারিত হইলে তৎক্ষণাৎ উহা বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবে।

এই বেদরাশি অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান এবং এই শব্দরাশি হইতে সমগ্র জগৎ অভিব্যক্ত। কল্পান্তে এই সব শক্তির প্রকাশ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া প্রথমে কেবল শব্দে এবং পরে চিন্তায় লীন হইয়া যায়। পরবর্তী কল্পে চিন্তা প্রথমে শব্দরাশিতে ব্যক্ত হয় এবং পরে শব্দগুলি হইতে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইজন্য যাহা বেদে নাই, তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব, তাহা ভ্রান্তিমাত্র। বেদের এই অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদনের জন্য বহু গ্রন্থ আছে। যদি আপনারা বলেন, বেদ মানুষের দ্বারা রচিত, তাহা হইলে এই সব গ্রন্থের রচয়িতাদের নিকট আপনারা হাস্যাস্পদ হইবেন। মানুষের দ্বারা বেদ প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছিল—এ কথার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেবের কথা ধরা যাক। প্রবাদ আছে, তিনি বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বেদপাঠও করিয়াছিলেন। যদি খ্রীষ্টান বলে, 'আমার ধর্ম ঐতিহাসিক ধর্ম এবং সেজন্যই উহা সত্য, আর তোমার ধর্ম মিথ্যা।' মীমাংসক উত্তর দিবেন, 'তোমার ধর্মের একটি ইতিহাস আছে এবং তুমি নিজেই স্বীকার করিতেছ, কোন মানুষ উনিশ শত বৎসর পূর্বে ইহা

আবিষ্কার করিয়াছে। যাহা সত্য, তাহা অসীম ও সনাতন। ইহাই সত্যের একমাত্র লক্ষণ। সত্যের কখনও বিনাশ নাই—ইহা সর্বদা একরূপ। তুমি স্বীকার করিতেছ, তোমার ধর্ম কোন-না-কোন ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল। বেদ কিন্তু সেরূপ নয়; কোন অবতার বা মহাপুরুষ দ্বারা উহা সৃষ্ট নয়। বেদ অনন্ত শব্দরাশি—স্বভাবতঃ যে শব্দগুলি শাশ্বত ও সনাতন, সেগুলি হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি ও সেগুলিতেই ইহার লয় হইতেছে। তত্ত্বের দিক দিয়া ইহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।...সৃষ্টির আদিতে শব্দের তরঙ্গ। জীবসৃষ্টির আদিতে জীবাণুর মতো শব্দতরঙ্গেরও আদি-তরঙ্গ আছে। শব্দ ছাড়া কোন চিন্তা সম্ভব নয়।...

যেখানে কোন বোধ চেতনা বা অনুভূতি আছে, সেখানে শব্দ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যখন বলা হয়, চারখানি গ্রন্থই কেবল বেদ, তখন ভুল বলা হয়। তখন বৌদ্ধেরা বলিবেন, 'আমাদের শাস্ত্রগুলিই বেদ, সেগুলি পরবর্তী কালে আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে।' তাহা সম্ভব নহে, প্রকৃতি এইভাবে কার্য করে না। প্রকৃতির নিয়মগুলি একটু একটু করিয়া প্রকাশিত হয় না। মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মের খানিকটা আজ ও খানিকটা কাল প্রকাশিত হইবে, এরূপ হয় না। প্রত্যেকটি নিয়ম পরিপূর্ণ। নিয়মের ক্রমবিবর্তন মোটেই নাই। যাহা হইবার তাহা একেবারেই প্রকাশিত হইবে। 'নূতন ধর্ম', 'মহত্তর প্রেরণা' প্রভৃতি শব্দ নিতান্ত অর্থহীন। প্রকৃতির শতসহস্র নিয়ম থাকিতে পারে, মানুষ আজ পর্যন্ত তাহার অতি অল্পই হয়তো জানিয়াছে। তত্ত্বগুলি আছে, আমরা সেগুলি আবিষ্কার করি—এই মাত্র। প্রাচীন পুরোহিতকুল এই শব্দরাশির উচ্চারণ-বিধি অধিগত করিয়া দেবতাদের স্থানচ্যুত করিয়াছেন এবং তাহাদের স্থলে নিজদিগকে বসাইয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন: শব্দের কি অদ্ভুত শক্তি, তাহা তোমরা জান না! ঐগুলি কিভাবে ব্যবহার করা যায়, আমরা জানি। এই পৃথিবীতে আমরাই জীবন্ত দেবতা। আমাদের অর্থ দাও। অর্থের বিনিময়ে আমরা বেদের শব্দরাশিকে এমনভাবে কাজে লাগাইব, যাহাতে তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তোমরা কি নিজেরা বেদমন্ত্র যথাযথ উচ্চারণ করিতে পারো? পার না; সাবধান, যদি একটিও ভুল কর, তবে ফল বিপরীত হইবে। তোমরা কি ধনবান্, ধীমান্ ও দীর্ঘায়ু হইতে চাও এবং মনোমত পতি

বা পত্নী লাভ করিতে চাও? তাহা হইলে পুরোহিতদের অর্থ দাও এবং চুপ করিয়া থাকো।

আর একটি দিক আছে। বেদের প্রথম অংশের আদর্শ অপর অংশ উপনিষদের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথম অংশের যে আদর্শ, তাহার সহিত এক বেদান্ত ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের আদর্শের মিল আছে। ইহলোকে ও পরলোকে ভোগই ইহার মূল কথা—স্বামী-স্ত্রী পুত্র-কন্যা। অর্থ দাও, পুরোহিতরা তোমাকে ছাড়পত্র দিবেন—পরকালে স্বর্গে তুমি সুখে থাকিবে। সেখানেও তুমি সব আত্মীয়-স্বজনকে পাইবে এবং অনন্তকাল আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিবে। অশ্রু নাই, দুঃখ নাই—শুধু হাসি আর আনন্দ। পেটের বেদনা নাই—যত পারো খাও। মাথা-ব্যথা নাই, যত পারো ভোজসভায় যোগদান কর। পুরোহিতদের মতে ইহাই মানব-জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য।

এই জীবন-দর্শনের অন্তর্ভুক্ত আর একটি বিষয়ের সহিত আধুনিক ভাব-ধারার অনেকখানি মিল আছে। মানুষ প্রকৃতির দাস এবং চিরকালই সে এইরূপ থাকিবে। আমরা ইহাকে 'কর্ম' বলি। কর্ম একটি নিয়ম; ইহা সর্বত্র প্রযোজ্য। পুরোহিতদের মতে সকলেই কর্মের অধীন। তবে কি কর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার উপায় নাই? তাঁহারা বলেন, 'না। অনন্তকাল প্রকৃতির ক্রীতদাসরূপে থাকিতে হইবে—তবে সে দাসত্ব সুখের! যদি আমাদের উপযুক্ত দক্ষিণা দাও, তবে শব্দগুলি এমন ভাবে ব্যবহার করিব, যাহাতে তোমরা পরলোকে কেবল ভালটুকুই পাইবে, মন্দটুকু নয়।'—মীমাংসকেরা এইরূপ বলেন। যুগ যুগ ধরিয়া এইরূপ আদর্শই সাধারণের নিকট প্রিয় হইয়া আছে। জনসাধারণ কখনও চিন্তা করে না। যদি কেহ কখন স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহাদের উপর কুসংস্কারের প্রচণ্ড চাপ পড়ে। এই দুর্বলতার জন্য বাহিরের একটু আঘাতে তাহাদের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া টুকরা হইয়া যায়। প্রলোভন ও শাস্তির ভয় দ্বারা তাহারা চালিত হয়। নিজেদের ইচ্ছায় তাহারা চলিতে পারে না। সাধারণ লোককে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতে হইবে; চিরকাল ক্রীতদাস হইয়া তাহারা থাকিবে। পুরোহিতদের দক্ষিণা দেওয়া এবং তাহাদের মানিয়া চলা ছাড়া আর কোন কর্তব্য নাই—বাকী যাহা করণীয়, তাহা

যেন পুরোহিতরাই করিয়া দিবেন।...ধর্ম এইভাবে কতখানি সহজ হইয়া যায়! কারণ আপনাদের কিছুই করিবার নাই—বাড়ি গিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকুন। নিজেদের মুক্তিসাধনার সবই অপরে করিয়া দিবে। হায়, হতভাগ্য মানুষ!

পাশাপাশি আর একটি দার্শনিক চিন্তাধারা ছিল। উপনিষদ কর্মকাণ্ডের সকল সিদ্ধান্তের একেবারে বিপরীত। প্রথমতঃ উপনিষদ বিশ্বাস করেন, এই বিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন—তিনি ঈশ্বর, সমস্ত বিশ্বের নিয়ামক। কালে তিনিই কল্যাণময় ভাগ্যবিধাতায় পরিণত হন। এই ধারণা পূর্বের ধারণা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। পুরোহিতরাও এ কথা বলেন, তবে এখানে ঈশ্বরের যে ধারণা, তাহা অতি সূক্ষ্ম। বহু দেবতার স্থলে এখানে এক ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ উপনিষদও স্বীকার করেন, কর্মের নিয়মে সকলে আবদ্ধ; কিন্তু নিয়মের হাত হইতে মুক্তিপথের সন্ধানও তাঁহারা দিয়াছেন। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নিয়মের পারে যাওয়া। ভোগ কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কারণ ভোগ কেবল প্রকৃতির মধ্যেই সম্ভব।

তৃতীয়তঃ উপনিষদ যাগযজ্ঞের বিরোধী এবং উহাকে নিতান্ত হাস্যকর অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করেন। যাগযজ্ঞের দ্বারা সকল ঈপ্সিত বস্তু লাভ হইতে পারে, কিন্তু ইহাই মানুষের চরম কাম্য হইতে পারে না; কারণ মানুষ যতই পায়, ততই চায়। ফলে মানব হাসিকান্নার অন্তহীন গোলকধাঁধায় চিরকাল ঘুরিতে থাকে—কখনও লক্ষ্যে পৌছিতে পারে না; অনন্ত সুখ কোথাও কখনও সম্ভব নহে, ইহা বালকের কল্পনা মাত্র। একই শক্তি সুখ-ও দুঃখরূপে পরিণত হয়।

আজ আমার মনস্তত্ত্ব খানিকটা পরিবর্তন করিয়াছি। একটি অত্যন্ত অদ্ভুত সত্য আবিষ্কার করিয়াছি। অনেক সময় আমাদের মনে অনেক ভাব জাগে, যেগুলি আমরা চাই না; আমরা অন্য বিষয়ের চিন্তা দ্বারা ঐগুলি সম্পূর্ণভাবে চাপা দিতে চাই। সেই ভাবটা কি? দেখিতে পাই পনর মিনিটের মধ্যেই তাহা আবার মনে উদিত হয়। সেই ভাবগুলি এত প্রবল ও ভীষণভাবে আসিয়া মনে আঘাত করে যে, নিজেকে পাগল বলিয়াই মনে হয় এবং যখন এই ভাব প্রশমিত হয়,

তখন দেখা যায় যে, পূর্বের ভাবটাকে শুধু চাপিয়া রাখা হইয়াছিল। ইহার পরিণতি কি হইল? ভিতরে যে খারাপ সংস্কারগুলি ছিল, সেইগুলি কার্যে পরিণত হইয়াছে। প্রাণিগণ নিজ নিজ প্রকৃতিকে অনুসরণ করে। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ কি করিতে পারে?[১] গীতায় এইরূপ ভীষণ কথাই বলা হইয়াছে। কাজেই আমাদের সমস্ত সংগ্রাম—সমস্ত চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়। মনের মধ্যে সহস্র প্রেরণা একই সময়ে প্রতিযোগিতা করিতেছে; তাহাদিগকে চাপিয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু যখনই বাধা অপসারিত হয়, তখনই সমস্ত চিন্তাগুলি প্রকট হইয়া উঠে।

কিন্তু আশা আছে। যদি ক্ষমতা থাকে, তবে মনঃশক্তিকে একই সঙ্গে বহু অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আমার চিন্তাধারা পরিবর্তন করিতেছি। মন ক্রমশঃ বিকশিত হয়—যোগিগণ এই কথাই বলেন। মনের একটি আবেগ আর একটি আবেগকে জাগ্রত করে, তখন প্রথমটি নষ্ট হইয়া যায়। যদি তুমি ক্রুদ্ধ হইবার পরমুহূর্তে সুখী হইতে পারো, তবে পূর্বের ক্রোধ চলিয়া যাইবে। ক্রোধের মধ্য হইতেই তোমার পরবর্তী অবস্থার উদ্ভব হইতেছে। মনের এই অবস্থাগুলি সর্বদাই পরস্পর পরিবর্তন-সাপেক্ষ। চিরস্থায়ী সুখ ও চিরস্থায়ী দুঃখ শিশুর স্বপ্নমাত্র। উপনিষদ বলেন, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য দুঃখও নয়, সুখও নয়; কিন্তু যাহা হইতে এই সুখ ও দুঃখের উদ্ভব হইতেছে, তাহাকে বশীভূত করা। একেবারে গোড়াতেই যেন অবস্থাকে আমাদের আয়ত্তে আনিতে হইবে।

মতপার্থক্যের অন্য বিষয়টি এই: উপনিষদ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মগুলির—বিশেষতঃ পশুবলির সহিত সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানগুলির নিন্দা করেন। উপনিষদ বলেন, এই সব নিতান্তই নিরর্থক। প্রাচীন দার্শনিকদের এক সম্প্রদায় (মীমাংসকেরা) বলেন, কোন বিশেষ ফল পাইতে হইলে একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ কোন পশুকে বলি দিতে হইবে। উত্তরে বলা যায়, 'পশুটির প্রাণ লইবার জন্য তো পাপ হইতে পারে এবং তার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।' ঐ দার্শনিকরা বলেন, এ সব বাজে কথা! কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পুণ্য—তাহা তুমি কি করিয়া জানিলে? তোমার মন বলিতেছে?

---

১ প্রকৃতিং যন্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।—গীতা

তোমার মন কি বলে না বলে, তাহাতে অপরের কি আসে যায়? তোমার এ সকল কথার কোন অর্থ নাই—কারণ তুমি শাস্ত্রের বিরুদ্ধে চিন্তা করিতেছ। যদি তোমার মন এক কথা বলে এবং বেদ অন্য কথা বলেন, তবে তোমার মন সংযত করিয়া বেদের নির্দেশ শিরোধার্য কর। যদি বেদ বলেন, নরহত্যা ঠিক, তবে তাহাই ঠিক। যদি তুমি বল, 'না, আমার বিবেক অন্যরূপ বলে'—এ কথা বলা চলিবে না।

যে মুহূর্তে কোন গ্রন্থকে বিশেষ পবিত্র ও চিরন্তন বলিয়া বিশ্বাস করিলেন, তখন আর উহাকে সন্দেহ করিতে পারিবেন না। আমি বুঝিতে পারি না, এদেশের লোকেরা বাইবেলে পরম বিশ্বাসী হইয়াও কি করিয়া বলে—'উপদেশগুলি কত সুন্দর, ন্যায়সঙ্গত ও কল্যাণকর!' কারণ বাইবেল স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী—এই বিশ্বাস যদি পাকা হয়, তবে তাহার ভালমন্দ বিচারের অধিকার—আপনাদের মোটেই নাই। যখন বিচার করিতে বসেন, তখন আপনারা ভাবেন—আপনারা বাইবেল অপেক্ষা বড়। সে ক্ষেত্রে বাইবেলের প্রয়োজন কি? পুরোহিতরা বলেন, 'বাইবেল বা অন্য কাহারও সহিত তুলনা করিতে আমরা নারাজ। ইহার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, প্রমাণ কি? সেখানেই ইহার শেষ। যদি মনে করেন, কিছু ঠিক হয় নাই, তবে বেদের অনুশাসন অনুযায়ী ইহা ঠিক করিয়া লইবেন।

উপনিষদ ইহা বিশ্বাস করেন, তবে সেখানে একটি উচ্চতর মানও আছে। একদিকে যেমন বেদের কর্মকাণ্ড তাহারা অস্বীকার করে না, তেমনি আবার অন্যদিকে তাহাদের দৃঢ় মত এই যে, পশুবলি এবং অপরের অর্থের প্রতি পুরোহিতকুলের লোভ অত্যন্ত অসঙ্গত। মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া উভয়ের ভিতরে অনেক মিল আছে বটে, তবে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদ লইয়াই ঘোরতর মতানৈক্য বিদ্যমান। আত্মার কি দেহ ও মন আছে? মন কি কতগুলি ক্রিয়াশীল ও সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর সমষ্টি? সকলেই মানিয়া লয়, মনোবিজ্ঞান একটি নিখুঁত বিজ্ঞান; এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু আত্মা ও ঈশ্বর প্রভৃতি ব্যাপারে দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব রহিয়াছে।

পুরোহিতকুল এবং উপনিষদের মধ্যে আর একটি বড় পার্থক্য আছে। উপনিষদ বলেন—ত্যাগ কর। ত্যাগই সব কিছুর কষ্টিপাথর। সব কিছু ত্যাগ

কর। সৃজনী শক্তি হইতেই সংসারের যাহা কিছু বন্ধন। মন স্বস্থ হয় তখনই, যখন সে শান্ত। যে-মুহূর্তে মনকে শান্ত করিতে পারিবে, সেই মুহূর্তেই সত্যকে জানিতে পারিবে। মন যে এত চঞ্চল, তাহার কারণ কি? কল্পনা ও সৃজনী প্রবৃত্তিই ইহার কারণ। সৃষ্টি বন্ধ কর, সত্য জানিতে পারিবে। সৃষ্টির সমস্ত শক্তি বন্ধ হইলেই সত্য জানা যায়।

অন্যদিকে পুরোহিতকুল সৃষ্টির পক্ষপাতী। এমন জীবের কল্পনা কর, যাহার মধ্যে সৃষ্টির কোন ক্রিয়াকলাপ নাই। এ রকম অবশ্য চিন্তা করা যায় না। স্থায়ী সমাজ-বিবর্তনের জন্য মানুষকে একটি পরিকল্পনা করিতে হইয়াছিল। এইজন্য [বিবাহে] কঠোর নির্বাচন-প্রথা অবলম্বন করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অন্ধ ও খঞ্জের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে ভারতবর্ষে বিকলাঙ্গ লোকের সংখ্যা পৃথিবীর অন্য যে-কোন দেশ অপেক্ষা কম। মৃগীরোগী এবং পাগলের সংখ্যাও সেখানে কম। ইহার কারণ—প্রত্যক্ষ যৌন-নির্বাচন। পুরোহিতদের বিধান হইল—বিকলাঙ্গেরা সন্ন্যাসী হউক। অপরদিকে উপনিষদ বলেনঃ না, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে তাজা ও সুন্দর ফুলই পূজার বেদীতে অর্পণ করা কর্তব্য। আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী ও সুস্থতম ব্যক্তিরাই সত্যলাভের চেষ্টা করিবে।

এই সব মত-পার্থক্য সত্ত্বেও পুরোহিতেরা নিজেদের এক পৃথক জাতি-গোষ্ঠীতে (ব্রাহ্মণ) পরিণত করিয়াছে, এ কথা আমি আপনাদের আগেই বলিয়াছি। দ্বিতীয় হইল রাজপুরুষের জাতি (ক্ষত্রিয়)। উপনিষদের দর্শন রাজাদের মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত, পুরোহিতদের মস্তিষ্ক হইতে নয়। প্রত্যেক ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়া একটা অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। মানুষ নামক জীবের উপর ধর্মের কিছু প্রভাব আছে বটে, কিন্তু অর্থনীতির দ্বারাই সে পরিচালিত হয়। ব্যষ্টির জীবনের উপর অন্য কিছুর প্রভাব থাকিতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে মানুষের ভিতর যখনই কোন অভ্যুত্থান আসিয়াছে, তখনই দেখা গিয়াছে, আর্থিক সম্পর্ক ব্যতীত মানুষ কখনও সাড়া দেয় নাই। আপনি যে ধর্মমত প্রচার করিতেছেন, তাহা সর্বাঙ্গসুন্দর না হইতে পারে, কিন্তু যদি তাহার পশ্চাতে অর্থনৈতিক পটভূমিকা থাকে এবং কিছু-সংখ্যক উৎসাহী সমর্থক ইহার প্রচারের জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তবে আপনি একটি গোটা দেশকে আপনার ধর্মমতে আনিতে পারিবেন।

যখনই কোন ধর্মমত সফল হয়, তখন (বুঝিতে হইবে) অবশ্যই তাহার আর্থিক মূল্য আছে। একই ধরনের সহস্র সম্প্রদায় ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম করিলেও যে-সম্প্রদায় আর্থিক সমস্যা সমাধান করিতে পারে, তাহাই প্রাধান্য লাভ করিবে। পেটের চিন্তা—অন্নের চিন্তা মানুষের প্রথম। অন্নের ব্যবস্থা প্রথমে, তারপর মস্তিষ্কের। মানুষ যখন হাঁটে, তখন তাহার পেট চলে আগে, মাথা চলে পরে। ইহা কি লক্ষ্য করেন নাই? মস্তিষ্কের অগ্রগতির জন্য এখনও কয়েক যুগ লাগিবে। ৬০ বৎসর বয়স হইলে মানুষ সংসার হইতে বিদায় লয়। সমগ্র জীবন একটি ভ্রান্তি। বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিবার মতো বয়স হইতে না হইতে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। যতদিন পাকস্থলী সবল ছিল, ততদিন সব ঠিক ছিল। যখন বালসুলভ স্বপ্ন বিলীন হইয়া বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ দেখিবার সময় আসিল, তখন মস্তিষ্কের গতি শুরু হয়; এবং যখন মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রাধান্য লাভ করিল, তখন সংসার হইতে চলিয়া যাইতে হয়। তাই উপনিষদের ধর্মকে জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী করা বড় দুরূহ ব্যাপার। অর্থগত লাভ সেখানে খুব অল্প, কিন্তু পরার্থপরতা সেখানে প্রচুর।…

উপনিষদের ধর্ম যদিও প্রভূত রাজশক্তির অধিকারী রাজন্যবর্গের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তবু ইহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল না। তাই সংগ্রাম প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়াছিল। প্রায় দুই হাজার বছর পরে বৌদ্ধ-ধর্মের বিস্তারের সময় ইহা চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হয়। বৌদ্ধধর্মের বীজ ছিল এই রাজা ও পুরোহিতের সাধারণ দ্বন্দ্বের মধ্যে। এই প্রতিযোগিতায় ধর্মের অবনতি হয়। একদল এই ধর্মকে ত্যাগ করিতে চাহিল, অন্যদল বৈদিক দেবতা, যজ্ঞ প্রভৃতিকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহিল। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণের শৃঙ্খল মোচন করিল। এক মুহূর্তে সকল জাতি ও সম্প্রদায় সমান হইয়া গেল। ধর্মের মহান্ তত্ত্বগুলি ভারতে এখনও বর্তমান, কিন্তু সেগুলি প্রচার করার কাজ এখনও বাকী আছে, অন্যথা সেই তত্ত্বগুলি দ্বারা কোন উপকার হইবে না।

দুইটি কারণে প্রত্যেক দেশেই পুরোহিতগণ গোঁড়া ও প্রাচীনপন্থী হয়। একটি কারণ—তাহাদের জীবিকা, অন্যটি—তাহাদিগকে জন-সাধারণের সঙ্গে চলিতে হয়। তাহা ছাড়া পুরোহিতদের মন সবল নয়। যদি জনসাধারণ বলে, 'দুই হাজার দেবতার কথা প্রচার কর,' পুরোহিতরা

তাহাই করিবে। যে জনমণ্ডলী তাহাদের টাকা দেয়, পুরোহিতরা তাহাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র, ভগবান তো টাকা দেন না; কাজেই পুরোহিতদের দোষ দেওয়ার পূর্বে নিজেদেরই দোষ দিন। আপনারা যেরূপ শাসন, ধর্ম ও পুরোহিতকুল পাইবার উপযুক্ত, সেইরূপই পাইবেন। ইহা অপেক্ষা ভাল কিছু পাওয়া আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই সংঘর্ষ ভারতবর্ষেও আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইহার একটি চূড়ান্ত অবস্থা দেখা গেল গীতাতে। যখন সমগ্র ভারতবর্ষ দুইটি বিবদমান দলে বিভক্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিল—তখন এই বিরাট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। তিনি গীতার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ এবং পুরোহিত ও জন-সাধারণের ধর্মমতের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করেন। আপনারা যীশুখ্রীষ্টকে যেমন শ্রদ্ধা ও পূজা করেন, শ্রীকৃষ্ণকেও তেমনি ভারতবর্ষের লোক শ্রদ্ধা ও পূজা করেন। শুধু যুগের ব্যবধান মাত্র। আপনাদের দেশের ক্রীস্‌মাসের মতো হিন্দুরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি (জন্মাষ্টমী) পালন করেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে। তাঁহার জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে; সেগুলির কিছু কিছু যীশুখ্রীষ্টের জীবনীর সহিত মিলিয়া যায়। কারাগারেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল। পিতা শিশুকে লইয়া পলায়ন করেন এবং গোপগোপীদের নিকট তাঁহার পালনের ভার অর্পণ করেন। সেই বৎসর যত শিশু জন্মিয়াছিল, সকলকেই হত্যা করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং জীবনের শেষ ভাগে তাঁহাকে অপরের হাতে প্রাণ দিতে হইয়াছিল —ইহাই নিয়তি।

শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সেগুলি সম্বন্ধে আমার তত আগ্রহ নাই। অতিরঞ্জন-দোষ হিন্দুদেরও আছে। খ্রীষ্টান মিশনরীরা যদি বাইবেলের একটি গল্প বলে, হিন্দুরা বিশটি গল্প বলিবে। আপনারা যদি বলেন, তিমিমাছ্ জোনা-কে গলাধঃকরণ করিয়াছিল—হিন্দুরা বলিবেন, তাহাদের কেহ না কেহ একটি হাতীকে গিলিয়াছিল।...বাল্যকাল হইতে আমি শ্রীকৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে অনেক কথা শুনিয়াছি। আমি ধরিয়া লইতেছি, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া একজন কেহ ছিলেন এবং গীতা তাঁহার অপূর্ব গ্রন্থ। এ কথা অনস্বীকার্য যে, গল্প বা উপ-কথাগুলি বিশ্লেষণ করিলে ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। উপকথাগুলি

অলঙ্কারের কাজ করে। স্বভাবতই সেগুলি যতটা সম্ভব সুশোভন করা হয় এবং আলোচ্য ব্যক্তির চরিত্রের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়া হয়। বুদ্ধদেবের কথা ধরা যাক—ত্যাগই কেন্দ্রগত ভাব; হাজার হাজার উপকথা রচিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকটিতে ঐ ত্যাগের মাহাত্ম্য ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। লিঙ্কনের মহান্ জীবনের এক-একটি ঘটনাকে লইয়া বহু গল্প রচিত হইয়াছে। গল্পগুলি বিশ্লেষণ করিলে একটি সাধারণ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। উহার মধ্যে ঐ ব্যক্তির চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল অনাসক্তি। তাঁহার কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজন নাই, কোন অভাবও তাঁহার নাই। কর্মের জন্যই তিনি কর্ম করেন। কর্মের জন্য কর্ম। পূজার জন্য পূজা। পরোপকার কর—কারণ, পরোপকার মহৎ কাজ; আর কিছু চাহিও না। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র। অন্যথা এই উপকথাগুলিকে সেই অনাসক্তির আদর্শের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না। গীতা তাঁহার একমাত্র উপদেশ নয়।…

আমি যত মানুষের কথা জানি, তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তাঁহার মধ্যে মস্তিষ্কের উৎকর্ষ, হৃদয়বত্তা ও কর্মনৈপুণ্য সমভাবে বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত নাগরিক, যোদ্ধা, মন্ত্রী অথবা অন্য কোন দায়িত্বশীল পুরুষের কর্মপ্রবণতায় প্রাণবন্ত। বিদ্যাবত্তা, কবি-প্রতিভা, ভদ্র ব্যবহার—সব দিক দিয়াই তিনি ছিলেন মহান্। গীতা ও অন্যান্য গ্রন্থে এই সর্বাঙ্গীণ ও বিস্ময়কর কর্মশীলতা এবং মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের অপূর্ব সমন্বয়ের কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতায় যে হৃদয়বত্তা ও ভাষার মাধুর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অপূর্ব ও অনবদ্য। এই মহান্ ব্যক্তির প্রচণ্ড কর্মক্ষমতার পরিচয় এখনও দেখা যায়। পাঁচ হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে—আজও কোটি কোটি লোক তাঁহার বাণীতে অনুপ্রাণিত হইতেছে। চিন্তা কর—তোমরা তাঁহাকে জানো বা না জানো—সমগ্র জগতে তাঁহার চরিত্রের প্রভাব কত গভীর! তাঁহার পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞাকে আমি পরম শ্রদ্ধা করি। কোন প্রকার জটিলতা, কোন প্রকার কুসংস্কার সেই চরিত্রে দৃষ্ট হয় না। জগতের প্রত্যেক বস্তুর একটি নিজস্ব স্থান আছে, এবং তিনি তাহার যোগ্য মর্যাদা দিতে জানিতেন। যাহারা কেবল তর্ক করে এবং বেদের মহিমা সম্বন্ধে সন্দেহ করে, তাহারা সত্যকে জানিতে পারে না; তাহারা ভণ্ড ব্যতীত আর কিছুই

নয়। কুসংস্কার এবং অজ্ঞতারও স্থান বেদে আছে। প্রত্যেক বস্তুর যথাযথ স্থান নির্ণয় করাই প্রকৃত রহস্য।

তারপর হৃদয়বত্তা! বুদ্ধদেবেরও পূর্ববর্তী শ্রীকৃষ্ণই সকল সম্প্রদায়ের নিকট ধর্মের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। মনঃশক্তির এবং প্রচণ্ড কর্মপ্রবণতার কী অপূর্ব বিকাশ! বুদ্ধদেবের কর্মক্ষমতা একটি বিশেষ স্তরে পরিচালিত হইত—উহা আচার্যের স্তর। তিনি স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিলেন, নতুবা আচার্যের কাজ করা সম্ভব নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেছেন! যিনি প্রবল কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে একান্তভাবে শান্ত রাখেন এবং যিনি গভীর শান্তির মধ্যে কর্মপ্রবণতা দেখান, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী ও জ্ঞানী[১]। যুদ্ধক্ষেত্রের অস্ত্রশস্ত্র এই মহাপুরুষ ভ্রূক্ষেপ করেন না। সংগ্রামের মধ্যেও তিনি ধীর স্থিরভাবে জীবন ও মৃত্যুর সমস্যাসমূহ আলোচনা করেন। প্রত্যেক অবতারই তাঁহার উপদেশের জীবন্ত উদাহরণ। নিউ টেষ্টামেণ্টের উপদেশের তাৎপর্য জানিবার জন্য আপনারা কাহারও না কাহারও নিকট যাইয়া থাকেন। তাহার পরিবর্তে নিজেরা উহা বার বার পড়ুন এবং খ্রীষ্টের অপূর্ব জীবনালোকে উহা বুঝিতে চেষ্টা করুন।

মনীষীরা চিন্তা করেন এবং আমরাও চিন্তা করি। কিন্তু তাহার মধ্যে পার্থক্য আছে। আমাদের মন যাহা চিন্তা করে, শরীর তাহা অনুসরণ করে না। আমাদের কার্য ও চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। যে শক্তির বলে 'শব্দ' বেদ হয়, আমাদের কথায় সেই শক্তি নাই। কিন্তু ঋষি বা মনীষীরা যাহা চিন্তা করেন, তাহা অবশ্যই কর্মে পরিণত হয়। যদি তাঁহারা বলেন, 'আমি ইহা করিব' তবে তাঁহাদের শরীর সেই কাজ করিবেই। পরিপূর্ণ আজ্ঞাবহতাই উদ্দেশ্য। তুমি একমুহূর্তে নিজেকে ঈশ্বর কল্পনা করিতে পারো, কিন্তু তুমি ঈশ্বর হইতে পার না—বিপদ এইখানেই। মনীষীরা যাহা চিন্তা করেন, তাহাই হন—আমাদের চিন্তাকে কার্যে পরিণত করিতে অনেক সময় প্রয়োজন।

আমরা এতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সমসাময়িক যুগের কথা আলোচনা করিলাম। পরবর্তী বক্তৃতায় 'গীতা' সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানিতে পারিব।

---

১ গীতা, ৪।১৮

গীতা—২

(১৯০০ খৃঃ ২৮শে মে স্যান ফ্র্যান্সিস্কোতে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপি)

গীতা সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু ভূমিকার প্রয়োজন। দৃশ্য—কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গন। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের আধিপত্য লাভের জন্য একই রাজবংশের দুইটি শাখা—কুরু ও পাণ্ডব যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। পাণ্ডবদের ছিল রাজ্যে ন্যায়সঙ্গত অধিকার, কৌরবদের ছিল বাহুবল। পাণ্ডবদের পাঁচ ভ্রাতা এতদিন বনে বাস করিতেছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁহাদের সখা। কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে সূচ্যগ্র মেদিনী দিতেও রাজী হইল না।

গীতায় প্রথম দৃশ্যটি যুদ্ধক্ষেত্রের। উভয় দিকে আছেন আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতিবন্ধুরা—এক পক্ষে কৌরব-ভ্রাতৃগণ, অপর পক্ষে পাণ্ডবেরা। একদিকে পিতামহ ভীষ্ম, অন্যদিকে পৌত্রগণ। বিপক্ষদলে তাঁহার জ্ঞাতি বন্ধু ও আত্মীয়দের দেখিয়া, তাহাদিগকে বধ করিবার কথা চিন্তা করিয়া অর্জুন বিমর্ষ হইলেন এবং অস্ত্রত্যাগ করাই স্থির করিলেন। বস্তুতঃ এইখানেই গীতার আরম্ভ।

পৃথিবীতে আমাদের সকলেরই জীবন এক বিরামহীন সংগ্রাম। অনেক সময় আমরা আমাদের দুর্বলতা ও কাপুরুষতাকে ক্ষমা ও ত্যাগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাই। কিন্তু ভিক্ষুকের ত্যাগে কোন কৃতিত্ব নাই। আঘাত করিতে সমর্থ কোন মানুষ যদি সহিয়া যায়, তবে তাহাতে কৃতিত্ব আছে; যাহার কিছু আছে, সে যদি ত্যাগ করে, তবে তাহাতে মহত্ত্ব আছে। আমরা তো জানি আমাদের জীবনেই কতবার আমরা আলস্য ও ভীরুতার জন্য সংগ্রাম ত্যাগ করিয়াছি, আর আমরা সাহসী—এই মিথ্যা বিশ্বাসে নিজেদের মনকে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

'হে ভারত (অর্জুন), ওঠ, হৃদয়ের এই দুর্বলতা ত্যাগ কর, ত্যাগ কর এই নির্বীর্যতা! উঠিয়া দাঁড়াও, সংগ্রাম কর।'[১]—এই তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোকটি দ্বারাই

---

১ গীতা, ২।৩

গীতার স্থচনা। যুক্তিতর্ক করিতে গিয়া অর্জুন উচ্চতর নৈতিক ধারণার প্রসঙ্গ আনিলেন: প্রতিরোধ করা অপেক্ষা প্রতিরোধ না করা কত ভাল, ইত্যাদি। তিনি নিজেকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিনি কৃষ্ণকে ভুল বুঝাইতে পারিলেন না। কৃষ্ণ পরমাত্মা, স্বয়ং ভগবান্। তিনি অবিলম্বেই অর্জুনের যুক্তির আসল রূপ ধরিয়া ফেলিলেন—ইহা দুর্বলতা। অর্জুন নিজের আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়া অস্ত্রাঘাত করিতে পারিতেছেন না।

অর্জুনের হৃদয়ে কর্তব্য আর মায়ার দ্বন্দ্ব। আমরা যতই পক্ষিস্থলভ মমতার নিকটবর্তী হই, ততই ভাবাবেগে নিমজ্জিত হই। ইহাকে আমরা ভালবাসা বলি। আসলে ইহা আত্ম-সম্মোহন। জীবজন্তুর মতো আমরাও আবেগের অধীন। বৎসের জন্য গাভী প্রাণ দিতে পারে—প্রত্যেকটি জীবই পারে। তাহাতে কি? অন্ধ পক্ষিস্থলভ ভাবাবেগ পূর্ণত্বে লইয়া যাইতে পারে না। অনন্তচৈতন্যলাভই মানবের লক্ষ্য। সেখানে আবেগের স্থান নাই, ভাবালুতার স্থান নাই, ইন্দ্রিয়গত কোন কিছুর স্থান নাই; সেখানে কেবল বিশুদ্ধ বিচারের আলো, সেখানে মানুষ আত্মস্বরূপে দণ্ডায়মান।

অর্জুন এখন আবেগের অধীন। তাঁহার যাহা হওয়া উচিত, তিনি তাহা নন, প্রজ্ঞার অনন্ত আলোকে কর্মরত আত্ম-নিয়ন্ত্রিত জ্ঞানী ঋষি হইতে হইবে। হৃদয়ের তাড়নায় মস্তিষ্ককে বিচলিত করিয়া, নিজেকে ভ্রান্ত করিয়া, 'মমতা' প্রভৃতি স্থন্দর আখ্যায় নিজের দুর্বলতাকে আবৃত করিবার চেষ্টা করিয়া তিনি শিশুর মতো হইয়াছেন, পশুর মতো হইয়াছেন। কৃষ্ণ তাহা দেখিতেছেন। অর্জুন সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মতো কথা বলিতেছেন, বহু যুক্তির অবতারণা করিতেছেন; কিন্তু তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অজ্ঞের কথা।

'জ্ঞানী ব্যক্তি জীবিত বা মৃত কাহারও জন্যই শোক প্রকাশ করেন না।[১] তুমি মরিতে পার না; আমিও না। এমন সময় কখনও ছিল না, যখন আমরা ছিলাম না। এমন সময় কখনও আসিবে না, যখন আমরা থাকিব না। ইহজীবনে মানুষ যেমন শৈশবাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে যৌবন ও বার্ধক্য অতিক্রম করে, তেমনি মৃত্যুতে সে দেহান্তর গ্রহণ করে মাত্র। জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাতে মুহ্যমান হইবে কেন?[২] এই যে

১ গীতা, ২।১১ ২ গীতা, ১২-১৩

আবেগপ্রবণতা তোমায় পাইয়া বসিয়াছে, ইহার মূল কোথায়? ইন্দ্রিয়গ্রামে। 'শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ সকলের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়স্পর্শ হইতেই অনুভূত হয়। তাহারা আসে এবং যায়।'[১] এইক্ষণে মানুষ দুঃখী, আবার পরক্ষণেই সুখী। এরূপ অবস্থায় সে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না।

'যাহা চিরকাল আছে (সৎ), তাহা নাই—এরূপ হইতে পারে না; আবার যাহা কখনও নাই (অসৎ), তাহা আছে—এরূপও হইতে পারে না। সুতরাং যাহা এই সমগ্র বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে, তাহা আদি-অন্তহীন অবিনাশী বলিয়া জানিবে। এই বিশ্বে এমন কিছুই নাই যাহা অপরিবর্তনীয় আত্মাকে পরিবর্তিত করিতে পারে। এই দেহের আদি ও অন্ত আছে, কিন্তু যিনি দেহের মধ্যে বাস করেন, তিনি অনাদি ও অবিনশ্বর।'[২]

ইহা জানিয়া মোহ ত্যাগ কর এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, পশ্চাৎপদ হইও না,—ইহাই আদর্শ। ফল যাহাই হউক, কর্ম করিয়া যাও। নক্ষত্রগণ কক্ষচ্যুত হইতে পারে, সমগ্র জগৎ আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। মৃত্যু তো শুধু দেহান্তরপ্রাপ্তি মাত্র! যুদ্ধ করিতে হইবে। ভীরুতা ও কাপুরুষতার দ্বারা কিছুই লাভ করা যায় না। পশ্চাদপসরণের দ্বারা কোন বিপদ দূর করা যায় না। দেবতাদের নিকট তোমরা অহরহ আকুল প্রার্থনা করিতেছ, তাহাতে কি তোমাদের দুঃখ দূর হইয়াছে? ভারতের জনসাধারণ ষাটকোটি দেবতার কাছে কান্নাকাটি করা সত্ত্বেও কুকুর-বিড়ালের মতো দলে দলে মরিতেছে। দেবতারা কোথায়? তাঁহারা তখনই আগাইয়া আসেন, যখন তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারো। দেবতাদের কি প্রয়োজন?

কুসংস্কারের কাছে এই নতিস্বীকার করা, নিজের মনের খেয়ালের কাছে নিজেকে বিকাইয়া দেওয়া তোমার শোভা পায় না। হে পার্থ! তুমি অনন্ত, অবিনশ্বর; তোমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। অনন্তশক্তিশালী আত্মা তুমি; ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার তোমায় শোভা পায় না। ওঠ, জাগো, দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর। যদি মৃত্যু হয় হউক। সাহায্য করিবার কেহ নাই। তুমিই তো জগৎ। কে তোমায় সাহায্য করিতে পারে? 'জীবগণের অস্তিত্ব

---

১ গীতা, ২।১৪ ২ গীতা, ২।১৬

শরীর উৎপত্তির পূর্বে এবং মৃত্যুর পরে অব্যক্ত থাকে। শুধু মাঝখানের স্থিতিকালটুকু ব্যক্ত। কাজেই তাহাতে শোকের কারণ কিছুই নাই।'[১]

'কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে দেখেন, কেহ ইহাকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন, অপর কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে শ্রবণ করেন, আবার অনেকে শুনিয়াও ইহাকে জানিতে পারেন না।'[২]

কিন্তু এই আত্মীয়স্বজনকে বধ করা যে পাপ—একথা বলার তোমার অধিকার নাই; কারণ তুমি ক্ষত্রিয় এবং বর্ণাশ্রম-অনুযায়ী যুদ্ধ করাই তোমার স্বধর্ম। ...'সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও।'[৩]

এখানে গীতার অন্য একটি বিশেষ মতবাদের সূচনা করা হইতেছে—অনাসক্তির উপদেশ। অর্থাৎ আমরা কার্যে আসক্ত হই বলিয়া আমাদের কর্মফল ভোগ করিতে হয়। ...'কেবল যোগযুক্ত হইয়া কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করিলে কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়।'[৪] সমস্ত বিপদ তুমি অতিক্রম করিতে পারিবে। 'এই নিষ্কাম কর্মযোগের অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করিয়া মানব জন্মমরণরূপ সংসারের ভীষণ আবর্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।'[৫]

'হে অর্জুন, কেবলমাত্র নিশ্চয়াত্মিকা একনিষ্ঠ বুদ্ধি সফলকাম হয়। অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিগণের মন সহস্র বিষয়ে নিবিষ্ট হওয়ায় শক্তির অপচয় ঘটে। অবিবেকীরা বেদোক্ত কর্মে অনুরক্ত; স্বর্গাদি ফলের জনক বেদের কর্ম-কাণ্ডের বাহিরে কিছু আছে, এ কথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। কারণ তাঁহারা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের সাহায্যে ভোগসুখ ও স্বর্গলাভ করিতে চান এবং সেজন্য যজ্ঞাদি করেন।'[৬] 'এই সকল লোক যতক্ষণ না বৈষয়িক ভোগ-সুখের প্রত্যাশা ত্যাগ করেন, ততক্ষণ তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সাফল্য আসিতে পারে না।'

ইহাও গীতার আর একটি মহান্ উপদেশ। বিষয়ের ভোগসুখ যতক্ষণ না পরিত্যক্ত হয়, ততক্ষণ আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হয় না। ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে সুখ কোথায়? ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের ভ্রম সৃষ্টি করে মাত্র। মানুষ

---

১ গীতা—২।২৮
২ ঐ—২।২৯
৩ ঐ—২।৩৮
৪ গীতা—২।৩৯
৫ ঐ—২।৪০
৬ ঐ—২।৪১-৪৩

মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকেও একজোড়া চক্ষু ও একটি নাসিকার কামনা করে। অনেকের কল্পনা—এ জগতে যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে, স্বর্গে গিয়া তদপেক্ষা বেশীসংখ্যক ইন্দ্রিয় পাওয়া যাইবে। অনন্ত কাল ধরিয়া সিংহাসনে আসীন ভগবান্‌কে—ভগবানের পার্থিব দেহকে তাঁহারা দেখিতে চান। এইসকল লোকের বাসনা—শরীরের জন্য, শরীরের ভোগসুখের জন্য, খাদ্য ও পানীয়ের জন্য। স্বর্গ তাহাদের নিকট পার্থিব জীবনের বিস্তারমাত্র। মানুষ ইহ-জীবনের অতিরিক্ত কিছু চিন্তা করিতে পারে না: এই শরীরকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের জীবনের সব-কিছু। 'মুক্তিপ্রদ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এই শ্রেণীর মানবের নিকট একান্ত দুর্লভ।'[১]

'বেদ সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক বিষয়গুলি শিক্ষা দেয়।' বেদ কেবল প্রকৃতির অন্তর্গত বিষয়গুলি শিক্ষা দেয়। পৃথিবীতে যাহা দেখা যায় না, লোকে তাহা ভাবিতে পারে না। স্বর্গ লইয়া কথা বলিতে গেলে, তাহাদের মনে জাগে—সিংহাসনে একজন রাজা বসিয়া আছেন, আর লোকে তাঁহার নিকট ধূপ জ্বালাইতেছে। সবই প্রকৃতি; প্রকৃতির বাহিরে কিছুই নাই। কাজেই বেদ প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কিছু শিক্ষা দেয় না। 'এই প্রকৃতির পারে যাও; অস্তিত্বের এই দ্বৈত-ভাবের পারে যাও; তোমার ব্যক্তিগত চেতনার পারে যাও; কোন কিছুকে গ্রাহ্য করিও না, মঙ্গল বা অমঙ্গলের দিকে তাকাইও না।'[২]

আমরা নিজেদিগকে দেহের সহিত অভিন্নভাবে দেখিতেছি। আমরা দেহমাত্র, অথবা দেহটি আমাদের, আমার দেহে চিমটি কাটিলে আমি চীৎকার করি। এ-সকলই অর্থশূন্য, কারণ আমি আত্মস্বরূপ। দেহকে আত্মার সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করার জন্যই এই দুঃখ-শোক কল্পনা, প্রাণী দেবতা দানব, এই বিশ্বজগৎ—প্রত্যেকটি জিনিস আসিয়া পড়িয়াছে। আমি চৈতন্য-স্বরূপ। তুমি চিমটি কাটিলে আমি কেন লাফাইয়া উঠিব?...এই দাসত্ব লক্ষ্য কর। তুমি লজ্জিত হইতেছ না? আমরা নাকি ধার্মিক! আমরা নাকি দার্শনিক! আমরা নাকি ঋষি! ভগবান্ মঙ্গল করুন—আমরা কী? জীবন্ত নরক বলিতে যাহা বুঝায়, আমরা তাহাই। পাগল বলিতে যাহা বুঝায়, আমরা তাহাই।

---

১ গীতা—২।৪৫ ২ ঐ—২।৪৪

আমরা আমাদের শরীরের 'ধারণা' ছাড়িতে পারি না। আমরা পৃথিবীতেই বদ্ধ আছি। এই সংস্কারগুলিই আমাদের বন্ধন। যখন আমরা শরীর ছাড়িয়া যাই, তখন এই-জাতীয় সহস্র সংস্কারের বন্ধনে বাঁধা পড়ি।

একেবারে আসক্তিশূন্য হইয়া কে কাজ করিতে পারে? ইহাই প্রকৃত প্রশ্ন। ঐরূপ (আসক্তিশূন্য) ব্যক্তির নিকট কর্মের সফলতা ও বিফলতা সমান কথা। যদি সারা জীবনের কর্ম একমুহূর্তে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, তাহা হইলেও ঐ ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড একবারের জন্য বৃথা স্পন্দিত হয় না। 'ফলের কথা চিন্তা না করিয়া যিনি কর্মের জন্য কর্ম করিয়া যান, তিনিই যোগী। এইভাবে তিনি জন্মমৃত্যুর যন্ত্রণাকে অতিক্রম করেন; এইভাবে তিনি মুক্ত হন।'[১] তখন তিনি দেখিতে পান যে, সকল প্রকার আসক্তিই মিথ্যা মায়া। আত্মা কখনও আসক্ত হইতে পারেন না।...তারপর তিনি সকল শাস্ত্র ও দর্শনের পারে গমন করেন।'

গ্রন্থ ও শাস্ত্রের দ্বারা যদি মন বিভ্রান্ত হয়, এক মহা আবর্তের মধ্যে আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এইসব শাস্ত্রের সার্থকতা কি? কোন শাস্ত্র এই প্রকার বলে, অন্যটি আর এক প্রকার বলে। কোন্ গ্রন্থ অবলম্বন করিবে? একাকী দণ্ডায়মান হও। নিজের আত্মার মহিমা দেখ! তোমায় কর্ম করিতে হইবে, তবেই তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবে।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কে?' 'যিনি সকল বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন; কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, এমনকি এই জীবনও নয়, স্বাধীনতা নয়, দেবতা নয়, কর্ম নয়, কোন কিছুই নয়; যখন তিনি পরিতৃপ্ত, তখন আর অধিক কিছু চাহিবার তাঁহার নাই।'[২] তিনি আত্মার মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং নিজের মধ্যে সংসার দেবতা স্বর্গ—সকলই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তখন দেবতারা আর দেবতা থাকেন না, মৃত্যু আর মৃত্যু থাকে না, জীবন আর জীবন থাকে না। প্রত্যেকটি জিনিসই পরিবর্তিত হইয়া যায়। 'যদি কাহারও ইচ্ছা দৃঢ় হয়, তাঁহার মন যদি দুঃখে বিচলিত না হয়, যদি তিনি কোন প্রকার সুখের আকাঙ্ক্ষা না করেন, যদি তিনি সকল প্রকার আসক্তি, সকল প্রকার ভয়, সকল প্রকার ক্রোধ হইতে মুক্ত হন, তবে তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।'[৩]

---

১ গীতা—২।৫১ ২ ঐ—২।৫৫ ৩ ঐ—২।৫৬

'কচ্ছপ যেমন করিয়া তাহার পাগুলিকে অভ্যন্তরে টানিয়া লয়, তাহাকে আঘাত করিলে একটি পা-ও বাহিরে আসে না, ঠিক তেমনি যোগী তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলিকে অভ্যন্তরে টানিয়া লইতে পারেন।'[১] কোন কিছুই ঐ (ইন্দ্রিয়)-গুলিকে জোর করিয়া বাহিরে আনিতে পারে না। কোন প্রলোভন বা কোন কিছুই তাঁহাকে টলাইতে পারে না। সারা বিশ্ব তাঁহার চতুর্দিকে চূর্ণ হইয়া যাক, উহা তাঁহার মনে একটি তরঙ্গও সৃষ্টি করিবে না।

অতঃপর একটি অতিপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। অনেক সময় লোকে বহুদিন ধরিয়া উপবাস করে,...কোন নিকৃষ্ট ব্যক্তি কুড়ি দিন উপবাস করিলে বেশ শান্তও হইয়া উঠে। এই উপবাস আর আত্মপীড়ন—সারা পৃথিবীর লোক করিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণের ধারণায় এইসব অর্থশূন্য। তিনি বলেন: যে মানুষ নিজের উপর উৎপীড়ন করে, তাহার নিকট হইতে ইন্দ্রিয়গুলি কিছুকালের জন্য নিবৃত্ত হয়, কিন্তু বিশগুণ অধিক শক্তি লইয়া পুনঃপ্রকাশিত হয়। তখন তুমি কি করিবে? ভাবখানা এই যে, স্বাভাবিক হইতে হইবে। কৃচ্ছ্রসাধন নহে। অগ্রসর হও, কর্ম কর, কেবল দৃষ্টি রাখিও যেন আসক্ত হইয়া না পড়। যে ব্যক্তি অনাসক্তির কৌশল জানে না বা তাহার সাধনা করে না, তাহার প্রজ্ঞা কখনও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

আমি বাহিরে গিয়া চোখ মেলিলাম, যদি কিছু থাকে, আমি অবশ্যই দেখিতে পাইব, না দেখিয়া পারি না। মন ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে ধাবিত হয়। এখন ইন্দ্রিয়গুলিকে যে-কোন প্রকার প্রকৃতি-জাত প্রতিক্রিয়া বর্জন করিতে হইবে।

'যাহা সংসারের নিকট অন্ধকার রাত্রি, সংযমী পুরুষ তাহাতে জাগরিত থাকেন। ইহা তাঁহার নিকট দিবালোক। আর যে বিষয়ে সারা সংসার জাগ্রত, তাহাতে সংযমী নিদ্রিত।'[২] এই সংসার কোথায় জাগ্রত?—ইন্দ্রিয়ে। মানুষ চায় ভোজন, পান আর সন্তান; তারপর কুকুরের মতো মরে।...কেবল ইন্দ্রিয়-ব্যাপারেই তাহারা সর্বদা জাগ্রত। তাহাদের ধর্মও ঐজন্যই। তাহারা আরও কামিনী, আরও কাঞ্চন, আরও সন্তান লাভের জন্য একটি ভগবান

---

১ গীতা—২।৫৮ ২ ঐ—২।৬৯

আবিষ্কার করিয়াছে। অধিকতর দেবত্বলাভে সাহায্য করিবার জন্য ভগবানকে চায় নাই।

'যেখানে সারা জগৎ জাগ্রত, সেখানে যোগী নিদ্রিত, যেখানে অজ্ঞেরা নিদ্রিত, যোগী সেখানে জাগ্রত;' সেই আলোকের রাজ্যে—যেখানে মানুষ নিজেকে পাখির মতো, পশুর মতো শরীর মাত্র বলিয়া দেখে না,—দেখে অনন্ত মৃত্যুহীন অমর আত্মারূপে। এখানে অজ্ঞেরা সুপ্ত; তাহাদের বুঝিবার সময় নাই, বুদ্ধি নাই, সাধ্য নাই। সেখানে কেবল যোগীই জাগ্রত থাকেন, তাহাই তাঁহার নিকট দিবালোক।

'পৃথিবীর নদীগুলি অবিরত তাহাদের জলরাশি সমুদ্রে ঢালিতেছে, কিন্তু সমুদ্রের সুন্দর গম্ভীর প্রকৃতি অবিচলিত, অপরিবর্তিতই থাকে। তেমনি ইন্দ্রিয়গুলি একযোগে প্রকৃতির সকল সংবেদন আনিলেও জ্ঞানীর হৃদয় কোন-প্রকার বিক্ষেপ বা ভয়ের কথা ভাবিতে পারে না।'[১] লক্ষ লক্ষ স্রোতে দুঃখ আসুক, শত শত স্রোতে সুখ আসুক! আমি দুঃখের অধীন নই—আমি সুখেরও ক্রীতদাস নই।

১ গীতা—২।৭০

গীতা—৩

(১৯০০ খৃঃ ২৯শে মে স্যান ফ্র্যান্সিস্কোতে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপি)

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনি আমাকে কর্মের উপদেশ দিতেছেন, অথচ ব্রহ্মজ্ঞানকে জীবনের উচ্চতম অবস্থা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। হে কৃষ্ণ, যদি জ্ঞানকে কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তবে কর্মের উপদেশ দিতেছেন কেন?[১]

শ্রীকৃষ্ণ: অতি প্রাচীনকাল হইতে দুইটি সাধনপথ প্রচলিত আছে। জ্ঞানানুরাগী দার্শনিকগণ জ্ঞানযোগের এবং নিষ্কামকর্মিগণ কর্মযোগের কথা বলেন। কিন্তু কর্ম ত্যাগ করিয়া কেহ শান্তি লাভ করিতে পারে না। এ জীবনে কর্ম বন্ধ করিয়া থাকা মুহূর্তমাত্র সম্ভব নয়। প্রকৃতির গুণগুলিই মানুষকে কর্ম করিতে বাধ্য করে। যে ব্যক্তি বাহ্য কর্ম বন্ধ করিয়া মনে মনে কর্মের কথা চিন্তা করে, সে কিছুই লাভ করিতে পারে না। সে মিথ্যাচারী হইয়া যায়। কিন্তু যিনি মনের শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে ধীরে ধীরে বশীভূত করিয়া কর্মে নিযুক্ত করেন, তিনি পূর্বোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি কর্ম কর।[২]

'যদি তুমি এ রহস্য বুঝিয়া থাকো যে, তোমার কোন কর্তব্য নাই—তুমি মুক্ত, তথাপি অপরের কল্যাণের জন্য তোমাকে কর্ম করিতে হইবে। কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা আচরণ করেন, সাধারণ লোকে তাহাই অনুসরণ করে।[৩]

'পরা শান্তির অধিকারী মুক্ত মহাপুরুষ যদি কর্মত্যাগ করেন, তবে যাহারা সেই জ্ঞান ও শান্তি লাভ করে নাই, তাহারা মহাপুরুষকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিবে এবং তাহাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইবে।

'হে পার্থ, ত্রিভুবনে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি আমি সর্বদা কর্মে ব্যাপৃত আছি। যদি আমি মুহূর্তের জন্য কর্ম না করি, তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যাইবে।'[৪]

---

১ গীতা—৩।১

২ ঐ—৩।২-৮

৩ ঐ—৩।২০-২১

৪ ঐ—৩।২২-২৪

'অজ্ঞ ব্যক্তিরা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যেরূপ কর্ম করে, জ্ঞানিগণকে অনাসক্ত ভাবে এবং কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া সেইরূপ কর্ম করিতে হইবে।'[১]

আপনি যদি জ্ঞানের অধিকারীও হন, তবু অজ্ঞান ব্যক্তিদের বালসুলভ বিশ্বাসকে বিভ্রান্ত করিবেন না। পরন্তু তাহাদের স্তরে নামিয়া আসিয়া তাহাদিগকে ক্রমশঃ উন্নত করিবার চেষ্টা করুন।—ইহা একটি অতিশয় শক্তিশালী ভাব, এবং ভারতে ইহাই আদর্শ হইয়া গিয়াছে। তাই দেখা যায়, ভারতবর্ষে জ্ঞানী মহাপুরুষগণ মন্দিরে যান, প্রতিমাপূজাও করেন,—ইহা কপটতা নয়।

গীতার পরবর্তী অধ্যায়ে পড়ি, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন: যাঁহারা ভক্তিপূর্বক অন্যান্য দেবতার পূজা করেন, তাঁহারা বস্তুতঃ আমারই পূজা করেন।[২] এই ভাবে মানুষ সাক্ষাৎ ভগবানেরই পূজা করিতেছে। ভগবানকে ভুল নামে ডাকিলে কি তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন? যদি ক্রুদ্ধ হন, তবে তিনি ভগবান নন। এ কথা কি বুঝিতে পার না, মানুষের হৃদয়ে যাহা আছে, তাহাই ভগবান্? —যদিও ভক্ত শিলাখণ্ড পূজা করিতেছে, তাহাতে কি আসে যায়?

ধর্ম কতকগুলি মতবাদের সমষ্টি—এই ধারণা হইতে যদি আমরা একবার মুক্ত হইতে পারি, তবেই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। ধর্মের একটি ধারণা: আদি মানব আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছিলেন বলিয়াই পৃথিবীর সৃষ্টি,—আর পলাইবার পথ নাই। যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করুন—অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুতে বিশ্বাস করুন! কিন্তু ভারতে ধর্মের ধারণা অন্যরূপ। সেখানে ধর্ম মানে অনুভূতি, উপলব্ধি; অন্য কিছু নয়। চার ঘোড়ার জুড়িগাড়িতে, বৈদ্যুতিক শকটে অথবা পদব্রজে—কিভাবে লক্ষ্যে পৌঁছিলেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। উদ্দেশ্য এক। খ্রীষ্টানদের পক্ষে সমস্যা—কিভাবে সেই ভীষণ ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে। ভারতীয়দের সমস্যা—নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করা এবং নিজেদের হারানো আত্মভাবকে ফিরিয়া পাওয়া।

আপনি কি উপলব্ধি করিয়াছেন—আপনি আত্মা? যদি বলেন—'হাঁ', তবে 'আত্মা' বলিতে আপনি কি বোঝেন? আত্মা কি এই দেহ-নামক

---

১ গীতা—৩।২৫ ২ ঐ—৯।২৩

মাংসপিণ্ড, অথবা অনাদি অনন্ত চিরশান্ত জ্যোতির্ময় অমৃতত্ব? আপনি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হইতে পারেন, কিন্তু যতক্ষণ আপনি নিজেকে এই দেহ মনে করিতেছেন, ততক্ষণ আপনি আপনার পায়ের নীচের ঐ ক্ষুদ্র কীটের সমান। এ অপরাধের মার্জনা নাই, আপনার অবস্থা আরও শোচনীয়; কারণ আপনি দর্শনশাস্ত্র সবই জানেন, অথচ দেহবোধ হইতে ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিতেছেন না। শরীরই আপনার ভগবান—ইহাই আপনার পরিচয়! ইহা কি ধর্ম?

আত্মাকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করাই ধর্ম। আমরা কি করিতেছি? ঠিক ইহার বিপরীত। আত্মাকে জড়বস্তুরূপে অনুভব করিতেছি! অমৃতস্বরূপ ঈশ্বর হইতে আমরা মৃত্যু ও জড়বস্তু নির্মাণ করি, এবং প্রাণহীন জড়বস্তু হইতে চেতন আত্মা 'সৃষ্টি' করি!

ঊর্ধ্ববাহু ও হেটমুণ্ড হইয়া কঠোর তপস্যা দ্বারা অথবা ত্রিমুণ্ডধারী পাঁচ হাজার দেবতার আরাধনা দ্বারা যদি ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধি করা সম্ভব হয়, তবে সানন্দে ঐগুলিকে গ্রহণ করুন। যেভাবেই হউক, আত্মজ্ঞান লাভ করুন। এ বিষয়ে কোন সমালোচনার অধিকার কাহারও নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন: যদি তোমার সাধন-পদ্ধতি উচ্চতর ও উন্নততর হয় এবং অপরের পদ্ধতি খুব খারাপ বলিয়াই মনে হয়, তথাপি তাহার নিন্দা করিবার কোন অধিকার তোমার নাই।

ধর্ম কতকগুলি অর্থহীন শব্দের সমষ্টি নয়, পরন্তু ধর্মকে ক্রমবিকাশ বলিয়া মনে করিতে হইবে। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে এক বিশিষ্ট ব্যক্তির ঈশ্বর-দর্শন হইয়াছিল; মুশাও (Moses) দাবাগ্নির মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিয়াছিলেন। মুশা ঈশ্বর দর্শন করিয়া যাহা করিয়াছেন, তাহাতে কি আপনাদের পরিত্রাণ হইয়াছে? অপরের ঈশ্বরদর্শনের কথা আপনাদের মধ্যে প্রেরণা দিয়া ঈশ্বর-দর্শন করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে পারে, এতদ্ব্যতীত আর এতটুকু সাহায্য করিতে পারে না। পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণের দৃষ্টান্তগুলির ইহাই মূল্য, আর বেশী কিছু নয়। সাধনার পথে এগুলি নির্দেশক-স্তম্ভ মাত্র। একজন আহার করিলে যেমন অপরের ক্ষুধা দূর হয় না, তেমনি একজনের ঈশ্বরদর্শনে অপরের মুক্তি হয় না। নিজেকেই ঈশ্বরদর্শন করিতে হইবে। ভগবানের প্রকৃতি কি, তাঁহার একটি শরীরে তিনটি মাথা অথবা ছয়টি দেহে পাঁচটি মাথা—এইরূপ অর্থহীন কলহেই এইসকল লোক প্রবৃত্ত হয়। আপনি কি ঈশ্বরদর্শন

করিয়াছেন? না।…এবং লোকে বিশ্বাস করে না যে, তাহারা কখনও ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারে। মর্ত্যের মানুষ আমরা কি নির্বোধ! নিশ্চয়ই;—পাগলও বটে!

ভারতবর্ষে এই ঐতিহ্য চলিয়া আসিতেছে—যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে তিনি অবশ্যই আপনারও ঈশ্বর, আমারও ঈশ্বর। সূর্য কাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি? আপনারা বলেন, স্যাম্ খুড়ো সকলেরই খুড়ো। যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে নিশ্চয়ই আপনি তাঁহাকে দেখিতে পারেন, নতুবা সেরূপ ঈশ্বরের চিন্তাই করিবেন না।

প্রত্যেকে মনে করেন, তাঁহার পথই শ্রেষ্ঠ পথ। খুব ভাল! কিন্তু মনে রাখিবেন—ইহা আপনার পক্ষেই ভাল হইতে পারে। একই খাদ্য যাহা একজনের পক্ষে দুষ্পাচ্য, অপরের পক্ষে তাহা সুপাচ্য। যেহেতু ইহা আপনার পক্ষে ভাল, অতএব আপনার পদ্ধতিই প্রত্যেকের অবলম্বনীয়—সহসা এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন না। জ্যাকের কোট সব সময় জন বা মেরীর গায়ে না-ও লাগিতে পারে। যাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা নাই, যাহারা চিন্তা করে না—এরূপ নরনারীকে জোর করিয়া এই রকম একটা ধরাবাঁধা ধর্মবিশ্বাসের ভিতর ঢুকাইয়া দেওয়া হয়! স্বাধীনভাবে চিন্তা করুন; বরং নাস্তিক বা জড়বাদী হওয়াও ভাল, তবু বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার করুন! এ ব্যক্তির পদ্ধতি ভুল—এ কথা বলিবার কি অধিকার আপনার আছে? আপনার নিকট ইহা ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু ইহার নিন্দা করিবার অধিকার আপনার নাই। অর্থাৎ এই মত অবলম্বন করিলে আপনার অবনতি হইবে; কিন্তু এ কথা বলা যায় না যে, ঐ ব্যক্তিও অবনত হইবে। তাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ: যদি তুমি জ্ঞানী হও, তবে একজনের দুর্বলতা দেখিয়া তাহাকে মন্দ বলিও না।

যদি পারো তাহার স্তরে নামিয়া তাহাকে সাহায্য কর। ক্রমে ক্রমে তাহাকে উন্নত হইতে হইবে। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আমি হয়তো তাহার মগজে পাঁচ ঝুড়ি তথ্য সরবরাহ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে তাহার কী ভাল হইবে? পূর্বাপেক্ষা হয়তো তাহার অবস্থা একটু খারাপই হইবে।

কর্মের এই বন্ধন কোথা হইতে আসে? আমরা আত্মাকে কর্মদ্বারা শৃঙ্খলিত করি। আমাদের ভারতীয় মতে সত্তার দুইটি দিক—একদিকে প্রকৃতি, অন্যদিকে আত্মা। প্রকৃতি বলিতে শুধু বহির্জগতের বস্তুসমূহ

বোঝায় না; আমাদের শরীর মন বুদ্ধি—এমন কি 'অহংকার' পর্যন্ত এই প্রকৃতির অন্তর্গত। অনন্ত জ্যোতির্ময় শাশ্বত আত্মা এই সকলের ঊর্ধ্বে। এই মতে আত্মা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, আত্মা চিরকাল ছিলেন এবং চিরকাল থাকিবেন।...কোন সময়েই আত্মাকে মনবুদ্ধির সহিতও অভিন্নরূপে গণ্য করা যায় না...[দেহের সঙ্গে তো দূরের কথা]।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, আমাদের ভুক্ত খাদ্যই চিরকাল মন সৃষ্টি করিতেছে; মন জড়পদার্থ। আত্মার সহিত খাদ্যের কোন সম্পর্ক নাই। খাওয়া বা না খাওয়া, চিন্তা করা বা না করা...তাহাতে আত্মার কিছু আসে যায় না। আত্মা অনন্ত জ্যোতিঃস্বরূপ। এই জ্যোতি চিরকাল সমভাবে থাকে। আলোর সম্মুখে নীল বা সবুজ—যে কাঁচ দিয়াই দেখ না কেন, তাহাতে আলোর কিছু আসে যায় না; মূল আলোর রঙ অপরিবর্তনীয়। মনই বিভিন্ন পরিবর্তন আনে—নানা রঙ দেখায়। আত্মা যখন এই দেহ ত্যাগ করে, তখন এ-সবই টুকুরা টুকুরা হইয়া যায়।

প্রকৃতিরও প্রকৃত স্বরূপ আত্মা। সৎস্বরূপ আত্মাই জীবাত্মারূপে [আমাদের শরীর-মনের মধ্য দিয়া] চলা ফেরা করে, কথা বলে এবং সব কিছু কর্ম করে। জীবাত্মার শক্তি মন-বুদ্ধি ও প্রাণই জড়ের দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হইতেছে। যদিও চেতন আত্মা আমাদের চিন্তা, শারীরিক কর্ম ও সব-কিছুর কারণ, যদিও আত্মার জ্যোতি সর্বত্র প্রতিফলিত, তথাপি ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ শীত-উষ্ণ প্রভৃতি প্রকৃতিগত যাবতীয় দ্বন্দ্ব ও দ্বৈতভাব আত্মাকে স্পর্শ করে না।

'হে অর্জুন, এই সমস্ত ক্রিয়া প্রকৃতির অন্তর্গত। আমাদের শরীর-মনের মধ্য দিয়া প্রকৃতি তাহার নিয়মানুসারে কাজ করিয়া চলিতেছে। আমরা প্রকৃতির সহিত নিজদিগকে অভিন্ন মনে করিয়া বলিতেছি—আমি এই সকল কর্মের কর্তা। এইভাবে আমরা ভ্রান্তির কবলে পড়ি।'[১]

কোন না কোন কিছুর বাধ্য হইয়াই আমরা কর্ম করি। ক্ষুধা বাধ্য করে, তাই আমি খাই। দুঃখভোগ হীনতর দাসত্ব। প্রকৃত 'আমি' (আত্মা) চিরদিন মুক্ত। কে তাহাকে কর্মে বাধ্য করিতে পারে? কারণ

---

১ গীতা—৩।২৭

সুখদুঃখের ভোক্তা তো প্রকৃতির অন্তর্গত। যখন আমরা দেহের সহিত নিজেকে অভিন্ন বলিয়া ভাবি, তখনই বলি, 'আমি অমুক, আমি এই দুঃখভোগ করিতেছি। এইরূপ যত বাজে কথা।' কিন্তু যিনি সত্যকে জানিয়াছেন, তিনি নিজেকে সবকিছু হইতে পৃথক করিয়া রাখেন। তাঁহার শরীর কি করে বা মন কি ভাবে, তাহা তিনি গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু মানব-সমাজের এক বিরাট অংশই ভ্রান্তির বশীভূত; যখনই তাহারা কোন ভাল কাজ করে, তখন নিজেদের ইহার কর্তা বলিয়া মনে করে। তাহারা এখনও উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, তাহাদের বিশ্বাস বিচলিত করিও না। মন্দ ছাড়িয়া তাহারা ভাল কাজ করিতেছে; খুব ভাল, তাই করুক!...তাহারা কল্যাণকর্মী। ক্রমশঃ তাহারা বুঝিবে, ইহা অপেক্ষা আরও গৌরব আছে। তাহারা সাক্ষিমাত্র—কাজ স্বতই হইয়া যায়, ক্রমশঃ তাহারা বুঝিবে। যখন অসৎকর্ম একেবারে ত্যাগ করিয়া কেবল সৎকর্ম করিতে থাকিবে, তখনই তাহারা বুঝিতে আরম্ভ করিবে যে, তাহারা প্রকৃতির ঊর্ধ্বে। তাহারা কর্তা নয়, তাহারা কর্ম হইতে পৃথক, তাহারা সাক্ষিমাত্র। তাহারা শুধু দাঁড়াইয়া দেখে। প্রকৃতি হইতে বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইতেছে।...তাহারা এ-সকল হইতে উপরত। 'হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র সৎস্বরূপই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। সেই সৎ ঈক্ষণ করিলেন এবং জগতের সৃষ্টি হইল।'[১] 'জ্ঞানীও প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া কার্য করে। প্রত্যেকেই প্রকৃতির অনুযায়ী কার্য করে। কেহ প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে পারে না।'[২] অণুও প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে না। কি অন্তর্জগতে, কি বহির্জগতে অণুকেও নিয়ম মানিতেই হইবে। 'বাহিরের সংযমে কি হইবে?'

জীবনে কোন কিছুর মূল্য কিসের দ্বারা নির্ণীত হয়? ভোগসুখ বা ধনসম্পদের দ্বারা নয়। সব জিনিস বিশ্লেষণ করুন। দেখিবেন আমাদের শিক্ষার জন্য অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন কিছুরই মূল্য নাই। অনেক সময় ভোগসুখ অপেক্ষা দুঃখকষ্টই আমাদের আরও ভাল অভিজ্ঞতা দেয়। অনেক সময় সুখাস্বাদ অপেক্ষা আঘাতগুলিই আমাদের জীবনে মহত্তর শিক্ষা দিয়া থাকে। দুর্ভিক্ষেরও একটা মূল্য আছে।

---

১ ছান্দোগ্য উপ.,—৬।২।২-৩ ২ গীতা—৩।৩৩

শ্রীকৃষ্ণের মতে আমরা একেবারে সদ্যোজাত নূতন জীব নই। আমাদের সত্তা পূর্বেও ছিল। আমাদের মনবুদ্ধিও একেবারে নূতন নয়। আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে, প্রত্যেকটি শিশু কেবল অতীত মানব-জীবনের অভিজ্ঞতা নয়, তাহার পূর্ববর্তী উদ্ভিদ্-জীবনের অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতিও সঙ্গে লইয়া আসে। তাহার সংস্কারে অতীত অধ্যায়গুলি সব আছে—বর্তমান অধ্যায় আছে, আর আছে সম্মুখে ভবিষ্যতের অনেকগুলি অধ্যায়। প্রত্যেকের জীবনপথ পূর্ব হইতেই পরিকল্পিত, মানচিত্রে আঁকা রহিয়াছে। এই অন্ধকার সত্ত্বেও কোন ঘটনা বা অবস্থার উদ্ভব কারণ ব্যতীত হইতে পারে না।...অজ্ঞানই ইহার কারণ। কার্যকারণের অন্তহীন শৃঙ্খলে একটির পর একটি শিকলি বাঁধা রহিয়াছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এইরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কার্য ও কারণের বিশ্বব্যাপী এই শৃঙ্খলের একটি শিকলি আপনি ধরিয়াছেন, আমি আর একটি। ঐ শৃঙ্খলের সেই সেই অংশটুকু আমাদের নিজস্ব প্রকৃতি।

এখন শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন : নিজের প্রকৃতিগত পথে চলিতে চলিতে মরাও ভাল। অপরের পথ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিও না।[১] এই আমার নিজের পথ এবং তাহাতেই আমি চলিতেছি। আপনি উপরের পথে চলিতেছেন। নিজের পথ ছাড়িয়া আমি ঐ পথে যাইতে সর্বদা প্রলুব্ধ হইতেছি এবং ভাবিতেছি আপনার সহযাত্রী হইব। যদি আমি ওখানে যাই, তবে আমি 'ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ' হইব। এই সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হইতে হইবে। এ-সবই ক্রমোন্নতির কথা। উন্নতির পথ ধীরে ধীরে। অপেক্ষা করুন, সব পাইবেন। নতুবা পরের পন্থা অবলম্বন করিলে আধ্যাত্মিক জীবনে বিপদ দেখা দিবে। ধর্ম শিক্ষা দিবার এইটি মৌলিক রহস্য।

মানুষের পরিত্রাণ বলিতে আপনারা কি বোঝেন? সকলকে একই ধর্ম-মতে বিশ্বাস করিতে হইবে? কখনই তাহা নয়। অবশ্য এমন কতকগুলি উপদেশ বা আদর্শ আছে, যেগুলি সমগ্র মানবসমাজের পক্ষে প্রযোজ্য। যথার্থ আচার্য আপনার প্রকৃতি এবং কোন্ পথ আপনার পক্ষে শ্রেয়, তাহা বলিয়া দিতে পারেন। আপনি হয়তো নিজের প্রকৃত স্বরূপ জানেন না; আপনারা নিজদিগকে যে সাধনপথের অধিকারী বলিয়া ভাবিতেছেন, তাহা ভুলও

১ গীতা—৩।৩৫

হইতে পারে। এ বিষয়ে এখনও আপনার চেতনা বিকশিত হয় নাই। কিন্তু প্রকৃত আচার্যকে উহা জানিতে হইবে। আপনাকে একবার দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিবেন, আপনি কোন্ পথের অধিকারী, এবং তিনিই আপনাকে সেই পথ ধরাইয়া দিবেন। অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া এধারে ওধারে নানাপ্রকার চেষ্টা করিলেও আমরা এতটুকু অগ্রসর হইতে পারি না। তারপর যথাসময়ে সদ্গুরুর জীবন-প্রবাহে পড়িয়া আমরা দ্রুত অগ্রসর হই। ঈশ্বর-কৃপার নিদর্শন এই যে, অনুকূল স্রোত পাইবার শুভ মুহূর্তে আমরা ভাসিয়া থাকি। তারপর আর সংগ্রাম নাই। সেই পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ঐ পথ ত্যাগ করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করা অপেক্ষা বরং ঐ পথে (চলিতে চলিতেই) মরিতে হইবে।

কিন্তু সাধারণতঃ কি হয়? আমরা একটি ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া কতগুলি ধরাবাঁধা মত স্থাপন করি, মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য ভুলিয়া যাই। সকলকে এক প্রকৃতির মনে করিয়া সেরূপ ব্যবহার করি। কিন্তু দুইটি মানুষের কখনও একই দেহ, একই মন হয় না; ···দুইটি ব্যক্তির ধর্ম বা সাধনপথ কখনও এক হইতে পারে না। যদি ধর্মপথে অগ্রসর হইতে চান, তবে কোন সংগঠিত ধর্মের (organized religion) দ্বারস্থ হইবেন না। ঐগুলি দ্বারা ভাল অপেক্ষা শতগুণ মন্দই হইয়া থাকে, কারণ উহাতে ব্যক্তিগত উন্নতি রুদ্ধ হইয়া যায়। মনোযোগের সহিত সব কিছু দেখুন, কিন্তু নিজের পথে নিষ্ঠা রাখুন। যদি আমার পরামর্শ শোনেন, তবে কোন ফাঁদে পা দিবেন না। যখনই কোন সম্প্রদায় তাহাদের ফাঁস পরাইবার জন্য চেষ্টা করিবে, তখনই নিজেকে সেখান হইতে মুক্ত করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। যেমন মধুকর বহু ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করে, অথচ কোন ফুলে আবদ্ধ হয় না, তেমনই সংগঠিত ধর্মে প্রবেশ করুন, কিন্তু আবদ্ধ হইবেন না। ধর্ম আপনাকে ও আপনার ঈশ্বরকে লইয়া; কোন তৃতীয় ব্যক্তি আপনাদের উভয়ের মধ্যে আসিবে না। একবার ভাবিয়া দেখুন—এই সংগঠিত ধর্মগুলি কী করিয়াছে! কোন্ নেপোলিয়নের অত্যাচার এই সকল ধর্মীয় নির্যাতন অপেক্ষা ভয়ঙ্কর ছিল? যদি আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হই, অমনি অপরকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করি। একজনকে ভালবাসার অর্থ যদি অপরকে ঘৃণা করাই বুঝায়, তার চেয়ে ভাল না বাসাই ভাল। এ ভালবাসা নয়, নরক! যদি নিজের লোকগুলিকে

ভালবাসার অর্থ অপর সকলকে ঘৃণা করা, তবে তাহা নিছক স্বার্থপরতা ও পশুত্ব; ইহার ফলে পশুতে পরিণত হইতে হইবে। অতএব অপরের ধর্ম যতই বড় বলিয়া মনে হউক না কেন, তাহা অবলম্বন করা অপেক্ষা নিজের (গুণগত) ধর্ম পালন করিয়া মরাও শ্রেয়।[১]

'অর্জুন, সাবধান, কাম ও ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ইহাদিগকে সংযত করিতে হইবে। ইহারা বিজ্ঞ ব্যক্তিদের বিবেকও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই কামের অনল দুষ্পূরণীয়। ইন্দ্রিয়সমূহে এবং মনে কামের অধিষ্ঠান। আত্মা কিছুই কামনা করেন না।'[২]

'পুরাকালে এই যোগ আমি সূর্যকে শিখাইয়াছিলাম। সূর্য উহা (রাজর্ষি) মনুকে শিক্ষা দেন।...এইভাবে যোগের জ্ঞান এক রাজা হইতে অন্য রাজায় পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু কালক্রমে যোগের মহৎ শিক্ষা নষ্ট হইয়া যায়। তাই আজ আমি আবার তোমার নিকট তাহা বলিতেছি।'

তখন অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন? আপনি তো সেদিন জন্মিয়াছেন, এবং [সূর্য আপনার বহু পূর্বে জন্মিয়াছেন]—আপনি সূর্যকে এই যোগ শিখাইয়াছেন, তাহা কিরূপে সম্ভব?'[৩]

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন: হে অর্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে; তুমি সেগুলি সম্বন্ধে সচেতন নও। আমি অনাদি জন্মরহিত সর্বভূতের অধীশ্বর। নিজ প্রকৃতির সহায়ে আমি দেহধারণ করি। যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি মানুষকে সাহায্য করিবার জন্য আবির্ভূত হই। সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতির বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। যে যে-ভাবে আমাকে পাইতে চায়, সেই ভাবেই আমি তাহার কাছে যাই। কিন্তু হে পার্থ, জানিও কেহই আমার পথ হইতে কখনও বিচ্যুত হইতে পারে না।[৪]

কেহ কখনও বিচ্যুত হয় নাই। আমরাই বা কিরূপে হইব? কেহই ভগবানের পথ হইতে বিচ্যুত হয় না।

...সকল সমাজই একটা যা তা করিয়া খাড়া করা সাধারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ত্রুটিহীন সাধারণীকরণের উপরই (যথার্থ) নিয়ম গঠিত হইতে

১ গীতা—৩।৩৫

২ ঐ—৩।৩৭, ৪০

৩ ঐ—৪।১-৪

৪ ঐ—৪।৫-৮, ১১

পারে। প্রাচীন প্রবাদ কি? প্রত্যেক নিয়মের ব্যতিক্রম আছে।...যদি উহা সত্যই নিয়ম হয়, তবে তাহা লঙ্ঘন করা যায় না। কেহই উহা লঙ্ঘন করিতে পারে না। আপেল কি মাধ্যাকর্ষণের বিধি কখনও লঙ্ঘন করে? নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব আর থাকে না। এক সময় আসিবে, যখন আপনি নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন, এবং সেই মুহূর্তে আপনার চেতনা মন ও দেহ বিলীন হইয়া যাইবে।

ঐ তো একজন চুরি করিতেছে। কেন সে চুরি করে? আপনারা তাহাকে শাস্তি দেন। কেন, আপনারা তাহার কর্মশক্তি কি কোন কাজে লাগাইতে পারেন না?...আপনারা বলিবেন, সে পাপী। অনেকেই বলিবেন, সে আইন লঙ্ঘন করিয়াছে। বিশাল মানবগোষ্ঠীকে জোর করিয়া (বৈচিত্র্য-হীন) একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সেইজন্যই এত সব দুঃখযন্ত্রণা পাপ ও দুর্বলতা।...পৃথিবীকে যতটা খারাপ বলিয়া মনে করা হয়, পৃথিবী কিন্তু ততটা খারাপ নয়। মূর্খ আমরা পৃথিবীকে এতটা খারাপ করিয়াছি। আমরা নিজেরাই ভূতপ্রেত দৈত্যদানব সৃষ্টি করি, এবং পরে তাহাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাই না। আমরা নিজেদের চোখ ঢাকিয়া চীৎকার করি, 'কেহ আসিয়া আমাদিগকে আলো দেখান।'—নির্বোধ! চোখ হইতে হাত সরাইয়া লও! তাহা হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা দেবতাদের আহ্বান করি, কেহই নিজের উপর দোষারোপ করে না। বাস্তবিক ইহাই দুঃখের বিষয়। সমাজে এত মন্দ কেন? মন্দ কাহাকে বলে?—দেহসুখ ও শয়তানি ভাব। মন্দকে প্রাধান্য দাও কেন? মন্দগুলিকে এত বড় করিয়া দেখিতে কেহ তো বলে নাই। 'হে অর্জুন, আমার পথ হইতে কেহই সরিয়া যাইতে পারে না।'[১] আমরা নির্বোধ, আমাদের পথও নির্বোধের পথ। এই সব মায়ার ভিতর দিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। ভগবান স্বর্গই সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষ নিজের জন্য নরক সৃষ্টি করিয়াছে।

'কোন কর্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কর্মফলে আমার স্পৃহা নাই। যে-কেহ আমাকে এইভাবে জানে, সে কর্মকৌশল জানে এবং কর্মদ্বারা

---

১ গীতা—৪।১১

কখনও আবদ্ধ হয় না। প্রাচীন ঋষিগণ এই তত্ত্ব জানিয়া নির্বিঘ্নে কর্মে নিযুক্ত হইতেন। হে অর্জুন, তুমিও সেইভাবে কর্ম কর।'[১]

'যিনি প্রচণ্ড কর্মে গভীর শান্তভাব এবং গভীর শান্তভাবে প্রচণ্ড কর্ম দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।'[২] এখন প্রশ্ন এই: প্রতিটি ইন্দ্রিয় প্রতিটি স্নায়ু কর্মপরায়ণ হইলেও আপনার মনে গভীর প্রশান্তি আছে কি?—কোন কিছু আপনার মনকে চঞ্চল করে না তো? কর্মচঞ্চল বাজারের রাস্তায় দাঁড়াইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, চারিদিকে ভিড় ঘুরপাক খাইতেছে, তাহার মধ্যে আপনার মন কি ধ্যানমগ্ন ধীর ও শান্ত? অথবা গিরিগুহায় স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে কি আপনার মন তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল? যদি এইরূপ হয়, তবে আপনি যোগী—মুক্ত পুরুষ, নতুবা নন।

'যাঁহার প্রত্যেকটি কর্মপ্রচেষ্টা বন্ধনহীন, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ও স্বার্থরহিত, সত্য-দ্রষ্টাগণ তাঁহাকেই জ্ঞানী বলিয়া থাকেন।'[৩] যতক্ষণ স্বার্থবোধ থাকিবে, ততক্ষণ আমাদের নিকট প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হইবে না। নিজেদের অহঙ্কার দ্বারা আমরা সব-কিছুকে রঞ্জিত করি। বস্তুগুলি নিজস্ব রূপেই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়; তাহারা যে আবৃত তাহা নয়, কিছুই আবৃত থাকে না। আমরা তাহাদিগকে আবৃত করি। আমাদের মনবুদ্ধির তুলি দিয়া ভিন্নভাবে তাহাদিগকে চিত্রিত করি। যে-সকল জিনিস আমরা পছন্দ করি না, সেগুলি কাছে আসিলে আমরা সেগুলির উপর একটু তুলি বুলাইয়া দিই, তারপর সেগুলির দিকে তাকাইয়া থাকি।...আমরা কোন কিছু জানিতে চাই না। সব জিনিসকে আমরা নিজেদের রঙে রঙাইয়া লই। স্বার্থই সকল কর্মের প্রেরণাশক্তি। বস্তুর স্বরূপ আমাদের দ্বারাই আবৃত রহিয়াছে, গুটিপোকার মতো নিজেদের চারিদিকে জাল সৃষ্টি করিয়া আমরা তাহার মধ্যে আবদ্ধ হই। গুটিপোকা তাহার নিজের জালেই নিজে আবদ্ধ হয়। আমরাও ঠিক তাহাই করিতেছি। যখনই 'আমি' শব্দটি উচ্চারণ করি, তখনই একটি পাক খাইল। 'আমি ও আমার' বলামাত্র আর এক পাক খাইল। এইরূপে চলিতে থাকে...।

---

১ গীতা—৪।১৪-১৫

২ ঐ—৪।১৮

৩ ঐ—৪।১৯

কাজ না করিয়া আমরা এক মুহূর্ত থাকিতে পারি না। কাজ করিতেই হইবে। কিন্তু প্রতিবেশী যখন বলে, 'এস, সাহায্য কর', তখন মনে যে-ভাব উদিত হয়, নিজেকে সাহায্য করিবার সময়ও সেই ভাব পোষণ করিবেন। ইহার বেশী নয়। অপরের শরীর অপেক্ষা আপনার শরীর বেশী মূল্যবান্ নয়। অপরের দেহের জন্য যতটুকু করিয়া থাকেন, নিজের শরীরের জন্য তার বেশী করিবেন না। ইহাই ধর্ম।

'যাঁহার সকল কর্মপ্রচেষ্টা ফলতৃষ্ণা- ও স্বার্থবুদ্ধি-রহিত, তিনিই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্মের এইসকল বন্ধন দগ্ধ করিয়াছেন, তিনি জ্ঞানী।'[১] শুধু পুস্তক-পাঠের দ্বারা এই অবস্থা লাভ হয় না। একটি গর্দভের পৃষ্ঠে গোটা গ্রন্থাগারটি চাপাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে সে মোটেই জ্ঞানী হইয়া উঠিবে না। কাজেই বহু পুস্তক পড়িবার প্রয়োজন কি? 'কর্মে আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক সর্বদা পরিতৃপ্ত থাকিয়া এবং কোন লাভের প্রত্যাশা না করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম করেন, অথচ কর্মের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন।'[২]

মাতৃগর্ভ হইতে উলঙ্গ অবস্থায় এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, উলঙ্গ অবস্থাতেই ফিরিয়া যাইব। অসহায় অবস্থায় আসিয়াছিলাম, অসহায় অবস্থায় চলিয়া যাইব। এখনও আমি অসহায়। আমাদের গন্তব্য কোথায়, লক্ষ্য কি—এ অবস্থার কথা চিন্তা করাও আমাদের পক্ষে ভয়াবহ। কত অদ্ভুত অদ্ভুত ভাব আমাদের পাইয়া বসে, তাহাও আমরা জানি না। আমরা প্রেতাত্মার মিডিয়ামের কাছে যাই—ভূতপ্রেত যদি কোন সাহায্য করিতে পারে। ভাবুন, কী দুর্বলতা! ভূতপ্রেত, শয়তান, দেবতা—সব এস! পুরোহিত, ভণ্ড, হাতুড়ে—যে যেখানে আছ, সকলে এস! যে মুহূর্তে আমরা দুর্বল হই, ঠিক তখনই তাহারা আমাদের পাইয়া বসে এবং যত দেবতা আমদানি করে।

আমার দেশে দেখিয়াছি, কেহ হয়তো শক্তিমান্ ও শিক্ষিত হইয়া দার্শনিকভাবে বলে, 'এই সব প্রার্থনা পুণ্যস্নানাদি অর্থহীন।'...তারপর তাহার পিতা দেহত্যাগ করিলেন, তাহার মাতৃ-বিয়োগ হইল। হিন্দুর পক্ষে এই শোক এক প্রচণ্ড আঘাত। তখন দেখা যাইবে পূর্বোক্ত ব্যক্তি প্রতিটি কর্দমাক্ত কুণ্ডে স্নান করিতেছে, মন্দিরে যাইতেছে, সকলের দাসত্ব করিতেছে,

১ গীতা, ৪।১৯ ২ গীতা, ৪।২০

—যে পারো, সাহায্য কর! কিন্তু আমরা অসহায়! কাহারও নিকট হইতে কোন সাহায্য আসে না। ইহাই সত্য।

মানুষের সংখ্যা হইতে দেবতার সংখ্যা বেশী, তবুও কোন সাহায্য আসে না। কুকুরের মতো আমরা মরি, তবু কোন সাহায্য নাই। সর্বত্র পশুর মতো ব্যবহার, দুর্ভিক্ষ রোগ দুঃখ অসদ্ভাব! সকলেই সাহায্যের জন্য চিৎকার করিতেছে, কিন্তু কোন সাহায্য নাই। কোন আশা না থাকিলেও আমরা সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করিয়া চলিয়াছি। কি শোচনীয় অবস্থা! কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! নিজেদের অন্তরে অনুসন্ধান করুন। আমাদের এই দুঃখকষ্টের অর্ধেকের জন্য আমরা দোষী নই; মাতাপিতাই দায়ী। আমরা এই দুর্বলতা লইয়াই জন্মিয়াছি—এবং পরে আরও বেশী দুর্বলতা আমাদের মাথায় ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ধীরে ধীরে আমরা ইহা অতিক্রম করি।

নিজেকে অসহায় মনে করা—দারুণ ভুল। কাহারও কাছে সাহায্য চাহিও না। আমরা নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করি। যদি তাহা না পারি, তবে আমাদের সাহায্য করিবার কেহ নাই।...

'তুমি নিজেই তোমার একমাত্র বন্ধু এবং তুমি নিজেই তোমার একমাত্র শত্রু। আত্মা বা মন ছাড়া অন্য কোন শত্রু নাই, আত্মা বা মন ছাড়া অন্য বন্ধু নাই।'[১] ইহাই শেষ ও শ্রেষ্ঠ উপদেশ। কিন্তু ইহা শিখিতে কত কালই না লাগে! অনেক সময় মনে হয়, এই আদর্শ আমরা যেন ধরিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু পরমুহূর্তে পুরাতন সংস্কার আসিয়া পড়ে। আমাদের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যায়। দুর্বল হইয়া আবার সেই ভ্রান্ত সংস্কার ও অপরের সাহায্যকেই আঁকড়াইয়া ধরি। অপরের সাহায্য পাইব, এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া আমাদের যে বিরাট দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন! পুরোহিত তাহার নিয়মমত পূজা বা প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সম্ভবতঃ কিছু প্রত্যাশা করে। ষাট হাজার লোক আকাশের দিকে তাকাইয়া প্রার্থনা করে এবং প্রার্থনান্তে পুরোহিতের প্রাপ্য অর্থ দেয়। মাসের পর মাস লোকেরা আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে, প্রার্থনা করে ও পুরোহিতকে টাকা দেয়;

---

১ গীতা, ৬।৫

একবার ভাবিয়া দেখুন! ইহা কি পাগলামি নয়? পাগলামি ছাড়া ইহাকে আর কি বলা যায়? ইহার জন্য দায়ী কে? আপনারা ধর্মপ্রচার করিতে পারেন, ইহা শুধু অপরিণত শিশুদের মন উত্তেজিত করা! ইহার জন্য আপনাদের দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। অন্তরের অন্তস্তলে আপনারা কি? যে দুর্বল চিন্তাগুলি আপনি অন্যের মাথায় ঢুকাইয়া দিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির জন্য আপনাকে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ সহ মূল্য দিতে হইবে। কর্মের নিয়ম তাহার প্রাপ্য আদায় করিবেই।

জগতে একটিমাত্র পাপ আছে, তাহা দুর্বলতা। বাল্যকালে যখন মহাকবি মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্য পড়িয়াছিলাম, তখন শয়তানকেই একমাত্র সৎ ব্যক্তি বলিয়া শ্রদ্ধা করিতাম। তিনিই মহাপুরুষ, যিনি কখনও দুর্বলতার বশীভূত হন না, সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হন এবং জীবনপণ করিয়া সংগ্রাম করেন। ওঠ, জাগো, ঐ প্রকার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও···। পাগলের সংখ্যা আর বাড়াইও না। যে অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী, তাহার সহিত আর তোমার দুর্বলতা যুক্ত করিও না। জগতের কাছে আমি এই কথাই বলিতে চাই। শক্তিমান্ হও; ভূতপ্রেত ও শয়তানের কথা তোমরা যে বলো, আমরাই তো জীবন্ত শয়তান। শক্তি ও ক্রমোন্নতিই জীবনের চিহ্ন। দুর্বলতা মৃত্যুর চিহ্ন, যাহা কিছু দুর্বল, তাহাকে এড়াইয়া চলো। উহাই মৃত্যু। উহা যদি শক্তি হয়, তবে তাহার জন্য নরকেও যাও এবং ঐ শক্তি লাভ কর। সাহসীরাই মুক্তির অধিকারী। 'বীরপুরুষরাই স্ত্রীরত্নলাভের যোগ্য,' আর যাহারা সর্বাপেক্ষা বীর, শুধু তাহারাই মুক্তিলাভের যোগ্য। কাহার নরক? কাহার অত্যাচার? কাহার পাপ? কাহার দুর্বলতা? কাহার মৃত্যু? কাহার রোগ?

আপনারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন; যদি যথার্থই বিশ্বাস করিতেই হয়, তবে প্রকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাসী হউন। 'তুমি পুরুষ, তুমি স্ত্রী, তুমি সবল যুবকের পদবিক্ষেপে চলিতেছ, আবার জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ দণ্ডসহায়ে চলিতেছ।'[১] তুমিই দুর্বলতা, তুমিই ভয়, তুমিই স্বর্গ এবং তুমিই নরক; তুমিই সর্প হইয়া দংশন কর, রোজা হইয়া বিষমুক্ত কর;—তুমিই ভয়- মৃত্যু- ও দুঃখরূপে উপস্থিত হও।···

১ ছান্দোগ্য, ৭।২৩-২৪

সকল দুর্বলতা, সকল বন্ধনই আমাদের কল্পনা। সজোরে একটি কথা বলো, ইহা শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। দুর্বল হইও না, ওঠ, বাহির হইবার আর অন্য কোন পথ নাই। শক্ত হইয়া দাঁড়াও, শক্তিমান্ হও, ভয় নাই। কুসংস্কার নাই। নগ্ন সত্যের সম্মুখীন হও। দুঃখকষ্টের চরম—মৃত্যু যদি আসে, আসুক। প্রাণপণ সংগ্রামের জন্য আমরা কৃতসংকল্প। ধর্ম বলিতে আমি ইহাই জানি, আমি ইহা লাভ করি নাই, লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি সফল হইতে না পারি, তোমরা পারিবে। অগ্রসর হও।

'যেখানে একজন অপরকে দেখে এবং একজন অপরকে শোনে, যতক্ষণ দ্বৈতবোধ আছে, ততক্ষণ ভয় থাকিবেই, এবং ভয়ই সমস্ত দুঃখের কারণ।'[১]

যখন যেখানে একজন অপরকে দেখে না, যেখানে সবই এক,—সেখানে দুঃখী হইবার কেহ নাই, অসুখী হওয়ারও কেহ নাই। একই আছেন, দ্বিতীয় নাই—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। কাজেই ভয় করিও না; ওঠ, জাগো, যে পর্যন্ত লক্ষ্যস্থলে না পঁহুছিতেছ, সে পর্যন্ত থামিও না।

---

১ শ্বেতাশ্বতর ৪।৩

তথ্যপঞ্জী

তথ্যপঞ্জী

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ

পৃষ্ঠাঙ্ক

২৩১ রামায়ণ প্রাচীনতর : বাল্মীকি আদিকবি বলিয়া অভিহিত হন। ইহাতেও সূচিত হয়, রামায়ণই প্রাচীনতর। মহাভারতে বহু স্থানে রামায়ণের উপাখ্যানগুলির উল্লেখ আছে, কিন্তু রামায়ণের কোন স্থানেই মহাভারতের উল্লেখ নাই।

২৩৪ যে শ্লোক : মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকম্ অবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

২৪৩ অশ্বমেধ যজ্ঞ : সর্বলক্ষণযুক্ত একটি অশ্বের ললাটে জয়পত্র বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত, সঙ্গে সৈন্যসামন্ত থাকিত। কেহ অশ্বকে বাধা দিলে সঙ্গের সৈন্যেরা যুদ্ধ করিত। বৎসরান্তে অশ্ব ফিরিয়া আসিলে তাহাকে বধ করিয়া যজ্ঞ করা হইত। ফল স্বর্গ- ও মোক্ষলাভ।

২৪৮ হোমারের কাব্য : গ্রীক মহাকবি—খৃঃ পূঃ ৯ম শতাব্দী। Iliad ও Odyssey নামে দুই মহাকাব্য রচনা করেন। 'ইলিয়াডে' ট্রয় যুদ্ধের শেষ বৎসরের বিবরণ আছে। যুদ্ধশেষে ইউলিসিসের দশবৎসরব্যাপী ভ্রমণের কাহিনী লইয়া 'ওডিসি' রচিত।

২৪৯ স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানানুসারে :

অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা।
উন্মত্তজড়মূকাশ্চ যে চ কেচিন্নিরিন্দ্রিয়াঃ ॥
সর্বেষামপি তু ন্যায্যং দাতুং শক্ত্যা মনীষিণা।
গ্রাসাচ্ছাদনমত্যন্তং পতিতো হ্যদদদ্ভবেৎ ॥ মনু, ৯।২০১-২০২

—নপুংসক, পতিত, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, জড়, মূক, ইন্দ্রিয়শূন্য—ইহারা পিতৃ-ধনে অধিকারী নহে। রিকৃথভাগী সকলে ঐ ক্লীবাদি পুত্রদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন দিবে ; যদি না দেয়, তবে তাহারা পাপী হয়।

২৫৩ বহুপতিক যুগের : যে-স্থানে এবং যে-যুগে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কম থাকে, সেখানে সে-সময়ে বহুপতি-বিবাহ দেখা যায়।

পৃষ্ঠাঙ্ক

২৪৫ রাজসূয় যজ্ঞ : সম্রাটের করণীয় যজ্ঞবিশেষ। এই যজ্ঞে অধীন রাজারা আসিয়া ভৃত্যোচিত কর্ম করিয়া থাকেন।

২৫৬ মন্ত্রের নাম সাবিত্রী : গায়ত্রী মন্ত্র ; ব্রহ্মার শক্তি সাবিত্রী।

২৬৬ সৈরিন্ধ্রী : যে নারী পরগৃহে শিল্পাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। বিরাটগৃহে দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী নাম গ্রহণ করিয়া অজ্ঞাতবাস করেন।

২৬৯ অক্ষৌহিণী : ২১৮৭০টি রথ, ২১৮৭০টি হস্তী, ৬৫৬১০টি অশ্ব, ১০৯৩৫০টি পদাতিক—এই-সংখ্যক সেনা।

২৭১ যে গ্রন্থে : শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ।

২৯৭ Atavism : 'The recurrence, in a descendant, of characters of a remote ancestor ; reversion to a more primitive type.'—Webster.
—ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের মধ্যে পূর্বপুরুষের বৃত্তির পুনঃপ্রকাশ।

৩১৮ জনৈক রাজাকে : বিম্বিসার (রাজত্ব খৃঃ পূঃ ৫৩৭—৪৮৫)

৩২৪ Sermon on the Mount : New Testament, Matthew ৫-৭ম অধ্যায় এবং Luke ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত যীশুর উপদেশাবলী।

৩৫৫ Trinity : The union of three (the Father, the Son and the Holy Ghost) in one Godhead. খ্রীষ্টান ধর্মমতে ঈশ্বরের ত্রিত্ব—ঈশ্বরের মধ্যে পিতা, পুত্র ও পরম আত্মা, এই তিনের একীভবন।

৩৫৬ Gabriel : (ইংরেজী উচ্চারণ গেব্রিয়েল্) দেবদূত বিশেষ। ইনি মহম্মদের নিকট কোরানের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করেন।

৩৫৭ মুশা : Moses ইহুদীদিগের ধর্ম-নেতা। খৃঃ পূঃ ১৫৭১—১৪৫১।

৩৬৮ সেই ধর্মসম্প্রদায় : জৈন ধর্মসম্প্রদায়।

৪১৯ কল্প : ব্রহ্মার একদিন ; মানুষের ৪৩২ কোটি বৎসর।

পত্রাবলীর তথ্যপঞ্জী

বামদিকের সংখ্যাগুলি পত্রের ক্রমিক সংখ্যা; ১২৮ পর্যন্ত ৬ষ্ঠ খণ্ডে, ৩৬৪ পর্যন্ত ৭ম খণ্ডে, বাকী এই খণ্ডে—মোট ৫৫২ খানি পত্র। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ৭ম খণ্ডে 'ব্যক্তিপরিচয়' এবং এই খণ্ডে 'পত্রাবলীর সূচীপত্র' দ্রষ্টব্য।

পত্রসংখ্যা

১ কালাবাবুর কুঞ্জ: শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত বলরাম বসুর পিতামহ পরমবৈষ্ণব গুরুপ্রসাদ বসু বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম-সুন্দরের বিগ্রহ স্থাপনের জন্য বৃন্দাবনে এই কুঞ্জ বা দেবায়তনটি নির্মাণ করেন। কালাবাবু-নামক তাঁহাদের জনৈক কর্মচারী ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন বলিয়া স্থানীয় লোকেরা ইহাকে 'কালাবাবুর কুঞ্জ' বলিত। তদবধি ইহা এই নামেই পরিচিত।

২ বৃদ্ধ গুরুভ্রাতা: গোপালদা, বুড়োগোপাল বা স্বামী অদ্বৈতানন্দ ১৮৮৮ খৃঃ ৺কেদার-বদরিকা দর্শন করেন।

৩ অষ্টাধ্যায়ী: পতঞ্জলি-কৃত পাণিনি ব্যাকরণের 'মহাভাষ্য'। 'আমার গুরু-মহারাজের দুইখানা ফটোগ্রাফ'—ক্যামেরায় তোলা শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বসমেত চারিটি ফটো পাওয়া যায়—দুইটি দণ্ডায়মান, একটি ধ্যানে উপবিষ্ট এবং আর একটি শেষ-শয্যায় শায়িত অবস্থায়। প্রথম ফটোটি গৃহীত হয় ১৮৭৯ খৃঃ ২১শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় কেশব সেনের বাসভবন 'কমলকুটীরে'। ফটোটিতে দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ গভীরসমাধিমগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান, দক্ষিণহস্ত ঊর্ধ্বে উত্তোলিত এবং অঙ্গুলিসকল মৃগমুদ্রাযুক্ত, বাম হস্তটি বক্ষোদেশে সংস্থাপিত ও বিশেষ মুদ্রাযুক্ত, মুখশ্রী দিব্যহাস্যে উৎফুল্ল। তাঁহার দ্বিতীয় ফটোটি গৃহীত হয় ভক্তবর সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাহায্যে রাধা-বাজারে বেঙ্গল ফটোগ্রাফের স্টুডিওতে। শ্রীরামকৃষ্ণ ক্যামেরা দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ হইলে এই ফটো তোলা হয়। তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি একটি থামের উপর স্থাপিত, বাম হস্ত বক্ষোদেশের

পত্রসংখ্যা

কিঞ্চিৎ নিম্নে সন্নিবদ্ধ, পরিধানে ধুতি, গায়ে ফুলহাতা কামিজ, কামিজের উপর রঙীন কোট। ধ্যানাসনে উপবিষ্ট সমাধিস্থ ফটোখানি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজীউর মন্দিরের বারান্দায় তোলা। —কোন্ দুইখানি স্বামীজী পাঠাইয়াছিলেন, বলা কঠিন।

'উপদেশের কিয়দংশ—কোনও ব্যক্তি সঙ্কলিত'—এই পত্রটি ১৯.১১.৮৮ তারিখে লিখিত, তৎপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের যে-সকল সংকলন প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) পরমহংসের উক্তি—কেশবচন্দ্র সেন সংকলিত। (২৪শে জানুআরি, ১৮৭৮) ১০ পৃঃ।

(২) পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি, ১ম ভাগ—সুরেশচন্দ্র দত্ত সংকলিত। (১২৯১ সাল, ইং ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৮৪) ২৪ পৃঃ। ১৮৮৬ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের অব্যবহিত পরে ইহার ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়।

(৩) তত্ত্বসার—রামচন্দ্র দত্ত সঙ্কলিত। বৈশাখ, ১২৯২ সাল (ইং ১৮৮৫) ১৩৯ পৃঃ।

(৪) তত্ত্বপ্রকাশিকা বা শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—রামচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও খণ্ডাকারে প্রকাশিত। ১৮৮৭ খৃঃ জুলাই মাসের মধ্যে তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়।

(৫) পরমহংসের উক্তি (২য় সংখ্যা) এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে গিরিশচন্দ্র সেন কর্তৃক প্রকাশিত। ১৮০৮ শক, মাঘ (২৪শে জানুআরি, ১৮৮৭) ৬৪ পৃঃ।

[দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস—সমসাময়িক দৃষ্টিতে']

—এখানে স্বামীজী সম্ভবতঃ সুরেশচন্দ্র দত্ত সংগৃহীত উপদেশাবলীর কথাই বলিয়াছেন।

৫ 'গুরুদেবের জন্মভূমি'—হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রাম।

৬ আঁটপুর : হুগলী জেলার অন্তঃপাতী তারকেশ্বরের নিকট একটি গ্রাম, স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি। ১৮৮৬ খৃঃ ২৪শে ডিসেম্বর

পত্রসংখ্যা

(Christmas Eve)—নরেন্দ্র প্রমুখ নয়জন গুরুভ্রাতা প্রজ্বলিত ধুনির সম্মুখে ভগবান্ ঈশার ত্যাগপূত জীবন আলোচনা করিতেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের উদ্দীপনায় সকলের মনে সন্ন্যাসের সংকল্প এবং সংঘগঠনের বাসনা দৃঢ় হয়।

'যে উপদেশামৃত'—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা শ্রীম ১৮৯৭ খৃঃ প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী ইংরেজী পুস্তিকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। ১৯০২ খৃঃ হইতে শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' বাংলায় প্রকাশিত হইতে থাকে। ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত-প্রকাশিত তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকাতেও শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ প্রকাশিত হইত।

কিন্তু স্বামীজীর পত্রটি ৭.২.৮৯ তারিখে লিখিত। অতএব অনুমিত হয়, স্বামীজী শ্রীম-লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশামৃতের অন্য কোন আদি সংস্করণের প্রশংসা করিয়াছেন। ১৮৯৭ খৃঃ শ্রীম-কর্তৃক ইংরেজী পুস্তিকার দুই খণ্ড প্রকাশিত হইলে স্বামীজী তাঁহাকে আরও দুইটি প্রশংসাসূচক পত্র লেখেন। এই গ্রন্থে ৩৭২ ও ৩৭৯ পত্রদ্বয় দ্রষ্টব্য।

১০ 'আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা'—মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী (১৮৩৯—১৯১১ খৃঃ), মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৯—১৯৫৬) ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০—১৯৬২)। পরবর্তী কালে সাধক-প্রকৃতি মহেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে এবং দর্শন ও শিল্প-বিষয়ে বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভূপেন্দ্রনাথ মনীষী পণ্ডিত, বাংলাদেশের বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ও গ্রন্থ-প্রণেতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার রচিত Swami Vivekananda: The Patriot and Prophet স্বামীজী সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ।

১২ 'Imitation of Christ'—টমাস আ কেম্পিস-বিরচিত এই গ্রন্থখানির কিছু অংশ 'ঈশা-অনুসরণ' নামে স্বামীজী বাংলায় অনুবাদ করেন। ষষ্ঠ খণ্ডে 'ভাববার কথা'র তথ্যপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

স্বামী অখণ্ডানন্দের 'স্মৃতিকথা'য় (১৮৪ পৃঃ) আর একটি

পত্রসংখ্যা

তথ্য পাওয়া যায়। 'বসুমতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় স্বামীজীর 'ঈশানুসরণ' প্রকাশিত (Imitation of Christ-এর বঙ্গানুবাদ) হইত।

'কেন শূদ্র উপনিষদ পড়িবে না?'—এ-সম্বন্ধে স্বামীজীর মতামত পত্রাবলীর অন্যত্র, 'ভারতে বিবেকানন্দ' গ্রন্থে এবং 'স্বামিশিষ্য-সংবাদে' ব্যক্ত হইয়াছে। 'নির্দেশিকা'য় যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

১৩ 'আমার সকল ব্রাহ্মণজাতীয় গুরুভ্রাতা'—স্বামীজীর সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে ব্রাহ্মণজাতীয় ছিলেন: শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী সারদানন্দ), তারকনাথ ঘোষাল (স্বামী শিবানন্দ), শশিভূষণ চক্রবর্তী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায় (স্বামী অখণ্ডানন্দ), হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী তুরীয়ানন্দ), যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী (স্বামী যোগানন্দ)। হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) ১৮৯৭ খৃঃ মঠে যোগদান করেন।

'নরেশচন্দ্রের একটি সুন্দর গীত'—বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে নদীয়া রাজবংশের কুমার নরেশচন্দ্র অন্যতম শ্যামাসঙ্গীত-প্রণেতা।

১৮ 'কলিকাতার একজন বাবুর বাসায়'—২৫শে ডিসেম্বরের পত্রে দ্রষ্টব্য: বৈদ্যনাথে পূর্ণবাবুর বাসায় কয়েকদিন আছি।

১৯ ডাক্তারবাবু: এলাহাবাদের ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র বসু।

২৪ বাবাজী: পওহারী বাবা—৭ম খণ্ডে ব্যক্তিপরিচয়ে এবং এই খণ্ডে 'মহাপুরুষ-প্রসঙ্গে' দ্রষ্টব্য।

৩৬ 'একটি বাবুর একটি ছোট্ট বাগানে'—গগনবাবুর বাগানবাড়ি।

৩৭ 'এলাহাবাদে এক ভ্রাতার পীড়ার সংবাদ'—যোগেন বা স্বামী যোগানন্দ এই সময় বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। (২০ নং পত্র দ্রঃ)।

'হৃষীকেশের খবর—মন ছুটিয়াছে'—কালী বা স্বামী অভেদানন্দ তখন সেখানে পুনঃ পুনঃ জ্বরে ভুগিতেছিলেন।

৪০ 'সুরেশবাবুর পীড়া'—১৮৯০ খৃঃ ২৫শে মে ৪০ বৎসর বয়সে উদরী রোগে কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন।

৪৩ 'আর একটি গুরুভাই আমার নিকটে ছিলেন'—স্বামী প্রেমানন্দ।

পত্রসংখ্যা

৪৭ 'খৃষ্টিয়ান রাজার অদ্ভুত আইনের জ্বালায়'—মহাসমাধির পর পরমহংস সন্ন্যাসীর মরদেহের সলিল-সমাধিই প্রশস্ত; কিন্তু তখন ইংরেজের আইনে কলিকাতায় তাহা নিষিদ্ধ থাকায় শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ দাহ করিতে হয়। কাশীতে ও উত্তরাখণ্ডে ঐরূপ আইন বলবৎ ছিল না, কারণ পরবর্তী কালে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী অদ্ভুতানন্দের মরদেহ গঙ্গাগর্ভে বিসর্জিত হয়।

'আমার এক ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব গুরুভ্রাতা'—শশীমহারাজ বা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।

৬২ 'কেন প্রশ্নে আমাদের নাই অধিকার'—ইংরেজী Our's not to reason why তুলনীয়: Charge of the Light Brigade কবিতায় Their's not to reason why.

৬৩ 'প্রায় সকল দক্ষিণী রাজার সঙ্গেই আলাপ হয়েছে'—এই সময়ের মধ্যে মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, রামনাদ প্রভৃতি রাজ্যের রাজাদের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হয়।

৬৫ 'মান্দ্রাজের লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে'—আলাসিঙ্গা পেরুমল, জি. জি., নরসিংহাচারিয়ার, সিঙ্গারভেলু মুদালিয়র, সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রভৃতি মান্দ্রাজের অনুগত শিষ্যেরা স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেন।

'যে দুজন স্বামীজী গতবারে জুনাগড়ে আপনার নিকট গিয়েছিলেন'—স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ।

৬৭ 'প্রত্যেক মন্দিরে কতকগুলি সংস্কৃত মন্ত্র প্রাচীন বাংলা অক্ষরে লেখা'—'চীন আর জাপানে সব মন্দিরের গায়ে ওঁ হ্রীং ক্লীং সব বড় বড় সোনালী অক্ষরে লেখা দেখেছি। সে অক্ষর বাংলার এত কাছাকাছি যে বেশ বোঝা যায়।' (—পরিব্রাজক)

৬৮ 'ব্রিজি মেডোজ'—মিস কেট স্যানবর্ন নিউ হাম্পশায়ার থেকে এসে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এ একটি পরিত্যক্ত খামার বাড়ি কিনে 'ব্রিজি মেডোজ'-রূপে তা পুনর্গঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেখানকার জীবন-প্রসঙ্গে দুখানি পুস্তক তিনি রচনা করেছেন। 'বাড়িটির আশেপাশে

পত্রসংখ্যা

ছিল মনোরম পাইন, রূপালি বার্চ ও বড় বড় এল্‌ম্ গাছের সারি, শালুকভরা একটি প্রাকৃতিক জলাশয় ও দুটি ছোট নদী, যার ছায়া-বিছানো তীরে ফুটত ফরগেট-মি-নটের গুচ্ছ। বাড়িটির অর্ধেক ছাদ জুড়ে একটি আঙুর গাছ উঠেছিল।'

'বস্টনের এক গ্রামে এক বৃদ্ধা মহিলা'—মিস কেট স্যানবর্ন। 'একটি পাগলাটে, ধুতিপরা মারাঠা ব্রাহ্মণ'—এই মারাঠা ব্রাহ্মণের নাম রাজোয়াড়ী, কিন্তু সকলে 'রিচি' বলে ডাকত। চিকাগো মেলায় ভারত-উৎপন্ন জিনিসপত্র বেচতে যায়। এই কড়া মেজাজের দোকানদারটি কাগজের রিপোর্টারের কাছে বরোদা-মহারাজের নিন্দা করে। কিন্তু রিপোর্টাররা এই ব্রাহ্মণটির নাম ভুলে যাওয়ায় পরদিন কাগজে বেরুল বিবেকানন্দ বরোদা মহারাজের নিন্দে করেছেন। (মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭)।

'এক বৃহৎ মহিলা-সভায় বক্তৃতা'—ঐ ক্লাবের ১৮৯৩ খৃঃ বার্ষিক রিপোর্ট থেকেও কোন তথ্য পাওয়া গেল না। জ্ঞাতব্য তথ্যের স্বল্পতা সত্ত্বেও পরবর্তী কালে ব্রুকলিন রমাবাঈ সার্কেলের ঘটনাবলীর আলোকে আমরা নিশ্চিত হ'তে পারি যে, স্বামীজী ব্রুকলিন রমাবাঈ সার্কেলের মহিলাদের কাছে ভারতের এবং তথাকার বালবিধবাদের যথার্থ চিত্র অঙ্কিত করেন, যে-চিত্র তাঁরা খুব একটা পছন্দ করেননি। (—New Discoveries)

'চিকাগো মেলার একজন কর্তা'—মিঃ পামার

'সোমবারে সেলেমে এক বৃহৎ মহিলাসভায় বক্তৃতা'—২৪শে অগস্ট, ১৮৯৩ খৃঃ 'সেলেম ইভনিং নিউজ'-এ এই সংবাদটি প্রকাশিত হয় : আগামী সোমবার ভারতাগত একজন জ্ঞানী সন্ন্যাসী 'থট্ এণ্ড ওয়ার্ক ক্লাবে'র সভ্যদের নিকট তাঁহার নিজের দেশ, ধর্ম ও রীতিনীতি সম্পর্কে বক্তৃতা করিবেন।…যে-সকল ভদ্রমহোদয় এবং মহিলাগণ সদস্য নন, তাঁহারা ক্লাবের কোন সদস্যের মারফত টিকিট পাইতে পারেন ; 'রাজা' তাঁহার দেশীয় পোশাক পরিধান করিবেন। (N. D. pp. 30-33)।

পত্রসংখ্যা

৭২ 'সেখানে একটি বক্তৃতায় ৮৭ ডলার মিলেছে'—চিকাগোর ৯০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত স্ট্রীটর নামক ক্ষুদ্র শহরের প্লাম্ব্ অপেরা হাউসে প্রায় ছয়শত লোকের উপস্থিতিতে বক্তৃতাটি হইয়াছিল। বিষয়: তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের দ্বারা আর্যজাতির সহিত তাঁহাদের বর্তমান বংশধরগণের সম্পর্কপ্রতিষ্ঠা। (N. D. p. 104)

৭৭ 'আমাদের ধর্মের যে-সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম'—চিকাগো মেলার বিজ্ঞান বিভাগে ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, স্বামীজী 'The Essence of Hindu Religion' প্রসঙ্গে বক্তৃতা করেন। (—Lectures in America etc. by P. C. Mazoomdar)।

৮১ 'লীনের এক মহিলা'—মিসেস ব্রীড। (ব্যক্তিপরিচয় দ্রষ্টব্য)

৮৬ '১৭ তারিখে লীন ক্লাবের নিমন্ত্রণ'—লীন বস্টন শহর হইতে দশ মাইল দূরবর্তী একটি শিল্পনগরী। স্বামীজী লীনে দুইটি বক্তৃতা করেন, প্রথমটি ১৭ই এপ্রিলের বিকালে নর্থ শোর ক্লাবে এবং দ্বিতীয়টি ১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যায় অক্সফোর্ড হলে জনসাধারণের সমক্ষে। নর্থ শোর ক্লাবের একটি ক্যালেণ্ডারে পাওয়া যায় ১৭ই এপ্রিলের বক্তৃতার বিষয় ছিল: The Manners and Customs of India. (N. D. p. 366)।

৮৭ 'মান্দ্রাজে একটা প্রকাণ্ড সভা আহ্বান'—১৮৯৪ খৃঃ জুন মাসে মান্দ্রাজে স্বামীজীর অভিনন্দন-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সংবাদ ৩০শে অগস্ট 'বস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট'-এ প্রকাশিত হইলে স্বামীজী তাহা জানিতে পারেন।

১০১ 'মজুমদারের লেখা রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত'—১৮৭৯ খৃঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যায় The Theistic Quarterly Review পত্রের ৩২-৩৯ পৃষ্ঠায় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের লেখা 'The Hindu Saint' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। পরে উদ্বোধন কার্যালয় হইতে উহা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম ১৮৭৬ খৃঃ ১৬ই এপ্রিল 'Sunday Mirror' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

পত্রসংখ্যা

১০৩ 'সোয়ামস্কটে যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন এক অতি ধনী মহিলা'—স্বামীজী এই পত্রে জানান যে, তিনি উক্ত মহিলার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন, ২৬শে জুলাই (১৮৯৪)-এর একটি চিঠি সোয়ামস্কট হইতে লেখা ৩১শে জুলাইএর পত্রে স্বামীজী লিখিয়াছেন, 'মিস গার্নসি সোয়ামস্কট থেকে বাড়ি গেছেন'।

১০৪ মূল পত্রে কোন তারিখ নাই ; কলিকাতার সংবর্ধনা-সভা হইয়াছিল ৫ই সেপ্টেম্বর এবং স্বামীজী নিশ্চয়ই সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহের পূর্বে তাহা জানিতে পারেন নাই।

'কলকাতার এক অভিজাত-শ্রেষ্ঠ'—রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

১০৭ 'ডেট্রয়েটবাসিনী আর একটি উচ্চশিক্ষিতা মহিলা···একটি দ্বীপে আমায় নিয়ে যাবেন'—এই মহিলার নাম মিস ডাচার। 'থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে' ইঁহারই বাটীতে প্রায় দেড়মাসকাল থাকিয়া স্বামীজী তাঁহার আমেরিকান শিষ্য ও শিষ্যাগণের অধ্যাত্মজীবন গঠন করেন। মিস ডাচারও স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

'পাইন গাছের তলায়'—এখানে (গ্রীনএকারে) জনকতক আগ্রহশীল ছাত্র জুটিয়াছিল। তাহারা একটি প্রাচীন দেবদারু বৃক্ষের তলে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া স্বামীজীর মুখে বেদান্ত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিত। তদবধি সকলে ঐ বৃক্ষটিকে 'স্বামীজীর দেবদারু বৃক্ষ' (Swami's Pine) বলিয়া অভিহিত করিত।—(প্রমথনাথ বসুর 'স্বামী বিবেকানন্দ' ৪৫৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

১০৮ 'গাছতলায় আমাদের দলের একটি ছবি'—পাইন গাছের তলায় স্বামীজীর ছবি New Discoveries গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

১৩০ 'টাউন হলের সভায় যে প্রস্তাবগুলি হইয়াছে'—প্রস্তাবগুলি ছিল এইরূপ : (১) এই সভা হিন্দুধর্মের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর বিরাট ধর্মসভায় যে মহৎ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন ও পরে আমেরিকার অন্যান্য স্থানে যে-সকল কার্য করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। (২) এই সভা চিকাগো মহাসভার সভাপতি ও সাধারণভাবে আমেরিকার সকল

পত্রসংখ্যা

অধিবাসীকে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি সহৃদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। (৩) এই সভা উপরি-উক্ত দুইটি প্রস্তাব স্বামী বিবেকানন্দ, ডাঃ ব্যারোজ ও মিঃ স্নেলকে এবং সঙ্গের পত্রখানি স্বামী বিবেকানন্দকে পাঠাইয়া দিবার জন্য সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছেন।

১৩২ 'ইতিমধ্যেই নিউইয়র্কে একটা সমিতি স্থাপন করেছি'—শিক্ষামূলক প্রচারকার্যের সুবিধার জন্য স্বামীজী ১৮৯৪ খৃঃ নভেম্বরে নিউইয়র্কে একটি সমিতি গঠন করেন। ১৮৯৫ খৃঃ অধিকাংশ সময় কোন সমিতির সহায়তা ছাড়া কাজ করিলেও ইহার অস্তিত্ব বজায় ছিল। পরে (১৮৯৬ খৃঃ ফেব্রুআরির আগে) উক্ত সোসাইটি Vedanta Society of New York নামে পরিচিত হয়। গার্নসি পরিবার, মিসেস ওলি বুল, মিস ফিলিপ্স্, মিস ফার্মার, মিস থার্সবি প্রভৃতি কয়েকজন সেই সমিতির সভ্য ছিলেন। (N. D. pp. 460, 540)।

১৩t 'স্প্যাল্ডিংদের ওখানে খেতে গিয়েছিলাম'—বিখ্যাত বেহালাবাদক অ্যালবার্ট স্প্যাল্ডিং (Albert Spaulding) তাঁহার আত্মজীবনী 'Rise to follow'-তে লিখিয়াছেন, তাঁহার বাল্যাবস্থায় তাঁহাদের পরিবারের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় ছিল এবং তাঁহারা প্রায়ই স্বামীজীর বিষয় আলোচনা করিতেন। সেখানে আরও উল্লিখিত আছে যে, স্বামীজী একবার তাঁহাদের গৃহে নৈশভোজনে গিয়াছিলেন। (N. D. pp. 67, 381)।

১৩৮ 'ডাঃ ব্যারোজের ধর্মসভা সম্বন্ধে বিবরণ-পুস্তকখানি'—'The World's Parliament of Religions'.

১৪৩ 'জনৈক অবসরপ্রাপ্ত মিশনরী আমাকে'—এই মিশনরীর নাম রেভারেণ্ড হিউম, তিনি ভারতের একটি Christian Mission-এর ডিরেক্টর ছিলেন। ১৮৯৪ খৃঃ ১২ই মার্চ ডেট্রয়েট অপেরা হাউসে 'Christian Mission in India' প্রসঙ্গে স্বামীজী ভারতে খ্রীষ্টান মিশনরীদের কার্যকলাপের সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা করিলে রেভাঃ হিউম ২১শে মার্চ ম্যাসাচুসেট্স্ হইতে প্রকাশ্য বিতর্কের উদ্দেশ্যে

পত্রসংখ্যা

স্বামীজীকে এক পত্র লেখেন। স্বামীজী সংক্ষেপে তার উত্তর দেন। 'ইণ্ডিয়ান মিররের মহানুভব সম্পাদক'—নরেন্দ্রনাথ সেন; ১৮৯৫ খৃঃ ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা টাউন হলে স্বামীজীর সংবর্ধনা-সভায় ইনি বক্তৃতা করেন।

১৪৯ 'পরমহংস মহাশয়ের জীবনচরিত লিখে পাঠাব'—১৮৯৬ খৃঃ পূর্বে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই। ১৮৯৬ খৃঃ ২৪শে ফেব্রুআরি 'ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে' তিনি 'Sree Ramakrishna Paramahansadeva' প্রসঙ্গে বক্তৃতা করেন। পরে লণ্ডনেও স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা দুইটি একত্র 'My Master' নামে প্রকাশিত হয়। (শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস —সমসাময়িক দৃষ্টিতে ১৭১ পৃঃ দ্রঃ)।

১৫০ 'সন্ধ্যাকালটা পরমানন্দে কেটে গেল'—১৮৯৪ খৃঃ ২৮শে ডিসেম্বর স্বামীজী বস্টন হইতে ব্রুকলিনে যান এবং মিঃ হিগিন্‌স্ (Mr. Charles M. Higgins)-এর বাড়িতে সেইদিন সন্ধ্যায় আপ্যায়িত হন। সেদিনকার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল 'বৈদিক ধর্মের দর্শন'। 'মিঃ হিগিন্‌স্ আমার সম্বন্ধে যে পুস্তিকাটি ছাপিয়েছেন'—মিঃ চার্লস্ হিগিন্‌স্ ছিলেন ব্রুকলিন এথিক্যাল এসোসিয়েশনের একজন কর্মচারী। ১৮৯৪ খৃঃ নভেম্বর মাসে তিনি স্বামীজী সম্বন্ধে দশ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা ছাপাইয়া প্রাচ্যধর্ম-অধ্যয়নে উৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করেন। আমেরিকা ও ভারতবর্ষের সংবাদ-পত্রসমূহ হইতে তথ্য গ্রহণ করিয়া পুস্তিকাটি সুষ্ঠুভাবে রচিত হইয়াছিল। (N. D. p. 467-468)।

১৫১ ভারতবর্ষের জনসাধারণকে অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের পঙ্ক হইতে উদ্ধারের কাজ কত কঠিন এবং উহা সম্পাদনের নিমিত্ত কি পরিমাণ ত্যাগ ও চেষ্টার প্রয়োজন, তাহা অতি পরিষ্কার জোরালো ভাষায় এই পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। এ সম্পর্কে ধনী অভিজাত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্তব্য অল্পকথায় ব্যক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত ভাবই পরে দেশের মধ্যে গঠনমূলক কর্মসূচীর জন্ম দিয়াছে।

পত্রসংখ্যা

১৫৭ মিসেস ওলি বুল একজন উত্তম অধিকারী। তাই তাঁহার পিতৃ-বিয়োগে স্বামীজী তাঁহাকে মামুলি ধরনে সান্ত্বনা না দিয়া মৃত্যু, পরকাল, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক প্রভৃতির কথা লিখিতেছেন। প্রথম-শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযোগী করিয়া একটি নক্সা এবং দু-তিনটি উপমার সাহায্যে মূল বৈদান্তিক তত্ত্ব স্বামীজী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা কঠোপনিষদের সংক্ষিপ্তসার।

১৬২ 'তোমরা ভগিনী চারজন'—মিঃ জর্জ ডব্লু হেলের দুই কন্যা মিস মেরী ও মিস হ্যারিয়েট হেল এবং তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্রী মিস হ্যারিয়েট ও মিস ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলি।

১৭৪ 'বার্বার হাউসে প্রদত্ত বক্তৃতা'—১৮৯৫ খৃঃ মিসেস বার্বার নামক একজন সমাজনেত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় স্বামীজী কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেইগুলিই 'Barbar's Lecture'.

'সহস্র-দ্বীপোদ্যান'—সেণ্ট লরেন্স নদীর উপর থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক নামক দ্বীপপুঞ্জ। মিস ডাচার নামে এক মহিলার আমন্ত্রণে স্বামীজী সেখানে তাঁহার কুটিরে ১৮৯৫ খৃঃ ১৯শে জুন হইতে ৬ই অগস্ট পর্যন্ত থাকিয়া প্রত্যহ বেদান্তাদি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার শিষ্য ও শিষ্যাগণের জীবন গঠন করেন। সর্বসমেত বারো জন শিষ্য সেখানে তাঁহার উপদেশ হইতে আধ্যাত্মিক প্রেরণালাভ করেন। এখানেই স্বামীজী ল্যাণ্ড্‌স্‌বার্গ (স্বামী কৃপানন্দ) ও মেরী লুইকে (স্বামী অভয়ানন্দ) সন্ন্যাস দান করেন এবং পাঁচজনকে ব্রহ্মচর্যব্রত ও অপর কয়েকজনকে 'মন্ত্র' দীক্ষা দেন। ঐ সময়কার উপদেশাবলী মিস ওয়াল্ডো কর্তৃক 'দেববাণী' (Inspired Talks) গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে।

১৭৭ 'যে সর্বজনীন মন্দির স্থাপিত হবার কথা উঠেছিল'—বস্টনের নিকট স্বামীজীর একটি 'সর্বজনীন মন্দির' (International University বা Temple Universal) স্থাপন করার ইচ্ছা ছিল—যেখানে সর্বধর্ম শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই বিশ্বমন্দির-প্রতিষ্ঠা বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই, যদিও রেঃ ড্রুম্যান ইহাকে স্বামীজীর প্রিয় আদর্শগুলির

পত্রসংখ্যা

মধ্যে অন্যতম বলিয়াছেন। ১৮৯৬ খৃঃ স্বামীজীর অনুরাগী মিস সারা ফার্মার ও ডঃ জেনস্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'Monsalvat School for the Study of Comparative Religions'-এর মধ্যেই সেই আদর্শ-রূপায়ণের প্রচেষ্টা আছে বলা চলে। (N. D. p. 588)।

১৭৮ 'মাদ্রাজ অভিনন্দন-সভার সভাপতি'—মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ বিচারপতি স্যর সুব্রহ্মণ্য আয়ার।

১৮০ 'এখন থেকে নিউইয়র্ক আমার প্রধান আস্তানা'—ব্রুকলিন এথিক্যাল সোসাইটিতে 'হিন্দুধর্ম' বক্তৃতার পর থেকেই স্বামীজীর আমেরিকার কাজ দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু গণ্যমান্য এবং ধনী ব্যক্তি তাঁহার ভাব গ্রহণ করিতে থাকে। শুধু আমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণের উপর নির্ভর না করিয়া এই সময় স্বামীজী নিউইয়র্কে একটি বাসা ভাড়া নেন; রাজযোগ জ্ঞানযোগ বিষয়ক বক্তৃতার পর যে যাহা দিত তাহাতেই খরচ চালাইতেন, ধ্যান ধারণায় অধিকাংশ সময় কাটাইতেন, রন্ধনাদিও নিজে করিতেন। কিছুকাল ল্যাণ্ড্স্বার্গ শিষ্যরূপে এখানে তাঁহার সঙ্গে ছিল।

১৮৩ 'আমি হাজারবার ঠুকেছি, এবারও ঠুকলাম…'—পত্রের পাণ্ডুলিপিতে দেখা গেল: 'টুকেছি' 'টুকলাম' আছে। 'চলন্তিকা'য়: টুকা টোকা দোষ উল্লেখ করা।

১৮৬ 'আমি এই মাত্র এখানে পৌছিলাম'—ইংরেজী পত্রে আছে 'I have just arrived home'. নিউইয়র্কের এই ঠিকানাই ছিল তখন স্বামীজীর বাড়ি বা আস্তানা; এখান হইতেই তিনি পার্সি গিয়াছিলেন, এখান হইতেই সহস্রদ্বীপোদ্যানে যান।

১৮৬ জনৈক ইংরেজের একখানি পত্র পেলাম—মিঃ স্টার্ডির আমন্ত্রণ পত্র।

১৯১ 'সেইজন্য ডাঃ ক্রম্যান্‌কে…একটা বড় হোটেলে নিয়ে যেতে হয়েছিল' —রেঃ ওয়াল্টার ক্রম্যান বাল্টিমোরে স্বামীজীকে চারটি হোটেলে লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার গায়ের কালো রং-এর জন্য কেহ স্থান দেয় নাই। অবশেষে 'Revert' নামে একটি বড় হোটেল স্বামীজীকে গ্রহণ করে।

পত্রসংখ্যা

১৯৮ 'জনৈক বন্ধুর সহিত প্রথমে পারি-তে যাইতেছি'—বন্ধুটির নাম মিঃ ফ্রান্সিস লেগেট।

২০৭ 'যদি শশীর আসা স্থির হয়'—বেদান্ত প্রচারের জন্য প্রথমে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের আমেরিকা যাইবার কথা। কিন্তু তিনি শুষ্ক চর্মরোগে ভুগিতেছিলেন বলিয়া ডাক্তারের পরামর্শে শীতপ্রধান দেশে যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন।

২১১ 'আমি ভারতবর্ষে লিখেছি একজনের জন্য'—স্বামীজী স্বামী সারদানন্দকে লিখিয়াছিলেন ইংলণ্ডে যাইবার জন্য, কিন্তু সারদানন্দ তখন যান নাই। পরে স্বামীজীর দ্বিতীয় বার আহ্বানে তিনি ১৮৯৬ খৃঃ মার্চ মাসে লণ্ডন যাত্রা করেন এবং পরে সেখান হইতে আমেরিকা যান।

২১৪ 'প্রিন্সেস হলে বক্তৃতা'—২২শে অক্টোবর ১৮৯৫ খৃঃ পিকাডিলির প্রিন্সেস হলে স্বামীজী 'আত্মজ্ঞান' প্রসঙ্গে একটি প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। লণ্ডনের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। (৯ম খণ্ডে 'কথোপকথন'—৪৩৬ পৃঃ দ্রঃ)।

২১৮ 'সম্পাদকের নাম মিঃ হাউইস'—চিকাগো মেলাতে অ্যাংলিকান চার্চের অন্যতম নেতা মিঃ ক্যানন হাউইস স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হন। 'The Dead Pulpit' নামক প্রবন্ধে তিনি Vivekanandaism প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।

২২৫ 'যেরূপ কার্য করিতেছ, তাহা অতি উত্তম'—এই সময় স্বামী অখণ্ডানন্দ রাজপুতানায় যে সেবাব্রতের সূচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে স্বামীজীর খুব উৎসাহ ছিল।

'আলোয়ারে আমার কতকগুলো চেলাপত্র আছে'—স্বামী অখণ্ডানন্দ জয়পুর হইতে আলোয়ারে যান এবং সেখানে স্বামীজীর শিষ্য গোবিন্দ সহায়জীর বাড়িতে আট-দশ দিন থাকিয়া একটি সাপ্তাহিক সমিতি স্থাপন করেন। 'স্বামী অখণ্ডানন্দ'—১০৫ পৃঃ দ্রঃ।

২৩১ 'স্বর্গীয় দম্পতি'—১৮৯৫ খৃঃ ফ্রান্সিস লেগেট ও মিস ম্যাকলাউডের ভগ্নী মিসেস বেটি স্টার্জিস পারি-তে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। এই দম্পতিকেই 'স্বর্গীয় দম্পতি' বা 'স্বর্গের পাখী' বলা হইয়াছে।

পত্রসংখ্যা

২৩২ 'যে সন্ন্যাসীটি আসছেন'—স্বামী সারদানন্দের কথা স্বামীজী উল্লেখ করিয়াছেন। সারদানন্দ ইহার প্রায় তিন মাস পরে আলমবাজার মঠ হইতে যাত্রা করিয়া এপ্রিল মাসে লণ্ডনে পৌছান।

২৩৩ 'সেক্রেটারির পত্র পেয়েছি,···বক্তৃতা দেবো'—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে মিঃ ফক্সের আমন্ত্রণে স্বামীজী ১৮৯৬ খৃঃ ২৫শে মার্চ দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অনেক অধ্যাপক ও শত শত গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের সম্মুখে 'Philosophy of the Vedanta' প্রসঙ্গে একটি গভীর তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটি ছাত্রদের আগ্রহে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়, ভূমিকা লিখিয়া দেন অধ্যাপক রেভাঃ এভারেট।

'চারখানি ছোট ছোট বই তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে'—রাজযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এই চারিটি পুস্তক ছাপাইতে স্বামীজী তৎপর হইয়াছিলেন।

২৩৫ 'এরা এখন একজন সঙ্কেতলিপিকার নিযুক্ত করেছে'—মিঃ গুডউইন (ব্যক্তিপরিচয় দ্রষ্টব্য)।

২৩৯ 'শশী কেমন স্থান জাগিয়ে বসে থাকে'—অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ সকলেই তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেও শশী বা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রথমে বরাহনগর মঠে ও পরে আলমবাজার মঠে একনিষ্ঠভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৯৭ খৃঃ স্বামীজীর আদেশে তিনি মাদ্রাজে প্রচারকার্য করিতে যান।

'কালী ও যোগেন টাউন হল মিটিং···'—১৮৯৪ খৃঃ ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা টাউন হলে নাগরিকদের পক্ষ হইতে অনুষ্ঠিত স্বামীজীর অভিনন্দন-সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে স্বামী অভেদানন্দ ও যোগানন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

'নিরঞ্জন সিলোন প্রভৃতি স্থানে অনেক কার্য করিয়াছে'—স্বামী নিরঞ্জনানন্দ সিংহল ও দক্ষিণ ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচার করিয়া ১৮৯৫ খৃঃ প্রারম্ভে আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন।

২৪০ 'সারদা কি বাংলা কাগজ বার করবে বলছে?'—১৮৯৪ খৃঃ হইতেই স্বামীজী তাঁহার গুরুভ্রাতাগণকে একটি বাংলা কাগজ বাহির

পত্রসংখ্যা

করিবার জন্য উৎসাহ দিয়া আসিতেছিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ (সারদা) ১৮৯৬ খৃঃ গোড়ার দিকেই ইহার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, কিন্তু তাঁহার সম্পাদনায় ও অধ্যক্ষতায় 'উদ্বোধন' পত্রিকা পাক্ষিক আকারে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৮৯৯ খৃঃ ১৪ই জানুআরি (১লা মাঘ, ১৩০৫)। দশম বৎসর হইতে ইহা মাসিক আকারে বাহির হইতেছে।

২৪৩ 'গঙ্গাধর খুব বাহাদুরি করছে'—স্বামী অখণ্ডানন্দ ইতিপূর্বেই খেতড়ি ও রাজপুতানার অন্যান্য অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দরিদ্র প্রজা ও কৃষকদের উন্নতিবিধানের মধ্য দিয়া তিনি যে সেবা-ব্রতের সূচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে স্বামীজী খুব সন্তুষ্ট হন।

২৫৬ 'যাদের আমি সন্ন্যাস দিয়েছি, তাদের মধ্যে সত্যই একজন স্ত্রীলোক' —মেরী লুই নাম্নী এক ফরাসী মহিলা থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে স্বামীজীর বেদান্ত ক্লাসের ছাত্রী ছিলেন। ইঁহাকেই স্বামীজী সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করিয়া নাম দেন 'স্বামী অভয়ানন্দ'। সেখানে ল্যাণ্ড্স্বার্গ নামক আর একজন শিষ্যকেও স্বামীজী সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করিয়া 'স্বামী কৃপানন্দ' নাম দেন। ১৩ই ফেব্রুআরি ১৮৯৬ খৃঃ লিখিত স্বামীজীর পত্রে পাওয়া ডাঃ স্ট্রীট নামক একজন ধর্ম-প্রচারককে তিনি সন্ন্যাস দান করেন, তাঁহার নাম হয় যোগানন্দ।

২৬৮ 'নাইন্টিন্থ্ সেঞ্চুরিতে…প্রবন্ধ লিখেছেন'—১৮৯৬ খৃঃ অগস্ট মাসের The Nineteenth Century পত্রে 'A Real Mahatma' নামক প্রবন্ধে পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রবন্ধের শেষে ৩১টি উক্তি সঙ্কলিত হয়। এই প্রবন্ধে কেশবচন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও শিষ্য বলাতে কেশবভক্তেরা প্রবল আপত্তি জ্ঞাপন করেন। তাহারই ফলে ৩৯৫টি উক্তি সংগ্রহ করিয়া 'Rama-krishna : His Life and Sayings' নামক বৃহত্তর জীবনীটি লিখিত হয়। (শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস : সমসাময়িক দৃষ্টিতে ১৭০ পৃঃ দ্রঃ)।

২৬৯ 'একটি হিন্দু ছেলেকে দত্তক গ্রহণ'—এই ছেলেটির নাম অক্ষয়কুমার ঘোষ, পরে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার হইয়াছিলেন।

পত্রসংখ্যা

২৭২ 'সম্প্রতি কালীকে আনাব, তাকে তৈয়ার থাকতে বলো'—১৮৯৬ খৃঃ জুলাই মাসের শেষভাগে স্বামীজী ইওরোপ-ভ্রমণে বাহির হন এবং সেপ্টেম্বরের শেষে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার কিছুদিন পরেই স্বামী অভেদানন্দ (কালী) স্বামীজীকে সাহায্য করিবার জন্য লণ্ডনে উপস্থিত হন।

২৭৪ 'মিসেস মার্টিনের বাড়িতে একটা পার্টিতে'—নিমন্ত্রণ-সভায় স্বামীজী The Hindu Idea of Soul প্রসঙ্গে বক্তৃতা করেন।

২৭৫ 'তিনজন ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে সুইজরলণ্ডের পাহাড়ে যাচ্ছি'—বন্ধু তিনজন হলেন মিঃ এবং মিসেস সেভিয়ার ও মিস মূলার।

২৭৭ 'প্রবুদ্ধ ভারত-গুলি পৌছেছে'—১৮৯৬ খৃঃ জুলাই মাসে বি. আর. রাজম্ আয়ারের সম্পাদনায় মাদ্রাজ হইতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক ইংরেজী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ খৃঃ মে মাসে মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইলে পত্রের প্রকাশ মাত্র একমাসের জন্য অর্থাৎ ১৮৯৮ খৃঃ জুলাই মাসের জন্য বন্ধ থাকে; পরে আবার ১৮৯৮ খৃঃ অগস্ট মাস হইতে স্বামী স্বরূপানন্দের সম্পাদনায় ও মিঃ সেভিয়ারের পরিচালনায় আলমোড়ার 'টম্প্‌সন' হাউস হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৯৯ খৃঃ ১৯শে মার্চ অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রবুদ্ধ ভারতের অফিস মায়াবতীতে চলিয়া যায়। এই পত্রিকার জন্য স্বামীজী প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেন।

'আমার তৈরী প্রতীকটি দেখুন'—স্বামীজী মঠ ও মিশনের জন্য যে প্রতীকটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে আছে একটি কুণ্ডলীবদ্ধ সর্প, তাহার মধ্যে তরঙ্গায়িত জল (কর্মের প্রতীক), নবোদিত সূর্য (জ্ঞানের প্রতীক), প্রস্ফুটিত পদ্ম (প্রেমের প্রতীক) এবং হংস (আত্মা বা পরমাত্মার প্রতীক)। পরমাত্মাই আমাদের কর্ম, জ্ঞান ও প্রেম দান করেন। (৯ম খণ্ডে 'স্বামিশিষ্য-সংবাদ' ১৯০ পৃঃ দ্রঃ)।

২৮১ 'ম্যাক্সমূলার···শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখতে প্রস্তুত'—স্বামীজী, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার 'Ramakrishna :

পত্রসংখ্যা

His Life and Sayings' গ্রন্থটি রচনা করেন। ১৮৯৮ খৃঃ লণ্ডনের লংম্যান্‌স্ গ্রীন এণ্ড কোং কর্তৃক ইহা প্রকাশিত হয় এবং ১৯৫১ খৃঃ অদ্বৈত আশ্রম হইতে পুনর্মুদ্রিত হয়।

২৮৩ 'এনি বেস্যাণ্ট···ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা'—থিওজফিস্ট এনি বেস্যাণ্ট কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া স্বামীজী লণ্ডনে সেণ্ট জন্‌স্ উডে তাঁহার অ্যাভিনিউ রোডের বাসভবনে 'ভক্তি' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

৩১৬ 'একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী হচ্ছে'—স্মৃতিস্তম্ভটির ফলকে খোদিত আছে: সত্যমেব জয়তে। যে স্থানে মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জগতে বৈদান্তিক ধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রোথিত করিয়া অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ের পর তাঁহার ইংরেজ শিষ্যগণসহ ভারতভূমিতে প্রথম পবিত্র পদপঙ্কজ স্থাপন করেন, সেই পুণ্যস্থান চিহ্নিত করিবার উদ্দেশ্যে এই ৪০ ফুট স্মৃতিস্তম্ভ রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি কর্তৃক ১৮৯৭ খৃঃ ২৭শে জানুআরি তারিখে নির্মিত হইল।

৩২১ 'ভারতী পত্রিকায় মৎসম্বন্ধী প্রবন্ধ'—সরলা দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকা। সম্পাদিকার স্মৃতিকথা 'জীবনের ঝরা পাতা' দ্রষ্টব্য।

৩৩৭ 'যে-সব ছেলেরা শিক্ষা পাচ্ছে, তাদের একজন···ইঞ্জিনিয়র'—এখানে হরিপ্রসন্ন বা স্বামী বিজ্ঞানানন্দের কথা বলা হইয়াছে। তিনি উত্তর ও মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র ছিলেন। ১৮৯৭ খৃঃ তিনি চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া আলমবাজার মঠে যোগদান করেন।

৩৪৮ 'আসন্ন বিশ্বমেলা'—চিকাগো মহামেলার অনুকরণে প্যারিস প্রদর্শনী উপলক্ষে এক ধর্মমহাসভার অধিবেশন হইবার কথা ছিল, কিন্তু গোঁড়া খ্রীষ্টান মহলে বিবেকানন্দ-ভীতি ও বেদান্ত-ভীতি এত প্রবল হইয়াছিল যে, অবশেষে একটি ধর্মেতিহাস সভা (Congress of the History of Religions) আহ্বান করা হইয়াছিল। ইহাতে যোগদানের জন্য স্বামীজী ১৯০০ খৃঃ ২০শে জুলাই নিউইয়র্ক হইতে প্যারিস অভিমুখে রওনা হন। সেখানে তিনি ধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধেই বক্তৃতা দেন এবং দেশবিদেশের বহু মনীষীর সঙ্গে পরিচিত হন।

পত্রসংখ্যা

৩৮৭ 'ডন কাগজখানি'—স্বামীজীর বন্ধু হাইকোর্টের উকীল সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ডন' (Dawn) নামক মাসিক পত্রটি বাহির করেন। পূর্বে আলমবাজার মঠের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

'ব্রহ্মবাদিন্'—স্বামীজীর একান্ত অনুগত শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলের সম্পাদনায় এই পাক্ষিক পত্রটি ১৮৯৫ খৃঃ ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বামীজীর বহু বক্তৃতা পত্র প্রবন্ধ কবিতা ইহাতে প্রকাশিত।

৩৯৭ 'নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়টি'—১৮৯৮ খৃঃ ১২ই নভেম্বর ৺কালী-পূজার দিন বাগবাজার ১৬নং বোসপাড়া লেনে একটি ক্ষুদ্র ভাড়াটে বাড়িতে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্পণের পর নিবেদিতার পরিকল্পিত বালিকা বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়।

৩৯৮ 'কাশ্মীরের রাজা জমি দিতে রাজী'—কাশ্মীরে একটি সংস্কৃত কলেজ ও মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্যে স্বামীজী ঝিলাম নদীর তীরে একখণ্ড ভূমি পছন্দ করিয়াছিলেন এবং কাশ্মীরের মহারাজা উহা দান করিতে রাজী ছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন ইংরেজ রেসিডেন্ট মিঃ ট্যালবট (Adalbert Talbot) সাহেবের প্রতিকূলতায় প্রস্তাবটি কাউন্সিলে পর্যন্ত আলোচিত হইতে পারে নাই। (ভগিনী নিবেদিতার Notes of Some Wanderings : ১৫৮ পৃঃ দ্রঃ)।

৪০০ 'ফ্লোরেন্সের কোন প্রতিমূর্তির মতো যার চেহারা'—ভগিনী ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে ফ্লোরেন্সের ভেনাসের প্রতিমূর্তির সঙ্গে তুলনা করা হইত। স্বামীজী নিশ্চয় তাঁহার কথাই উল্লেখ করিতেছেন।

৪০১ 'দুজন আমেরিকান লেডি ফ্রেণ্ড মাত্র আছেন'—এই সময় মিস জোসেফাইন ম্যাকলাউড ও মিসেস ওলি বুলই স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন। ইঁহারা জাতিতে আমেরিকান না হইলেও সেখানেই তাঁহাদের কর্মভূমি ছিল।

৪০৮ 'নূতন বড়লাটকে সম্মান জ্ঞাপন করতে'—লর্ড কার্জন ১৮৯৯ খৃঃ বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করেন।

পত্রসংখ্যা

৪১৯ 'সারদা বলে, কাগজ চলে না'—এখানে নবপ্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' পত্রিকার কথা বলা হইতেছে।

৪৫৯ 'হোম অব্ ট্রুথ': লস্ এঞ্জেলেসের ধর্মীয় সমিতি, কতকটা ক্রিশ্চান সায়েন্সের মতো। স্বামীজী এখানে অনেক ক্লাস করেন ও বক্তৃতা দেন।

৫০৩ 'ক্যাপ্টেন সেভিয়ার বেচারা…এভাবে দুজন মহাপ্রাণ ইংরেজ'—ক্যাপ্টেন জে. এইচ. সেভিয়ার ১৮৯৭ খৃঃ স্বামীজীর সঙ্গে ভারতবর্ষে আসেন এবং এখানেই স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন। স্বামীজীর একান্ত অনুগত সেভিয়ার মায়াবতী আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্র পরিচালনার ব্যাপারে একনিষ্ঠভাবে সহায়তা করেন। ১৯০০ খৃঃ ২৮শে অক্টোবর মায়াবতী আশ্রমে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

স্বামীজীর একান্ত অনুগত শিষ্য জে. জে. গুডউইনও তাঁহার সঙ্গে ভারতবর্ষে আসেন এবং স্বামীজীর সঙ্গে পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার বক্তৃতাবলী সংকেতলিপিতে লিখিয়া রাখিতেন। তাঁহারই জন্য স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি আমরা পাঠ করিতে পারিতেছি। তিনি ১৮৯৮ খৃঃ ২রা জুন উতকামণ্ডে আন্ত্রিক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

৫১০ 'তারা এই পাহাড়ের উপর একটি সুন্দর আশ্রম স্থাপন করেছেন'—স্বামীজীর সহিত ভারতবর্ষে আসিয়া সেভিয়ার-দম্পতি অদ্বৈত বেদান্ত সাধনার জন্য হিমালয়ের ক্রোড়ে কোন নিভৃত স্থান খুঁজিতেছিলেন। আলমোড়ার বাড়িটি (টম্প্‌সন্ হাউস) তাঁহাদের যথেষ্ট নির্জন মনে হইল না। মিঃ সেভিয়ার ও স্বামী স্বরূপানন্দ আলমোড়া শহর হইতে ৫০ মাইল পূর্বে ৬,৮০০ ফুট উচ্চে একটি স্থান নির্বাচন করিলেন এবং এইভাবে ১৮৯৯ খৃঃ ১৯শে মার্চ হিমালয়ের অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইল।

৫৫১ 'আপনার অত্যন্ত সানুগ্রহ আমন্ত্রণের জন্য অশেষ ধন্যবাদ'—প্রায় দুই বৎসর পর স্বামীজী ঢাকার এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কতিপয় সন্ন্যাসী-শিষ্য সহ তিনি ১৯০১ খৃঃ ১৮ই মার্চ ঢাকা রওনা হন।

পত্রাবলীর সূচীপত্র

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	তারিখ	স্থান	উদ্দিষ্ট ব্যক্তি	ভাষা
২৫	১৮৯০	৩০ জানু.	গাজীপুর.	বলরাম বসু	বাং
২৬		৩১ "	"	প্রমদা মিত্র	"
২৭		৪ ফেব্রু.	"	"	"
২৮		৭ "	"	"	"
২৯		১৩ "	"	"	"
৩০		১৪ "	"	"	"
৩১		" "	"	বলরাম বসু	"
৩২		" "	"	সদানন্দ	"
৩৩		১৯ "	"	প্রমদা মিত্র	"
৩৪		— "	"	অখণ্ডানন্দ	"
৩৫		২৫ "	"	প্রমদা মিত্র	"
৩৬		মার্চ	"	অখণ্ডানন্দ	"
৩৭		৩ "	"	প্রমদা মিত্র	"
৩৮		৮ "	"	"	"
৩৯		১২ "	"	বলরাম বসু	"
৪০		১৫ "	"	"	"
৪১		" "	"	অতুল ঘোষ	"
৪২		— "	"	অখণ্ডানন্দ	"
৪৩		৩১ "	"	প্রমদা মিত্র	"
৪৪		২ এপ্রিল	"	অভেদানন্দ	"
৪৫		" "	"	প্রমদা মিত্র	"
৪৬		১০ মে	বরাহনগর	"	"
৪৭		২৬ "	বাগবাজার	"	"
৪৮		৪ জুন	"	"	"
৪৯		৬ জুলাই	"	সারদানন্দ	ইং
৫০	১৮৯১	১৪ এপ্রিল	আজমীঢ়	গোবিন্দসহায়	"
৫১		৩০ "	আবু পাহাড়	"	"

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	তারিখ	স্থান	উদ্দিষ্ট ব্যক্তি	ভাষা
৫২	১৮৯১	—	আবু পাহাড়	গোবিন্দ সহায়	ইং
৫৩		—	—	হরিদাস বিহারীদাস	”
৫৪	১৮৯২	২৬ এপ্রিল	বরোদা	”	”
৫৫		১৫ জুন	পুনা	”	”
৫৬		—	বোম্বাই	”	”
৫৭		২২ অগস্ট	”	”	”
৫৮		২০ সেপ্টে.	”	পণ্ডিত শঙ্করলাল	”
৫৯	১৮৯৩	—	মাড়গাঁও	হরিপদ মিত্র	বাং
৬০		২১ ফেব্রু.	হায়দরাবাদ	আলাসিঙ্গা	ইং
৬১		২৭ এপ্রিল	খেতড়ি	ডাঃ নঞ্জুণ্ডরাও	”
৬২		—	বোম্বাই	বালাজীরাও	”
৬৩		২৮ এপ্রিল	খেতড়ি	হরিদাস বিহারীদাস	”
৬৪		২২ মে	বোম্বাই	”	”
৬৫		— ”	খেতড়ি	”	”
৬৬		২৪ ”	বোম্বাই	ইন্দুমতী মিত্র	বাং
৬৭		১০ জুলাই	ইয়োকোহামা	আলাসিঙ্গা প্রভৃতি	ইং
৬৮	১৮৯৩	২০ অগস্ট	ব্রিজি মডোজ	আলাসিঙ্গা	ইং
৬৯		৩০ ”	সেলেম	অধ্যাপক রাইট	”
৭০		৪ সেপ্টে.	”	”	”
৭১		২ অক্টো.	চিকাগো	”	”
৭২		১০ ”	”	মিসেস উড্স্	”
৭৩		২৬ ”	”	অধ্যাপক রাইট	”
৭৪		২ নভে.	”	আলাসিঙ্গা	”
৭৫		১৯ ”	”	মিসেস উড্স্	”
৭৬		২৮ ডিসে.	”	হরিপদ মিত্র	বাং
৭৭	১৮৯৪	২৪ জানু.	”	মান্দ্রাজী ভক্তগণ	ইং
৭৮		২৯ ”	”	হরিদাস বিহারীদাস	”

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	তারিখ	স্থান	উদ্দিষ্ট ব্যক্তি	ভাষা
১০৬	১৮৯৪	২৬ জুলাই	সোয়ামস্কট	হেল ভগিনীগণ	ইং
১০৭		৩১ "	গ্রীনএকার ইন	মেরী ও হ্যারিয়েট হেল	"
১০৮		১১ অগস্ট	"	হেল ভগিনীগণ	"
১০৯		৩১ "	এনিস্কোয়াম	মেরী হেল	"
১১০		" "	যুক্তরাষ্ট্র	আলাসিঙ্গা	"
১১১		১৩ সেপ্টে.	বস্টন	ল্যাণ্ডস্‌বার্গ	"
১১২		" "	"	মেরী হেল	"
১১৩		১৯ "	"	ওলি বুল	"
১১৪		২১ "	আমেরিকা	আলাসিঙ্গা	"
১১৫		" "	"	কিডি	"
১১৬		২৫ "	নিউ ইয়র্ক	রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি	বাং
১১৭		২৬ "	বস্টন	ওলি বুল	ইং
১১৮		২৭ "	আমেরিকা	আলাসিঙ্গা	"
১১৯		২৯ "	"	"	"
১২০		— "	চিকাগো	হরিদাস বিহারীদাস	"
১২১		২২ অক্টো.	বাল্টিমোর	রামকৃষ্ণানন্দ	বাং
১২২		২৩ "	ওয়াশিংটন	বিহিমিয়া চাঁদ	ইং
১২৩		— "	বাল্টিমোর	মিসেস হেল	"
১২৪		—	ওয়াশিংটন	মেরী হেল	"
১২৫		২৬? "	"	ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলি	"
১২৬		২৭ "	"	ওলি বুল	"
১২৭		" "	"	আলাসিঙ্গা	"
১২৮		১৫ নভে.	চিকাগো	হরিদাস বিহারীদাস	"
১২৯		— "	"	"	"
১৩০		১৮ "	নিউ ইয়র্ক	রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	"
১৩১		১৯ "	"	আলাসিঙ্গা প্রভৃতি	"

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	তারিখ	স্থান	উদ্দিষ্ট ব্যক্তি	ভাষা
১৩২	১৮৯৪	৩০ নভে.	যুক্তরাষ্ট্র	আলাসিঙ্গা	ইং
১৩৩		” ”	”	কিডি	”
১৩৪		” ”	”	ডাঃ নঞ্জুণ্ডরাও	”
১৩৫		৮ ডিসে.	কেম্ব্রিজ	মেরী হেল	”
১৩৬		— ”	”	”	”
১৩৭		২১ ”	”	”	”
১৩৮		২৬ ”	যুক্তরাষ্ট্র	আলাসিঙ্গা	”
১৩৯		—	চিকাগো	গোবিন্দ সহায়	”
১৪০		—	যুক্তরাষ্ট্র	”	”
১৪১		—	চিকাগো	রামকৃষ্ণানন্দ	বাং
১৪২		—	—	অখণ্ডানন্দ	”
১৪৩		—	আমেরিকা	অনাগারিক ধর্মপাল	ইং
১৪৪		—	”	আলাসিঙ্গা	”
১৪৫		—	”	খেতড়ির মহারাজা	”
১৪৬		—	”	অভেদানন্দ	বাং
১৪৭		—	”	শিবানন্দ	”
১৪৮		—	—	মঠের ভ্রাতৃবৃন্দ	”
১৪৯		—	—	ব্রহ্মানন্দ	”
১৫০		২৮ ”	ব্রুকলিন	ওলি বুল	ইং
১৫১		—	চিকাগো	আলাসিঙ্গা	”
১৫২	১৮৯৫	৩ জানু.	”	সুব্রহ্মণ্য আয়ার	”
১৫৩		—	—	ব্রহ্মানন্দ	বাং
১৫৪		১১ ”	চিকাগো	জি. জি.	ইং
১৫৫		১২ ”	আমেরিকা	আলাসিঙ্গা	”
১৫৬		—	—	ব্রহ্মানন্দ	বাং
১৫৭		২০ ”	ব্রুকলিন	ওলি বুল	ইং
১৫৮		২৪ ”	নিউ ইয়র্ক	”	”

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	তারিখ	স্থান	উদ্দিষ্ট ব্যক্তি	ভাষা
১৫৯	১৮৯৫	১ ফেব্রু.	নিউ ইয়র্ক	মেরী হেল	ইং
১৬০*		২৪ জানু.	”	ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলি	”
১৬১		৯ ফেব্রু.	”	বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল	বাং
১৬২		১০ ”	”	মেরী হেল	ইং
১৬৩		১৪ ”	”	ওলি বুল	”
১৬৪		—	”	আলাসিঙ্গা	”
১৬৫		৬ মার্চ	আমেরিকা	”	”
১৬৬		২১ ”	নিউ ইয়র্ক	ওলি বুল	”
১৬৭*		২৫ ফেব্রু.	”	ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলি	”
১৬৮		৪ এপ্রিল	আমেরিকা	আলাসিঙ্গা	”
১৬৯		১০ ”	—	মিঃ লেগেট	ইং
১৭০		১১ ”	যুক্তরাষ্ট্র	রামকৃষ্ণানন্দ	বাং
১৭১		” ”	নিউ ইয়র্ক	ওলি বুল	ইং
১৭২		২৪ ”	”	মিঃ স্টার্ডি	”
১৭৩		—	”	”	”
১৭৪		২৫ ”	”	ওলি বুল	”
১৭৫		২ মে	আমেরিকা	কলিকাতার একজন	”
১৭৬		৫ ”	নিউ ইয়র্ক	হেল ভগিনীগণ	”
১৭৭		৬ ”	আমেরিকা	আলাসিঙ্গা	”
১৭৮		৭ ”	নিউ ইয়র্ক	ওলি বুল	”
১৭৯		১৪ ”	”	আলাসিঙ্গা	”
১৮০		২৮ ”	”	”	”
১৮১		— মে	”	ওলি বুল	”
১৮২		— জুন	”	ম্যাকলাউড	”
১৮৩		—	যুক্তরাষ্ট্র	রামকৃষ্ণানন্দ	বাং

* পত্রখানির তারিখ ঠিক আছে, ক্রমিক সংখ্যা সংশোধনীয়।

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	তারিখ	স্থান	উদ্দিষ্ট ব্যক্তি	ভাষা
২১১	১৮৯৫	২৪ সেপ্টে.	রিডিং ইংলণ্ড	ওলি বুল	ইং
২১২		৪ অক্টো.	”	মার্গারেট নোবল	”
২১৩		” ”	”	ব্রহ্মানন্দ	বাং
২১৪		— ”	”	মিস ম্যাকলাউড	ইং
২১৫		৬ ”	”	ওলি বুল	”
২১৬		— ”	”	মিসেস লেগেট	”
২১৭		২০ ”	”	মিস ম্যাকলাউড	”
২১৮		২৪ ”	”	আলাসিঙ্গা	”
২১৯		—	”	রামকৃষ্ণানন্দ	বাং
২২০		৩১ ”	(লণ্ডন)	মিঃ স্টার্ডি	ইং
২২১		” ”	”	মিস ম্যাকলাউড	”
২২২		—	”	ব্রহ্মানন্দ	বাং
২২৩		১ নভে.	চেলসী	মিঃ স্টার্ডি	ইং
২২৪		২ ”	—	”	”
২২৫		১৩ ”	লণ্ডন	অখণ্ডানন্দ	বাং
২২৬		১৮ ”	”	আলাসিঙ্গা	ইং
২২৭		২১ ”	”	—	”
২২৮		—	বৃটানিয়া (জাহাজ)	মিঃ স্টার্ডি	”
২২৯		৫ ডিসে.	”	এলবার্টা	”
২৩০		৮ ”	নিউ ইয়র্ক	ওলি বুল	”
২৩১		” ”	”	মিস ম্যাকলাউড	”
২৩২		” ”	”	মিঃ স্টার্ডি	”
২৩৩		১০ ”	”	—	”
২৩৪		১৬ ? ”	”	মিঃ স্টার্ডি	”
২৩৫		২০ ”	”	আলাসিঙ্গা	”
২৩৬		২৩ ”	”	সারদানন্দ	”
২৩৭		২৯ ”	”	মিস ফার্মার	”

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	তারিখ	স্থান	উদ্দিষ্ট ব্যক্তি	ভাষা
২৩৮	১৮৯৫	২৯ ডিসে.	রিজলী ম্যানর	মিঃ স্টার্ডি	ইং
২৩৯		—	—	মঠের ভ্রাতৃগণ	বাং
২৪০		” ”	—	ব্রহ্মানন্দ	”
২৪১		—	—	রামকৃষ্ণানন্দ	”
২৪২		—	আমেরিকা	আলাসিঙ্গা	ইং
২৪৩	১৮৯৬	জানু.	—	ত্রিগুণাতীতানন্দ	বাং
২৪৪		৬ ”	নিউ ইয়র্ক	মেরী হেল	ইং
২৪৫		১৬ ”	”	মিঃ স্টার্ডি	”
২৪৬		১৭ ”	”	ত্রিগুণাতীতানন্দ	বাং
২৪৭		২৩ ”	আমেরিকা	আলাসিঙ্গা	ইং
২৪৮		২৪ ”	”	যোগানন্দ	বাং
২৪৯		১০ ফেব্রু.	”	মেরী হেল	ইং
২৫০		১৩ ”	”	মিঃ স্টার্ডি	”
২৫১		১৭ ”	—	আলাসিঙ্গা	”
২৫২		২৯ ”	নিউ ইয়র্ক	মিঃ স্টার্ডি	”
২৫৩		— মার্চ	বস্টন	ত্রিগুণাতীতানন্দ	বাং
২৫৪		১৭ ”	নিউ ইয়র্ক	মিঃ স্টার্ডি	ইং
২৫৫		—	—	মেরী হেল	”
২৫৬		২৩ ”	বস্টন	আলাসিঙ্গা	”
২৫৭		— ”	আমেরিকা	”	”
২৫৮		—	”	”	”
২৫৯		৬ এপ্রিল	চিকাগো	ওলি বুল	”
২৬০		১৪ ”	নিউ ইয়র্ক	—	”
২৬১		” ”	”	ডাঃ নঞ্জুণ্ডরাও	”
২৬২		” ”	”	হেল ভগিনীগণ	”
২৬৩		” ”	”	ত্রিগুণাতীতানন্দ	বাং
২৬৪		— ”	লণ্ডন	মিঃ স্টার্ডি	ইং

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	তারিখ	স্থান	উদ্দিষ্ট ব্যক্তি	ভাষা
২৬৫	১৮৯৬	২৭ এপ্রিল	রিডিং, ইংলণ্ড	রামকৃষ্ণানন্দ	বাং
২৬৬*		২০ „	„	হেল ভগিনীগণ	ইং
২৬৭		— মে	লণ্ডন	এলবার্টা ?	ইং
২৬৮		৩০ „	„	ওলি বুল	„
২৬৯		„ „	„	মেরী হেল	„
২৭০		৫ জুন	„	—	„
২৭১		৭ „	„	মার্গারেট নোবল	„
২৭২		২৪ „	„	রামকৃষ্ণানন্দ	বাং
২৭৩		৩ জুলাই	রিডিং	রামকৃষ্ণানন্দ	বাং
২৭৪		৬ „	লণ্ডন	মিঃ লেগেট	ইং
২৭৫		৭ „	„	হেল ভগিনীগণ	„
২৭৬		৮ „	„	—	„
২৭৭		১৪ „	„	ডাঃ নঞ্জুণ্ডরাও	„
২৭৮		২৫ „	সুইজরলণ্ড	ওলি বুল	„
২৭৯		—	„	মিঃ স্টার্ডি	„
২৮০		৫ অগস্ট	(লণ্ডন)	লালা বদ্রীশাহ	„
২৮১		„ „	সুইজরলণ্ড	মিঃ স্টার্ডি	„
২৮২		৬ „	„	আলাসিঙ্গা	„
২৮৩		৮ „	„	„	„
২৮৪		„ „	„	মিঃ গুডউইন	„
২৮৫		„ „	„	মিঃ স্টার্ডি	„
২৮৬		১২ „	„	„	„
২৮৭		২৩ „	লুসার্ন	„	„
২৮৮		„ „	„	ওলি বুল	„
২৮৯		„ „	সুইজরলণ্ড	রামকৃষ্ণানন্দ	বাং

* পত্রখানির তারিখ ঠিক আছে, ক্রমিক সংখ্যা সংশোধনীয়।

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	তারিখ	স্থান	উদ্দিষ্ট ব্যক্তি	ভাষা
২৯০		২৬ অগস্ট	সুইজরলণ্ড	ডাঃ নঞ্জুণ্ডরাও	ইং
২৯১		— ”	”	কৃপানন্দ	”
২৯২	১৮৯৬	১০.সেপ্টে.	কিয়েল	মিঃ স্টার্ডি	ইং
২৯৩		১৭ ”	উইম্বলডন	হ্যারিয়েট হেল	”
২৯৪		” ”	উইম্বলডন	মেরী হেল	”
২৯৫		২২ ”	”	আলাসিঙ্গা	”
২৯৬		—	(লণ্ডন)	”	”
২৯৭		৭ অক্টো.	”	মিস ম্যাকলাউড	”
২৯৮		৮ ”	”	মিস ওয়াল্ডো	”
২৯৯		” ”	”	—	”
৩০০		২৮ ”	(লণ্ডন)	'ইণ্ডিয়ান মিরর'	”
৩০১		” ”	”	আলাসিঙ্গা	”
৩০২		১ নভে.	”	মেরী হেল	”
৩০৩		১১ ”	ওয়েস্টমিনস্টার	আলাসিঙ্গা	”
৩০৪		১৩ ”	”	—	”
৩০৫		২০ ”	লণ্ডন	আলাসিঙ্গা	”
৩০৬		২১ ”	”	লালা বদ্রীশাহ	”
৩০৭		২৮ ”	”	মেরী ও হ্যারিয়েট	”
৩০৮		৩ ডিসে.	”	এলবার্টা	”
৩০৯		” ”	”	মিস ম্যাকলাউড	”
৩১০		৯ ”	”	ওলি বুল	”
৩১১		১৩ ”	”	আমেরিকান মহিলা	”
৩১২		” ”	—	মিঃ লেগেট	”
৩১৩		২০ ”	ফ্লোরেন্স	এলবার্টা	”
৩১৪		” ”	”	ব্রহ্মানন্দ	”
৩১৫	১৮৯৭	৩ জানু.	ড্যাম্পিয়ার	মেরী হেল	”
৩১৬		৩০ ”	রামনাদ	”	”

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	তারিখ	স্থান	উদ্দিষ্ট ব্যক্তি	ভাষা
৩১৭		১২ ফেব্রু.	মাদ্রাজ	ব্রহ্মানন্দ	ইং
৩১৮		২৫ "	আলমবাজার মঠ	ওলি বুল	"
৩১৯	১৮৯৭	১৯ মার্চ	দার্জিলিং	শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী	সং
৩২০		২০ "	"	রামকৃষ্ণানন্দ	বাং
৩২১		৬ এপ্রিল	দার্জিলিং	সরলা ঘোষাল	বাং
৩২২		২৪ "	"	"	"
৩২৩		২৮ "	—	মেরী হেল	ইং
৩২৪		৫ মে	আলমবাজার মঠ	ওলি বুল	"
৩২৫		" "	"	মার্গারেট নোবল	"
৩২৬		২০ "	আলমোড়া	সুধীর (শুদ্ধানন্দ)	"
৩২৭		" "	"	ব্রহ্মানন্দ	বাং
৩২৮		২৯ "	"	শশী ডাক্তার	ইং
৩২৯		৩০ "	"	প্রমদা মিত্র	বাং
৩৩০		১ জুন	"	—	ইং
৩৩১		" "	"	শুদ্ধানন্দ	সং
৩৩২		২ "	"	মেরী হেলবয়েস্টার	ইং
৩৩৩		৩ "	"	মার্গারেট নোবল	"
৩৩৪		" "	"	আমেরিকান ভক্ত	"
৩৩৫		১৪ "	"	ব্রহ্মানন্দ	বাং
৩৩৬		১৫ "	"	অখণ্ডানন্দ	"
৩৩৭		২০ "	"	মার্গারেট নোবল	ইং
৩৩৮		" "	"	ব্রহ্মানন্দ	বাং
৩৩৯		৩ জুলাই	"	শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী	সং
৩৪০		৪ "	"	মার্গারেট নোবল	ইং
৩৪১		৯ "	"	মেরী হেল	"
৩৪২		১০ "	"	ব্রহ্মানন্দ	বাং
৩৪৩		" "	"	মিস ম্যাকলাউড	ইং

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	তারিখ	স্থান	উদ্দিষ্ট ব্যক্তি	ভাষা
৩৭১	১৮৯৭	১২ অক্টো.	মরী	ব্রহ্মানন্দ	বাং
৩৭২		” ”	রাওলপিণ্ডি	‘শ্রীম’	ইং
৩৭৩		৩ নভে.	জম্মু	মার্গারেট নোবল	ইং
৩৭৪		১১ ”	লাহোর	ব্রহ্মানন্দ	বাং
৩৭৫		১৫ নভে.	লাহোর	ইন্দুমতী মিত্র	”
৩৭৬		” ”	”	ব্রহ্মানন্দ	”
৩৭৭		২৪ ”	ডেরাডুন	ইন্দুমতী মিত্র	”
৩৭৮		” ”	”	প্রেমানন্দ	”
৩৭৯		” ”	”	‘শ্রীম’	ইং
৩৮০		৩০ ”	দিল্লী	ব্রহ্মানন্দ	বাং
৩৮১		৮ ডিসে.	খেতড়ি	”	”
৩৮২		১৪ ”	”	”	”
৩৮৩		২৭ ”	জয়পুর	শিবানন্দ	ইং
৩৮৪	১৮৯৮	৩ জানু.	দেওঘর	মৃণালিনী বসু	বাং
৩৮৫		২৫ ফেব্রু.	বেলুড় মঠ	রামকৃষ্ণানন্দ	ইং
৩৮৬		” ”	”	রাজা প্যারীমোহন	”
৩৮৭		— মার্চ	—	রামকৃষ্ণানন্দ	”
৩৮৮		২ ”	—	মেরী হেল	”
৩৮৯		১৮ এপ্রিল	দার্জিলিং	মিস ম্যাকলাউড	”
৩৯০		২৩ ”	”	ব্রহ্মানন্দ	বাং
৩৯১		২৯ ”	”	মিস ম্যাকলাউড	ইং
৩৯২		২০ মে	আলমোড়া	মার্গারেট নোবল	”
৩৯৩		” ”	”	ব্রহ্মানন্দ	বাং
৩৯৪		৯ জুন	”	খেতড়ির মহারাজা	ইং
৩৯৫		১০ ”	”	মহঃ সর্ফরাজ হোসেন	”
৩৯৬		৩ জুলাই	কাশ্মীর	মিঃ স্টার্ডি	”
৩৯৭		১৭ ”	শ্রীনগর	ব্রহ্মানন্দ	বাং

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	তারিখ	স্থান	উদ্দিষ্ট ব্যক্তি	ভাষা
৩৯৮	১৮৯৮	১ অগস্ট	শ্রীনগর	ব্রহ্মানন্দ	বাং
৩৯৯		২৫ ”	”	মার্গারেট নোবল	ইং
৪০০		২৮ অগস্ট	”	মেরী হেল	”
৪০১		১৭ সেপ্টে.	”	হরিপদ মিত্র	বাং
৪০২		১৭ ”	”	খেতড়ির মহারাজা	ইং
৪০৩		১৬ অক্টো.	লাহোর	” ”	”
৪০৪		” ”	”	হরিপদ মিত্র	বাং
৪০৫		২৬ ”	বেলুড় মঠ	খেতড়ির মহারাজা	ইং
৪০৬		নভে. ?	”	” ”	”
৪০৭		১২ ”	কলিকাতা	মিস ম্যাকলাউড	”
৪০৮		১৫ ডিসে.	বেলুড় মঠ	খেতড়ির মহারাজা	ইং
৪০৯		” ”	”	—	”
৪১০		২৯ ”	দেওঘর	ওলি বুল	”
৪১১	১৮৯৯	২ ফেব্রু.	বেলুড় মঠ	মিস ম্যাকলাউড	”
৪১২		১৬ মার্চ.	”	মেরী হেল	”
৪১৩		১১ এপ্রিল.	”	—	”
৪১৪		১৬ ”	”	সরলা ঘোষাল	বাং
৪১৫		১৪ জুন	আলমবাজার	—	ইং
৪১৬		১৪ জুলাই	পোর্ট সৈয়দ	মিঃ স্টার্ডি	”
৪১৭		৩ অগস্ট	উইম্বলডন	মিস ম্যাকলাউড	”
৪১৮		”	”	মেরী হেলবয়েস্টার	”
৪১৯		১০ ”	লণ্ডন	ব্রহ্মানন্দ	বাং
৪২০		২ সেপ্টে.	রিজলী	—	ইং
৪২১		৪ ”	”	ওলি বুল	”
৪২২		১৪ ”	”	মিঃ স্টার্ডি	”
৪২৩		— ”	”	মেরী হেল	”
৪২৪		৩ অক্টো.	”	”	”

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	তারিখ	স্থান	উদ্দিষ্ট ব্যক্তি	ভাষা
৪২৫	১৮৯৯	৩০ অক্টো	রিজলী	মেরী হেল	ইং
৪২৬		—	"	মিঃ স্টার্ডি	"
৪২৭		১ নভে.	"	মার্গারেট নোবল	"
৪২৮		১৫ "	নিউ ইয়র্ক	"	"
৪২৯		" "	"	ওলি বুল	"
৪৩০		— "	"	মিঃ স্টার্ডি	"
৪৩১		২০ "	"	মেরী হেল	"
৪৩২		" "	আমেরিকা	ব্রহ্মানন্দ	বাং
৪৩৩		২১ "	নিউ ইয়র্ক	"	ইং
৪৩৪		২৬ "	চিকাগো	মিসেস লেগেট	"
৪৩৫		৩০ "	"	"	"
৪৩৬		৬ ডিসে.	লস এঞ্জেলেস	নিবেদিতা (মার্গারেট)	"
৪৩৭		১২ "	—	ওলি বুল	"
৪৩৮		২২ "	—	"	"
৪৩৯		— "	"	তুরীয়ানন্দ	বাং
৪৪০		২৩ "	"	নিবেদিতা	ইং
৪৪১		২৭ "	"	ওলি বুল (ধীরামাতা)	"
৪৪২		" "	"	মেরী হেল	"
৪৪৩	১৯০০	১৭ জানু.	"	ওলি বুল	"
৪৪৪		২৪ "	"	নিবেদিতা	"
৪৪৫		১৫ ফেব্রু.	"	"	"
৪৪৬		" "	"	ওলি বুল	"
৪৪৭		২০ "	প্যাসাডেনা	মেরী হেল	"
৪৪৮		২১ "	ক্যালিফোর্নিয়া	অখণ্ডানন্দ	বাং
৪৪৯		২ মার্চ	স্যান ফ্রান্সিস্কো	মেরী হেল	ইং
৪৫০		৪ "	"	ওলি বুল	"
৪৫১		" "	"	নিবেদিতা	"

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	তারিখ		স্থান	উদ্দিষ্ট ব্যক্তি	ভাষা
৪৫২	১৯০০	৭	মার্চ	স্যান ফ্রান্সিস্কো	মিস ম্যাকলাউড	ইং
৪৫৩		”	”	”	ওলি বুল	”
৪৫৪		৭	”	”	হরিভাই(তুরীয়ানন্দ)	বাং
৪৫৫		১২	”	”	ব্রহ্মানন্দ	”
৪৫৬		”	”	”	ওলি বুল	ইং
৪৫৭		”	”	”	মেরী হেল	”
৪৫৮		১৭	”	”	মিসেস লেগেট	”
৪৫৯		”	”	”	”	”
৪৬০		২২	”	”	মেরী হেল	”
৪৬১		২৫	”	”	নিবেদিতা	”
৪৬২		২৮	”	”	”	”
৪৬৩		৩০	”	”	মিস ম্যাকলাউড	”
৪৬৪		—	এপ্রিল	”	”	”
৪৬৫		১	”	”	ওলি বুল	”
৪৬৬		৬	”	”	নিবেদিতা	”
৪৬৭		৭	”	”	আমেরিকান বন্ধু	”
৪৬৮		”	”	”	মিসেস লেগেট	”
৪৬৯		৮	”	”	ওলি বুল	”
৪৭০		১০	”	”	মিস ম্যাকলাউড	”
৪৭১		১২	”	আলামেডা	আমেরিকান বন্ধু	”
৪৭২		১৭	”	—	মিঃ লেগেট	”
৪৭৩		১৮	”	আলামেডা	মিস ম্যাকলাউড	”
৪৭৪		২০	”	”	”	”
৪৭৫		২৩	”	—	মেরী হেল	”
৪৭৬		৩০	”	—	”	”
৪৭৭		২	মে	—	মিসেস ব্লজেট	”
৪৭৮		”	”	—	নিবেদিতা	”

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	তারিখ	স্থান	উদ্দিষ্ট ব্যক্তি	ভাষা
৪৭৯		২৬ মে	স্যান ফ্রান্সিস্কো	নিবেদিতা	ইং
৪৮০		১৭ জুন	লস এঞ্জেলেস	মেরী হেল	„
৪৮১	১৯০০	২০ জুন	নিউ ইয়র্ক	নিবেদিতা	„
৪৮২		২৩ „	„	মেরী হেল	„
৪৮৩		২ জুলাই	নিউ ইয়র্ক	নিবেদিতা	„
৪৮৪		১১ „	„	মেরী হেল	„
৪৮৫		১৮ „	„	তুরীয়ানন্দ	„
৪৮৬		২০ „	„	মিস ম্যাকলাউড	„
৪৮৭		২৪ „	„	„	„
৪৮৮		২৫ „	„	তুরীয়ানন্দ	„
৪৮৯		— অগস্ট	„	মায়াবতীর সাধু	বাং
৪৯০		১৩ „	প্যারিস	হরি ভাই	„
৪৯১		১৪ „	„	জন ফক্স	ইং
৪৯২		— „	„	হরি ভাই	বাং
৪৯৩		২৫ „	„	নিবেদিতা	ইং
৪৯৪		২৮ „	„	„	„
৪৯৫		১ সেপ্টে.	„	তুরীয়ানন্দ	বাং
৪৯৬		— „	„	„	„
৪৯৭		৩ „	„	মিসেস লেগেট	ইং
৪৯৮		১০ „	„	এলবার্টা	„
৪৯৯		২২ „	ব্রেটানে	„	„
৫০০		— অক্টো.	প্যারিস	মাদাম কাল্ভে	ফরাসী
৫০১		১৪ „	„	ক্রিস্টিন	„
৫০২		২৬ নভে.	পোর্ট টাউফিক	মিস ম্যাকলাউড	ইং
৫০৩		১১ ডিসে.	বেলুড় মঠ	„	„
৫০৪		১৫ „	„	ওলি বুল	„
৫০৫		১৯ „	„	নিবেদিতা	„

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	তারিখ	স্থান	উদ্দিষ্ট ব্যক্তি	ভাষা
৫০৬	১৯০০	২৩ "	দেওঘর	মৃণালিনী বস্থ	বাং
৫০৭		২৬ "	বেলুড় মঠ	রামকৃষ্ণানন্দ	"
৫০৮		২৬ ডিসে.	বেলুড় মঠ	মিস ম্যাকলাউড	ইং
৫০৯	১৯০১	৬ জানু.	মায়াবতী	ওলি বুল	"
৫১০		১৫ জানু.	"	মিঃ স্টার্ডি	ইং
৫১১		২৬ "	বেলুড় মঠ	ওলি বুল	"
৫১২		২ ফেব্রু.	"	"	"
৫১৩		১৪ "	"	মিস ম্যাকলাউড	"
৫১৪		১৭ "	"	"	"
৫১৫		২৯ মার্চ	ঢাকা	ওলি বুল	"
৫১৬		১৫ মে	বেলুড় মঠ	স্বরূপানন্দ	"
৫১৭		১৮ "	"	মেরী হেল	"
৫১৮		৩ জুন	"	রামকৃষ্ণানন্দ	বাং
৫১৯		—	"	"	ইং
৫২০		১৪ "	"	মিস ম্যাকলাউড	"
৫২১		১৮ "	"	"	"
৫২২		—	"	"	"
৫২৩		৫ জুলাই	"	মেরী হেল	"
৫২৪		৬ "	"	ক্রিস্টিন	"
৫২৫		২৭ অগস্ট	"	মেরী হেল	"
৫২৬		২৯ "	"	মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	"
৫২৭		৭ সেপ্টে.	"	"	"
৫২৮		" "	"	নিবেদিতা	"
৫২৯		৮ অক্টো.	"	"	"
৫৩০		৮ নভে.	"	মিস ম্যাকলাউড	"
৫৩১	১৯০২	৯ ফেব্রু.	বেনারস ক্যাণ্ট.	স্বরূপানন্দ	"
৫৩২		১০ "	"	ওলি বুল	"

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	তারিখ	স্থান	উদ্দিষ্ট ব্যক্তি	ভাষা
৫৩৩	১৯০২	১২ ফেব্রু.	বেনারস ক্যান্ট.	ব্রহ্মানন্দ	বাং
৫৩৪		” ”	”	নিবেদিতা	ইং
৫৩৫		১৮ ”	”	ব্রহ্মানন্দ	বাং
৫৩৬		২১ ”	”	”	”
৫৩৭		২৪ ”	”	”	বাং
৫৩৮		২১ এপ্রিল	বেলুড় মঠ	মিস ম্যাকলাউড	ইং
৫৩৯		১৫ মে	”	”	”
৫৪০		১৪ জুন	”	ওলি বুল	”

—পরিশিষ্ট—

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	তারিখ	স্থান	উদ্দিষ্ট ব্যক্তি	ভাষা
৫৪১	১৮৯৪	২০ অগস্ট	এনিস্কোয়াম	ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলি	ইং
৫৪২		২৬ সেপ্টে.	বস্টন	”	”
৫৪৩	১৮৯৫	৩ জানু.	চিকাগো	ওলি বুল	”
৫৪৪		২৭ মার্চ	নিউ ইয়র্ক	ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলি	”
৫৪৫		— মে	”	—	”
৫৪৬		— ”	ইউ. এস. এ.	খেতড়ির মহারাজা	”
৫৪৭		১৮ জুন	সহস্রদ্বীপোদ্যান	মিঃ লেগেট	”
৫৪৮		২৯ জুলাই	”	মিসেস স্টার্জেস	”
৫৪৯	১৮৯৬	—	রিডিং	—	”
৫৫০		মে	ইংলণ্ড	রামকৃষ্ণানন্দ	বাং
৫৫১	১৮৯৯	৬ মার্চ	বেলুড় মঠ	ঈশ্বর ঘোষ	ইং
৫৫২	১৯০০	২৮ ”	স্যান ফ্রান্সিস্কো	মেরী হেল	”

নির্দেশিকা